ISSN 0976-9463

তবুএকলব্য

ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
১৩ বর্ষ ৩য় সংখ্যা • অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৮

TABU EKALABYA

An International Peer Reviewed Refereed Research Journal on
Language, Literature, Culture & Human Sciences

বা
উ
ল

বিশেষ সংখ্যা

আমন্ত্রিত সম্পাদক ॥ তপন মণ্ডল
সম্পাদক ॥ দীপঙ্কর মল্লিক

দি গৌরী কালচারাল এন্ড এডুকেশনাল অ্যাসোসিয়েশন
হৃদয়পুর, নিবেদিতা পার্ক, কলকাতা ১২৭
সম্পর্ক : ৯৮৩০৪৪৪১৮/২৮

TABU EKALABYA

An International peer reviewed Research Journal on

Language, Literature, Culture & Human Sciences.

ISSUE : 13, Vol. 35, July-September 2018

ISSN : 0976-9463

TABU EKALABYA
An International peer reviewed Research Journal on Language
Literature & Human Sciences.
Invide Editor : Tapan Mondal

Editor : Dipankar Mallik

Executive Editor : Debarati Mallik & Tapas Pal.

Printed & Published by *Debarati Mallik* on behalf of
TABU EKOLABYA, Kolkata- 700009, West Bengal, India.
Contact No. : 9836733383 / 9836733393
e-mail : tabuekalabya@gmail.com
facebook : Tabu Ekalabya
Website : www.gouriculture.com
প্রাপ্তিস্থান : দে'জ, দিয়া, দে বুক স্টোর (দীপু), পাতিরাম, ধ্যানবিন্দু, পাতা বাহার।

মূল্য ১৯৯ টাকা

সভাপতি
বিপ্লব মাজী

মুখ্য উপদেষ্টা
স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ
রামকুমার মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক
দীপঙ্কর মল্লিক

যুগ্ম সম্পাদক
তপন মণ্ডল

কার্যকরী সম্পাদক
দেবারতি মল্লিক
তাপস পাল

সহ-সম্পাদক
দিব্যেন্দু পালধি

আহ্বায়ক
রামকৃষ্ণ মণ্ডল

উপদেষ্টামণ্ডলী : অধ্যাপক ও গবেষক

পবিত্র সরকার, সুমিতা চক্রবর্তী, তপোধীর ভট্টাচার্য, বরুণকুমার চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রততী চক্রবর্তী, হাবিব আর রহমান, বারিদ বরণ ঘোষ, শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী, দীপক রায়, বিকাশ রায়

উপদেষ্টামণ্ডলী : কবি ও লেখক

সেলিনা হোসেন, অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, ইয়াং জংজে, জ্যামি প্রোক্টর-খু, ট্রান্ কোয়াঙ কুই, জারকো মিলেনিক সমীর রক্ষিত, অমর মিত্র, সাধন চট্টোপাধ্যায়, জয়া মিত্র, শুভময় মণ্ডল

সম্পাদকমণ্ডলী

সত্যবতী গিরি, শহীদ ইকবাল, সোনালি মুখার্জি, মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায়, উদয়চাঁদ দাশ, রেজাউল করিম, হোসনে আরা জলি, বরেন্দু মণ্ডল, শ্যামাচরণ মণ্ডল, বিদিশা সিনহা, রাধেশ্যাম সাহা, সুব্রত ঘোষ, স্বপন কুমার আশ, সুবীর সেন, প্রিয়ব্রত ঘোষাল, শুভঙ্কর রায়, অর্ণব সাধুখাঁ, প্রসেনজিৎ বিশ্বাস, আশিষ রায়, মণিশঙ্কর মণ্ডল

কার্যকরী কমিটি

পুষ্পেন্দু মজুমদার, দীপক কুমার ঘোষ, অরুণাভ চক্রবর্তী, মধুসূদন সাহা, বাপ্পা প্রামাণিক, সুস্মিতা মণ্ডল

সূচি

রবীন্দ্রনাথের বাউল-ভাবনা / **মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায়**

বাউল রবীন্দ্রনাথ : 'রবীন্দ্রবাউল' / **সুরঞ্জন মিদ্দে**

বাউল গানে নারী / **লীনা চাকী**

গুরুবাদ ও লালনের তত্ত্বচিন্তা / **রাধেশ্যাম সাহা**

বাংলার বাউল : একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা / **সুভাষ মিস্ত্রী**

বাউল সংগীত : ধর্ম ও তত্ত্বের মেলবন্ধনে / **অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়**

লালনের গান : মানুষ হওয়ার সাধনা / **সুব্রত পুরকাইত**

বাউল দর্শনে মিলন ভাবনা ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা / **স্বরাজ কুমার দাশ**

একবিংশ শতকে বাঁকুড়ার বাউল / **সুমন্ত মণ্ডল**

মনের মানুষ / **মধুমিতা সরকার**

দেহতত্ত্বের দুই ভিন্ন ধারার সাধন-সংগীত তুকখা ও বাউল / **পবিত্র রায়**

বাংলার বাউল সাধনায় সুফি ও বৈষ্ণব সাধনার প্রভাব / **মমতা খাঁ**

খ্যাপা খুঁজে ফেরে পরশপাথব / **সুস্মিতা ঘোষ**

রবীন্দ্রজীবন ও সৃষ্টিকর্মে বাউল প্রেরণা / **নাজিমুল হক**

বাউল দর্শনে মরমিয়া সাধকেরা / **সৌমিত্র মুখোপাধ্যায়**

গানের গুরু, প্রাণের গুরু : কুবির গোঁসাই ও শাহ আব্দুল করিম / **পুষ্পেন্দু মজুমদার**

দেহের দেহলীতে অমৃতের আরাধনা : বাউলের পরম অভীষ্ট / **দীপায়ন পাল**

আধুনিক কবিতা ও বাউলমন / **রিয়া ঢোল**

বাউল গান ও ভবপ্রীতানন্দের ঝুমুর / **বরুণ মণ্ডল**

সহজিয়া শব্দ গানের ফকির লালন সাঁই / **দেবব্রত মণ্ডল**

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশি সংগীতে বাউল ভাবনা : সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা / **সুশান্ত মণ্ডল**

বাউলকথা : বিশ্বমানবতার চৈতন্যকথা / **অমিত দে**

জাতি ধর্মের ঊর্ধ্বে লালন ও তার বাউল গান / **অনামিকা মুখার্জি**

কবিগুরু ও বাউল রাজের সাক্ষাত সমাচার / **সোমালি চক্রবর্ত্তী**

জীবনমুখী লালনগীতি / **সুকন্যা রায়চৌধুরী**

রবীন্দ্রনাথের বাউলাঙ্গের গান / **অস্মিতা মিত্র**

জনপদাবলী : সম্প্রীতির সন্ধানে / **দীপঙ্কর মল্লিক**

‘খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ পাথর’ : প্রসঙ্গ বাউল / **মধুসূদন সাহা**

সুধীর চক্রবর্তীর ইন্টারভিউ/**দীপঙ্কর মল্লিক**

বাউলের টানে রবীন্দ্রনাথ/**সঞ্চিতা সাহা**

দিয়া-র নির্বাচিত বই

৪৪/১এ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৯
দূরভাষ - ৯৮৩৬৭৩৩৩৯৩/৯৮৩৬৭৩৩৩৮৩
e-mail : diyapublication@gmail.com
website : www.diyapublication.com

কাব্য-কবিতা

আলোক সরকার
কাব্যসমগ্র ১, ২, ৩ প্রতি খণ্ড ২৫০্
তরুণ সান্যাল
কাব্যসমগ্র ৩, ৪, ৫ প্রতি খণ্ড ২৫০্
শান্তি সিংহ
নির্বাচিত কবিতা ১ ১৫০্
বিশ্বানাথ প্রসাদ তিওয়ারী
ভাষান্তর : সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়
নির্বাচিত কবিতা ৫০্

উপন্যাস

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
পছন্দের পাঁচ উপন্যাস (পথের পাঁচালী, অপরাজিত, আরণ্যক, ইছামতি, অশনী-সংকেত) ৪০০্
মহাশ্বেতা দেবী
পছন্দের পাঁচ উপন্যাস (অরণ্যের অধিকার, চোট্টি মুণ্ডা এবং তার তীর, কবি গন্দ্যঘটী গাঞ্রির জীবন ও মৃত্যু, বেনে বউ, মাস্টার সাব) ৩০০্
সেলিনা হোসেন
পছন্দের পাঁচ উপন্যাস (হাঙর নদী গ্রেনেড , যাপিত জীবন, নীল ময়ূরের যৌবন, চাঁদবেনে, কাঁটাতারে প্রজাপতি) ৫০০্
দেবেশ রায়
তিনটি নভেলা ২০০্
সিদ্ধার্থ
ফিরে এসো মৃত্তিকা ১০০্
তানভীর মোকাম্মেল
দুই নগর ১০০্
শান্তি সিংহ
মাঘ নিশীথের কোকিল ৬০্
বিশ্বজিৎ কর্মকার
যাপনকথা ১০০্

গল্প

সমীর রক্ষিত
গল্প সমগ্র ১, ২, ৩, ৪ প্রতি খণ্ড ৩০০্
সিদ্ধার্থ/পরকীয়া ১০০্

গদ্য ও প্রবন্ধ গ্রন্থ

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য
গদ্য সংগ্রহ ৬০০্
বিপ্লব মাজী
গদ্য সংগ্রহ-১ (কবি ও কবিতা বিষয়ক) ৪৫০্
সভ্যতার সংঘাত : ইতিহাসের সমাপ্তি ৫০্
আইডেনটিটি ও বিশ্বায়ন ১২৫্
মার্কসবাদ ও পোস্টমডার্নিজম ৬০্
অচিন্ত্য বিশ্বাস সম্পাদিত
অনুপূরিত অদ্বৈত মল্লবর্মন ২০০্
তরুণ মুখোপাধ্যায়
কথাকার অমিয়ভূষণ মজুমদার ৬০্
স্বরাজ সেনগুপ্ত/ভাষার প্রতিমা ১৫০্
শঙ্করলাল ভট্টাচার্য
গদ্য সমগ্র ১ম খণ্ড ৩০০্
উদয়চাঁদ দাশ
দেশবিভাগ ও বাংলা আখ্যান ৪০০্
আখ্যান পরিক্রমা ৪০০্
বিজিত কুমার ঘোষ
কালজয়ী বাংলা গল্প ও অন্যান্য প্রবন্ধ ৩০০্

লোকসাহিত্য

বরুণকুমার চক্রবর্তী, দীপঙ্কর মল্লিক, গোপালচন্দ্র বাইন সম্পাদিত

লোকসংস্কৃতি : দেশে দেশান্তরে ৪০০

মণিলাল খান

রবীন্দ্রনাথের লোকসাহিত্য ও অন্যান্য প্রবন্ধ ১০০

সৌমেন সেন

লোকসংস্কৃতি : পরিসর, প্রজ্ঞা, পরম্পরা ১৫০

দীপঙ্কর মল্লিক

লোকায়ত সংস্কৃতি : তত্ত্বে ও সাহিত্যে ১৫০

মধ্যযুগচর্চা

সত্যবতী গিরি

প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যচর্চা ৪০০

সনৎকুমার নস্কর

প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য : পরিপ্রশ্ন ও পুনর্বিবেচনা ৩০০

আশিসকুমার দে

মধ্যযুগের আবহাওয়া : বিপন্ন গণকেরা ১০০

দীপঙ্কর মল্লিক

মধ্যযুগ ফিরে দেখা : রামেশ্বরের শিবায়ন ৬০

বৈষ্ণব পদাবলী : তত্ত্বে ও কাব্যে ২৫০

কবিকঙ্কণের অভয়ামঙ্গল : পাঠ প্রতিক্রিয়া ২০০

আদিত্যকুমার লালা সম্পাদিত

মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল ১৫০

রবীন্দ্রনাথ

বারিদবরণ ঘোষ

মোহিতলালের রবীন্দ্রনাথ ৩৫০

দীপঙ্কর মল্লিক

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব : অন্য রবীন্দ্রনাথ ১০০

রবীন্দ্র কবিতাপাঠ ১০০

নাটক

রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কালজয়ী বাংলা নাটক : পুনর্বিচার ২০০

অপূর্ব দে

নাট্যব্যক্তিত্বের মুখোমুখি ১০০

সাহিত্যের ইতিহাস

দীপঙ্কর মল্লিক

বাংলা সাহিত্যের সামগ্রিক ইতিহাস ৪৯৯

গবেষণা ও প্রবন্ধ গ্রন্থ

দীপঙ্কর মল্লিক

লোকসংস্কৃতির আলোকে বাংলা মঙ্গলকাব্য ৩০০

বাংলা উপন্যাসে জনজাতি সমাজ ও সংস্কৃতি ২০০

তাপস সাহা

বাংলা সাহিত্য গ্রন্থচিত্রণ তত্ত্ব, প্রকরণ ও ইতিহাস ২৫০

গুরুপদ অধিকারী

এই সময়ের বাংলা আখ্যান : আলোচনা ও বিশ্লেষণ ২০০

অর্পিতা দাস

বাংলা কবিতায় পুরাণ অনুসঙ্গের নবরূপায়ণ ২০০

কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়

উপন্যাসে নবমূল্যায়ন : উনিশ শতক ১৫০

ভাষাতত্ত্ব

দীপঙ্কর মল্লিক

ভাষাতত্ত্বের সহজপাঠ ৩৫০

চন্দন খাঁ

ভাষাতত্ত্ব ও ভাষার ইতিহাস ১০০

রেফারেন্স বুক

দীপঙ্কর মল্লিক

সাহিত্য টীকাকোষ ১৫০

অলংকার : তত্ত্ব ও প্রয়োগ ১৫০

একালের কবিতা : শৈলীবিজ্ঞানের পাঠ ৮০

কমলাকান্তের দপ্তর ৮০

কাব্যজিজ্ঞাসা ও কাব্যতত্ত্ব ৮০

একালের কবিতা : শৈলীবিজ্ঞানের পাঠ ৮০

সান্ত্বনা চক্রবর্তী সম্পাদিত

মধুসূদনের বীরাঙ্গনা : পাঠ প্রতিক্রিয়া ১৫০

বিদিশা সিনহা ও দীপঙ্কর মল্লিক সম্পাদিত

মানিকের পুতুল নাচের ইতিকথা : পাঠ প্রতিক্রিয়া ১৫০

রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপঙ্কর মল্লিক ও দেবযানী সেনগুপ্ত সম্পাদিত

মহাশ্বেতা দেবীর অরণ্যের অধিকার ২৫০

রবীন্দ্রনাথের বাউল-ভাবনা

মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায়

দূরে কেন আছ?
দ্বারের আগল ধরে নাচ,
বাউল আমারি এইখানে।

'শিশুভোলানাথ' (১৯২২)-এর 'বাউল' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ শিশুর মন ও মনস্তত্ত্বের নিরিখে বাউলের সান্নিধ্য লাভের আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহকে ব্যক্ত করেছেন। আসলে এই আগ্রহের নেপথ্যে শিশুর স্বেচ্ছাধীন কল্পনাপ্রবণ মনের মুক্তি-বাসনা প্রকাশিত। যেখানে পাঠশালা নেই, গুরুমশায় নেই, অভ্যস্ত জীবনের একঘেয়ে আবর্তন যেখানে জীবনকে শৃঙ্খলিত করে না, শিশুর সেখানেই অবাধ বিচরণের আকুলতা। সেখানে আছে খোলা মাঠ, বাতাসের দোলায় গাছের লুটোপুটি, আর স্বচ্ছ নীল আকাশের মন-ভোলানো হাতছানি। বাউলের উদাসী মন তাই কোথায় যেন মিলে যায় শিশু-মনের সঙ্গে। তার মন তো খাঁচায় বন্দী থাকার বস্তু নয়। ঘর অপেক্ষা 'বাহির'-এর প্রতি তার অধিক আকর্ষণ।

মন সদা যার চলে
যত ঘরছাড়াদের দলে।[১]

তাই ঘরছাড়া বাউলের সঙ্গে শিশুর মনোগত সাদৃশ্য দুর্লক্ষ্য নয়। কিন্তু শুধু কি শিশু? আমাদের সকলের মধ্যেই আছে পথের প্রতি টান। 'বিচিত্র প্রবন্ধে'র (১৯০৭) 'পথপ্রান্তে' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন, 'আমরা তো পথিক হইয়াই জন্মিয়াছি'[২], তখন তা যেন এক বাউল মনের অভিপ্রায়কেই ব্যক্ত করে। জমিদারী দেখাশোনার কাজে শিলাইদহে এসে বাউলদের খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ কবির হয়েছিল। তিনি নিজেই সে কথা স্বীকার করেছেন—'শিলাইদহে যখন আমি ছিলাম বাউলদের সঙ্গে আমার সর্বদা সাক্ষাৎ ও আলাপ আলোচনা হতো।' নন্দলাল সেনগুপ্তকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> বাউলের গান শিলাইদহে খাঁটি বাউলের মুখে শুনেছি ও তাদের পুরাতন খাতা দেখেছি। নিঃসংশয়ে জানি বাউল গানে একটা অকৃত্রিম বিশিষ্টতা আছে যা চিরকেলে আধুনিক।...আমার অনেক গান বাউল ছাঁচের, কিন্তু জাল করার চেষ্টা করিনি, সেগুলো স্পষ্টত রবীন্দ্র-বাউলের রচনা।

সুতরাং বাউল এবং বাউলের গান ছিল রবীন্দ্রনাথের বিশেষ আগ্রহের বিষয়। শিলাইদহ তখন

বাউল বৈষ্ণবদের প্রধান ক্ষেত্র ছিল। কবির মনোধর্মের সঙ্গে বাউলের প্রাণধর্মের বিশেষ কোনো পার্থক্য ছিল না। বাউলের গানের মানবতাবাদী প্রেরণা, শাস্ত্রাচারহীন মহামিলনের আদর্শ রবীন্দ্র-মানসের অনুকূল ছিল বলেই তাঁর 'রবীন্দ্রবাউলে'র পরিচয় অসার্থক হয়নি। বাউলের মরমিভাবনা ও হৃদয়বৃত্তির ভাবপ্লাবনের মতো বাউল সংস্কৃতিও কবির অনেক সৃষ্টির প্রেরণা হয়ে উঠেছে। 'শেষসপ্তক'(১৯৩৫)-এর তেতাল্লিশ সংখ্যক কবিতায় যেন আপন জীবন অনুভবের ভাষ্যই কবি রচনা করেছেন—

> তরুণ যৌবনের বাউল
> সুর বেঁধে দিল আপন একতারাতে,
> ডেকে বেড়ালো
> নিরুদ্দেশ মনের মানুষকে
> অনির্দেশ্য বেদনার খেপা সুরে।[৩]

বাউলের খেপা সুরের সন্ধান রবীন্দ্রনাথ তো পেয়েছেন অনেক আগেই। 'বাউল' কবিতাতেই বলেছেন—

> ওরি কাছে বুঝি
> আছে তোমার নাচের পুঁজি,
> তোমার খেপা পায়ের ছুটি?

এই 'খেপা' বা 'পাগল'-এর উল্লেখ রবীন্দ্র-রচনায় একাধিকবার এসেছে। 'বিচিত্র প্রবন্ধে'র 'পাগল' প্রবন্ধে যেমন বলেছেন—

> পাগল শব্দটা আমাদের কাছে ঘৃণার শব্দ নহে। ...আমাদের খেপা-দেবতা মহেশ্বর...। আমি ভাবিতেছিলাম, চারিদিকে পরিচিতের বেড়ার মধ্যে প্রাত্যহিক নিয়মের দ্বারা আমি বাঁধা— ...আজ আমার জরুরি কাজের বোঝা ঐ সৃষ্টিছাড়ার পায়ের কাছে ফেলিয়া দিলাম।[৪]

কবির প্রিয় পাগল-দেবতা মহেশ্বর পরম আনন্দময়। তিনি নিখিলকে 'নিয়মের বাহিরের দিকে টানিতেছেন।' 'বাউল' কবিতাতেও রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> আমায় শেখাও সুরে-গড়া
> তোমার তালা-ভাঙার পাঠ।

অবশ্য কবির বাউল খেপা মহেশ্বর নন। কিন্তু এঁরা দুজনেই আমাদের প্রতিদিনের তুচ্ছতার বাইরে নিয়ে যান। নিয়ে যান 'বাঁধা কাজে'র ছকে চলা জীবনের বাইরে। এই ব্যতিক্রমটুকুর মধ্য দিয়েই কবির বাউলকে প্রথম চেনা।

শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গগন হরকরা, কাঙাল হরিনাথ, গোঁসাই রামলাল, সর্বক্ষেপী বোষ্টমী, গোঁসাই গোপাল ও লালনের শিষ্য সম্প্রদায়ের সাক্ষাৎ হয়। তবে লালন ফকিরের সঙ্গে কবির দেখা হয়েছিল কি-না সেই বিতর্কিত প্রশ্নে না গিয়ে আমরা এ কথা বলতে পারি, লালনের গান কবিকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিল। "জীবনস্মৃতি"র 'গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ' অধ্যায়ে এবং ১৩১৪ সালে প্রকাশিত 'গোরা' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ লালনের 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কম্‌নে আসে যায়' গানটির উল্লেখ করেছেন। 'গোরা' উপন্যাসে প্রথম ব্যবহৃত এই গান শুধুমাত্র উল্লেখ হয়ে থাকেনি, কাহিনির ভাববস্তুকে স্বতন্ত্র তাৎপর্য দান করেছে। তবে এ পাখি শুধু যাওয়া-আসা

করে না, সে বলে 'বন্ধনহীন অচেনার কথা।' মন তাকে চিরন্তন করে ধরে রাখতে চায়—'ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতেম পাখির পায়।' কিন্তু পারা যায় না বলেই বাউলের গানের সুরে আক্ষেপ ঝরে পড়ে। উপনিষদও এমনই দুই পাখির কথা বলেছেন—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্যোহভিচাকশীতি॥

রবীন্দ্রনাথও বললেন খাঁচার পাখি ও বনের পাখির কথা, সীমা-অসীমের ব্যঞ্জনায় যার সার্থক রূপায়ণ। 'শান্তিনিকেতন ভাষণমালা'য় (১৯৩৫) সেই উপলব্ধির প্রগাঢ় উচ্চারণ—

> সমস্ত সীমার মধ্যে সীমার অতীত সেই অচেনাকে ক্ষণে ক্ষণে জানতে পারছি,— সেই অসীমকেই আমার করতে পারবার জন্য প্রাণে ব্যাকুলতা।[৫]

আর এই ব্যাকুলতার কারণেই বাউলের 'আমি কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যে রে'—কবির মানস-ভাবনার সঙ্গে নৈকট্য-সূত্র রচনা করে। 'সাহিত্যের পথে' (১৯৩৬)-র 'সাহিত্যতত্ত্ব' প্রবন্ধেও এ গানের উল্লেখ আছে। সেখানে রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মের সত্য-স্বরূপের অন্তর্গত 'আমি আছি'(I am) প্রসঙ্গে এ কথা বলেছেন। বাউল জীবনের যে মরমি অন্তরপুরুষ, তিনি সীমারূপের অতীত। বাউলের মতো কবিও সারাজীবনে তাঁর সন্ধান করেছেন এবং অন্তরসত্তায় উপলব্ধি করেছেন তাঁকে। তবে শুধু লালনের গান নয়, শিলাইদহ পোস্ট-অফিসের ডাকহরকরা বাউল কবি গগনচন্দ্র দাসের গান রবীন্দ্রনাথকে প্রাণিত করে। 'ভারতী' পত্রিকার ১৩০২ ভাদ্র সংখ্যায় গগন হরকরার কয়েকটি গান প্রকাশিত হয়। হিবার্ট বক্তৃতা, কমলা বক্তৃতামালা বা 'হারামণি'র ভূমিকায় কবি গগনের গানের উল্লেখের পাশাপাশি তার তাত্ত্বিক তাৎপর্যও ব্যাখ্যা করেছেন। গগনের সঙ্গে তাঁর সখ্যের উল্লেখ আছে শচীন্দ্রনাথ অধিকারীর 'শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে—'...গানের পর গান—সুরতরঙ্গ। অনেকদিন সন্ধ্যার পর নির্জনে বোটের ছাদে বসে রবীন্দ্রনাথ এঁর গীতসুধা পান করতেন।' ১৯২২-এ কালীমোহন ঘোষকে লেখা চিঠিতে কবি নিজে তাঁর এই বাউল-সঙ্গলাভের অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। তাদের সহজ-সরল জীবনের প্রতি কবির আকর্ষণ ছিল। আর তাদের দারিদ্র্যপূর্ণ জীবনের প্রতি ছিল দরদ শ্রদ্ধা ও সহমর্মিতা—

> তারা গরীব। পোশাক-পরিচ্ছদ নাই। দেখলে বোঝবার জো নাই তারা কত মহৎ। কিন্তু কত গভীর বিষয় কত সহজভাবে তারা বলতে পারত। —শান্তিদেব ঘোষ, 'রবীন্দ্রসঙ্গীত বিচিত্রা'

'ফাল্গুনী'-র (১৯১৬) অন্ধ বাউল থেকে শুরু করে ঠাকুরদা ('রাজা'/'অরূপরতন' ১৯১০/১৯২০), ধনঞ্জয় বৈরাগী ('মুক্তধারা' ১৯২২), দাদাঠাকুর ('অচলায়তন'/'গুরু' ১৯১২/ ১৯১৮), এমন কী 'রক্তকরবী' (১৯২৬) নাটকের বিশুপাগল চরিত্র পরিকল্পনায় বাউলের আন্তরধর্মের প্রভাব অপ্রকাশিত নয়। 'শারদোৎসব' (১৯০৮) বা 'ডাকঘর' (১৯১২)-এর ঠাকুরদাদা বা ঠাকুরদার কথা এ প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়বে। 'গৃহপ্রবেশ' (১৯২৫) নাটকে মৃত্যুপথযাত্রী যতীনের স্মৃতি রোমন্থনে এসেছে কিনু বাউলের কথা। যতীন বোন হিমিকে বলেছে।

> অনেকদিন পরে আমাদের কিনু বাউলের সেই গানটা আমার মনে পড়ছে—
>
> ওরে মন যখন জাগলি না রে
> তখন মনের মানুষ এল দ্বারে

তার চলে যাবার শব্দ শুনে
ভাঙল রে ঘুম,
ও তোর ভাঙল রে ঘুম অন্ধকারে।

বাউলের পরিচয় তার গানে। তার একতারায় ঘর ছাড়ার আহ্বান আছে, আর গানের সুরে আছে, আত্মশুদ্ধির মন্ত্র। 'সাহিত্যতত্ত্ব' নিবন্ধে রবীন্দ্র-ব্যাখ্যায় এই সত্যেরই পরিচয় আছে—

> আপন অন্তরে ব্যক্তিপুরুষকে নিবিড় করে অনুভব করি, যখন আপন বাইরে গোচর হয়েছে রসাত্মক রূপ।[৬]

বাউলে এই ভিতর-বাইরের সমন্বয় ঘটেছে। এক হয়ে গেছে ঘর ও পথ। আর উপনিষদ-কথিত আনন্দরূপ অমৃতের ধারা বহমান আছে বাউলের গানে, বাউল সংস্কৃতিতে। অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য রবীন্দ্রনাথের উপর বাউল গানের প্রভাব প্রসঙ্গে বলেছেন—

> বাউলের বিশ্বপ্রেমানুভূতির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ নিজের অন্তরাশ্রিত বিশ্বপ্রেমানুভূতির প্রথম স্পন্দন অনুভব করেছিলেন—এ কথা মনে করা ভুল হবে না। ...ঈশ্বরানুভূতির ভিতর দিয়েই বাউলের বিশ্বপ্রেমের অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। ....বাউল সাধনার মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশ্বপ্রেমানুভূতির প্রথম প্রেরণা লাভ করেছিলেন বলেই তার মধ্যে এই অধ্যাত্মভাব।

কিন্তু শুধু অধ্যাত্মবোধ নয়, বাউলের মধ্যে যে বিশ্ববোধের প্রেরণার সন্ধান পেয়েছিলেন কবি, তা ভারতবর্ষের চিরায়ত ঐতিহ্যেরই অনুবৃত্তি। এখানে হিন্দু-মুসলমানের কোনো ভেদাভেদ নেই। মানুষের অন্তরতর গভীর সত্যের মিলনের ধারা তারা বহন করে নিয়ে চলেছে। এই মিলনেই ভারতের সভ্যতার সত্য পরিচয়। বাউল সাহিত্য, বাউল সম্প্রদায়ের সাধনা হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই, 'একত্র হয়েছে অথচ কেউ কাউকে আঘাত করেনি।'[৭]

বাউল গানের ঐতিহাসিক মূল্যের কথা রবীন্দ্রনাথ বিশেষ ভাবে বলেছেন। অর্থাৎ 'এর থেকে স্বদেশের চিত্তের একটা ঐতিহাসিক পরিচয় পাওয়া যায়।'[৮] আমাদের স্বদেশ অর্থাৎ ভারতবর্ষের ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িয়ে আছে মিলনের সংস্কৃতি— 'দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে।' বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ স্বরূপ রাখি-বন্ধন উৎসবে এই বার্তাই কবি সকলের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন। তাই হয়তো এই পর্বে রচিত রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গানে বাউল সুরের প্রভাব লক্ষ করা যায়। সেই সুরের উদাত্ততায় হৃদয়ের গভীর ব্যাকুলতা যেন উৎসারিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ সারা জীবনে দুঃখ-শোক কম পাননি। কিন্তু তাঁর জীবনবোধটাই এমন ছিল যে, সব অশান্তি বিপর্যয়কে তিনি শান্ত চিত্তে গ্রহণ করেছিলেন, আস্থা রেখেছিলেন এক পরম অস্তিবোধে। তাই তাঁর কাছে সব শূন্যতা, দুঃখ ও বেদনাবোধই ছিল আপাত, চিরসত্য নয়। ''জীবনস্মৃতি''র 'প্রভাতসঙ্গীত' অধ্যায়ে কবি যে কথা বলেছিলেন— 'এতদিন জগৎকে কেবল বাহিরের দৃষ্টিতে দেখিয়া আসিয়াছি, সেইজন্য তাহার একটি সমগ্র আনন্দরূপ দেখিতে পাই নাই', তা তো বাউল দর্শনেরও মর্মকথা। এই 'সমগ্র আনন্দরূপে'র মধ্যে আছেন সেই পরম, যা রবীন্দ্রনাথের 'মনের মানুষ'। উপনিষদে আছে—'তং বেদ্যং পুরুষং বেদ মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ।' যাঁকে জানবার তাঁকে জানো, নইলে সে মরণবেদনা! তিনি পরম প্রিয় বলে সব সময়ে চোখের আলোয় ধরা দেবেন, এমন নয়! নয়নের মাঝখানেই তাঁর সত্যিকারের ঠাঁই। তাই তিনি 'আঁধার ঘরের রাজা' হলেও —

যেন রে তোর হৃদয় জানে তোর আছেন রাজা
একতারাতে একটি যে তার আপন মনে সেইটি বাজা।

'গীতবিতানে'র অন্য একটি গানেও কবি বলেছেন—

সে যে মনের মানুষ, কেন তারে বসিয়ে রাখিস নয়ন দ্বারে
ডাকনারে তোর বুকের ভিতর নয়ন ভাসুক নয়ন ধারে।

বাউলের মতো রবীন্দ্রনাথও যে 'মনের মানুষে'র কথা বলেছেন, তিনি ক্ষণিকের উপলব্ধিমাত্র নন, সমগ্র জীবনচেতনার সঙ্গেই সম্পৃক্ত। সর্ব ধর্মে স্রষ্টার যে অভিন্নরূপের প্রকাশ, তিনি তা-ই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সহিত্য-সাধনায় এঁকে প্রেরণাদাতা বা ছাত্রীর ভূমিকায় দেখেছেন। তাঁকে কখনো বলেছেন 'প্রেরণালক্ষ্মী', কখনো বলেছেন 'জীবনদেবতা'। ইনিই কবির অন্তর্যামী— ভিতর থেকে কবির জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছেন। বাউলের 'মনের মানুষ' বা রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতার যে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাই থাকুক না কেন, এর সত্যস্বরূপ নিহিত আছে উপলব্ধির গভীরতায়—'মনের মানুষ মনের মাঝে করো অন্বেষণ।' ''জীবনস্মৃতি''র 'গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ'-এ রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> গান রচনা করিবার সময় এইটে বার বার অনুভব করা গিয়েছে...আমি যে গোপন কথাটি শুনিবার জন্য সাধাসাধি করিতেছি তাহা যেন বনশ্রেণির শ্যামলিমার মধ্যে মিলাইয়া আছে, ...তাহা যেন সমস্ত জল স্থল আকাশের নিগূঢ় গোপন কথা। ...আমার মন বলিতে লাগিল, আমাদের এই জগতের মধ্যে একটি কোন্ বিদেশিনী আনাগোনা করে, ...সেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিশ্ববিমোহিনী বিদেশিনীর দ্বারে আমার গানের সুর আমাকে আনিয়া উপস্থিত করিল।[৯]

বলাবাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববোধ বা সর্বাত্মবোধের সঙ্গে জীবনদেবতার ভাবনা জড়িয়ে আছে। আমাদের অন্নবস্ত্রের প্রয়োজন দৈনন্দিনতার সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু যে পথের আহ্বানে আমরা ঘরছাড়া হই, সে পথ বাউলের পথ। 'মানুষ আপনাকে পাবার জন্য বেরিয়েছে, —আপনাকে না পেলে, তার আপনার চেয়ে যিনি বড়ো আপন তাঁকে পাবার যো নেই।' এ কথা 'তপোবনে ভারতবর্ষের ঋষি' যেমন জানেন, তেমনই জানেন বাংলাদেশের বাউল। রবীন্দ্রনাথ নিজের মধ্যে বাউলকে দেখেছেন, দেখেছেন প্রকৃতির মধ্যে, যেখানে বাদল প্রকৃতি বাউলের মতো তার একতারায় বৃষ্টির সুর বাজায়—'সারা বেলা ধরে ঝরো ঝরো ধারা।'[১০] অঞ্জনা-নদীতীরে চন্দনী গাঁয়ের অন্ধ কুঞ্জবিহারীর সঙ্গী তো সেই একতারাই! যা 'বক্ষেতে ধরে' সে 'গুন্ গুন্ গান গায় গুঞ্জন-স্বরে'।[১১] অন্ধ কুঞ্জের মতো 'ফাল্গুনী' নাটকেও আছে অন্ধ বাউল। রবীন্দ্রনাথ শুধু এই চরিত্রটি সৃষ্টি করেননি, নিজে এই চরিত্রে অভিনয় করেছেন।

বাউলের জীবনদর্শনে যে মিলনের আদর্শ দেখেছিলেন কবি, তা বিশ্বজাগতিক মানবতার প্রশ্নে উত্তীর্ণ। জীবনের প্রায় শেষ প্রহরে রাশিয়া ভ্রমণ এবং 'রাশিয়ার চিঠি' লেখার সময়েও তাঁর বাউলের গান মনে পড়েছে। আসলে এ তাঁর সারা জীবনের অন্বেষণ। 'মানুষের ধর্ম' (১৯৩৩)-এ মনের মানুষের ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> সেই মনের মানুষ সকল-মনের মানুষ, আপন মনের মধ্যে তাঁকে দেখতে পেলে সকলের মধ্যেই তাঁকে পাওয়া যায়। এই কথাই উপনিষদ বলেছেন : যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি।[১২]

আর আমাদের বাংলাদেশের বাউল বললেন—মনের মানুষকে 'একবার দিব্যচক্ষু খুলে গেলে দেখতে পাবি সর্বঠাঁই'[১৩] রবীন্দ্রনাথ মানুষকে, মানুষের ধর্মকে বৃহৎ অর্থে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর

অধ্যাত্মভাবনাও শেষ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে মানুষের দ্বারে। কবির নিজের কথায়—

> বিশ্বদেবতা আছেন, তাঁর আসন লোকে লোকে, গ্রহ-চন্দ্র-তারায়। জীবনদেবতা বিশেষভাবে জীবনের আসনে, হৃদয়ে হৃদয়ে তাঁর পীঠস্থান, সকল অনুভূতি সকল অভিজ্ঞতার কেন্দ্রে। বাউল তাঁকেই বলেছে, মনের মানুষ। এই মনের মানুষ, এই সর্বমানুষের জীবনদেবতার কথা বলবার চেষ্টা করেছি 'Religion of man' বক্তৃতাগুলিতে।

কবি তাঁর জীবনদেবতাকে মনের মানুষকে খুঁজে পেয়েছেন অন্ত্যজ, ব্রাত্য, মন্ত্রবর্জিত মানুষদের মধ্যে—

> কতদিন দেখেছি ওদের সাধককে
> একলা প্রভাতের রৌদ্রে সেই পদ্মানদীর ধারে,
> যে নদীর নেই কোনো দ্বিধা
> পাকা দেউলের পুরাতন ভিত ভেঙে ফেলতে।
> দেখেছি একতারা হাতে চলেছে গানের ধারা বেয়ে
> মনের মানুষকে সন্ধান করবার গভীর নির্জন পথে।[১৪]

রবীন্দ্র-মানসে বাউল-চেতনার মূলে 'আমি কোথায় পাব তারে' গানটির ভূমিকা অনস্বীকার্য। 'হারামণি'র ভূমিকায় এর সহজ কথা, কিন্তু সুরের যোগে অন্তর্নির্হিত অর্থের অপূর্ব জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠার বিষয়টি খুব স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। পণ্ডিতের কঠিন কথা বাউলের গানে গেঁয়ো সুর আর সহজ ভাষায় হৃদয়স্পর্শী হয়ে ওঠে। তা বাংলাদেশের চিত্তকে শ্যামলতায় আচ্ছন্ন করে এবং 'চলতি ভাষার স্বভাব রক্ষা করে' আমাদের লোকায়ত ঐতিহ্যের অংশরূপে জীবনের সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়ে যায়। বাউল সংগীতে ধর্ম-সংগম অন্যতম মুখ্য বিষয়। কিন্তু এই ধর্ম-সংগমের মূল হোতা প্রাণের মানুষ বা মনের মানুষ ('The man of my heart') কোথায় থাকেন? থাকেন মানুষেরই মধ্যে '... is in man and not in the temple'

> আমি কোথায় পাব তারে
> আমার মনের মানুষ যে রে।

এই অন্বেষণ বা জিজ্ঞাসা নিয়ে কবির যে পথ চলা শুরু হয়েছিল তার উত্তর পেয়েছেন নিজের ভিতর থেকেই-মনের মধ্যেই তাঁকে খুঁজে পেতে হবে। কারণ 'আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে তাই হেরি তায় সকলখানে।' "শেষসপ্তক"-এর 'তেরো' সংখ্যক কবিতায় এরই প্রত্যয়বদ্ধ উচ্চারণ 'অচিন তখন বেরিয়ে আসে বিশ্বভুবনে'।[১৫] রবীন্দ্রনাথের বাউল-ভাবনায় উপনিষদ ও লৌকিক জীবন-চেতনা দুয়েরই সমন্বয় ঘটেছে। বাউল-সাধনার মরমিয়াভাব ব্যথার মূর্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, যে ব্যথার আসল রূপটি আনন্দময়! 'লিপিকা'র গদ্যে বললেন—

> আমার ভিতরমহলের ব্যথা আজ গেরুয়াবসন পরেছে। পথে বাহির হতে চায়, সকল কাজের বাহিরের পথে, সে পথ একটিমাত্র সরল তারের একতারার মতো, কোন্ মনের মানুষের চলায় বাজছে।

এই উপলব্ধির প্রগাঢ়তাতেই, রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা ও বাউলের মনের মানুষ একাকার হয়ে গেছে। বাউল-ভাবধারা তাঁকে মানবতার পূর্ণলক্ষে পৌঁছতে সাহায্য করেছে। তাঁর জীবন দর্শনের অঙ্গীভূত সত্য হয়ে উঠেছে। তাই বাউলের মনের মানুষের সন্ধান ও কবির আপন সৃষ্টির অন্বেষণে

কোনো প্রভেদ নেই। মনের মানুষকে নিয়ে মানুষের যেমন মিলনের মধ্যেই বিচ্ছেদানুভব; সেখানেই তাঁকে পাওয়ার মধ্যেও না-পাওয়ার বেদনা, তেমনি যে-কোনো সৃষ্টিই পূর্ণতার মধ্যেও অপূর্ণতার অনুভবে সার্থক। কবি মনে করতেন, অন্বেষণ না থাকলেই উপলব্ধির বিকৃতি ও বিনাশ। তাই বাউলের মতো কবির চলারও মূল কথা—

He is lost to me and I seek him
wandering from land to land.

উৎসের সন্ধানে

১. 'বাউল' "শিশুভোলানাথ", রবীন্দ্ররচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ ১৯৬১, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ. ৫৯৫

২. 'পথপ্রান্তে', "বিচিত্র প্রবন্ধ", রবীন্দ্ররচনাবলী, চতুর্দশ খণ্ড, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ. ৭২৭

৩. তেতাল্লিশ সংখ্যক 'শেষ সপ্তক', রবীন্দ্ররচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ. ২১৪

৪. 'পাগল', "বিচিত্র প্রবন্ধ", রবীন্দ্ররচনাবলী, চতুর্দশ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫৬

৫. 'ছোট ও বড়ো', শান্তিনিকেতন, রবীন্দ্ররচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ. ৪৬৩

৬. 'সাহিত্যতত্ত্ব' "সাহিত্যের পথে", রবীন্দ্ররচনাবলী, চতুর্দশ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬০

৭. 'বাউল-গান', "সংগীত", রবীন্দ্ররচনাবলী, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ. ৯৬৪

৮. 'বাউল-গান', "সংগীত", রবীন্দ্ররচনাবলী, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ. ৯৬৩

৯. 'গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ', "জীবনস্মৃতি", রবীন্দ্ররচনাবলী, দশমখণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ. ৯৫

১০. 'বাদল বাউল বাজায়', রবীন্দ্ররচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ. ৩৫১

১১. 'আগমনী', চিত্রবিচিত্র, রবীন্দ্ররচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩৯

১২. 'মানুষের ধর্ম', রবীন্দ্ররচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৬

১৩. তদেব।

১৪. পনেরো সংখ্যক কবিতা, 'পত্রপুট', রবীন্দ্ররচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৭

১৫. তেরো সংখ্যক কবিতা, 'শেষসপ্তক', রবীন্দ্ররচনাবলী, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ. ১৬৪

বাউল রবীন্দ্রনাথ : 'রবীন্দ্রবাউল'

সুরঞ্জন মিদ্দে

কবিবাউলের 'ফাল্গুনী' অন্ধবাউল

'বাউল' একটি শাস্ত্রের নিয়মবর্জিত লৌকিক ধর্ম সম্প্রদায়। তন্ত্র, যোগ, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব সহজিয়া এবং সুফি তত্ত্বের সংমিশ্রণে সৃষ্টি হয়েছে বাউল সমাজ ও বাউল সংস্কৃতি। বাউলের দর্শন আছে, আছে সাধন পদ্ধতি। আছে সাধক জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা। আর এই সমস্ত বাউল সাধনা বাউল সংগীতকে কেন্দ্র করেই বাউল সমাজ এগিয়ে যায়। তাই বাউল সংস্কৃতি হচ্ছে 'গানই জ্ঞান'। আর সেই বাউল গানের অনুষঙ্গে আসে বাদ্য এবং নৃত্য। সংগীত, বাদ্য ও নৃত্যের সমাহারে বাউল খোঁজেন তাঁর মনের মানুষকে, অচিন পাখি, পরমাত্মা এবং রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতাকে।

বাউল নৃত্য পরিবেশনে শাস্ত্রের কঠিন কোনো আইন নেই। মাঠে, ঘাটে, সবুজ প্রকৃতির আনমনা খোলা প্রান্তরে বাউল গান ও নাচ আপন মনে বেজে ওঠে। স্বতঃস্বারিত সেই প্রাণখোলা গান আর নাচ আপনা থেকে সুর ধ্বনিত হয়। বাউল নৃত্য মূলত একক নৃত্য। পুরুষ প্রধানত অংশগ্রহণ করে। সময়ে-অসময়ে বাউলানীর অংশগ্রহণ ব্রাত্য নয়। বাউল সাধনার অন্যতম উপাদান নৃত্য। নৃত্য মূলত গানের সুর ও তালে দেহের অঙ্গ সঞ্চালন। ডান হাতে একতারা আকাশমুখী উঁচানো থাকে। বাম হাত দিয়ে কোমরে বাঁধা বাঁয়ায় তালাঘাত করা হয়। বাউলেরা গানের সুর তালে নৃত্যে মত্ত হয়ে সৃষ্টিকর্তার ধ্যানে মগ্ন থাকে। গানের সুরে, বাদ্যের তালে এবং নৃত্যের ছন্দে বাউল হারিয়ে যায় অসীম জগতে।

স্বয়ং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাউল প্রেমে মজেছিলেন। তাই তিনি নিজেকে 'রবীন্দ্র বাউল' বলতে দ্বিধা করেননি। 'ফাল্গুনী' ও 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে তিনি বাউলের ভূমিকায় আভিনয় করেছেন। অভিনয় করতে গিয়ে তিনি নিজেও বাউল নৃত্যে মোহিত হয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'ফাল্গুনী' নাটকের উৎসর্গপত্রে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে অভিহিত করেছেন, 'কবি বাউল' নামে। সেই সঙ্গে নাট্যকাব্যটিকে 'একতারা'র প্রতীকে প্রকাশ করেছেন। 'ফাল্গুনী' নাটকে 'অন্ধবাউলে'র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের অভিনয় ছিল প্রাণের আবেগে হৃদয়ের স্পর্শ। 'ফাল্গুনী' (১৯১৬) নাটকের একাধিক গানে বাউল চেতনার তাৎপর্য ধরা পড়েছে। এমনকি লালন ফকিরের গানের বাউলভাষ্য রবীন্দ্র সৃজনে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। বাউল সাধকদের মতোই রবীন্দ্রনাথ কবিতায় 'গানে' 'পরম'কে নানান প্রতীকে অনুসন্ধান করেছেন। হারিয়ে যাওয়া চোখের দৃষ্টি দিয়ে নয় অন্ধবাউলের সমস্ত সত্তা দিয়ে। 'ফাল্গুনী' নাটকটি বাসন্তী যৌবনের জয়গান উচ্চকিত হওয়া সত্ত্বেও চরিত্রবিচারে বাউলধর্মী। 'ফাল্গুনী' নাটক বাউল মর্যাদায় মহত্তম এক অরূপ দর্শন। সেই গভীর অচেনা পথের

সন্ধান জানেন একমাত্র 'অন্ধবাউল'। 'ফাল্গুনী' নাটকের গানে রবীন্দ্রনাথ বাউল চেতনার পরমতত্ত্বে ভর করেই প্রকাশ করেছেন— সেই অরূপ সন্ধান—মনের মানুষ—অচিনপাখিকে।

তুই ফেলে এসেছিস কারে, মন, মন রে আমার।...
কেমন করে ফিরবি তাহার দ্বারে মন, মন রে আমার।

এই প্রসঙ্গে লালন ফকিরের বাউলভাষ্য খুবই সহজ সরল।

যে পথে এসেছে রে মন
যেতে হবে সেই পথে।

এই 'ফিরে যাওয়া' তত্ত্বে বাউলের মতো কবিও হতে পারেন সাধক সাঁইয়ের সমধর্মী—যিনি প্রকৃতি, পৃথিবী ও মানবসত্তার সঙ্গে এক অদ্ভুত যোগসূত্র অনুভব করেন। মরমি কবি তাই 'তুমি-আমি' ব্যবধান ঘুচিয়ে মিলনের পথ তৈরি করেন। 'তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে আলোয় আকাশভরা'— গানটির অন্তরে 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র সাগর পরিক্রমারত 'সোনার তরী'র কথা মনে করিয়ে দেয়। নিজেকে জানার এই তত্ত্ব এদেশে প্রাচীন হওয়া সত্ত্বেও লৌকিক মরমি গানের ক্ষেত্রে ঐতিহ্যবাহী সম্পদে পরিণত হয়েছে। লালন ফকিরের একাধিক গানে 'আপনারে চেনা জানার' আকাঙ্ক্ষা ফুটে উঠেছে। ঠিক একইভাবে রবি বাউল গাইলেন—

আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না,
এই জানারই সঙ্গে সঙ্গে তোমার চেনা।

গ্রামবাংলার বাউল আর মারফতি-মুর্শিদী গায়কদের কণ্ঠে এই আবেদন সর্বজনীন। রবি বাউলের একতারা জীবনের শেষ দশকে এসে পরিপূর্ণ মানবিক মূল্যবোধের আলোকে মহত্তম্ হয়েছেন। অধ্যাত্মবাদের জটিলতাকে অতিক্রম করে শুধু 'মানুষ' শব্দটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। সেই 'মানুষ' প্রাধান্য পেয়েছে ভালোবাসার পাত্র হিসাবে। কখনো রহস্যময়ী 'বিদেশিনী'র আদলে, কখনো বা 'কাঙাল'রূপে 'অধরা'কে ধরতে চেয়েছেন।

মনের মানুষ : জীবন দেবতা

কোথায় পাবো তারে
আমার মনের মানুষ যে রে!
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশ্যে
দেশে বিদেশে বেড়াই ঘুরে।

শিলাইদহের এক বাউল এই গান গেয়েছিল। বড় বিস্ময় লেগেছিল কবির। 'অন্ধকারে মাকে দেখতে পাচ্ছে না যে, শিশু তারই কান্নার সুর— তাঁর কণ্ঠে বেজে উঠেছে'। ভাষার সরলতা, আর ভাবের গভীরতায়, সুরের দরদের সঙ্গে ভক্তি মিশে একাকার। উপনিষদের সেই বাণী 'অন্তরতর হৃদয়াত্মা' যেন বাউলের মুখের 'মনের মানুষ' একই দর্শনের প্রতিধ্বনি। বাউলদের 'মনের মানুষ' বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কাছে 'জীবনদেবতা'—

> জীবন-দেবতা বিশেষভাবে জীবনের আসনে, হৃদয়ে হৃদয়ে তাঁর পীঠস্থান, সকল অনুভূতি সকল অভিজ্ঞতার কেন্দ্রে। বাউল তাকেই বলেচে মনের মানুষ।

বাউলরা এমন একজন মানুষের অনুসন্ধান করেন, যিনি নীরবে মানুষের হৃদয়েই থাকে। উপনিষদের

সেই নিরাকার জীবনদেবতা, অন্তরের অন্তর্যামীও কবির কাছে সমান। তাই বাউলদের জীবনদর্শন তাঁর গানে, কবিতায়, নাটকে বার বার প্রতিফলিত হয়েছে। এই 'মনের মানুষ' তাঁর 'Religion of Man' গ্রন্থেও প্রকাশিত।

কবি রবীন্দ্রনাথ মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা মহৎ মানুষের উপাসনা। এই মহৎ মানুষ আসলে অন্তরের মানুষ। এই মানুষ বাইরে নয়। থাকে আমাদের ভিতরে। রবীন্দ্রনাথ নিছক ভাববাদী নন। তিনি কঠোর বাস্তববাদীও। কবি মানব মনের দ্বৈতসত্তার কথা স্বীকার করেন। প্রথম, মানুষ 'ব্যক্তি মানুষ' আর দ্বিতীয় মানুষ 'সর্বকালীন মানুষ' বা বিশ্বজনীন মানুষ। কবি রবীন্দ্রনাথ এই দুই মানুষের পার্থক্যকে এক অনন্যসাধারণ উপমায় বুঝিয়ে দিয়েছেন—

> প্রদীপ আপনার তেল সংগ্রহ করে। আপনার উপাদান নিয়ে প্রদীপের বাজারদর...শিখা আপনাকেই প্রকাশ করে, এবং তারই প্রকাশে আর সমস্তও প্রকাশিত।

এখানে 'প্রদীপ' হল ব্যক্তিমানুষের অহমের প্রতীক, আর 'শিখা' হল বিশ্বজনীন আত্মার প্রতীক। এই অন্তরাত্মাকে জানার সাধনার অগ্রপথিক ছিলেন বাংলার বাউল। রবীন্দ্রনাথ আজীবন সেই অন্তর অনুশীলনে 'অচিন মানুষে'র সন্ধান করেছেন।

বাউলরা মানুষ ভজনা করেন। বাউলদের ভজনা লৌকিক অধ্যাত্মবাদী সাধনা, বাউলরা সমস্ত তথাকথিত ধর্মের ঊর্ধ্বে,অসাম্প্রদায়িক এবং মানবতাবদী। মানুষ বাউলের কাছে প্রথম ও শেষ আশ্রয়। বাউলের সাধনা তাই শরীরকেন্দ্রিক। স্পষ্ট করে সোজা কথায় নারী-পুরুষ যুগল সাধনায় নারী অপরিহার্য। বাউলরা শরীর ও মন দুটি পথের সাধনা করেন। শরীরকে বাদ দিয়ে শুধু মনের সাধনায় বাউল বিশ্বাসী নন। বাউল সাধনায় শরীর অত্যাবশ্যক। তবে শরীর সাধনাই বাউল ভজনার শেষ পথ নয়। বাউল সাধনা সম্পূর্ণরূপে গুরুবাদী ভজনা। প্রাথমিকভাবে বাউলদের ভোগবাদী মনে হতে পারে। কিন্তু এই কামনাকে বাউল জয় করতে চায়। বাউল শুধু শরীর সর্বস্ব নয়। বাউলদের সাধনা আধ্যাত্মিক জীবনের স্বাধীন সত্তার সন্ধান। স্বাধীনসত্তাই আসলে 'মনের মানুষ'। বাউল তাই সংসারবর্জিত। বাউলের বিশ্বাস—'যা আছে ভাণ্ডে, তাই আছে ব্রহ্মাণ্ডে'। বাউলের দুটি পথের একটি পথকে সচেতনভাবে গ্রহণ করেছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। কবি শুধু মানসিক সাধনাকে আশ্রয় করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কাছে দেহ নয় মনের উত্তরণই প্রধান পথ। বাউল সাধনায় সুফি কিংবা বৈষ্ণব প্রভাব বর্তমান। আর আমাদের রবীন্দ্রদর্শনে ভারতীয় উপনিষদই শেষ কথা। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় দর্শন মহাসভায় 'The Religion of Man'-এ বলেছেন—

> This idea of mine found at a later date its expression in some of my poems addressed to what I called Jiban Debata, the Lord of my life.

বাউলের 'মনের মানুষ'ই রবীন্দ্রমননে 'জীবনদেবতা'। লক্ষ্য উভয়ের এক। পার্থক্য নির্ধারিত পথের। বাউল যেখানে দেহ ও মন দুই চান; সেখানে কবি শুধু অন্তর অনুশীলনের অনুগামী। সেই অন্তর সাধনা অবশ্যই উপনিষদের শ্লোক। 'তসেবৈকং জানথ আত্মনাম্'। তবে আশ্চর্য উপনিষদের বাণী আর বাউলের 'মনের মানুষে'র গভীর সাযুজ্য— আমাদেরকে বিস্মিত করে।

কবি রবীন্দ্রনাথের প্রাণধর্মের প্রেরণা আর বাউলের 'মনের মানুষ'-এর উৎস ছিল অভিন্ন। বাউল গান আর সহজ সাধনার গভীরভাব রবীন্দ্রমানসে নিবিড়ভাবে মিশে গেছে। তাই তার গল্প, উপন্যাস, নাটক-প্রবন্ধ-কবিতা-গানে বাউল এসেছে বারবার বহু বিচিত্র ধারায়। কবি রবীন্দ্রনাথ

ক্রমশ পরিবর্তিত হয়ে গেছেন 'রবীন্দ্রবাউল'-এ। বাউল গানের সুর, কথা ও গভীর ভাবনা যেমন তাঁকে স্পর্শ করেছে, তেমনি তাদের জীবনপ্রতীক 'একতারা' বা 'আলখাল্লা' তাঁর প্রিয়বস্তু ছিল।

রবীন্দ্রমানসে বাউল চেতনার প্রধান ছিল লালন ফকিরের গান, তাঁর শিষ্য গগন হরকরা, এবং গোঁসাই রামলাল, সর্বপেক্ষী বোষ্টমী। রবীন্দ্রনাথও একটি চিঠিতে উল্লেখ করেছেন—

> নিঃসংশয়ে জানি বাউলগানে একটা অকৃত্রিম বিশিষ্টতা আছে, যা চিরকেলে আধুনিক। ...আমার অনেক গান বাউলের ছাঁচের, কিন্তু জাল করতে চেষ্টা করিনি, সেগুলো স্পষ্টত রবীন্দ্রবাউলের রচনা।

শিলাইদহে (১৮৯১-১৯৯০) থাকাকালীন কবির নিত্যসঙ্গী গগন হরকরা (দাস) ছিলেন প্রাণখোলা প্রকৃতির চলমান বাউল। বাউল গগন হরকরা মত্ত প্রাণের প্রেরণায় নাচতে নাচতে গান করতে করতে চিঠি পৌঁছে দিতেন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরের মানুষের ঘরে ঘরে। বাউল গগন তাঁর নাটকের বাউল চরিত্রের নিদর্শন। 'ডাকঘর' নাটকেও গগন বাউলের প্রভাব আছে বলেই মনে হয়। পাশ্চাত্যের ফ্রান্সে 'অল ইণ্ডিয়া ফোক রিলিজিয়ন' বক্তৃতায় কবি গগন বাউলকে স্মরণ করেছেন—

> The First Baul Song, Which I Chance to hear with my attention, Profoundly stirred my mind.

বস্তুত শিলাইদহের বাউল সমাজের প্রেরণাই তাঁকে প্রাণিত করেছিল 'রবীন্দ্রবাউল'-এ। বাউলের মতো কবিও আচার-সর্বস্ব ধর্মকে পরিহার করে মানবধর্মকে নিজের ধর্ম বলে মানতেন। শিলাইদহ ও কুষ্ঠিয়ার বাউলদের সঙ্গে গভীর সাহচর্য কবির শেষ জীবন পর্যন্ত অটুট ছিল। 'মনের মানুষে'র সন্ধানে আজীবন ধ্যানমগ্ন ছিলেন।

বাউলদের বিশ্বমানবতাবোধ ও সর্বধর্মসমন্বয়বোধ কবিকে আকৃষ্ট করেছিল। বাউল গান কবির বহু গানে প্রতিফলিত হয়েছে। যেমন— মূল বাউল গান।

১. 'আমি কোথায় পাব তারে।'
২. 'কথা কয় কাছে দেখা যায় না।'
৩. 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখী।'
৪. 'তোরই ভিতর অতল সাগর।'
৫. 'মনের মধ্যে মনের মানুষ করো অন্বেষণ।

কবির গান—

১. 'আমি তারেই খুঁজে বেড়াই।'
২. 'আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে।'
৩. 'আমার মন যখন জাগলি নারে
তোর মনের মানুষ এল দ্বারে।'
৪. 'সে যে মনের মানুষ কেন তারে বসিয়ে রাখিস।'
৫. 'তোর গোপন প্রাণে একলা মানুষ যে।'

বাউল রবীন্দ্রনাথের কাছে কখনও ফকির, আবার কখনও ঠাকুরদা। বাউলদের সদলবলের প্রয়োগ ঘটেছিল 'মুক্তধারা' নাটকে। কখনোবা তারা আবার বৈরাগী নামে পাওয়া যায়।

বিশ শতকে বাউলগানকে কবি সম্প্রসারিত করেছেন রাষ্ট্রনৈতিকতার প্রয়োজনে। সাম্রাজ্যবাদের বিভেদ নীতির বিরুদ্ধে দেশের হিন্দু-মুসলমান জনগণকে একত্রিত করার জন্য স্বদেশপ্রেমের গান

লিখেছেন। সেই স্বদেশ প্রেমের গানের মূল সুর ছিল ‘বাউল’ সুরের প্রধান ভিত্তি। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে স্বদেশি গানের সংকলনের নাম দিয়েছিলেন ‘বাউল’। ‘এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে’, ‘যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে’, ‘আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন, আপনি’, ‘ছি, ছি, চোখের জলে ভেজাস নে আর মাটি’ ‘বাংলার মাটি, বাংলার জল বাংলার বায়ু বাংলার ফল’ও ‘বিধির বাঁধন কাটবে তুমি কি এমন শক্তিমান’—এর মতো জনপ্রিয় স্বদেশি সংগীতগুলিতেই সেই বাউলগানের সুর প্রকাশিত হয়েছে। যেখানে কবির ‘প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি’ প্রকাশিত হয়েছে।

রবিঠাকুরের ফকির লালন

একজন ফকির, অন্যজন ঠাকুর। একজন রাজা, অন্যজন প্রজা। একজনের জন্মভূমি কুষ্ঠিয়ার ছেঁউরিয়ার গ্রামে। অন্যজনের শহর কলকাতা তৎকালীন ভারতের রাজধানী। দুজনের দেখা হয়েছিল কিনা সেটা খুব জরুরি নয়। ঠাকুরবাড়ির রবি যে তাঁকে ভালো করে জানতেন সেটা স্পষ্ট বোঝা যায়। অন্যজন অন্তত ঠাকুরবাড়ি জ্যোতির কাছে বসে ছিলেন—সেটার প্রমাণ আছে। শুধু রবি কিংবা জ্যোতিদাদার সঙ্গো নয় ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে প্রবেশ করে গিয়েছিলেন ‘ভারতী’র মাধ্যমে। পরে বিশ্বভারতী সুরক্ষিত হয়ে যাচ্ছেন।

এই ফকির সম্রাট লালন, ঠাকুরবাড়ির প্রশ্রয়ে বাংলার সীমানা পেরিয়ে বাংলার বাইরে ছড়িয়ে পড়েছিল। শুধু তাই নয় রবীন্দ্রনাথের রচনার মধ্যে এই ফকিরের উল্লেখ এক ভিন্ন মাত্রা পেয়ে যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ নিজের পরিচয়ে একজন ফকির কিংবা বাউল বলতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। সব মিলে আমরা বলতে পারি—এই ফকির ঠাকুরবাড়ির পত্রিকায় স্থান পেয়েছিলেন। ঠাকুরবাড়ির চিত্রশিল্পী এই ফকিরের প্রতিকৃতি প্রথম এঁকেছিল। সর্বোপরি ঠাকুরবাড়ির বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ফকিরকে বাংলার বাইরে প্রচার করে সর্বজনীনতার আলোকে প্রকাশ করেছে।

উনিশ শতকের শেষে ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে ঠাকুরবাড়ির বিখ্যাত পত্রিকা ‘ভারতী’তে প্রকাশিত হয় ফকিরের আটটি গান। পাঁচবছর আগে ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে ‘হিতকরী’তে প্রকাশিত হয় মাত্র একটি গান। ‘ভারতী’ পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন ঠাকুরবাড়ির স্বর্ণকুমারী দেবীর দুই মেয়ে, হিরন্ময়ীদেবী ও সরলাদেবী।

১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দের (১৩০২ বঙ্গাব্দ) আগস্ট-সংখ্যায় ‘ভারতী’ পত্রিকায় ফকির প্রকাশিত হল। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্র নতুন করে ফকিরকে মূল্যায়ন করলেন। আটটি গান সহ সংক্ষিপ্ত জীবনীও লিখলেন। ফকিরের মৃত্যুর পাঁচবছর পর সর্বপ্রথম প্রকাশিত হল কলকাতার প্রখ্যাত ঠাকুরবাড়ির পত্রিকা ‘ভারতী’তে। এই সময়ে রবি ঠাকুরের বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর। ‘ভারতী’ পত্রিকায় প্রকাশিত এই মূল্যবান রচনাটি কবি রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয় দেখেছেন ও পড়েছেন। একথা খুব জোরের সঙ্গো বলা যায়। এই আটটি গানের মধ্যে আছে— ‘আমার বাড়ীর কাছে আরশি নগর, এক পড়শী বসত করে’ গানটি আছে। ‘জগন্নাথ’ প্রসঙ্গো একটি গান আছে। এটি ছয় নম্বর গান—

জগন্নাথে দেখরে যেয়ে
জাত কেমন রাখে বাঁচিয়ে।
চণ্ডালে আনিলে অন্ন বাম্মণে তাই খায় চেয়ে।...

ধন্য প্রভু জগন্নাথ চায় নারে সে জাত অজাত
ভক্তের অধীন যে।

জাত-পাতের প্রশ্নে এই ফকিরের দর্শন ও অকাট্য যুক্তি একুশ শতকের আধুনিক মননকে চম্‌কে দেয়। 'হিতকরী', 'ভারতী'র পর 'প্রবাসী' পত্রিকায় ফকিরের গান প্রকাশিত হয় 'প্রবাসীর হারামণি' বিভাগে। রবি ঠাকুর এই 'প্রবাসী' পর্বেও সক্রিয় ভূমিকা দেখিয়েছেন।

১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে (১৩২২) অক্টোবর 'প্রবাসীর হারামণি'তে পাঠাচ্ছেন ফকিরের 'পঞ্চম' গানটি। রবি ঠাকুরের আগে আরো দুজন দুটি করে চারটি গান প্রকাশ করেছেন। রবি ঠাকুর এখানে তৃতীয় প্রেরক। তৃতীয় প্রেরক হলেও রবি ঠাকুরই সবচেয়ে বেশি সংখ্যক গান সংগ্রহ করেছেন। 'প্রবাসীর হারামণি' বিভাগে রবিঠাকুর ফকিরের কুড়িটি গান প্রকাশ করেন। শুধু তাই নয় (বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত) রবিঠাকুরের ব্যক্তিগত সংগ্রহে ফকিরের ২৯৮টি গান আছে। যা লালনচর্চায় একান্ত প্রয়োজনীয়।

ভাবতে আশ্চর্য লাগে রবি ঠাকুরের মতো কর্মব্যস্ত কবি লালন ফকিরের গানের ব্যাপারেও সদা সচেতন ছিলেন, সক্রিয় প্রকাশের ব্যাপারেও উদ্যোগ নিয়েছেন। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্র ভবনের মিউজিয়ামে সুরক্ষিত আছে ফকিরের গান। ২৯৮টি ফকিরের গানের এই সংরক্ষণ দুটি খাতায় লিখিত আছে। রবি ঠাকুরের এই গবেষণা যুগান্তকারী আজ একুশ শতকে এসে আমরা অনুভব করছি। শুধু ইসলাম রীতিতে ফকিরের গান সংরক্ষণ করে গোল বাধিয়ে দিয়ে গেছেন। এই গোল সোরগোল হয়ে আজ মীমাংসাও হয়ে গেছে। ফকির সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে। ধর্মের উপরে, জাতের উপরে। ফকির মানুষ। সবার উপরে মানুষ সত্য। ফকির মানবতাবাদী।

আজকে বিভিন্ন পর্যালোচনায় প্রমাণিত হয়েছে রবি ঠাকুরের সঙ্গে ফকিরের যোগাযোগ ছিল। বিশেষ করে এটা বলা যায় 'গীতাঞ্জলি'র অনেক গানে ফকিরের গানের ভাব ফুটে উঠেছে। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ছন্দের প্রকৃতি' আলোচনায় ফকিরের গানের উদাহরণ দিয়েছেন রবি ঠাকুর।

এমন মানব জনম আর কি হবে,
যা কর মন ত্বরায় কর এই ভবে।

কবি ফকিরের গানের প্রসঙ্গ আনছেন একেবারে শেষ বয়সের দিকে। কবির বয়স তখন প্রায় পঁচাত্তর বছর। যৌবন থেকে প্রৌঢ় পর্যন্ত কবি রবি ঠাকুরের জীবনচর্যায় ফকির এসেছে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায়। ঠাকুরবাড়ির উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক বিশ্বকবির মননে ফকির সর্বদা জাগরুক ছিল তা স্পষ্ট হয়েছে। 'গোরা' উপন্যাসের প্রথম কিস্তিতে প্রকাশিত হয়েছে ফকিরের সেই বিখ্যাত গান—

খাঁচার ভিতর অচিন পাখী কেম্‌নে আসে যায়
ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতেম পাখীর পায়।

মানবতার পূজারী ফকির লালন তাই একই সঙ্গে ফকির-বাউল। কোনো ধর্মের ছকে ফেলা যায় না যাবেও না, তাঁর যুক্তি বড় বাস্তব, স্বাধীন। একুশ শতকের আধুনিক মননে তা বিশ্বব্যাপী। শাশ্বত চিরন্তন বাণী তাই বিশ্ব মানবতাবাদে চির-ভাস্বর হয়ে গেছে। উনিশ শতকে যিনি সমন্বয়বাদী তিনি একুশ শতকে একেশ্বর পূজারী।

১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে ৫ মে ঠাকুরবাড়ির জ্যোতিদাদা ফকিরের মৃত্যুর দেড় বছর আগে ফকিরের

প্রতিকৃতি অঙ্কন করে চিত্রকলার জগতে চিরস্মরণীয় হয়ে গেছেন। পরবর্তী সময়ে ঠাকুরবাড়ির অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাবশিষ্য নন্দলাল বসুরও একটি ছবি আছে। কিন্তু জ্যোতিদাদার স্কেচটিই সাক্ষাৎ ফকিরের প্রতিকৃতি। কলকাতার প্রখ্যাত ঠাকুরবাড়ির প্রশ্রয়ে ফকিরকে বৃহত্তর মান্যসমাজে প্রথম চিনিয়ে দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত রবি ঠাকুরের মননে ফকির স্থায়ী ঠাঁই পেয়ে আধুনিক গবেষকদের পথ খুলে দিয়েছেন।

'আমার ঘরের চাবি পরের হাতে' কিংবা 'যখন শব্দ নিঃশব্দে খাবে, তখন ভাবের খেলা ভেঙ্গো যাবে'— পদগুলো পর্যালোচনা করলেই বোঝা যায় ফকির আসলে বাউলও নয়, কবি। ফকির ও ঠাকুর কবি আজ বাঙালি তথা ভারতীয় জীবনচর্যায় একাত্ম হয়ে গেছেন। হতে পারে একজন কুষ্টিয়া গ্রামের কবি, অন্যজন কলকাতার কিন্তু জীবন দর্শনে একাকার হয়ে যাচ্ছেন। রবি ঠাকুরের গোরা শেষ পর্যন্ত মানবতাবাদী হয়ে যায়। আর ফকির লালনের ধর্ম চেতনাও জীবনের চরম-কঠোর অভিজ্ঞতা সিঞ্চিত রসে উজ্জীবিত হয়ে মানবসত্যে উত্তীর্ণ।

'বাড়ির কাছেই আরশীনগরের কথা' আমাদের কাছে গোপনই থেকে গেছে। লালনচর্চার ব্যাপকতা আমাদের দৈনন্দিন মননের গভীরে প্রবেশ করার জন্য আরও সময় অপেক্ষা করতে হবে। ফকিরের সাম্রাজ্যে ঠাকুরবাড়ির ভূমিকা কিংবদন্তী। কিন্তু একুশ শতকে আমাদের ভূমিকা লালন চর্চা করা নয় পালনও করা। বাঙালির মুক্তি সেই পথে। যে পথে কাঁটার মুকুট থাকবে না। থাকবে না ধর্মের ধান্ধা। তিনি বাঙালির। ভারতীয় তথা বিশ্বের। পূর্ব পাকিস্তানের নয়। এই মানব ফকিরই কাঁটার জাল ছিন্ন করে দিয়েছে। মানবতার প্রতীক এই ফকির মানব তীর্থের জয়গান করে এখানেই স্বর্গকেই দেখিয়েছেন। এই পথেই আমাদের একমাত্র মুক্তি।

রবীন্দ্রসাহিত্য : বাউলতত্ত্বের রসভাষ্য

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মননে লালন ফকিরের গান বিশেষ মাত্রা দিয়েছে। বিশেষ করে বাউল প্রসঙ্গ এক ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে। কবির মনে বাউল গান সামগ্রিকভাবে বিস্তার লাভ করেছে। বাউল গান ও বাউল তত্ত্ব নিয়ে কবি ইংরাজি ও বাংলাতে একাধিক প্রবন্ধ রচনা করেছেন। সাহিত্যের প্রায় সব শাখাতেই কবির আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা পেয়েছে। বিশেষ করে বাউলসুরে কবি অসংখ্য গান রচনা করেছেন। তবে কবি শুধু পূর্ববঙ্গের বাউলদের সঙ্গো নয় পশ্চিমবঙ্গোর বীরভূম অঞ্চলের বাউলদের সঙ্গো বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। সেজন্য বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের বাউল সুরের আসল রূপটি তাই এক আশ্চর্য মিশ্র রূপের ধারা ভিন্নমাত্রা সংযোজন করে কালজয়ী হয়ে গেছেন।

কবির 'শিশু ভোলানাথ'(১৯২২) কাব্যে 'বাউল' নামক কবিতায় বাংলার বাউলের চিরন্তন সরল রূপচিত্রটি অসাধারণ মাত্রা পেয়েছে। সহজ-সরল শাশ্বত জীবনবোধ আমাদের মুগ্ধ করে—

দূরে অশথতলায়
পুঁতির কণ্ঠিখানি গলায়
বাউল দাঁড়িয়ে কেন আছ?
সামনে আঙিনাতে
তোমার একতারাটি হাতে
তুমি সুর লাগিয়ে নাচ!

'বনবাণী' (১৯২৬) কাব্যের ভূমিকায় কবি রবীন্দ্রনাথ বিচিত্র ভঙ্গীতে বাউলের উপমা ব্যবহার

করেছেন। মানুষের অনুভূতির মধ্যেই প্রকৃতি সর্বার্থক সার্থক। কবি প্রকৃতির মাঝে মানবীয় অনুভূতির ব্যঞ্জনা দিয়ে প্রকৃতিকে উপলব্ধি করেন। বাউলের জীবন মুক্তি তথা বিশ্বমুক্তি এক অসাধারণ বর্ণনায় প্রকাশিত হয়েছে—

> ওই গাছগুলো বিশ্ববাউলের একতারা ওদের মজ্জায় মজ্জায় সরল সুরের কাঁপন, ওদের ডালে ডালে পাতায় পাতায় একতালা ছন্দের নাচন। যদি নিস্তব্ধ হয়ে প্রাণ দিয়ে শুনি তাহলে অন্তরের মধ্যে মুক্তির বাণী এসে লাগে। ...তাতেই মুক্তির স্বাদ পাই। বিশ্বব্যাপী প্রাণের সঙ্গে প্রাণের নির্মল অবাধ মিলনের বাণী শুনি। ...পরম সুন্দরের মুক্তরূপে প্রকাশের মধ্যেই পরিত্রাণ,—আনন্দময় সুগভীর বৈরাগ্যই হচ্ছে সেই সুন্দরের চরম দান।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের 'শেষ সপ্তক'(১৯৩২) কাব্যের ১৩ সংখ্যক কবিতায় বিখ্যাত বাউল লালন ফকিরের গান সরাসরি এসেছে। কবির জীবনের শেষ পর্যায়ে ৭১ বছর বয়সে লালনের জীবন দর্শনে জারিত হচ্ছে নতুন করে। এক সুগভীর দার্শনিক ভাবনায় অশুভ ১৩ সংখ্যক কবিতাটি এক শুভ জীবনযাত্রার গভীর ভাবব্যঞ্জনা আমাদের চম্‌কে দিচ্ছে। 'বীথিকা' কাব্যের 'অচিন মানুষ' (১৯৩৪) কবিতা ও 'পত্রপুট' কাব্যের ৫ সংখ্যক কবিতাটি এই প্রসঙ্গে চিরস্মরণীয়। শুধু জীবনের গভীর বোধ নয়, আছে বাউল সাধনার প্রত্যক্ষ বর্ণনা গ্রামের হাটে যেখানে লোকজীবনের সমারোহে বাউলের উপস্থিতি বাংলার জীবন্ত ছবি ফুঁটে উঠেছে। আমাদের তথাকথিত জীবনে বাউল জীবনচর্যা প্রতিমুহূর্তে জীবনসুখী প্রশ্নের সামনে দাঁড় করায়। মায়াময় জীবনের আসল রহস্য দুঃসাহসী বাউলের জীবনচর্চা তথাকথিত জীবনচর্চাকে ভাবায় ও সেই সঙ্গে কাঁদায়ও।

'শেষ সপ্তক' (১৯৩২) কাব্যের ১৩ সংখ্যক কবিতায় লালন ফকিরের বিখ্যাত গানের সমাবর্তনে এক আশ্চর্য মাত্রা দিয়েছে—

বাউল এসে থামল...গাইল,
অচিন পাখি উড়ে আসে খাঁচায়;
        দেখে অবুজ মন বলে—
        অধরাকে ধরেছি।...
অচিন পাখি তুমি,
        মিলনের খাঁচায় থাক,
        নানা সাজের খাঁচা।
সেখানে বিরহ নিত্য থাকে পাখির পাখায়,
        স্থবির ওড়ার মধ্যে
        তার ঠিকানা নেই।

'বীথিকা' কাব্যের 'অচিন মানুষ'কে (১৯৩৪) কবিতার রূপ কল্পনায় বাউলের 'মনের মানুষ'—ভাবনার জিজ্ঞাসা সহজেই এসে পড়ে। কোথায় 'অচিন মানুষ' কোথায় 'মনের মানুষ'—মানুষ কি সত্যিকারের মনের মানুষ সারা জীবনের সাধনায় খুঁজে পায়? অতৃপ্ত মানুষ , চিরবিরহী মানুষ—সারা জীবন কার সাধনায় মগ্ন থাকে? সব মানুষের জীবন সাধনা কি সফল হয়? আসলে চেনামহলে অচেনা মায়া-মর্ত্যে ঘুরে ফিরি—আসল দেখা হয় না আর। আর অন্ধ বাউল চোখে না দেখেও জীবনের সার বুঝে নেয় কোন শক্তিতে?

'বীথিকার' 'অচিন মানুষ' (১৯৩৪) কবিতায় কবি রবীন্দ্রনাথ এক অসাধারণ বাউলের চিত্রকল্প

এনেছেন—

তুমি অচিন মানুষ ছিলে গোপন আপন গহন-তলে,
কেন এলে চেনার সাজে?
তোমায় সাঁজ-সকালে পথে ঘাটে দেখি কতই ছলে
আমার প্রতিদিনের মাঝে।
ও যে অচিন মানুষ-মন উহারে জানতে যদি চাহো
জেনো মায়ার রঙ-মহলে,
প্রাণে জাগুক্ তবে সেই মিলনের উৎসব-উৎসাহ
যাহে বিরহদ্বীপ জ্বলে।

বিশ্বকবির 'জীবনস্মৃতি'র পাতায়ও লালন ফকিরের এই বিখ্যাত গানের প্রসঙ্গ এসেছে। কবির নিজের লেখা একটা গানের সঙ্গে লালন ফকিরের গানের ভাবের মিল, মননের সাচুর্য আমাদের বিস্ময় জাগায়। স্বরগুঞ্জনের সঙ্গে প্রথম লাইনটা লিখিয়াছিলাম'।

আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী।
তুমি থাক সিন্ধুপারে ওগো বিদেশিনী।...
ভুবন ভ্রমিয়া শেষে
এসেছি তোমারি দেশে,
আমি অতিথি তোমারি দ্বারে, ওগো বিদেশিনী।।

এই গানটি লেখার অনেকদিন পরে বোলপুরের রাস্তায় লালন ফকিরের সেই বিখ্যাত গানটি গেয়ে চলেছিল এক বাউল।

খাঁচার মাঝে অচিন পাখি কম্‌নে আসে যায়
ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতেম পাখির পায়।।...
মন তুই রইলি খাঁচার আশে
খাঁচা যে তোর কাঁচা বাঁশে
কোন্‌দিন খাঁচা পড়বে খসে
ফকির লালন কেঁদে কয়।।

> দেখিলাম, বাউলের গানও ঠিক একই কথা বলিতেছে। মাঝে মাঝে বন্ধ খাঁচার মধ্যে আসিয়া অচিনপাখি বন্ধনহীন অচেনার কথা বলিয়া যায়; মন তাহাকে চিরন্তন করিয়া ধরিয়া রাখিতে চায়, কিন্তু পায় না। এই অচিনপাখির নিঃশব্দ যাওয়া আসার খবর গানের সুর ছাড়া আর কে দিতে পারে।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৬৭ বছর আগে ফকির কবি লালন জন্মেছিলেন। ফকির কবির মৃত্যুর পর বিশ্বকবি আরো ৫১ বছর বেঁচেছিলেন। ফকিরের মৃত্যুর সময় কবি মাত্র ২৯ বছরের যুবক। ১৯৩৪ খিস্টাব্দে কবি রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত 'ছন্দের প্রকৃতি' প্রবন্ধে লালনের প্রসঙ্গ এসেছে।

সেই 'অশিক্ষিত' লাঞ্ছনাধারীর দল যথাযথ বাংলা ভাষার সম্পদ নিয়ে আনন্দ করতে বাধা পায়

না। তাদের প্রাণের গভীর কথা তাদের সহজ ভাষায় উদ্ধৃত করে দেই—

আছে যার মনের মানুষ মনে
সে কি আর যপে মালা
নির্জ্জনে সে বসে বসে দেখছে খেলা।

এই ছন্দের ভঙ্গি একঘেয়ে না। ছোট বড় নানাভাবে, বাঁকে বাঁকে চলেছে। সাধু প্রসাধনে মেজে ঘসে বাড়ানো চলে, আশা করি এমন কথা বলবার সাহস হবে না কারো।

'ছন্দের প্রকৃতি' প্রবন্ধ ছাড়া কবির শেষ বয়সের রচনায় লালন চর্চার নিদর্শন আমাদের অবাক করে দেয়। বাংলা ছন্দের ক্ষেত্রে লালন সংগীতের কাব্যমূল্যের স্বীকৃতি ও সম্মান দিয়ে কবি অকৃত্রিম লালনচর্চার পরিচয় দিয়েছেন।

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত গানের খাতায় লালন ফকিরের গান আছে। কবির সংগৃহীত বাউল-গান থেকে 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রায় ২০টি গান প্রকাশ করে লালন ফকিরকে সামনে আনেন। এই সমস্ত ঘটনায় বেশ স্পষ্ট হয় রবীন্দ্রমানসে লালন বাউলের গান বেশ কার্যকরীরূপে প্রতীয়মান হয়েছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ছন্দের প্রকৃতি' প্রবন্ধ পাঠে নিরক্ষর ও দরিদ্র ফকিরকে রাজকীয় মর্যাদা দিয়েছেন। সেই থেকে সুফি সমাজে রবীন্দ্রনাথের কাছে লালনচর্চা এক ক্রমবর্ধমান অনুসন্ধিৎসা এনে দিয়েছে। যার ফসল হিসাবে আজও বাংলা ও বাঙালির জীবনসাধনায় ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ ও ফকির লালন একাত্ম হয়ে পড়েছেন।

লোকসংস্কৃতির প্রখ্যাত গবেষক মহম্মদ মনসুরউদ্দিনের 'হারামণি' গ্রন্থের ভূমিকায় বিশ্বকবি বাউল অনুরাগের কথা আরও একবার লিখিত ভাবে স্বীকার করলেন। কবি রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টতই লিখেছেন—

আমার অনেক গানেই আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি এবং অনেক গানে অন্য রাগ-রাগিনীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউলের সুর ও বাণী কোনো এক সময়ে আমার মনের মধ্যে সহজ হয়ে মিশে গেছে।

বাউল সম্প্রদায়, বাউলের গান ও তার তত্ত্বভাবনায় রবীন্দ্রনাথ হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান মিলনের মেলা দেখেছেন। এই ঐক্যের সত্যরূপটিকে প্রত্যক্ষ করেছেন— 'হারামণি' গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি খুব স্পষ্ট করে স্বীকার করেছেন।

"The Religion of Man" (১৯৩১) গ্রন্থের অন্তর্গত 'The man of my heart' প্রবন্ধে কবি বাউল প্রসঙ্গ স্মরণ করেছেন। ভারতবর্ষীয় দার্শনিক মহাসংঘের সভাপতির ভাষণে কবি বাউলগানের মধ্যে তত্ত্বের প্রসঙ্গ উপস্থিত করেছিলেন। বাংলার নিরক্ষর বাউল গানের প্রখ্যাত ইংরেজ কবি শেলির কবিতায় অতীন্দ্রিয় আবেশের মিল দেখেছেন। তিনি বলেছিলেন—

শুধু এই প্রভেদ যে, শেলির ভাষা জনকয়েক শিক্ষিত লোকের জন্য— আর এই বাউল গ্রামের চাষি ও সর্বসাধারণের, যাহারা এই গানের আধ্যাত্মিক অতি বাস্তবতায় অতিষ্ঠ হইয়া ওঠে না।

শিলাইদহ, সাজাদপুর ও পাতিসরে থাকাকালীন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পূর্ববাংলার অসংখ্য বাউল-ফকিরদের সঙ্গে, আন্তরিকতায় প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটেছিল। বিমগ্ধ মন নিয়ে কবি বাউল-ফকিরদের গান শুনেছিলেন। বাউল-ফকিরদের গানের সহজ-সরল-গভীরতা কবির মনকে

প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছিল। যা কবির আমৃত্যু জাগরুক ছিল।

লালন ফকিরের গান সংগ্রহের জন্য ক্ষিতিমোহন সেনের সঙ্গে আলোচনা করেছেন কবি। শান্তিদেব ঘোষের পিতা কালীমোহন ঘোষকে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

> তুমি তো দেখেছো শিলাইদহতে লালন শাহ ফকিরের শিষ্যগণের সহিত ঘন্টার পর ঘন্টা আমার কিরূপ আলাপ জমতো। তারা গরীব। পোষাক পরিচ্ছদ নাই। দেখলে বোঝাবার জো নাই তারা কত মহৎ।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের মনে বাউল গান এমনই প্রবল প্রভাব ফেলেছিল— যা সারাজীবন তিনি পালন করেছেন, লালন করেছেন আজীবন। কবি একসময় নিজেকে বাউল বলতে দ্বিধাবোধ করেননি। কবি নিজেই নিজের পরিচয় দিয়েছেন 'রবি বাউল' বলে। শুধু বলেই শেষ নয় কবির গানের কথায়, কবিতার ভাষায়, নাটকের গানে-চরিত্রে বাউল সুর, বাউল-ভাব ও বাউল ভাষা লালন ও পালন করেছেন।

কবির 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থের 'ছোটো বড়ো' প্রবন্ধে জানান, সারা জীবন বাউলের সেই চিরন্তন গান মনের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। '... মানুষ আপনার সব কিছুর মধ্যে আপনার চেয়ে বড়ো একটি কাকে অনুভব করছে। সেজন্যই ঐ বাউলের দলই বলছে—

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি
কম্‌নে আসে যায়।

আমার বসন্ত সীমার মধ্যে সীমার মধ্যে সীমার অতীত সেই অচেনাকে ক্ষণে ক্ষণে জানতে পারছি, সেই অসীমকেই আমার করতে পারবার জন্য প্রাণের ব্যাকুলতা।—

আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে
আমার মনের মানুষ কে রে!
আমি কোথায় পাব তারে।

উৎসের সন্ধানে

১. ড. তৃপ্তি ব্রহ্ম : 'লালন পরিক্রমা', ফার্মা প্রা.লি., ১৩৯৩
২. 'রোববার', 'প্রতিদিন', ৩১ অক্টোবর ২০১০
৩. সুধীর চক্রবর্তী : 'লালন', প্যাপিরাস, ১৯৯৮
৪. 'অচিন পাখি-লালন স্মারক গ্রন্থ', ২০১০, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লালন মেলা সমিতি
৫. ড. সলিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : 'রবীন্দ্রসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতি', নবজাতক প্রকাশন, ১৯৮৭
৬. ড. সুধীর কুমার : 'লোকায়ত রবীন্দ্রনাথ', করণ গ্রন্থালয়, ১৩৭২
৭. সুপ্রতীপ দেবদাস : 'লালন ফকিরের গান সংকলন', ইন্ডিয়ান বাউল, আর্ট একাডেমী, ১৪০২
৮. 'রবীন্দ্ররচনাবলী জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ' : পশ্চিমবঙ্গ সরকার
৯. লীনা চাকী (সম্পাদিত) : 'হৃদয়-রবীন্দ্রনাথ ও বাউল', ২০১০
১০. শান্তিদেব ঘোষ : 'বাউলদের মনের মানুষ ও গুরুদের রবীন্দ্রনাথ', ১৩৯৫

বাউল গানে নারী

লীনা চাকী

১

আমাদের ধারণায় বাউলেরা সমাজ-বহির্ভূত। একাকী নির্জনে আপন সাধন পথে চলেন তাঁরা। তাঁদের জীবন-চর্যা, সংসার সম্পর্কিত মানসিকতা, চারপাশের জগৎ বিষয়ে তাঁদের ধারণা, সবই আমাদের থেকে আলাদা। কিন্তু আমাদের এই জ্ঞান অসম্পূর্ণ। তাঁরা সাধারণ গার্হস্থ্য জীবনাচরণের সঙ্গে সম্পৃক্ত না হলেও, তাঁরা কিন্তু আমাদের মতই সমাজ সচেতন, চারধারের জগৎ-জীবন সম্পর্কে যথেষ্ট- রূপে ওয়াকিবহাল।

মোটামুটি ভাবে বলা চলে যে বিগত শতকই বাংলার বাউল-সংস্কৃতির স্বর্ণ যুগ। এই শতকেই এঁদের মধ্যে অনেক বড়ো সাধক কবি এসেছেন, অসংখ্য গান রচনা করেছেন এবং তাঁদের সাধনার ধারাকে উচ্চ কোটির জনসমাজের মনোযোগের বিষয় করে তুলতে পেরেছেন। এখন আমাদের আলোচ্য যে, কোন্ বৈশিষ্ট্যে বাউলদের গান ও সাধনা ঐ শতাব্দীর কৌতূহল আকর্ষণ করলো। প্রথমত তাঁদের গানের কাব্যমূল্যের একটি আকর্ষণ যে কোনো রসিক ও মননশীল ব্যক্তির রসপ্রাশন ঘটাবার ক্ষমতা রাখে। দ্বিতীয়ত, বাউলদের নারী-সম্পৃক্ত সাধনা (যে বিষয়ে অনেকেই নাসিকা কুঞ্চিত করেন)। এই দ্বিতীয় প্রসঙ্গেই আমরা বক্ষ্যমান প্রবন্ধে একটা তুলনার অবকাশ তৈরি করতে চাই।

আমাদের সামনে বাউল গানের যে বিপুল সম্ভার রয়েছে তার মাধ্যমে তাঁদের সাধন-পদ্ধতির জগতে উঁকি দিয়ে জানতে ও দেখতে পাচ্ছি যে নারী কেবল তাঁদের সাধনার সঙ্গিনীই নন, সেখানে তিনি সম্মাননীয়া। নিবিড় ভালোবাসার অংশীদার। উনিশ শতকের বাংলার (কোলকাতা-কেন্দ্রিক বাবু সমাজে) দাম্পত্য-জীবনের যে ছবি আমাদের সামনে ভাসে তার থেকে ভিন্ন রঙের ছবি এঁকেছেন তাঁদের গানে। সেখানে (ব্যক্তিগত সম্পর্কেও) নারী শুধু প্রধানাই নন— সম্ভ্রম ও প্রীতির অধিকারিণী। এরই পাশে পাশে নগর-বঙ্গের বাবুদের কাছে নারীর স্থান কোথায় ছিল তার অতি-সংক্ষিপ্ত হিসাব নেওয়া বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

উনিশ শতকের দুরন্ত বাবু কালচারের সুবিস্তারিত ছবি সে-সময়ে রচিত অসংখ্য নক্সা-প্রহসন-ছাড়া-গানের মধ্যে দিয়ে প্রচারিত হয়েছে— সে খবর আজ সবারই জানা। সেদিনের নগর-নটীদের ঘুঙুরের শব্দে কত গৃহবধূর কান্না চাপা পড়ে গেছে, মদের আসরের হুল্লোড়ের নিচে ব্যর্থ হয়েছে অসংখ্য কুলকামিনীর দীর্ঘশ্বাস। সে-সবের জীবন্ত চিত্র আঁকা আছে 'নববাবু বিলাস', 'নববিবি বিলাস', 'কলিকাতা কমলালয়', 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা', 'আলালের ঘরের দুলাল', 'সধবার

একাদশী', 'একেই কি বলে সভ্যতা' ইত্যাদি অপরিমেয় গ্রন্থ সমূহে। সে-সবের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সেদিনের সমস্ত নারী সমাজের হৃদয়-ভাঙা আর্তনাদের সঙ্গো পরিচয় করিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে কেবল একটি প্রায়-অপরিচিত পত্রের উল্লেখ এখানে করা হবে। পত্রটি ১৭৬৪ শকের কার্তিক মাসের 'বিদাদর্শন' পত্রিকার ৫ম সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল। ঐটির লেখিকা হলেন কলকাতার মেছোবাজার নিবাসিনী এক যৌনকর্মী (পত্র লেখিকা নিজের পরিচয় দিয়েছেন 'বেশ্যা') বলে। ঐ বারাঙ্গনা লিখেছেন—

> আমি শান্তিপুর নিবাসী এক কুলীন ব্রাহ্মণের কন্যা ছিলাম, আমার শৈশবকাল বাল্যক্রীড়ায় যান হইয়া যৌবনের প্রারম্ভ হইল, তথাপি আমার পিতা-মাতা বিবাহের উদ্যোগ করেন না। ইহাতে একদিন আমি প্রতিবাসিনী কোন রমণীর নিকটে এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া অবগত হইলাম, যে তিন বৎসর অপেক্ষাও অল্প বয়ঃক্রমকালীন আমার বিবাহ হইয়াছে। এই বাক্য শ্রবণমাত্র আমি একেবারে স্তব্ধ রহিলাম। পরন্তু যখন আমার ষোড়শবর্ষ বয়স তখন কোন দিবস অপরাহ্নে পঞ্চশৎবর্ষ বয়স্ক একজন মনুষ্য আমাদিগের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন, এবং পরিচয় গ্রহণ দ্বারা জানা গেল মাত্র আমার অন্তঃকরণ কম্পিত হইল। লজ্জা,ঘৃণা, ক্ষোভ, ক্রোধ, সংশয় প্রভৃতি ভাবের এ-প্রকার আন্দোলন হইয়াছিল, যে আমি আর লোক সমাজে মিশ্রিত হইবার অভিলাষ একেবারে ত্যাগ করিয়াছিলাম। তাঁহার কুৎসিত আকৃতি, গলিত অঙ্গ এবং পক্বকেশাদি দর্শন করিয়া আমি হতবুদ্ধি হইয়াছিলাম। আমি জ্ঞানত : তাঁহাকে বরণ করি নাই কদাপি তাঁহার সহিত জ্ঞানাবস্থায় সাক্ষাৎ নাই, তাঁহার সহিত মনের ঐক্য বা প্রণয়ের সঞ্চার হয় নাই অথচ তিনি আমার পতি, আমার সুখের মূলাধার, কি আশ্চর্য। তাঁহার মূর্তি যেমন কুৎসিৎ রজনীতে তাঁহার ব্যবহারও তদ্রূপ প্রত্যক্ষ হইল। যাহা হউক পরদিন প্রাতঃকালে তিনি আমার পিতার নিকটে কিঞ্চিৎ ধন সংগ্রহপূর্বক যে প্রস্থান করিলেন, সেই পর্যন্ত আর দর্শন হয় নাই। একে আমার যৌবনোদগত, তাহাতে এবম্প্রকার বিড়ম্বনা সকল সঙ্কটন হওয়াতে যেরূপ যাতনা বোধ হইল বিশেষত জীবনের সুখ যে পতিসম্ভোগ, তাহাতে এককালীন বঞ্চিত হইয়া অন্তঃকরণ যে প্রকার অস্থির হইল, তাহা কি বলিব। মাসাবধি দিবারাত্রি কেবল ক্রন্দন করিয়াছি। যদিও আমার নিতান্ত চেষ্টা ছিল সৎপথে রহিব এবং কুলধর্ম রক্ষা করিব কিন্তু অবশেষে জ্বালাতন হইয়া ব্যভিচারের পথকে অবলম্বন করিয়াছি এবং স্বাধীন মনে কলিকাতায় আগমনপূর্বক মেছোবাজারবাসিনী হইয়াছি।
>
> আমি এ-স্থলে বসতি করিলে আমার কনিষ্ঠা ভগিনী স্বামীর সহিত অনৈক্য এবং বিবাদ করিয়া গত বৎসর আমার সহবাসিনী হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আমার বাল্যকালের বিংশতি জন সঙ্গিনীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে! তাঁহারা আমার ন্যায় কলিকাতার স্থানে অধিবাস করিতেছেন।
>
> কলিকাতা নিবাসী বেশ্যা

নারীরও যে কিছু কামনা-বাসনা, মানসিক সংবেদনশীলতা, শারীরিক তৃপ্তি-অতৃপ্তি থাকতে পারে, এই অতি বাস্তব সত্যটি পত্রলেখিকা স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করে সমস্ত সমাজের মুখে যেন চপেটাঘাত করেছেন। এর থেকে এই সত্য বেরিয়ে আসে যে, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহের কারণে অনেকেই স্বামী সুখ-বঞ্চিত হয়ে গণিকালয়ে আশ্রয় নিতেন। কেবল গ্রাসাচ্ছাদন বা দারিদ্র্যই পতিতা বৃত্তির একমাত্র কারণ নয়।

২

এই নির্মম সত্য আমাদের জানা আছে যে, সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ দীর্ঘদিন বাঙালি সমাজের নারী নির্যাতনের কারণ হয়ে থেকেছে। বিশেষ করে বহুবিবাহের ক্ষেত্রে ব্যাভিচারের

ঘটনা ঘটতো সর্বাধিক। অতি বৃদ্ধ কুলিন পাত্র ডজন ডজন বিয়ে করে কুলিন অভিভাবকের কুল রক্ষা করত— এতে কখনও কখনও তাঁরা নাতনির বয়সি কন্যাকেও বিয়ে করতে দ্বিধা করত না। ফলে, এই সব বিবাহে মধুর দাম্পত্য সম্পর্ক তৈরির কিছুমাত্র অবকাশ থাকত না, সুস্থ পারিবারিক সম্পর্ক সৃষ্টি তো অনেক দূরের কথা। কেবল বিয়ের নামে যূপকাষ্ঠে বলি হওয়া এই সব মেয়েদের সবাই যে কুলত্যাগ করতে পারত তাও নয়; কোনো আশা-আকাঙ্ক্ষাই তাদের পূর্ণ হতো না, সারা জীবন হাহাকার করেই কাটতো। ১৮৮১ সালে প্রকাশিত জনৈকা অভয়াসুন্দরী দাসীর লেখা একটি কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে সমাজ ও সংসারে প্রপীড়িতা এক বঞ্চিত নারীর গভীর মর্মবেদনা এখানে উপস্থিত করতে চাই। তিনি লিখছেন—

দুর্ভাগিণী বঙ্গনারী, একে পুত্রশোকে মরি,
দ্বিগুণ যাতনা পায়, পতির অযতনে।
রুদ্ধ রাখি অন্তঃপুরে, যে দুঃখ দাও অন্তরে,
সে যাতনা বাক্যেতেও কহা নাহি যায়।...
ধন্য ওরে দেশাচার, করি তোরে নমস্কার,
কি বিচারে কি ব্যাভার শিখাতেছ স্বদলে।
সেই বিচারের ফলে, নারী প্রাণে অগ্নি জ্বলে,
দাহ হয় দিবানিশি বঙ্গনারী সকলে।

মাত্র দশ বৎসর বয়সে তিলোত্তমা স্বামী হরিপ্রসাদ ঘোষের ঘর করতে এসেছিলেন। কিন্তু তাঁর জীবনের সবচেয়ে সুন্দর মধুময় দিনগুলি কেটেছে স্বামী-সংসারের অবহেলা-তাচ্ছিল্য-অপমান আর অত্যাচার সহ্য করে। তিনি তাঁর এই জীবন-বেদনা, হাহাকার, অপমানের জ্বালা উজার করে দিয়েছেন তাঁর 'আপেক্ষ' শীর্ষক কবিতাগুচ্ছে (প্রকাশকাল ১৩২০ বঙ্গাব্দ, কলিকাতা)। একটি কবিতায় তিনি 'স্বামীর প্রতি ' অভিমান ভরা প্রশ্ন রেখেছেন —

তাইতো জিজ্ঞাসি ভুলেছ কি নাথ?
দেখিলে কি মোরে চিনিতে পার?
আমার মতন পাও কি যাতনা,
অথবা আমাকে চিনিতে নার।

'উচ্ছ্বাস'-এ—

দাসী বলি অবহেলি, দুই পদ দিয়ে ঠেলি,
কবিরে সুন্দরী সনে পুনঃ পরিণয়॥
এ বারতা মম মনে, সত্য কি গো হয়?

এইসব কবিতায় তিলোত্তমার মতো মেয়েরা কোনো অভিযোগ বা অভিশাপ বর্ষণ করেননি, কেবল অভিমানের পাষাণ ভারে আপনারা দীর্ণ হয়েছেন। এই ভাবেই সমগ্র ঊনবিংশ বা বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ কালের নারী-সমাজ নিজেদের দৈনন্দিন জীবন-লিপিতে আপনাপন যন্ত্রণা উৎকীর্ণ করে গেছেন, উত্তরকালের নারীদের জন্য। 'ভাগ্যবানের বউ মরে, তামা-পিতলে ঘর ভরে',মেয়েদের সম্পর্কে এই যখন সমাজ-মানসিকতা, তখন সেখানে মেয়েদের মর্যাদা কিভাবে রক্ষিত হবে।

ঠিক এর বিপরীত দিকে অবস্থান করেছেন বেশরা-সমাজ-বহির্ভূত বাউলেরা। তাঁদের গানে, আচরণ-চেষ্টাদিতে এবং সাধন-সিদ্ধিতে নারীর মর্যাদা সর্বাধিক। অন্তরের অন্তরতম সঙ্গো মিলনের যে সাধনা ঐসব মন্ত্রবর্জিত ব্রাত্য তাঁদের আখড়ায় আপন-আপন করণ-কারণের মধ্য দিয়ে উদযাপন করে চলেছেন, তাঁদের সাধন-সঙ্গিনী হিসাবে গৃহীত মহিলাটিকে হয়তো ঠিক সামাজিক দম্পতি হিসাবে পাওয়া যাবে না, কিন্তু নিষ্ঠাবান বাউলের সাধিকা হিসাবে, রাধাভাব পরিগৃহীতা রূপে, যুগল-সাধনার সঙ্গিনী মনে করে নিতে কোনো অসুবিধা হয় না। তাই সু-সম্মানিত এই সাধিকা নারীই বাউলের কাছে পৌঁছে দেয় সাধনা-শেষের কাঙ্ক্ষিত ধন, ঐ নারীর কাছেই থাকে সাধকের সিদ্ধস্তরে পৌঁছানোর চাবিকাঠি। তাই এমন যে নারী তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে লালন ফকিরকে লিখতে দেখি—

কোন রসে রতির খেলা জেন্তে হয় এই বেলা॥
সাড়ে তিন রতি বটে লেখা জাএ ছাস্ত্র পাটে
সাধ্যির মূল তিন রস ঘটে
তিন রস সহিট রসের বালা জেনল্যে সে রসের মরম
রশীক তাকে জাএ বলা॥
তিন রস সাড়ে তিন রতি বিভাগে করে স্থীতি
গুরুর ঠাঁই জেনে পাতি
সাসন করে নিরালা॥
তার মানব জনম সাপল হবে
এড়াবে সমন জ্বালা॥
রস রতির নাই বিচাক্ষন আন্দাজি করি সাদন
কিশে হয় প্রাপ্ত কি ধন
ঘোচে না মনের ঘোলা॥
আমি উজাই কি ভেটেনে পড়ি
ত্রি পীনির তির নালাএ॥ ...

(লালনের খাতায় যেমন বানান আছে ঠিক সেই রকম রেখে। লী. চা.) তাঁরই লেখা আর একটা গান এই রকম—

তিন দিনের তিন মরম জেনে
রশীক সাদলে ধরে তা একদিনে॥...
তিন শ সাইট রসের মাঝার
তিন রস গন্ন্য হয় রসিকার
সাদিলে সে করণ এড়াইবে
সমন এ ভুবনে॥

এরই পাশাপাশি অটলচাঁদের একটি গান উদ্ধৃত করা যেতে পারে —

বলি সাধনের রীতি
লয়ে প্রকৃতি সতী অগ্নি পারাতে গতি
উভয়রীতি থাকতে যদি পার,
তবে সেই মানুষকে সঙ্গো করে
রঙ্গো ভঙ্গো ফের।

বাউল মনে করে, নারী নিয়ে সাধনা, যেন ঘি আর আগুনের পাশাপাশি অবস্থান। তবুও সাধক যিনি, তিনি মনকে বশে রাখতে জানেন। এ বিষয়ে সাধক বাউল পদকর্তা বলেন—

শুদ্ধ প্রেম সাধবি যদি কাম-রতি রাখ হৃদয়ে পুরে।।
সাড়ে তিন রতির খেলা,
না জানলে ঘটবে জ্বালা,
জেনে শুনে মারো তালা
হরণ-পূরণ সাধন দ্বারে।।
সাধারণের ভাটির করণ,
সামস্যার হয় রে মরণ,
সমর্থার রয় যে উজল,
আধ রতি প্রেম গোপীকারে।।
শান্ত রসে মিলন রতি—
তাতে কারো হয় না মতি,
সম্পূর্ণ ঐ রাধা সতী
পূর্ণ প্রেমে আছে জ্যান্তে মরা।।

৩

রাধা ছিলেন প্রেমে একনিষ্ঠা। সাধিকার কাছেও প্রতিটি বাউলের তাই-ই একান্ত কামনা। সাধক তাঁর সাধিকার ওপরে সেই রাধাভাবই আরোপ করে কল্পনায় রাধার একনিষ্ঠ প্রেমকে দেখতে পান। পাশাপাশি বাউল সদাই ভয় বাসে যে সে-যদি এই রস-রতির খেলায় পরাজিত হন। কারণ তিনি জানেন যে—

ও তার বিন্দু বিসর্গ হলে,
ভজন যাবে রসাতলে,...

সে কারণেই বাউল সাধনায় আয়ত্ত করতে হয় শুদ্ধ চিন্তা। আর নারীর প্রতি পোষণ করতে হয় শ্রদ্ধা ও প্রেম। বাউল বলেন—

সাধনের করণ ভারি,
সাধন নয় ভারিভুরি,
আহা মরি যে জানে সে জানে।
চণ্ডীদাস আর রজকিনী জেনেছিল দুইজনে।...

বাউল গানে বারে বারে বলা হয়েছে এক মরণে দুজনের মরার কথা। রসরতির সাধনায় এই একসঙ্গে মরণ শুধু যোগ সাধনার কোন 'ক্রিয়া' নয়, এর সঙ্গে আশ্লিষ্ট থাকে গভীর প্রেম, আত্মার সঙ্গে আত্মার মিলন-ভাব। সে প্রেম কামনায় তীব্র চাওয়া এবং পাওয়ার মিলনজাত গভীর সুখবোধ শুধু নয়। বাউল গানগুলি মনোযোগ সহকারে অনুধাবন করলে বেশ বোঝা যায় যে, বাস্তবের রাধারানির কাছে কামনাময় কোনো মুহূর্তকে পাওয়া নয়, কেবল মৈথুনদণ্ডে রসাস্বাদন নয়, ১৮/১৯ শতকের দৃষ্টিতে নারীকে শুধু ভোগ্যা হিসাবে পাওয়া নয়, তাঁদেরকে সম্মান জানানো, ভালোবাসা হলো বাউলের সাধনার অঙ্গ।

লালন ফকির উনিশ শতকের প্রথম দু-এক এবং শেষের দশকটিকে বাদ দিয়ে, প্রায় ৬০/৭০

বছর ধরে অজস্র গান লিখেছিলেন। তাঁর আগে-পরে আরও অনেক সাধক মহাজনের লেখা গানও আমরা পেয়েছি। লালন শিষ্য দুদ্দু শাহ, ফকির পাঞ্জু শাহ, যাদুবিন্দু, পদ্মলোচন, হাউড়ে গোঁসাই এবং আরও অনেকের গান ছাপার অক্ষরে আমাদের হাতে এসেছে। বাউলের সাধ্য-সাধনার কথা গুরুশিষ্য পরম্পরায় বাহিত হয়ে আসে তাঁদের গানের মধ্যে দিয়ে। গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা, সাধনায় অবিচলিত থাকার পরামর্শ, সাধন প্রক্রিয়ার কথা ইত্যাদি 'সন্ধ্যা' ভাষায় বাউল গানে ধৃত হয়ে থাকে।

সাধন-গীতি রচনা এবং তা গাওয়ার প্রচলন আমাদের দেশে আদিকাল থেকেই রয়েছে। সে সব গান সাধক সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। কোনদিনই তাদের কাব্যমূল্যে বা সাংগীতিক বিশিষ্টতার বিচার করা হয়নি। অধ্যাপক ড. সুকুমার সেন তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস'-এ লিখেছেন—

> বাঙ্গালা ভাষা এবং সাহিত্যের উন্মেষক্ষণ হইতে গীতিকাব্য দুইটি বিশিষ্ট ধারায় প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে; এক ধারা সাধনগীতি আর ধারা পাঞ্চালী-পদাবলী। দ্বিতীয় ধারাটিই বারবার সাহিত্যের আসর জাঁকাইয়া আসিয়াছে। প্রথম ধারা কখনই সাহিত্যের দরবারে প্রবেশপত্র পায় নাই, শৈব সিদ্ধা-কাহিনীর মধ্য দিয়া সাহিত্যের দেউড়ি পর্যন্ত আসিয়া প্রত্যাগত। চর্যাগীতির পরে চারিশত বৎসরেরও অধিক সময়ের মধ্যে লেখা অধ্যাত্মগীতি ছাড়া উল্লেখযোগ্য কিছু পাওয়া যায় নাই।

এই বিশ্লেষণ বাউল গানকে অন্যান্য সাধনগীতি থেকে পৃথক আসনে স্থান দেয়। অদৃশ্য-কল্পিত-অনুমানকৃত কোনো দেব-দেবীর আরাধনা এখানে অনুপস্থিত। বাউলের অন্তরের মধ্যে যে আত্মা তাই-ই তার আরাধ্য। দেহের মধ্যেই তাঁর বৃন্দাবন। এমনকি বৈষ্ণবের অনুমানের রাধা নয়, বর্তমানের মানবীই তার আরাধ্যা—সংগীতের উপজীব্য। উল্লেখ্য যে লালন বা অপরাপর বাউল-গোঁসাই-এর গান কতটা সমাদর পেত বা আলোচিত হত, যদি না রবীন্দ্রনাথ সে সম্পর্কে আগ্রহী হতেন বা তাদের ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করতেন। আমরা জানি যে বাউলদের সাধন কথা যথা-তথা বলায় যেমন নিষেধ আছে, তেমনি বাউলদের গানের খাতা ও পুঁথি সযত্নে গুরুশিষ্য পরম্পরায় রক্ষা করাই এই সাধন-পথের রীতি। তবুও গোপনীয়তার অন্তরাল থেকে বেড়িয়ে এসে রবীন্দ্রনাথের হাত বেয়ে যা আমাদের পাতে পরিবেশিত হলো, তার রসাস্বাদ আমাদের বিস্মিত কৌতূহলের সৃষ্টি করেছে। তাঁদের সাধন সংগীতের এমন কাব্যমাধুর্যপূর্ণ অবয়ব এবং ছন্দ ও শব্দ ব্যবহার দেখলে মনেই হয় না যে এই সব বাউল সাধকদের অনেকেই প্রায় নিরক্ষর ।

বাউল সাধনার চারটি স্তর : স্থূল, প্রবর্ত, সাধক, সিদ্ধি। তাঁদের গানেরও চার স্তর। স্থূল, প্রবর্ত স্তরে গুরুভজনা, সাধক স্তরে প্রকৃতির কথা, সিদ্ধিস্তরে নিজের মধ্যে শুদ্ধ প্রেম চেতনা বা প্রকৃতি-অনুভবের কথা। তবে সাধনার পথ কঠিন, সেখানে টিঁকে থাকা পিছল ঘাট ব্যবহার করার মতোই কঠিন, কারণ পা পিছলালেই কামনদীতে ডুবে মরতে হবে।

চৈতন্য-আদর্শে প্রাণিত, বিভিন্ন লৌকিক-চেতনা সম্বন্ধে নানা ধর্মপথের সমন্বয়ে এবং নিজস্ব কিছু করণ-ক্রিয়ার যৌগে নির্মিত বাউল মতাদর্শ আজি নিশ্চিতভাবে তার নিজস্বতা তৈরি করতে পেরেছে। এঁরা (বাউলেরা) চণ্ডীদাস-রজকিনী, জয়দেব-পদ্মাবতী, বিল্বমঙ্গাল-চিন্তামণি, বিদ্যাপতি লছিমার মতো কামগন্ধহীন প্রেমরাজ্যেই শ্রেষ্ঠ এবং কাঙ্ক্ষিত জগৎ বলে মনে করেন। যুগল-ভজনে উল্লিখিতদের মতো প্রেমনিষ্ঠা ও সিদ্ধস্তরে পৌঁছনোর ব্যাকুলতাই বাউলের শ্রেষ্ঠ আকুতি। এ-কথা

গানে গানে তাঁরা বারেবারেই শুনিয়েছেন—

ভজ্‌রে ভজ্‌রে ও-মন শক্তি মূলাধারে।
শক্তি বিনা মুক্তি পদ এ-ভবে কেউ দিতে নারে॥
শক্তি কি যে অমূল্য ধন জানেন শ্রীনন্দের নন্দন,
তাই রাধা নামে করেন কীর্তন
স্বহস্তে তার পায়ে ধরে।
আবার নদেয় এসে অধীর হয়ে
কাঁদেন 'রাধা' বলে ভূমে পড়ে ॥
আবার দেখ মহেশ্বরে, শক্তির চরণ বক্ষে ধরে,
জীবে সে ভাব বুঝতে নারে,
মরে গিয়ে কামাচারে॥
চণ্ডীদাস ব্রাহ্মণের ছেলে রজকিনীরে ভজিয়ে,
আত্মায় আত্মা মিশিয়ে
নিত্যধামে গমন করে॥
আর কত দিব উপমা বিদ্যাপতি ভজনে লছিমা,
বৈষ্ণব শাস্ত্রে যায় রে শোনা
রূপে ভজনে মীরাবাঈরে।
তারণ কয় ভজ শক্তির চরণ,
শক্তি বিনে সাধন হবে না রে।।

বাউলের এই গানে দেবতায় আর মানুষে একাকার। সিঁড়ি ভাঙার মত প্রথমে দেবতার যুগল ভজনা, পরে বাউলের আদর্শ, দেবকল্প প্রেমরসিক চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি প্রমুখের যুগল ভজনার কথা, শেষ সেই পথের তন্নিষ্ট সাধক তারণের (পদকর্তা) শক্তি-নাম্নী সাধিকার চরণ-বন্দনা। পদকর্তা মনে করেন শক্তি ব্যতীত তাঁর সাধনা শুধু অসম্পূর্ণ নয়, অসম্ভব। দীনহীন-প্রায় নিরক্ষর সামান্য এক বাউল তারুণ তাঁর সাধিকা শক্তিকে মহীয়সী নারীর মর্যাদা দিয়েছেন।এর পাশে লালনের চমৎকার একটা গানে দেখি—

ও ম্যায়ার ঠ্যাং নাড়া ধান চাইল হলি ঠাকুরি খায়।
—ভজ গা যাইয়া ম্যায়ার পায়।
মণিপুরে ম্যায়ার সব চিঁড়ে কোটে গোদা পায়,
সেই চিঁড়ে দিয়ে পূজা করে, লাগে ব্রহ্মার সেবায়।
কি ম্যায়া জগতের গুরু— সে ম্যায়া চিনা দায়,
তাই অধীন লালন বলে, ম্যায়া হইয়া ম্যায়া ভজ,
ও আমি বারেবারে বলছি তাই, সব রইয়াছে ম্যায়ার পায়॥

এখানে লালনের পরামর্শ যদিও প্রকৃতি-স্বভাব ধরে প্রকৃতির সাধনা করো ('প্রকৃতি হইয়া করে প্রকৃতসেবন'

'নিগূঢ়ার্থ প্রকাশাবলী')। এটা সাধন কথা কিন্তু এই পদে ব্যবহৃত উপমায় পাচ্ছি যে নারীর স্থান পুরুষের চেয়েও উচ্চে। ধান উঠোনে মেলে দিয়ে মেয়েরা পা দিয়ে নেড়েচেড়ে রোদে শুকায়। আবার মেয়েদের পদাঘাতে ঢেঁকি যে চাল তৈরি করে, তাই দেবতার ভোগে লাগে। এখানে লালন কেবল সাধন-সহযোগিনীর কথা বলেননি, তামাম নারীর মহিমাও তাঁর গানে ব্যক্ত হয়েছে।

পাঞ্জু শাহ, অপর এক বাউল সাধক ও কবি। তাঁর একটি গানে আছে—

ভজন সাধন করবি রে মন কোন রাগে॥
আগের মেয়ের অনুগত হও গে॥
জগত জোড়া মেয়ের বেড়া রে,
কেবল এক পতি সাঁইজি জাগে॥
মেয়ে সামান্য ধন নয়, জগত করছে আলোময়,
কোটি চন্দ্র জিনি কিরণ,
বুঝি আছে মেয়ের পায়।
মেয়ে ছাড়া ভজন করা রে,
হবে না কোন লোগে॥...
পাঞ্জু ধরবি যদি গুরুর চরণ রে,
মেয়ের চরণ ধর আগে॥

পাঞ্জুর গানে গুরুপদ আর সাধিকা নারীর পদ দুই সমান কামনার ধন। বাউলের যে শুদ্ধ জগৎ আছে সেখানে নারীর মূল্য শত রজত কাঞ্চনের চেয়েও বেশি। তাঁদের কাছে পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য আকাশভরা আলো, চন্দ্রের কিরণ দিয়ে সৃষ্টি সেই অমূল্যধন নারী।

বাউল সাধক হিসাবে দুদ্দু শাহও অনেক গান রচনা করেছেন। তাঁর বিখ্যাত একটি গানে 'মেয়ে'র প্রাধান্য—

মেয়ের চরণ নেরে মাথায় করে।
মেয়ে বিনে এ ভুবনে গতি নাইরে॥
ত্যাজে নারী বনবসী হলি রে মর্কট সন্ন্যাসী।
মেয়ের চরণে গয়াকাশী,
দেখলি নে রে॥

নিজের সঙ্গিনীকে 'মেয়ে' বলে সস্নেহ সম্বোধন এবং তার চরণ মাথায় করে রাখার কথা যিনি বলেন তাঁর কাছে 'মেয়ে' শিব-শক্তির কল্পনায় সঞ্জীবিত প্রকৃতি-জগতের শক্তিরূপিনী বাস্তবেরই কোনো কন্যা; এবং এই কন্যার মধ্যে সঞ্চারিত শক্তিরূপ বাউল সাধনায় নারীর স্থানকেও বোঝায়।

বাউলের অনেক গানেই 'মেয়ে'-র উল্লেখ আছে। সে-সবে রয়েছে 'মেয়ে'র চরণ বন্দনার, কৃপা প্রার্থনা করার কথা।

প্রসঙ্গক্রমে বলি বাউল দৈহিক সুখানুভূতির জন্য ছুটে বেড়ায় না পরনারীর কাছে। এক নারীই তার রাধারানি। পরনারীবিলাসে বাউল সাধনা হয় না। সে-কথাও উল্লেখ আছে বাউলদের এক প্রাচীন পুথিতে—

একের সহিত ধর্ম—ধর্ম বলি তারে,
দুয়ের সঙ্গে করিলে ধর্ম বেশ্যা গণ্য করে।
তিনের সঙ্গে করিলে ধর্ম রসাতলে যায়,
চারের সঙ্গে ধর্ম করিলে নরক ভুঞ্জয়॥

সাধুকে সাবধান করার এই নির্দেশ সাধকদের মানতেই হতো, তাই তাঁদের গানে পাই—

শুদ্ধ রতি তার পীরিতে রে।
তার বসতি ব্রজপুরে॥

আর একটি গানে আছে মেয়েরা কেমন পরকে আপন করে নেয় তার বিষয়—

যেমন মেয়েরা যায় পরের বাড়ি,
পরকে লয় আপন করি
হয় মহা-মিলন॥
তারা একবার হাসে একবার কাঁদে
না ছাড়ে প্রেমের বাঁধন॥

এই চমৎকার উপমাটি এসেছে 'জ্যান্তে মরা' বা প্রেম-সাধনা ব্যাখ্যার কারণে। মেয়েরা শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে পরকে ভালবেসে আপন করে নেয়। বাউল একে বলেছেন, 'মহা-মিলন'। সংসারের খুঁটিনাটি মান-অভিমান অশান্তি থাকলেও প্রেমের বন্ধনকে সহজে ছাড়তে পারে না মেয়েরা। এমন সুন্দর করে পরের বাড়িতে একটা মেয়ের অধিষ্ঠিত হওয়ার কথা সে সময়ের ক-জন কবি বলেছেন?

৪

এখন খুব স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে যে উনিশ শতকের বাবু কালচারের পাশে যে সব নারী সাধিকা-অনুধ্যায়ী কবি-সাধক বাউলের কথা বলা হলো, তাঁদের সাধন-সঙ্গিনী মেয়েরা এই সাধন-প্রক্রিয়ার মধ্যে বসবাস করে কতটা সুখী, বা জীবন-পরিতৃপ্তি লাভ করেছে তা জানা যাবে কেমন করে? এ-বিষয়ে কোনো রোজনামচা নেই ঠিকই; তবুও বাউল গানের মধ্যে দিয়ে নারীর প্রতি যে শ্রদ্ধা-ভালোবাসা, স্নেহ ও প্রীতির ডালি অর্পিত হয়েছে তা থেকে বাউল সমাজে নারীর একটি সম্মানজনক অবস্থান বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। ঐ শতাব্দীতে কলকাতার নগর সমাজে নারীর সম্মান ও মর্যাদার যে অবমূল্যায়ন ঘটেছিলো। (যার উদাহরণ প্রবন্ধের সূচনাতেই দেওয়া হয়েছে) তা থেকে উচ্চতর আসন পেয়েছেন 'অবমূল্যাধন' নারী বাউল পদকর্তাদের রচনায় ও জীবন-চর্চায়।

বহুবিবাহ-বাল্যবিবাহ-পরনারীতে আসক্তি ইত্যাদি ব্যাভিচারের মধ্যে দিয়ে বাংলার নারীজাতির যে অপমান লজ্জা-কান্না-হাহাকার মাথা খুঁটে ফিরতো বাউল-সংগীতের নারীবিষয়ক গানে সেই নারীই পেয়েছে সম্মানের অধিকার। তাঁদের কাছে নারী সাধনকর্মে ব্যবহারযোগ্য কোনো ভঙ্গুর আধার মাত্র নয়—নারী পুরুষ, প্রকৃতি-পুরুষ হিসাবে এক মহাভাবমণ্ডলে একত্রে বসবাসকারী দ্বৈতসত্তা। তার অস্তিত্ব বাউল পদের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে বাংলা সাহিত্যকেও সমৃদ্ধ করেছে।

গুরুবাদ ও লালনের তত্ত্বচিন্তা

রাধেশ্যাম সাহা

রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত ঈশ্বর আর ভক্তের মাঝখানে গুরুবাদকে ভালোভাবে গ্রহণ করেননি। তিনি 'শান্তিনিকেতন' প্রবন্ধে বলেছেন—

> উপনিষৎ যাঁকে গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং বলেছেন, যিনি গভীরতম, তাঁকে দেখাশোনার সামগ্রী করে বাইরে এনে ফেলবার অদ্ভুত আবদার আমাদের খাটতেই পারে না। এই আবদার মিটিয়ে দিতে পারেন এমন গুরুকে আমরা অনেকসময় খুঁজে থাকি, কিন্তু যদি কোনো গুরু বলেন, 'আচ্ছা বেশ, তাঁকে খুব সহজে করে দিচ্ছি'—বলে সেই যিনি নিহিতং গুহায়াং তাঁকে আমাদের চোখের সম্মুখে যেমন—খুশি একরকম করে দাঁড় করিয়ে দেন, তা হলে বলতেই হবে, তিনি অসত্যের দ্বারা গোপনকে আরো গোপন করে দিলেন।

গুরু তো অলীকসর্বস্ব পুরুষ নন, কী করে সম্ভব নিহিত গুহায়িত ব্রহ্ম বা ঈশ্বরকে বাইরে প্রকাশ্যে এনে দাঁড় করানো? কোনো-না-কোনোভাবে গুরুবাদকে রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করেছেন।

কিন্তু সমাজে, মানুষের জীবনে, অধ্যাত্মসাধনায় গুরুর ভূমিকা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। 'আচার্য্যোপাসনং'—আচার্যের উপাসনা বা গুরুসেবার মধ্য দিয়েও পুণ্যলাভ সম্ভব। গুরু সর্বদেবময়। অন্য কোনো সাধনা না করেও যদি শুধু গুরুসেবা করা যায়, তবে পরমাগতি লাভ করা যায়। গুরু-সম্পর্কে বলা হয়েছে—

> গুশব্দস্ত্বন্ধকারঃ স্যাদ্রুশব্দস্তন্নিরোধকঃ।
> অন্ধকারনিরোধিত্বাদ্ গুরুরিত্যভিধীয়তে।।
> গুরুরেব পরা বিদ্যা গুরুরেব পরায়ণম্।
> গুরুরেব পরাকাষ্ঠা গুরুরেব পরং ধনম্।।

'গু' শব্দ অন্ধকার 'রু' শব্দ তার রোধক। অন্ধকার রোধ করে পরম জ্যোতির্ময়কে দর্শন করান বলেই তিনি গুরু নামে কথিত হন। গুরুই পরাবিদ্যা, গুরুই পরম আসক্তির স্থান, গুরুই পরম প্রধান, গুরুই পরম ধন।

গুরু ঈশ্বরলাভের পথে শিষ্যকে চালনা করেন। গুরু সর্বজন্মকৃত পাপ থেকে শিষ্যকে মুক্তি দিতে পারেন। গুরু সেবার দ্বারাই মানুষ সার্থক ও কৃতার্থ হয়। সংসারসাগর থেকে উদ্ধার পেতে হলে 'গুরু' মহামন্ত্র জপ বিধেয়, 'মন্ত্ররাজমিদং দেবি গুরুরিত্যক্ষরদ্বয়ম্'—'গুরু' এই দুটি অক্ষর মন্ত্রশ্রেষ্ঠ, 'গুরু' দেব-মুনিপূজিত সিদ্ধ মন্ত্র, শোক-ভয়-দুঃখ-দারিদ্র্য নাশক মন্ত্র, মহাভয়হর এই মন্ত্র। তাই 'গুরুরাজমন্ত্রম্'।

গুরুর ভূমিকা তাই অনস্বীকার্য। দেবতাদের গুরু ছিলেন বৃহস্পতি। দৈত্যদের গুরু ছিলেন শুক্রাচার্য। দেব-দানবের সংঘর্ষকালে দেবতারা বৃহস্পতিকে যজ্ঞের অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্যে বরণ করেন। ইনি হিরণ্য ও লোহিতবর্ণ। ইনি যজ্ঞপ্রাপক, রাক্ষস-নাশক, মেঘ-ভেদক আর স্বর্ণপ্রদায়ক। অভিষ্টবর্ষী বৃহস্পতি দেবকামীদের ফলপ্রদানকারী। ইনি ছন্দের অধিকারী সোম-যাজ্ঞিকদের বন্ধু। যজ্ঞের রক্ষাকর্তা, সর্বময় পিতা ও সর্বদেবতাস্বরূপ। মন্ত্রের অধিপতি। সম্ভবত তিনিই আদিগুরু।'

এ দেশে গুরুকে নমস্কার করে প্রাত্যহিক কাজের শুরু হয়ে থাকে। গুরুর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জনপ্রিয় শ্লোকটি এখানে উদ্ধার করা হল—

গুরুব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুদেবো মহেশ্বরঃ।
গরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।

'সপ্তজ্ঞানভূমিকা'র একটি স্তর 'বিচারণা', যেখানে ধর্মচর্চায় গুরুসেবা অন্যতম কৃত্য বলে দাবি করা হয়েছে। আত্মদর্শন বা ব্রহ্মদর্শনের জন্যে গুরুর নির্দেশ মেনে চলাটাই প্রধান কাজ। পথ প্রদর্শন ও পথ-চলার উপায় বলে দেন গুরু। গূঢ়-সংকেত উদ্ধার করেন গুরু। সদ্‌গুরু ব্রহ্মলাভে সাহায্য করেন। কুলগুরুও যথাশাস্ত্র ও যথাবিধি মেনে মন্ত্রদান করেন এবং শিষ্যের সময়কালে মন্ত্রসিদ্ধি ঘটে।

গুরু হন একাধারে পণ্ডিত, দূরদর্শী, সাধক, তত্ত্বজ্ঞানী। সুপথে জীবন পরিচালনার মুখ্য কাণ্ডারী। গুরু হবেন বুধসম, অন্তর্দর্শনে সাহায্যকারী, পণ্ডিত। কিন্তু যথার্থ জ্ঞানী ও পণ্ডিত বলতে কাকে বোঝায়? 'শ্রীমদ্ভাগবদগীতা'র চতুর্থ অধ্যায়ে বলা হয়েছে—

যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধ কর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ।।

এর অর্থ যাঁর সমস্ত কর্ম কামনা ও সঙ্কল্প বর্জিত, জ্ঞানীরা জ্ঞানরূপ এমন অগ্নি দ্বারা দগ্ধকর্মা ব্যক্তিকে পণ্ডিত বলে থাকেন। এমন কামনাশূন্য সঙ্কল্পশূন্য পণ্ডিত ও সদ্‌গুরু প্রাপ্তি নিতান্ত ভাগ্যের ব্যাপার। সদ্‌গুরু জীবন্মুক্তির পথ মুক্ত করেন, মন্ত্রসিদ্ধির প্রয়াস পান। 'গুরুতন্ত্রে' বলা হয়েছে—

গুরেঃ সেবা গুরোর্ধ্যানং গুরেঃ স্তোত্রং গুরোর্জপঃ।
গুরোঃ পূজা গুরোস্তৃপ্তি গুরোর্ভক্ত র্নৃণাং যদি।।
জন্ম ভাগ্যবশাদ্দেবি যেযাং সংজায়তে ক্বচিৎ।
তেষাং মন্ত্রো ভবেৎ সিদ্ধো জীবন্মুক্তাশ্চ তে নরাঃ।।

অর্থ : গুরুর সেবা, গুরুর ধ্যান, গুরুর স্তব, গুরুর নামজপ,গুরুপূজা, গুরুর তৃপ্তি, গুরুভক্তি বহু জন্মের ভাগ্যবশে কোনস্থানে যাঁদের সম্যকভাবে উপলব্ধ হয়, তাঁদের মন্ত্রসিদ্ধ হয়ে থাকে, তাঁরা জীবন্মুক্ত। গুরুদর্শন পুণ্য কর্মসমান। দেবদর্শন ও গুরুদর্শন শূন্যহাতে করতে নেই। শিষ্য গুরুদর্শনে যাবেন হাতে সমিধ নিয়ে। লোককল্যাণকর যজ্ঞানুষ্ঠানে গুরুর কোনো স্বার্থ নেই।

গুরু জ্ঞানী হবেন নিঃসন্দেহে। তিনি তত্ত্বজ্ঞানী হতে পারেন, হতে পারেন তত্ত্বদর্শী। তত্ত্বজ্ঞানী হলেন তিনি, যিনি অধ্যাত্মবিদ্যা বিষয়ে চর্চা ও অধ্যয়ন করেছেন, তত্ত্বজ্ঞানে ঋদ্ধ হয়েছেন। তিনি এদিক থেকে পরোক্ষ জ্ঞানী। অন্যদিকে, যিনি অধ্যাত্মবিদ্যাচর্চাকে শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনের মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করেছেন, তত্ত্বগত জ্ঞানকে সম্যক আত্মীভূত করেছেন, তিনি হলেন তত্ত্বদর্শী। তিনি

অ-পরোক্ষ জ্ঞানী। ইনিই পারেন শিষ্যকে সঠিক দিশা দেখাতে, তত্ত্বের সার্থকতা অনুভব করাতে।

গুরু-শিষ্যের পরম্পরা ভারতবর্ষের বহু প্রাচীন ঐতিহ্যের বিষয়। গুরুর কৃপা ছাড়া শিষ্য বড় অসহায়। প্রজ্ঞাবান, বিদগ্ধ অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ, প্রশান্তচিত্ত, শমগুণান্বিত গুরু সত্যস্বরূপের সমীপবর্তী হতে সাহায্য করেন, ব্রহ্মবিদ্যার সম্যক প্রকাশ করেন, পরমব্রহ্মলাভে সহায়তা করেন।

গুরু কি একজন? জন্মমাত্র মাতাই গুরু। এছাড়া আছেন পিতা, শিক্ষাগুরু, ধর্মগুরু...ইত্যাদি। রামায়ণে বলা হয়েছে—আরাধনাযোগ্য প্রত্যক্ষ পরমদেবতা হলেন পিতামাতা। তাঁদের আরাধনা করলেই ধর্ম-অর্থ-কাম-ত্রিলোক জয় করা যায়। 'মনুসংহিতা'য় বলা হয়েছে— পিতা-মাতা-গুরুর প্রিয় কাজ করলে, তাঁরা তুষ্ট হলে, সমস্ত তপস্যার ফল লাভ করা যায়। 'মনুসংহিতা'য় আচার্য বা গুরু সম্পর্কে বহু শ্লোক রয়েছে। যেমন—গুরুগৃহে যাবজ্জীবন বাস করতে শিষ্যের যদি ভালো লাগে, তাহলে গুরুর সযত্ন পরিচর্যা করবে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত। বলা হয়েছে—

আ সমাপ্তেঃ শরীরস্য যস্তু শুশ্রূষতে গুরুম্।
স গচ্ছত্যঞ্জসা বিপ্রো ব্রহ্মণঃ সম্ম শাশ্বতম্॥ (২/২৪৪)

যে শরীরপাত পর্যন্ত গুরুর শুশ্রূষা করে, সে অনায়াসে শাশ্বত ব্রহ্মলোকে স্থান পায়।

গুরুর প্রীতি উৎপাদন শিষ্যের কাজ, ক্ষেত্র, স্বর্ণ, গাভী, অশ্ব, ছত্র, চর্মপাদুকা, আসন, ধান্য, শাক ও বস্ত্র দিয়ে গুরুর প্রীতি উৎপাদন করবে শিষ্য। বলা হয়েছে, গুরুর দ্বারা আদিষ্ট হয়ে বা না হয়ে প্রতিদিন অধ্যয়ন ও আচার্যের কাজে সাহায্য করতে হবে। শিষ্য গুরুর অজানিতে তাঁর নামোচ্চারণ করবে না। তাঁর গতি বা কথার অনুকরণ করবে না। যেখানে গুরুর নিন্দা হয়, সেখানে কানদুটি চাপা দিতে হবে কিংবা স্থানান্তর বাঞ্ছনীয়। বলা হয়েছে, শরীর, বাক্য, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও মন সংযত করে গুরুর মুখের দিকে তাকিয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়িয়ে থাকবে শিষ্য—

শরীরঞ্চৈব বাচঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয়মনাংসি চ।
নিয়ম্য প্রাঞ্জলিস্তিষ্ঠেদীক্ষমাণো গুরোর্মুখম্॥ (২/১৯২)

'মনুসংহিতা'য় কয়েকটি বিষয়ে শিষ্যকে সতর্ক ও সাবধানও করা হয়েছে। গুরুপত্নীর অঙ্গে তৈলমর্দন, স্নান করানো, গা-মোছানো বা কেশপ্রসাধন এসব শিষ্য করবে না। 'মনুসংহিতা'র সতর্ক বাণী—

গুরুপত্নী তু যুবতির্নাভিবাদ্যেহ পাদয়োঃ।
পূর্ণবিংশতিবর্ষেণ গুণদোষৌ বিজানতা॥ (২/২১২)

অর্থাৎ পূর্ণ বিংশতিবর্ষ বয়স্ক গুণদোষযুক্ত শিষ্য যুবতী গুরুপত্নীর পাদস্পর্শ করে অভিবাদন করবে না।

॥ ২ ॥

হিন্দুজীবনের চারপাশে গুরুতন্ত্রের প্রবল উপস্থিতি। ধর্মীয় গ্রন্থসমূহে গুরুবাদের বিচিত্র স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। গৌণধর্মের ক্ষেত্রেও কি এমনটাই ঘটে? লালনের গানেও 'গুরু'র উজ্জ্বল উপস্থিতি। প্রচলিত শাস্ত্র ও শরিয়ত বিরোধী এদেশের বাউলেরা। অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তীর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—

> তত্ত্বগতভাবে ও বিশ্বাসে বা আচরণে সব লোকধর্ম শরিয়তবিরোধী। তারা শাস্ত্রশাসিত নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ্যতারও বিরোধী। বিরোধিতার বিস্তার আরও নানাদিকে—ব্রাহ্মণ্য অনুশাসন ও পুতুল পুজো আর অপদেবতার বন্দনায়, অলৌকিকে। জাতি-বর্ণ-ধর্মের ভেদ তাঁদের স্পর্শ করে না, তাঁদের কাছে গঙ্গাজলের মহিমা নেই। স্মৃতিশাস্ত্রের পুরোহিত আর কোরানজীবিত আলেম মোল্লাকে তাঁরা দূরে রাখেন।[৩]

তাহলে?—'এইখানে তাঁরা মানেন গুরু কিংবা মুরশিদকে কেননা। গুরু ও মুরশিদ পথদ্রষ্টা, পরিচালক।' ('ব্রাত্য লোকায়ত লালন')। মুরশিদ হলেন গুরু। ঈশ্বর ও ভক্তের মধ্যেখানের সংযোগের সেতু নির্মাণ করেন মুরশিদ। অধ্যাপক চক্রবর্তী বলেন,

> লালনপন্থা সাধ্য ও সাধকের মাঝখানে মুরশিদকে মান্যতা দিয়ে এক নতুন সাধনার উদ্ভাবন করে যা প্রত্যক্ষত অনৈসলামিক। এইভাবে গড়ে ওঠে একধরনের সমান্তরাল পরম্পরা, যা জনপ্রিয় ও ব্যাপক। মুরশিদের মান্যতা, সাধনপথে ও বিশ্বাসের জগতে মুরশিদের অবশ্যম্ভাবী স্বীকৃতি ও নির্দেশ মারফতি সাধকদের এক বিকল্পহীন কৃত্য। লালনপন্থা সেই মারফতি ধারার এক প্রবল ও প্রবর্ধিত উৎসার, যা শরিয়তি শাস্ত্রনির্দেশ ও আর্কীদার বিপরীত অবস্থানকে মেনে নিয়েছে।

গুরু-প্রভাবের ব্যাপ্তি জীবনের স্তরে স্তরে শিকড়ায়িত। লালন গুরুবাদী সাধনায় বিশ্বাসী। গুরুবন্দনায় তিনি বিরামহীন, অকুণ্ঠিতচিত্ত। বাউলজীবন একান্তই গুরুনির্ভর। লালন গুরুর কাছে দীক্ষিত। লালনের উপলব্ধি যে, মুরশিদ ও খোদার মধ্যে কোনো ভিন্নতা নেই—'জেহি মুরশিদ সেহি খোদা'। মুরশিদ-রসুল অভিন্ন, মুরশিদ শুধু গুরু নন, আল্লাহর মর্মসত্য যথাযথ জ্ঞাপনকারী। খোদাকেই তিনি মালেকসাঁই বলেছেন। মুরশিদ 'আপ্ততত্ত্বের' জ্ঞান শিষ্যের মধ্যে উদ্ভাসিত করেন। 'আপ্ততত্ত্বে'র মধ্য দিয়ে শিষ্যের মনে অপার্থিব জ্যোতি দেখা দেয়। গুরুরূপে তিনিই দয়াময়, সেই দয়ায় শিষ্যের জীবন আপ্লুত হয়। সাঁই-দরবেশ নিজের 'অহং' বিসর্জন দিয়ে আল্লার সত্তার মধ্যে নিজেকে বিলুপ্ত করে। একে বলে 'ফানা'। ফানা মৃত্যুভয় দূর করে, এর পদ্ধতি, সাধনতত্ত্ব গুরুর কাছে শিখতে হয়। লালন বলেন, 'যে জানে ফানার ফিকিরি সেই ফকির'। এই 'আপ্ততত্ত্ব' গুরুর কাছে শেখার, সাধনার নানা স্তরভেদ সম্পর্কে মুরশিদের নির্দেশই গুরুত্বপূর্ণ।

লালনের গুরু সিরাজ সাঁই বা সিরাজ ফকির। লালন ধর্মে হিন্দু, কায়স্থ সন্তান। উপাধি 'কর'। ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে জন্ম, অবশ্যই বিতর্কিত সাল। মৃত্যু ১৭ অক্টোবর, ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দ। শুক্রবার তাঁর মৃত্যুদিন। পুণ্যতীর্থ শ্রীক্ষেত্র থেকে ফেরার পথে লালন বসন্তরোগে আক্রান্ত হন। তাঁর সঙ্গীরা তাঁকে ফেলে পালায়। পাল্কীবাহক সিরাজ সাঁই অসুস্থ লালনকে বাড়িতে আশ্রয় দেন, সুস্থ করে তোলেন। গ্রামে ফিরলে মুসলমানের অন্নগ্রহণের জন্যে হিন্দুসমাজ তাঁকে জাতিচ্যুত ও গৃহচ্যুত করে। ক্ষুব্ধ লালন আশ্রয়দাতা সিরাজ সাঁইয়ের কাছে অতঃপর ফিরে আসেন। লালন সিরাজ সাঁইয়ের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। পরে লালন নিজেই একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হন। জনশ্রুতি যে, সে-কালে লালনের শিষ্যসংখ্যা দশহাজার ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তিনি হয়ে উঠেছিলেন বাউলদের গুরু।

লালন দেহবাদী, তাঁর সাধনা দেহকেন্দ্রিক, যৌন-যোগ-সাধনার নামান্তর। তাঁর সাধনাকে কেউ বলেছেন রহস্যবাদী, কেউ বলেছেন, মরমিয়া সাধনা। লালন বলেন—

উপাসনা নাই গো তার

দেহের সাধন সর্বসার
তীর্থ-ব্রত যার জন্য
এ দেহে তার সব মিলে।

দেহ যেন ঘর, খাঁচা। এই আত্ম-এর মধ্যেই পরমাত্মার অবস্থান। লালন তাই বলেন,

আমার ঘরখানায় কে বিরাজ করে
তারে জন্মভর একবার দেখলাম না রে।

লালনের গুরু ছিলেন জাতিতে মুসলমান, কিন্তু ইসলামধর্মের আচার-বিচার-পন্থার বাইরে ছিল তাঁর অবস্থান। তাঁর ধর্ম ফকিরিধর্ম।

মতিলাল দাশ লালনের গুরুবাদ সম্পর্কে বলেন—

> পরমার্থতত্ত্বের সহিত গুরুপদ ও নামপদ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আমাদের দেশের সাধনায় গুরুতত্ত্ব কত অধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছে— তাহা যাঁহারা ধর্ম্ম সাধনার বিচিত্র রূপের কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন। লালনও গুরুবাদের সমর্থক—গুরুই সেই অজ্ঞাত চরমপথের কাণ্ডারী—তিনিই খেয়া দেন, তাঁহার প্রদত্ত নামসাধনেই ঐকান্তিক শ্রেয়োলাভ হয়।[৪]

লালন তথা বাউলগণ মনে করেন, মনের মানুষই হলেন গুরু। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,

> এই মনের মানুষই মানুষের গুরু, কোন পার্থিব ও প্রাকৃত মানুষের একচেটিয়া গুরুগিরি করিবার অধিকার নাই। যিনি সহজ সত্যকে স্বয়ং উপলব্ধি করিয়া তাহা লোকের মনোগোচর করিয়া দিতে পারেন, তিনিই মানুষের গুরু। পূর্ণ সত্য কেউ উপলব্ধি করিতে পারে না, এইজন্য সকল মানুষেরই মধ্যে যতটুকু সত্য নিহিত আছে তাহা সন্ধান করিয়া লাভ করাই হইতেছে সৎ শিষ্যের কাজ। সুতরাং গুরুর অন্ত নাই, জন্মক্ষণ হইতে মৃত্যুক্ষণ পর্যন্ত নিরন্তর মানুষের গুরুকরণ চলিতে থাকে।[৫]

গুরু-শিষ্যের পরম্পরার মধ্যে গুরুর ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। লালন গুরুবন্দনা এভাবে করেছেন—

গুরু তুমি তন্ত্রের তন্ত্রী
গুরু তুমি মন্ত্রের মন্ত্রী
গুরু তুমি যন্ত্রের যন্ত্রী
না বাজাও বাজবে কেনে।

সাধনার আর সাধনবিষয়ের শেষ নেই। তাই শিক্ষার্থী শিষ্য এক গুরুর থেকে আর এক গুরুর সান্নিধ্য পেতে চান। মৌমাছি এক ফুল থেকে আর এক ফুলে বসে মধু সংগ্রহ করে। শিষ্যও এভাবে এক গুরু থেকে আর এক গুরুর কাছ থেকে সাধনবিষয় সংগ্রহ করতে পারে। জ্ঞানসংগ্রহ শিষ্যের অধিকার। বলা হয়েছে—

মধুলব্ধো যথা ভৃঙ্গঃ পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ।
জ্ঞানলুব্ধস্ তথা শিষ্যে গুরুর্বন্তরং ব্রজেৎ॥

বাউলও বলতে পারেন—

গুরু করব শত শত, মন্ত্র করব সার।
যার সঙ্গে মন মিলবে, দায় দিব তা'র॥

গুরু হলেন স্বরূপাধীন, তিনি হলেন একাধারে মাতা-পিতা-জ্ঞানদাতা; লালন-বলেন—

তুমি মাতা তুমি পিতা
তুমি হও জ্ঞানদাতা
তুমি চক্ষু দান দিয়ে
দেখাও আমায় শুভদিন॥

গুরুচরণের শরণ নিতে হলে ঐকান্তিক ভক্তি চাই। লালন বলেছেন—

ভবে মানুষ-গুরু নিষ্ঠা যার।
সর্ব-সাধন সিদ্ধ হয় তার॥

গুরু হলেন মুরশিদ, সেই—

মুরশিদ বিনে কী ধন আর আছে রে মন এ জগতে।
যে নাম স্মরণে মন রে, তাপিত অঙ্গ শীতল করে—

মুরশিদকে স্মরণ করলেই একমাত্র ভববন্ধনজ্বালা দূর হতে পারে। লালন বলেন—

দিন থাকতে মুরশিদ রতন চিনে নে না।
এমন সাধের জনম বয়ে গেলে আর হবে না॥

মুরশিদরূপ গুণনিধিই পারেন ভবনদী পার করে মানবের প্রকৃত উত্তরণ ঘটাতে। গুরুকে তাই অবলম্বন ও আশ্রয় করতেই হয়—

জান গে যা গুরুর দ্বারে জ্ঞান-উপাসনা।
কোন মানুষের কেমন কৃতি যাবে রে জানা॥

জ্ঞান-উপাসনার সাহায্য নিয়ে উপলব্ধি করতে হয়—'কোন পদ্মে জীবের স্থিতি কোন পদ্মে গুরুর আসন'। এই গুরুই হলেন সাঁই। খুব সম্ভব 'গোস্বামী' থেকে জাত 'গোসাঁই' শব্দটি 'সাঁই'—এ পরিবর্তিত। লালনের কাছে আলেকসাঁই, তাঁর গুরু সিরাজ সাঁই। একটি গানে গুরুচরণ ভজন করার কথা বলছেন—

আমি বলি তোরে মন গুরুর চরণ কররে ভজন।
গুরু চরণ পরম রতন কর রে সাধন॥
মায়াতে মত্ত হলে
গুরুর চরণ না চিনিলে
সত্যপথ হারাইলে
খোয়ালে গুরুবস্তু ধন॥
ত্রিপিনের ত্রি-ধারে
মীনরূপে সাঁই বিরাজ করে
কেমন করে ধরবে তারে
মন রে অবুঝ মন॥

আর একটি গানে গুরুপদে ডুবে থাকার কথা বলেছেন, গুরুশিষ্যের ধারা সম্পর্কে গুরুর চক্ষুদান প্রসঙ্গটি উল্লেখ করেছেন—

গুরুপদে ডুবে থাক রে মন।
গুরুপদে না ডুবিলে জনম যাবে অকারণ॥
গুরু-শিষ্য এমনি ধারা
চাঁদের কোলে থাকে তারা

আয়নাতে লাগিয়ে পারা
দেখে ত্রিভুবন।।
শিষ্য যদি হয় কায়েমি
কর্ণে দেয় তার মন্ত্রদানি
নিজ নামে হয় চক্ষুদানি
নইলে অন্ধ দু'নয়ন।।
ঐ দেখা যায় আন্‌কা নহর
অচিন মানুষ অচিন শহর
সিরাজ সাঁই কয় লালন রে তোর
জনম গেল অকারণ।।

'অমূল্য ধন' হাতে পেতে চাইলে গুরুপদে ঐকান্তিক নিষ্ঠা দরকার—

গুরুপদে নিষ্ঠা মন যার হবে।
যাবে তার সব অনুসার
অমূল্য ধন হাতে সেহি পাবে।।

গুরুকে সাধারণ মনুষ্যজ্ঞান করা উচিত নয়—

গুরুকে মনুষ্য জ্ঞান যার
অধঃপাতে গতি জ্ঞান তার
লালন বলে তাই আজ আমার
ঘটল বুঝি মনের কুস্বভাবে।।

লালন গুরুকে মান্যতা দিতে বলেছেন—

পারাপারের খবর জানো
জেনে মহর গুরুকে মানো
লালন কয় ভাবছ কেন
পড়ে মায়াফাঁসে।।

মানুষ খুব সহজে 'পুত্র-পরিবার বড় ধন' ভেবে ভবের ভুবনে ভুলে থাকে, 'গুরুধনকে ভাবলি মিছে'—এই গুরুধনকে চিনতে না পারলে 'নিদানে পস্তাবে পাছে'।

গুরুকে যে জন জানে, ওরে তার রূপ যায় চেনা
আছে তার নিশানা।

গুরুকে আশ্রয় করেই আত্মতত্ত্ব ও দেহতত্ত্ব সাধন করতে হয়, উপলব্ধি করতে হয়। বলা হয়েছে—'আত্মানাং বিদ্ধি'—নিজেকে জানো, সুফি সাধকেরা বলেন—

মান আরাফা নাকসাহু,
ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু।

নিজেকে জানলে রবকে বা ভগবানকে পাওয়া যায়। লালন বলেন, 'আপনারে চিনতে পারলে রে যাবে অচেনারে চেনা'। বলেন—

আপনারে আপনি চেনা যদি যায়
তবে তারে চিনতে পারি সেই পরিচয়।

কিংবা বলেন—

'আপনার আপনি মন না জান ঠিকানা
পরের অন্তরে কোটি সমুদ্দুর কীসে যাবে জানা।

বলা হয়, যা নেই ভাণ্ডে তা নেই ব্রহ্মাণ্ডে। মানুষের দেহই হল ব্রহ্মাণ্ড— নরদেহই ঈশ্বরের আবাসস্থল। ফলে লোকায়ত স্তরে কায়াসাধনার ব্যাপ্তি ঘটেছে। মনের মধ্যে যে ঈশ্বরের স্থান, সেখানেই তাঁর সঙ্গে মিলন ঘটে। কায়ার মধ্যেই জগৎ ও জগদীশ্বরের যোগ অনুভব করার পদ্ধতিই হল সহজ সাধন বা সহজিয়া সাধনা। গুরুই বুঝিয়ে দেন দেহসাধনার পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া। 'নরদেহ বিনু-নহে রসের আস্বাদন'—গুরুর নির্দেশে চলে রস-সাধনা। প্রকৃতি নারীর মধ্য দিয়ে শক্তি আর আনন্দের প্রকাশ ঘটায়, তাই সাধনক্রিয়ায় নারীকে দরকার। শাক্ততন্ত্রে শিবের সঙ্গে শক্তি, বৈষবদের কাছে রাধা প্রকৃতি, বাউলের সন্ধান সাধনসঙ্গিনী। বাউল উচ্চ-নীচ হিন্দু-মুসলমান ভেদ মানে না। বাউল-সাধনায় গুহ্যাচার ও যোগাচারের প্রভাব কম নয়। লোকসাধকদের গুহ্যসাধনা বা গোপন ক্রিয়া কলাপের কথা সাধারণ্যে প্রকাশ্য নয়। লালন গুরুর নির্দেশ ঠিক ঠিক পালনের কথা বলেছেন, বলেছেন—'গুরু চরণ পরম রতন কররে সাধন।'

উৎসের সন্ধানে

১. 'অদ্বয়তারকোপনিষদ'
২. 'ব্রাত্য লোকায়ত লালন', পুস্তক বিপণি।
৩. সুধীরচন্দ্র সরকার : 'পৌরাণিক অভিধান'।
৪. 'ব্রাত্য লোকায়ত লালন', পুস্তক বিপণি।
৫. আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত : 'লালন ফকিরের গান', পাঠক সমাবেশ ঢাকা, ২০০৯।
৬. চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বাউল', বর্ণপরিচয়, ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা।

বাংলার বাউল : একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

সুভাষ মিস্ত্রী

॥ এক ॥

লোকায়ত সহিত্য ও সংস্কৃতির বস্তুগত এবং অবস্তুগত উপাদান-উপকরণ মিশ্রিত লোকায়ত সংগীতের অন্যতম প্রধান প্রদর্শনশিল্প শরীর বিগ্রহ 'বাউল' বা বাউল সংগীত।

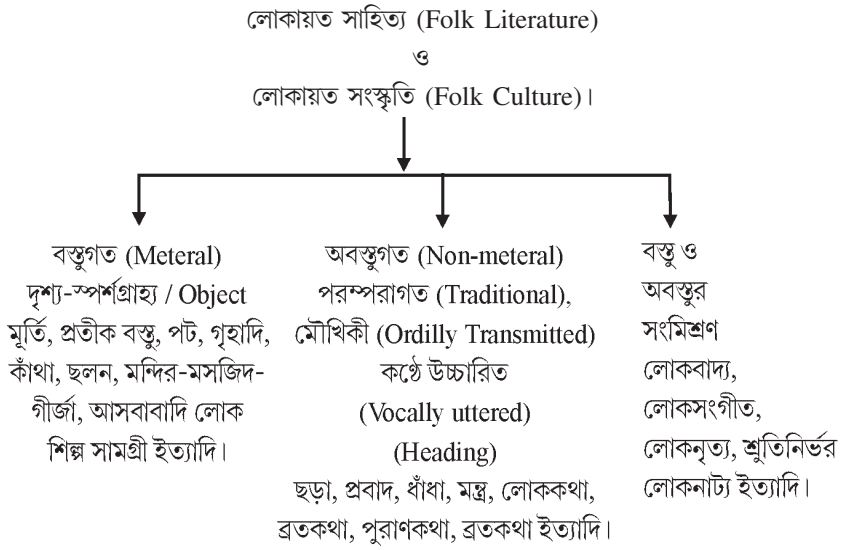

শ্বরণরহিত কর্ণেন্দ্রীয় যুক্ত মানুষ শিল্পী হতে পারেন, গায়ক নন কখনই। গান একাকী গায়কের, আবার, একান্তভাবে শ্রোতারও নিজস্ব; অথবা, একই সঙ্গে উভয়ের নিকট চরম ব্যক্তিগত। স্বকণ্ঠে উচ্চারিত গান গায়ক সর্বাগ্রে স্বকর্ণে শ্রবণ করেন এবং তৎমুহূর্তে অন্যকে শোনান। নিয়ত বিশ্বে প্রাত্যহিক প্রবহমান জীবনচর্যায় এমনও পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে যখন ব্যক্তিমানুষ সমষ্টির মধ্যে থেকেও আত্মশ্রোতা হয়ে যান, হয়ে ওঠেন আত্মগায়কশিল্পী—যেন আপনার সঙ্গে আপনারই আত্মগত সংযোগলীলাসাধন, সকল ভিড়ের মাঝে নিজস্ব করে একেলা মগ্ন।

বাউল ভাটিয়ালি-ভাওয়াইয়া-ঝুমুর প্রভৃতি গানও যেন কখনো কখনো শিল্পীরই একাকী বা শ্রোতারই একাকী—সামাজিক গোষ্ঠী সংস্কৃতির অন্তর্ভূক্ত হয়েও। বৌদ্ধ সহজিয়ার 'মহাসুখ' বৈষ্ণব সহজিয়ার 'মহাভাব' বাউল সাধনায় হয়েছে 'মনের মানুষ'। এই 'মনের মানুষ' মহামানবের মধ্যেকার মানবসত্তা ও দৈবসত্তার মিলন প্রসূত। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই বর্তমান মানবিক সত্তা (ন সুৎ < সুফি) এবং জীবনসত্তা (লহুৎ < সুফি)। তান্ত্রিক ও যৌগিক পদ্ধতিতে উভয়ের মিলন ঘটিয়ে 'পরমস্বরূপ', 'মনের মানুষ' উপলব্ধিই বাউলের চরম সিদ্ধি। এমনতর 'মনের মানুষ' পরিকল্পনায় উপনিষদীয় ব্রহ্মোপলব্ধির সাদৃশ্য ও প্রভাব থাকলেও মূলত তা সুফি মতবাদের 'অন্যলহক' ও 'নসুৎ-লহুৎ' তত্ত্ব প্রভাবিত সহজিয়া ভাণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডবাদের বিবর্তন ও রূপান্তর। গ্রামীণ জীবনের লিভিং স্টেজ বাউল—তার থ্রি ডাইমেনশ্যনাল ত্রিকৌণিক জ্যামিতিক চক্রবৃত্ত পদচারণা বা নৃত্যরচনা সংলাপ ঘটায় মস্তিষ্কের শরীরের, সমাজ-সমষ্টির। ভাটিয়ালিতেও শরীরের মস্তিষ্কের সংযোগ সক্রিয়তা বর্তমান। অনুষঙ্গাক্রমে থাকছে প্রকৃতির বিশাল পটভূমিকায় বহতা নদীর বুকে একাকী মাঝিরই একঠেরে বৈঠা বাওয়া। একবারেই উচ্চারিত একটি শব্দগুচ্ছ উচ্চারণের পর লম্বা একটানা টান—চড়া সুর ধরে ধীরে ধীরে নেমে আসে। সংগীতই বাউলের শাস্ত্র, সংগীতই বাউলের দর্শন। ভাটিয়ালিতে দর্শন-চিন্তন থাকুক বা না থাকুক নেই কোনো তাড়াহুড়ো, আছে গহিনচেতন মনের জীবনজিজ্ঞাসা। যেন জোয়ার ভাঙা উদাসীন নদীরই মতো মন্দাক্রান্তা ছন্দে বয়ে চলেছে জীবন। মাঠ হাওর, নদী, গাঙ, খাল-বিল এলাকার টানা সুর। বিশুদ্ধ 'যাওয়ারী' চালে গীত ভাওয়াইয়ার সুর যেন যৌবনের অসহ্য প্রেম-পিয়াসায় অতৃপ্ত; এ প্রেম মিলনে মধুর নয়, বিরহে বিষণ্ন। চাষির গৃহসমস্যা; মেয়ের বিবাহ, বিদায়, ঘরকন্না, রান্নাবান্না, সাজসজ্জা, কুমারীর প্রেম, ভিনদেশীয় মৈষাল বন্ধুর প্রতি আকর্ষণ, মৈষালবন্ধুর যাত্রা ও বিচ্ছেদ জীবনপথের উঁচু-নীচু ঝাঁকুনির আর্তি প্রকাশিত। তবুও, বাউলের মতো এখানে শরীরও মস্তিষ্কের যতটুকু কাজ থাকুক না কেন—উভয় সংগীতে হৃদয়ের আর্তি-আকুতিতে ভাবের পরমাণু বিচ্ছুরিত হয়। নিমেষে ব্যক্তি থেকে বৃহতে প্রতিফলিত হয়। অনস্বীকার্য, অর্থনৈতিক মোটিভেশনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয় যে জীবনের সংগ্রাম, সেখানে জীবিকাধারী প্রত্যেকটি মানুষের চূড়ান্ত লক্ষ্যমাত্রা থাকে জীবিকার শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছানো। বাউল ভাটিয়ালি-ভাওয়াইয়া-ঝুমুরে সেই মোটিভেশনের অনিবার্যতা সমুপস্থিত আন্তর-সংযোগ সঞ্চারণ প্রত্যক্ষতায়। বস্তুত, বাংলার লোকায়ত সাংগীতিক সংস্কৃতির সুরকে শাশ্বতকালের বাঁশরীতে ধরে রেখেছে পারফরমেন্স বা অভিনয়কলা। আবার কোনো পারফরমিং আর্টস উদ্দেশ্যবিহীনভাবে সৃষ্ট নয়। তার মধ্যে শতত সংগুপ্ত গভীর গূঢ় অর্থ, সামাজিক-অর্থনৈতিক-ধর্মনৈতিক তাৎপর্যময় মৌলিকত্ব বা সেলফ্ আইডেন্টিফিকেশন; শিল্প ও শিল্পীর চলার শক্তি, পথের পাথেয়, সামাজিক প্রেরণা ও উদ্দীপনা। লোকায়ত পারফরমেন্স উৎসব মেলা ধর্মানুষ্ঠান হাটবাজার বারোয়ারিতলা যেখান থেকেই উৎসারিত হোক তা একদিকে কেন্দ্রাভিগ ও অপরদিকে কেন্দ্রাতিগ বা ত্রিমাত্রিক নাটকের থ্রিডাইমেন শ্যনাল পদ্ধতিতে জনসংযোগের কাজ করে চলেছে। ঐতিহ্যবাহী ধর্মচিন্তা কিংবা ধর্মনিরপেক্ষ সামাজিক সমাচার, রাষ্ট্রনৈতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কিংবা স্থানিক প্রতিবেদন অথবা বিপ্লব-বিদ্রোহ বা আন্দোলন কথা গঙ্গা-যমুনা, পদ্মা-মেঘনার মোহনায় মিলনে মিশ্রণে একাকার।

॥ দুই ॥

'বাউল' শব্দটি বাংলার ধর্মীয় সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবনের ইতিহাসে বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনা ঋদ্ধ।

১. বাংলায় আউলিয়া > আউল্যা > আউলা > আউল সদৃশ্যে ঈশ্বরপ্রেমে মাতোয়ারাই 'বাউল'। শব্দটির উৎস সংস্কৃত 'বায়ু' শব্দের সঙ্গে অর্থদ্যোতক 'ল' প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন। বায়ু অর্থে যোগশাস্ত্রের স্নায়বিক শক্তির সঞ্চার—যে সম্প্রদায় দেহের স্নায়বিক শক্তির সঞ্চার সাধন করেন। বায়ু শব্দজাত 'বাউর' অর্থ সম্প্রসার্থে 'আ' যুক্ত করে 'বাউরা' (হিন্দি)।
২. সংস্কৃত বাতুল আকুল ব্যাকুল, হিন্দি বাউরা, আরবি ওয়ালিয়াজাত আউল থেকে বাউল উদ্ভুত। 'বাংলার বাউল ও বাউল গান' গ্রন্থে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেছেন—"সংস্কৃত বাতুল (অর্থাৎ উন্মাদ) শব্দের প্রাকৃত রূপ লইয়া 'বাউল' শব্দটি বাংলা ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে।"

তাঁর অভিমত

> 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়', 'চৈতন্যচরিতামৃত' ও 'রাগাত্মিকা' পদে এই 'বাতুল' শব্দের প্রাকৃত রূপ হিসাবে বাউল শব্দটি আমরা পাইয়াছি।

বাতুল অর্থাৎ উন্মাদ—

> একটি বিশিষ্ট ভাবের নিরন্তর আবেগে বাহ্যশূন্য বা ভাবোন্মাদ বা ধর্মোন্মাদ, বেশ-বাস ও আচার-ব্যবহারের প্রচলিত সামাজিক রীতি-নীতির বন্ধনমুক্ত, লোকাচার পরিত্যাগী, আত্মকর্ম সমাহিত উদাসীন ধর্মসাধকগণ বাউল নামে পরিচিত হইয়াছে।

চৈতন্যদেবের নীলাচলে অবস্থানকালে নবদ্বীপের বৈষ্ণব সমাজে অনাচার ও উশৃঙ্খলার সৃষ্টি হলে অদ্বৈতাচার্য মহাপ্রভুর নিকট জগদানন্দের মাধ্যমে একটি প্রহেলিকা পাঠিয়েছিলেন—

বাউলকে কহিও লোকে হইল আউল।
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল।।
বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল।।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্বদর্শনে চৈতন্যদেবকে রাধাকৃষ্ণের মিলিত রূপ হিসাবে যুগলতত্ত্ব ভাবনায় বিশ্বাস করা হয়। প্রহেলিকায় ব্যবহৃত 'বাউল' শব্দটি ভাবোন্মত্ত বা প্রেমোন্মাদ অর্থেই ব্যবহৃত।

৩. ঈশ্বরের সান্নিধ্যধন্য ভক্ত ওয়ালিয়া, আউলিয়া, আউয়াল (আরবি) থেকে আউল বা বাউল মতের আদি প্রবর্তক আউল চাঁদের নাম থেকেই আসা সম্ভব। সর্বশক্তিমান যাঁদেরকে 'ওলি' করেছেন, তাঁরাই কিছু নিয়ম-পালনের মাধ্যমে 'ওলি'র শক্তিতে শক্তিমান হয়ে ওঠেন। 'ওলি'গণ ঊর্ধ্ব-অধঃ বহু শ্রেণি বিভাজিত—সর্বশক্তিমানের শক্তি পয়গম্বরে, পয়গম্বরের শক্তি হজরত আলি মহাপুরুষ এবং তাঁর শক্তি তাঁদেরই শিষ্যমণ্ডলি ও তাঁদের হতে অধঃদিকে প্রত্যেক গুরুর শক্তি প্রবাহিত। 'ওলি' শব্দেরই উৎকৃষ্টতা বাচক আকার আউলিয়া সর্বশক্তিমান প্রদত্ত স্বাভাবিক শক্তিসম্পন্ন সাধুপুরুষ। যদিও, ময়মনসিংহ জেলায় প্রচলিত 'বাউল্লিয়া' অর্থে গৃহত্যাগী, বাউণ্ডুলে হেয়ভাবে বাউল।
৪. বাউলরা দেহত্মবাদী। দেহনির্ভর সাধনা একান্তই বস্তুনির্ভর। বৌদ্ধ 'বোধিহৃদয়' এবং

'বোধিচিত্ত' বাউলের 'মন্ত্রহীন' প্রেম। 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'র সতেরো সংখ্যক পদে উদ্ধৃত হয়েছে 'নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী। বুদ্ধ নাটক বিসমা হোই॥ ধ্রু॥' বৌদ্ধ 'বাজিল' ও 'বাউল' শব্দের অভিন্নতা স্বীকৃত। 'বজ্রকুল' থেকেও বাউল হওয়া সম্ভব। সরহের দোহাকোষ-এ উক্ত 'জোইনি গাঢ়ালিঙ্গা ণহি বর্জ্জিলু লহু উপসন্ন'।

৫. বৈষ্ণব সম্প্রদায় বিশেষত বাউল অভিধায়িত। আবার সাম্প্রদায়িক ভিখারীও। বাউলের দ্বিবিধ ধারা বর্তমান।

ক) গৃহত্যাগী, উদাসী

খ) গৃহী, লোকাচারী।

প্রথমধারার বাউল সংসারের সকল বন্ধন মুক্তি পিপাসু; পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ধারার বাউল আখড়াবাসী, সঞ্চয়ে অমনোযোগী, সঙ্গা ও ভিক্ষালব্ধ পাথেয়ই মূল। পঞ্চদশ শতকের 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' ও ষোড়শ শতকের 'চৈতন্যচরিতামৃত', 'ক্ষেপা' ও 'বাহ্য জ্ঞানহীন' অর্থে বাউল শব্দের প্রয়োগ বর্তমান। উভয় বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বাউলের আখড়া থাকলেও 'খ্যাপ' অর্থে বীরভূমের বাউল। এ বাংলায় বাউলের পীঠস্থান বীরভূম, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ। বলাবাহুল্য বাউল ধর্ম চৈতন্য-বৈষ্ণব প্রভাবজাত নয়, দেহাচার, যোগাচার, যৌনাচারমূলক আদিম-লৌকিক কৃতাদির পথ ধরে বিবর্তিত। বাউলের রাগপন্থী, মৈথুনাত্মক যোগসাধনাপন্থী। শততালির আলখাল্লায় ঢাকা শরীর, হাতে একতারা, পায়ে নূপুর, কোমরে বাঁয়া, গলায় তুলসির মালা। হাতে বালা ও একমুখ দাড়ি সমেত বাউল। শ্রীচৈতন্যের রাধাকৃষ্ণের মিলিতরূপ বা রসরাজ মহাভাবতত্ত্বের কারণে 'রসিক পাগল' বা 'মহাবাউল'। 'টলে জীব অটলে ঈশ্বর। টলাটলে গৌরাঙ্গ নির্ভর।' বাউল ভাবনায় চৈতন্যদেব প্রকৃতি-পুরুষের মিলনরূপ দেহমধ্যস্থিত পরমতত্ত্ব বা দিব্যসত্তা। জাতি, ধর্ম, বর্ণ শ্রেণি সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল মানুষকে সমান মর্যাদাদানের ঔদার্যতা তা তথাকথিত নিম্নবর্গ উদ্ভুত প্রবর্তক কেন্দ্রিক সম্প্রদায়গুলিকে প্রভাবিত করার সূত্রে চৈতন্যদেব বাউলের আদিপুরুষ।

॥ তিন ॥

'বাউল' বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনা বাহক—

১. এক বিশেষ শ্রেণির সাধক পুরুষ।

২. একটি বিশেষ ধর্মমত ও সাধন পদ্ধতি।

৩. বাউল অর্থে সংগীতের একটি স্বতন্ত্র ধারা।

৪. উপরি উক্ত তিনটি ধারারই মহাসঙ্গম।

বাউল গান বাউল তত্ত্বেরই রসভাষ্য। কথার অন্তর্লীন তাত্ত্বিকতা ও কীর্তন ভাঙা সুরের সমন্বয়ে বাউল নামক এক লোকায়ত ধর্মসম্প্রদায়ের সাধন প্রণালী রূপক-সংকেতে এই গানের মাধ্যমে প্রকাশিত। তত্ত্বের গভীর তাৎপর্য যিনি হৃদয়ঙ্গমে সক্ষম অথবা যিনি অক্ষম উভয়েরই নিকট এর সুর ও বিষয় জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায় দিগন্ত অতিক্রমী সর্বজনীন, ঐক্য ও সৌভ্রাতৃত্বমূলক, মানবিক আবেদনে ধর্ম-সম্প্রদায় নিরপেক্ষ।

আউল, বাউল, দরবেশ, সাঁই বিভাজিত ধারার মতো কর্তাভজা, সাহেবীধনী, ফকির,

নাথপন্থী, সুফি, নকশাবন্দী প্রভৃতি ধারারও প্রভাব রয়েছে বাউল সাধনায়। এঁদের বলরামী, রাধাবল্লভী সাধন ধারার যেমন সূক্ষ্ম স্বাতন্ত্র্য, তেমনি গুরুতত্ত্ববাদী, দেহতত্ত্ববাদী, মৈথুন মহাসুখ বিলাসী বাউলও আছেন। এঁরা ষটচক্র ভেদী সহজ পথর সাধক। চর্যাগীতির লুইপাদ যে সহজিয়া সাধনার প্রবর্তনা করেন, উক্ত ধারারই বিচিত্র পথগামী সহজিয়া বাউল সাধক।

'যে খোঁজে মানুষে খোদা সেই তো বাউল/বস্তুতে ঈশ্বর খুঁজে পায় তার উল'।

উদ্ধৃতাংশের 'বস্তু' বিশিষ্ট অর্থবহ—ভজনার মাধ্যমে অর্থাৎ বস্তুতে ঈশ্বর খোঁজার মাধ্যমে ঈশ্বর উপলব্ধিই বাউল সাধনা। তাঁদের বিশ্বাস 'রক্তধাতু শুক্রধাতু মা বাপ দুইজন ও তার শুক্রধাতু পরম পিতা তাহারে ভজনা কেন'।

'বাউল মানুষে ভজে/যেখানে নিত্য বিরাজে/বস্তুর অমৃতে মজে নারী সঙ্গী তাই'।

নারী সঙ্গ কোরে বস্তুতে ঈশ্বর খুঁজে 'উল' সন্ধানী বাউল। মল, মূত্র, রজঃ, বীর্য, নীর ইত্যাদি সাধনাচারের পরম প্রার্থিত বস্তু। বিন্দু সাধনাই বাউল সাধনার মূলতত্ত্ব। বিন্দু ব্রহ্মশক্তি, হ্লাদিনী শক্তি, তার সঙ্গসুধারস পরম প্রার্থনীয়। পুরুষ এখানে ভোক্তা, ভোগ্য শক্তি। উভয়েরই মিলনে মহানন্দরূপ সহজ অবস্থা।

আদ্য অন্ত এই মানুষে বাইরে কোথাও নাই
আচার বিচার ধোঁকাবাজি ভুলছি নারে ছাই
তন্ত্রে মন্ত্রে বেদ পুরাণে ঘুরায় কেবল নানান টানে
তীর্থস্থানে (সেই) সহজ মানুষ হারাই।

'লোকায়ত দর্শন'-এ ড.দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 'সহজ' শব্দের তাৎপর্য বিশ্লেষণে বলেছেন—যা জন্মেছে বা একটা কিছুর জন্মের সঙ্গে উৎপন্ন হয়। ড. শশীভূষণ দাশগুপ্তের ভাষায়—

> The word 'Sahaja' literary means that which is born or originates with the birth or origination of an entity.

বাউলের ভাষায় 'যত তন্ত্র মন্ত্র ধ্যান জ্ঞান সাধন মতে।' সে কারণে বর্তমানকে বা দেহকে ধর্মীয় সাধনার প্রধান উপকরণ হিসাবে গ্রহণ করেন। দেহই মন্দির, মসজিদ; দেহ সাধনাই সার। দেহভাণ্ডই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড। এই দেহ ব্রহ্মাণ্ডেই বাস করেন 'মনের মানুষ'। নরবপুদেহের মধ্য থেকে পুরুষ ও প্রকৃতির বিকাশ। দেহকে অবলম্বন করেই সহজানন্দ, সহজ মানুষ বা অটল মানুষের সন্ধান। তাই—

আগে দেহের খবর জানগে রে মন
তত্ত্ব না জেনে কি হয় সাধন।
দেহের সপ্ত স্বর্গ, সপ্ত পাতাল
চৌদ্দভুবন কর ভ্রমণ।

জপ-তপ-আচার-অনুষ্ঠান নয়, পরমতত্ত্ব লাভের জন্য 'ভাণ্ডকে জানিলে জানি ব্রহ্মাণ্ডের তত্ত্ব'।

আর কেন মন ভ্রমিছ বাহিরে
চলনা আপনার অন্তরে,
তুমি বাহিরে যারে তত্ত্ব কর

অবারিত সে যে আজ্ঞাচক্রের উপরে।
কুলকুণ্ডলিনী শক্তি রয় মূলাধারে
প্রণয়ের যোগে জাগাও তাহারে
শক্তি চেতন হলে পূর্নানন্দ মিলে
তোমার সদানন্দ স্বরূপ একবার দেখ না।
বামে ইড়া নাড়ী, দক্ষিণে পিঙ্গালা
রজঃতমঃগুণে করিতেছে খেলা
মধ্যে বিরাজে সুষুম্না
তারে ধর না কেন সাদরে।

'মনের মানুষ', 'অটল মানুষ', 'অলখ সাঁই', 'মানুষ রতন', 'অচিন পাখি' এমনতরো পরমাত্মাকে জানার জন্য সাধনা। এজন্য বিন্দুকে নিয়ন্ত্রিত করে তাকে ঊর্ধ্বগামী করে সহজানন্দকে অনুভব করাই বাউলের লক্ষ্য। 'মনের মানুষ অটলের ঘরে খুঁজে নাও তারে। নিগমেতে আছে মানুষ, মোগেতে বারাম ঘোরে'। 'পুরুষ ছাড়িয়া প্রকৃতি হবে/এক দেহ লয়ে নিত্যতে যাবে।' বৈষ্ণব সহজিয়ার মনের মানুষ ত্রিস্রোতাঃ সংস্কার, অযোনি ও সহজ। সংস্কার অর্থে পৃথিবীর মানুষ জন্ম-জরা-মৃত্যু শাসিত, দৈবশক্তি সম্পন্ন বৈকুণ্ঠপতি অযোনি এবং সহজ অর্থে রাধাসহ সহজানন্দ রসাস্বাদন। বাউল জানেন— 'গুরুরূপে নয়ন দে রে মন/গুরু বিনে কেউ নাই আপন', 'সেই মূলের সাধন গুরু জানে/তা জেনে মন সাধন করা।' গুরু বা মুর্শিদ চরণ সুধা সম্বলিত সাধক ও গুরুর মিলিত অবস্থা।

দেহতরী মূল কাণ্ডারী বসে আছে হাল ধরি,
ও ভাই কোন্ মিস্তিরি গড়লে তরী,
তরীর নয় দরজা খোলা
বেলা গেলে সন্ধ্যা হলে আপনি লাগে তালা।

॥ চার ॥

স্বতন্ত্র একটি লোকায়ত ধর্ম সম্প্রদায় রূপে বাউলের আত্মপ্রকাশ নিয়ে নানা মুনির নানা মত যাই থাকুক, ভারতবর্ষে বৈদিক যুগে প্রচলিত মরমীয়া সাধনা বৌদ্ধধর্মে মহাযান শাখায় নূতন রূপ পরিগ্রহ করে বাংলায় প্রগাঢ় রূপ পায়। তন্ত্র-সাধন পদ্ধতিতেও এর স্বরূপ প্রকটিত। বলা ভালো, তন্ত্রবাদে লোকায়ত দর্শনের উদ্ভব এবং বাউল তার অংশ বিশেষ। প্রাচীন বাংলার লৈখিক নিদর্শন চর্যাপদের দেহতত্ত্বমূলক পদই বাউলগানের উৎসমূল।

সুপ্রাচীন অতীতে বেদ-পুরাণাদি ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রীয় ধর্মাচারের পাশাপাশি আদিম ধর্মবিশ্বাস বা লোকায়ত ধ্যান-ধারণার প্রচলন ছিল। এঁরা দেহ নির্ভর সাধনমার্গে চরম সিদ্ধি অর্জনে বিশ্বাসী ছিলেন, যা কালে কালান্তরে সহজিয়া সাধন পদ্ধতি নামে পরিচিতি পায়। ড. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের ভাষায়—

> 'সহজ সাধনার মূল ভিত্তি যোগক্রিয়া। গূঢ় যোগক্রিয়ার দ্বারা নিজের পরমানন্দময় সত্তার উপলব্ধিই ইহার প্রকৃত সাধনা।'

শরীর মধ্যস্থিত বিবিধ নাড়ি চক্রাদির সংস্থান কল্পনা করে তান্ত্রিকগণ শরীর তত্ত্বাদির যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, সহজিয়ারা তা অনুসরণ করে তদনুরূপ স্থানে সরোবরাদি কল্পনা করেছেন।—লোকায়ত স্তরে

> তন্ত্রের মূলস্থিত এই গুহ্যসাধন ও যোগক্রিয়া হয়ত মোর্যযুগের পূর্ব হইতেই আদিম জনসমাজের

> মধ্যে বহুল প্রচলিত ছিল। এই লৌকিক ধারাই সিদ্ধান্তের বৌদ্ধতন্ত্র ও শৈবতন্ত্রের মধ্য দিয়া আসিয়া শাক্ত ও বৈষ্ণবের তন্ত্রাচারের বামাচার দিয়া সহজিয়া, আউল-বাউল (দেহতত্ত্ব, কর্তাভজা, নানা ভজন) প্রভৃতিতে ও একটু শুদ্ধিলাভ করিয়া রামপ্রসাদের কালীকীর্তনে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।[৩]

ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দীর যুগ পরিবেশে শিষ্ট সমাজ বা শাস্ত্রীয় শরীয়ত ধর্মের বাইরে থাকা লোকায়ত স্তরের মানুষ, যারা দেবাচার-যোগাচার সম্পৃক্ত ধর্মসাধনার প্রবাহের সঙ্গে বৈষ্ণব ও সুফীর সংমিশ্রণে যে সকল লোকায়ত ধর্ম সম্প্রদায়ের উদ্ভব, তারই অন্যতম একটি বাউল সম্প্রদায়।

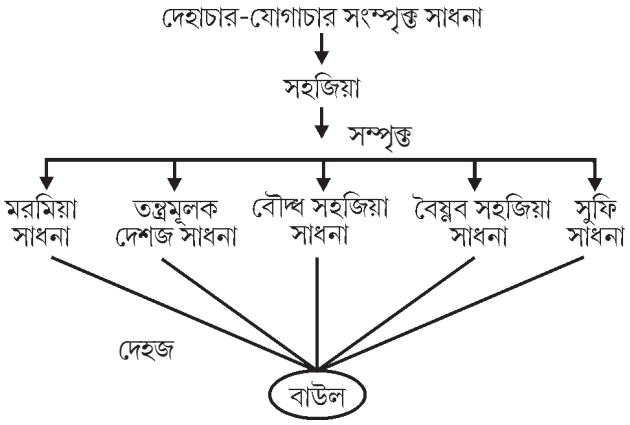

বাউল সাধনমার্গ পঞ্চ স্তরীয়—

ক) প্রবর্ত খ) সাধক গ) সিদ্ধ ঘ) সিদ্ধের সিদ্ধ ঙ) নিবর্ত তত্ত্বচিন্তনও

ত্রিমার্গীয়—

১. জ্ঞানমার্গ—আমাদের আস্তিক্য, নাস্তিক্য, সংখ্যাবাদের দিকে চলিত করে।
২. কর্মমার্গ—সমাজ, কর্ম, শাস্ত্র, রাষ্ট্রবিধি গড়ে তুলতে অনুপ্রাণিত করে।
৩. ভক্তিমার্গ—আমাদের প্রেমের পথে সঞ্চালিত করে।

এই ত্রিমার্গের চরম পরিণতি—'আত্মানাং বিদ্ধি'। নিজেকে চেনা, জানা। অর্থে বিশ্বকে চেনা, জানা, হাদীসের ভাষায় 'মান আরফা নাফসাহু ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু'—যে নিজেকে চিনেছেন যে আল্লাকে চিনেছে। বাউল সাধনার স্বরূপ প্রসঙ্গে ড. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখেছেন—

> সাধনায় প্রত্যেক পুরুষ নিজের শিবতত্ত্বকে জাগ্রত করিয়া নিজেকে শিবরূপে অনুভব করিবে, আবার প্রত্যেক নারীও তাহার অন্তর্নিহিত শক্তিতত্ত্বকে উদ্বুদ্ধ করিয়া নিজেকে পূর্ণ শক্তিরূপে উপলব্ধি করিবে। উভয় তত্ত্বের পুরুষ ও প্রকৃতির মিলনের দ্বারা পূর্ণ সাম্যরসঘটিত যে অসীম আনন্দানুভূতি, তাহাই হিন্দু তান্ত্রিকগণের কেবলানন্দ, বৌদ্ধতান্ত্রিকগণের মহাসুখ, বৈষ্ণব সহজিয়াগণের মহাভাবস্বরূপ সহজাবস্থা।

এই মহাভাবস্বরূপ সহজাবস্থায় উত্তরণ বাউলের ভাষায় 'জ্যান্তেমরা'। বাউল ত্রিমাত্রিক 'ব'-র

সাধক।

১. বস্তু-শুক্র
২. বাক্য-গুরুবাক্য
৩. ত্রিকোণ যোনি

ব-সাধনায় সিদ্ধিলাভকারী সাধকগণ গুহ্য পরিভাষায় বাউল—'ব' সাধনায় 'উল' হয়েছে যার সেই বাউল-এর গানই বাউল গান। কীর্তন ভাঙা সুর মূল কাঠামো এবং স্থায়ী। অন্তরা ও সঞ্চারী আশ্রয়ী হলেও পূর্ববঙ্গে ভাটিয়ালির প্রভাব, উত্তরবঙ্গে ভাওয়াইয়ার প্রভাব এবং রাঢ় অঞ্চলে ঝুমুরের প্রভাব মিলিয়ে একটি ঐতিহ্য শৈলীস্বরূপ বাউল গানকে সহজে চেনা যায়। প্রকৃত বাউল ব্যতিরেখে 'সখের বাউল', 'বেশধারী বাউল' সাধারণ সংগীত শিল্পীও বাউল গান গেয়ে থাকেন। রচয়িতার নামানুসারে 'লালনের গান', 'হাছনের গান', 'গগনের গান' ইত্যাদি এবং সূক্ষ্মভেদে 'ফকিরিগান', 'ভাবের গান', 'সাঁইয়ের গান', 'মুর্শিদি', 'দরবেশি', 'তত্ত্বগান' প্রভৃতি নামেও অবিহিত। বাউল-সাধককবি লালন সাঁই, গঙ্গারাম, গগন হরকরা, শেখ মদন, পাগলা ফাশই, পঞ্চু সাঁই, যাদুবিন্দু, দুদ্দুশাহ, চণ্ডী গোঁসাই, ক্ষ্যাপা নবীন দাস, ত্রিভঙ্গা গোঁসাই, হাওড়ে গোঁসাই, পদ্মলোচন প্রমুখ। বাউলগান বলতে যে গানকে বোঝায় তা লালন শাহের পূর্বে কেউ লিখেছেন কিংবা তার সঠিক প্রমাণ নেই। আবার, লালন তাঁর গানে গুরু সিরাজ সাঁই-এর নাম উল্লেখ করেছেন। সিরাজ সাঁই উচ্চমার্গের সাধক ছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁর রচিত কোনো বাউল গানের নিদর্শন তথ্য জানা যায় না। লালন ফকিরই 'বাউল গানের ভগীরথ'। এ-পার ও-পার বাংলার যেখানেই বাউল গান করুন না কেন, অঞ্চলভেদে গানের মূল সঙ্গাতকারী গুবগুবি অথবা একতারা ও ডুগি। বাউল রূপের পরিচয় মেলে খমকের ছন্দে তালে। তাল বাদে আদিম প্রকৃতির আইসোমেট্রিক যেমন দ্রুত লয়ের ঝোঁকে তেমনিভাবে তালগুলোতে অনুরূপ ঝোঁক ও তালভাগ দেখা যায়। গানের রূপকে ধরিয়ে দেয় বা তালরক্ষা করে এরজন্য বিভিন্ন করণ নির্ধারিত আছে। সদগুরু ধরে বিভিন্ন করণ অতিক্রম বা 'সাপে নেউলে পরমতত্ত্বের উপলব্ধি। সাপে নেউলে খেলার মধ্যে দমের কাজ বা বায়ু সাধনা অন্যতম। তান্ত্রিক প্রাণায়াম প্রায় বাউলের নিশ্বাস বায়ু নিয়ন্ত্রণ। দমের সাহায্যে বাউলরা উল্টো কলে সাধন শেখেন। বাউল সাধন করণে পঞ্চবান প্রচলিত।

মদন মাদন আর শোষন, স্তম্ভন।
সম্মোহন আদিকরি রসিক করণ॥

আবার বাণের সঙ্গে সংযুক্ত গুণ। —বাণ পুরুষ শক্তি ও গুণ নারী শক্তির প্রতীক। গুণে বাণ যোজনায় লক্ষ্যভেদ বাউলের উদ্দেশ্য। আয়ত্তকরণের মধ্যে বর্তমান—পুরুষ ও প্রকৃতির বিভিন্ন বস্তুপান, রস ও রতির কাজ, রসের কাজ, চন্দ্র সাধনা এবং এই আপন করণ 'ভজন কথা না কহিবে যথাতথা।' হিন্দুমার্গীয় পঞ্চস্তর অর্থাৎ প্রবর্ত-সাধক-সিদ্ধ-সিদ্ধের সিদ্ধ-নিবর্ত মুসলমান বাউলের নাছুত, লাহুত, জবরুতি, মালকুত, হাউত। অবশ্য, বাউলগান একদিকে ধর্মশাস্ত্র ও দর্শন, আবার অন্যদিকে সাধন সংগীত ও গীতিকবিতা। জাতি-বর্ণ-শ্রেণি সম্প্রদায়ের সীমানা পেরিয়ে বাউল সাধক মানুষের প্রেমময় সত্তাকেই মান্যতা দিয়েছেন সর্বাগ্রে। বাউল সাধকের অনন্ত বিশ্বাস এক সমাজ-সাম্যতা। কোরাণে-পুরাণে বিরোধ নেই, ধর্মে-শাস্ত্রে

গোঁড়ামি নেই। বস্তুনির্ভর সাধনস্তর থেকে প্রেমনির্ভর সাধনস্তরে উত্তরণের নাম বাউল সাধনা। অনুভূতি আর সঙ্গা-মাধুকরী পাথেয় বলেই সম্প্রদায়ের সীমান্তে তাঁদের বাস। মানুষের প্রেমই তাঁদের চিত্তবিলাস—'এই মানুষের রঙ্গো-রসে বিরাজ করে যাঁই আমার' কিম্বা 'এই মানুষ আছেরে মন/যাঁরে বলে মানুষ রতন।' রাবিন্দ্রীক ভাষ্যে—

আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে
(অমি) তাই হেরি তায় সকলখানে।

খমক, বায়া, দোতারা, ঘুঙুর, প্রেমজুড়ি, জুড়ি, সাবিন্দা, বাঁশি ও খঞ্জনি। বাউলের আসরে খোল, তবলাও ব্যবহৃত হয়। বাউল গান বিশেষ ধরনের অঙ্গাসজ্জায় ভূষিত হন। গেরুয়া বসন ফতুয়া, কিংবা রঙ-বেরঙের তালি মারা জোব্বা। তাঁদের গলার মালার রকমফের নির্ভর করে সাধনমাগর থাকের উপর। বিশেষ করে অঙ্গাসজ্জা, নৃত্য ভঙ্গিমা, বাদ্যের সঙ্গাত, কথা ও সুরে বাউল গান যে এক স্বতন্ত্র লোকায়তিক পারফরমিং আর্ট তা চিনে নিতে অসুবিধা হয় না।

উৎসের সন্ধানে

১. লোক সংস্কৃতির বিশ্বকোষ, ২০০৪
২. বাংলা লোকসংগীত, কোষ ২০১৩

তথ্যের সন্ধানে

(সংস্কৃতির রূপান্তর/গোপাল হারদার)।

বাউল সংগীত : ধর্ম ও তত্ত্বের মেলবন্ধনে

ড. অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

কীর্তনে আর বাউলের গানে আমরা দিয়েছি খুলি
মনের গোপনে নিভৃতভুবনে দ্বারছিল যতগুলি।

('আমরা', সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)

বাংলার লোকসংগীত ধারায় বাউল এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করে আছে। অন্যান্য লোকসংগীতের ন্যায় মূলত কোনো জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায় কিংবা গোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে নয় বরং এক সমন্বয়ী ধর্মের উপর ভিত্তি করে বাউল সংগীতের জন্ম। সেদিক থেকে বিচার করে বলা যায়, যতটা না সম্প্রদায়ের তার থেকে অনেক বেশি ধর্মীয়ভাব ও তত্ত্বের কাছাকাছি অবস্থান করে বাউল। আবার এই ধর্মীয় ভাবনাটিও এমন একটি মিশ্র-ভাবনা, যেখান থেকে কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের পৃথকীকরণ সম্ভব নয়। অর্থাৎ, তা সকল কালের সব ধর্মেরই পৃষ্ঠপোষকতাকারী এক ভাব-সম্মিলন। অথচ তাত্ত্বিক ভাবে এর জড়বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাবো যে, এর মূল সাধন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বৌদ্ধ সংগীত ও দোহাকেন্দ্রিক প্রাচীন বংলার তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের উপর। কিন্তু ভাবের মেলবন্ধনে বাউল হলো এমন এক বিশেষ ধর্ম যা তথাকথিত বহুধা বিস্তৃত ধর্মের শাখাপ্রশাখায় কালক্রমিক ভাবে জারিত হতে হতে নানা তত্ত্ব ও ভাবের সংমিশ্রণে সর্বধর্মের এক মিশ্র আরকে পরিণত হয়েছে। বাউল যেমন আজ আর শুধুমাত্র লোকমাত্রিক কিংবা লোককেন্দ্রিক সংগীতরূপে আলোচনার বিষয় বলেই গণ্য নয়, তা বাংলা তথা ভারতের শিষ্ট সংস্কৃতির এক অন্যতম চলিষ্ণু মাধ্যম, তেমনই তার মধ্যে থেকে সূর্যের সপ্তবর্ণের মতো বিচ্ছুরিত হয়ে চলেছে বৈষ্ণব সহজিয়া সাধনতত্ত্ব, সুফি দর্শন, রাধা-কৃষ্ণ লীলাবাদ, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম, শিবশক্তিতত্ত্ব প্রভৃতি। সব থেকে বড়ো কথা, শুধু ধর্ম নয় বরং বাউলের আজ সব থেকে বড়ো পরিচয় সংস্কৃতি রূপে। আর ধর্মসংগীত বলে আধুনিককালে যদি কিছু সৃষ্টি হয়ে থাকে তার অন্যতম দাবিদার হলো বাউল। সংগীত ছাড়া বাউলের কোনো ধর্মপ্রাণতাই সার্বজনীন নয়, যদিও অনেক সমালোচকই ধর্মসংগীতকে লোকসংগীত রূপে গ্রহণ করার পক্ষপাতী নন।[১]

বাউলের সঙ্গে অন্যান্য ধর্মতত্ত্বের মেলবন্ধনের প্রসঙ্গটিতে প্রথমেই আসা যেতে পারে সহজিয়াধর্ম প্রসঙ্গে। এই সহজিয়াধর্মের দু'টি ধারার কথা বলা যেতে পারে যার একটি হলো বৌদ্ধসহজিয়া ধর্ম, বাউলধর্মকে যার প্রকাশমুখ বলা যেতে পারে এবং দ্বিতীয়টি হল

বৈষ্ণবসহজিয়া ধর্ম—যার আধ্যাত্মিক ভাবনাকে বাউল পরে আত্মস্থ করেছে। বৌদ্ধসহজিয়া ধর্মে বলা হয়—

অপণে রচি রচি ভবনির্বাণা।
মিছে লোঅ বন্ধাবএ অপনা॥
অম্ভে ন জানহু অচিন্ত জোই।
জাম মরণ ভব কোইসণ হোই॥[২]

অর্থাৎ মানুষ তার পুনর্জন্ম ও নির্বাণের কথা মনে মনে পরিকল্পনা করে তার দেহের মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে পড়ে। অচিন্ত্য যোগী আমরা জানি না, জন্ম, মৃত্যু এবং পুনর্জন্ম কীভাবে হয়? জন্ম ও যেরূপ, মৃত্যুও তদ্রূপ। জীয়ন্তে ও মরণে কোনো বিশেষ নেই। বাউলরাও জীবন-মৃত্যুর এই খেলায় জীবনকে নৌকো এবং দুনিয়াকে দরিয়া হিসেবে ভাবতে বিশেষভাবে অভ্যস্ত। বাউল সংগীতে উপরিউক্ত বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মের কথাগুলিকেই আত্মাতত্ত্বের প্রকাশরূপে দেখানো হয় অনেকটা এইভাবে যা হল—

জনম-ভর যত্ন করে একদিনও আমি দেখলাম নারে
আমি এই দেখবার আশায় ফাঁদ পাতিলাম
তবু পাখি পড়ে না ফাঁদে, 'পুড়ুত' করে উড়ে যায়।

চর্যাপদের মধ্যে দিয়ে বাঙালির প্রাচীন ও পরম্পরাগত অধ্যাত্মের পরিচয় পাওয়া যায়, আর বাউলের মধ্যে দিয়ে পাওয়া যায় তার ভাবজগতের অখণ্ডতার পরিচয়। আবার বৈষ্ণবীয় সহজিয়াপদে যেভাবে চণ্ডীদাস বলেন—

শুন হ মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

বাউল সাধকের ধর্মও সেই সহজ মানুষকেই মরমিয়া মনের মানুষ বলে জেনে এসেছে। সে মানুষের মনে স্বর্গ-নরক, জন্ম-মৃত্যু, পরজন্ম-পুনর্জন্ম ও কালচক্র থেকেও এই আত্মসত্যের ও আত্মবিশ্বাসের উত্তীর্ণতা বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে। সর্বোপরি ঈশ্বর নামক আলৌকিক ও অমর আশ্রয় নয় বরং মরমানবের পৃথিবী ও তার লৌকিক শক্তির উপরই বাউলের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যা অনেকাংশে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমৃদ্ধও বটে। তবে একদিক থেকে বাউল বাংলার লোকধর্মের একটি মূলধারাকে আশ্রয় গড়ে উঠেছে। বাংলার লোকধর্ম কখনই শাস্ত্রনির্দেশিত পথে চলেনি। উপরন্তু বাংলার লোকধর্মে ধর্ম ও জীবন প্রায়শই একে অপরের পরিপূরক হয়ে উঠেছে। সেদিক থেকে বাউলের সাংগীতিক ভাবনায় যে জীবনের প্রকাশ দেখা যায় তা অন্যান্য লোকধর্মের ন্যায় সহজ ও মুক্ত, অর্থাৎ এ ধর্মসংগীত হল সহজ জীবনাশ্রিত।

বাংলা সাহিত্যে জয়দেবের গীতিগোবিন্দ থেকে শুরু করে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন তথা বৈষ্ণব পদাবলী কাব্য পর্যন্ত যে আধ্যাত্মিকতার ঢেউ লক্ষ করি তার মধ্যে স্পষ্ট একটি বিভাজন রেখা রয়েছে যার ওপারে অবস্থান করেছেন ঐশী ও ঐশ্বর্যময় শক্তির আধার ভগবান স্বয়ং আর এপারে তারই আরাধনাকারী দীন-হীন ভক্ত। দুশ্চর সাধনা ও দুর্বার ভক্তি ভিন্ন সে

বিভাজন রেখাটি অতিক্রম করে ভক্তের পক্ষে ভগবানের কাছে পৌঁছনো মোটেও সম্ভব নয়। শ্রীচৈতন্য জীবনীসাহিত্য ও চৈতন্য ভাবনাশ্রিত অন্যান্য সাহিত্যধারায় অলৌকিক ভাবনার স্থলে মানবমহিমার প্রকাশ ঘটেছে অনেক বেশি, ঠিক যেমন ভাবে সপ্তদশ শতাব্দীর আরাকানি রাজসভা সাহিত্যের প্রণয়-গাথার মধ্যে দিয়ে মানব স্বীকৃতির প্রকাশ ঘটেছে। এভাবেই অধ্যাত্ম ক্রমে লৌকিক হয়ে ওঠে। বাউলের ক্ষেত্রেও এমনটি দেখা যায়। তবে বাউল তার লৌকিক জীবনধারায় কোনোদিনই কোনো শাস্ত্রের অনুশাসনকে স্বীকার করে আসেনি বরং তা ধর্মের সহজ পরিচয় স্বরূপ মানবধর্ম ও মানবসত্যকেই শ্রেষ্ঠ রূপে জেনে এসেছে। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের বৈষ্ণব সহজিয়া সম্প্রদায়ের রচিত পদাবলীও মানবিক অনুভূতিতে ভরপুর। সেখানে শ্রীকৃষ্ণ অথবা রাধিকা সাধারণ জনসমাজেরই প্রতিনিধি। আউল-বাউলের মনের মানুষও আসলে তাই। পদাবলীর নায়ক শ্রীকৃষ্ণ যেমন বিষ্ণুপুরাণ অথবা শ্রীমদভগবৎগীতার অন্ধঅনুসরণ নয়, বাউলের মনের মানুষও তেমনি সহজ দিশায় দেহভাণ্ডে ব্রহ্মের সন্ধানে রত মানবিক প্রেম-সংগীতের কাণ্ডারি মাত্র। প্রকৃত অর্থে প্রতিটি ধর্মতত্ত্বের অন্তরালে একটি স্বজাতীয় লৌকিক ধর্মবোধ ক্রিয়াশীল থাকে। এই লৌকিক ধর্মবোধটিই ধর্মের গঠনতন্ত্রকে এক মানসিক ও মানবিক দৃঢ়তা প্রদান করে, সাহিত্য লক্ষণে যা কখনো হয়ে ওঠে সাহিত্যপদবাচ্য। আবার দৈশিক লক্ষ্যে সিঞ্চিত এই ধর্মসংগীতগুলিই কখনো কখনো হয়ে ওঠে জাতীয় চেতনার ধারক ও বাহক। বাউল সংগীতে বাঙালি তথা মানব ঐক্যের যে সরল বন্ধন ও সর্বজনীন ঐক্যবোধের কথা নিহিত রয়েছে তা প্রকৃতপক্ষে ভারতের আধ্যাত্মিক অস্তিত্ব এবং আত্মারই মূল নির্যাস, সারাৎসার।

বাংলার অন্যান্য লৌকিকধর্ম সংগীতের ন্যায় বাউলের ক্ষেত্রেও আচারমূলক ধর্মসংগীত অর্থাৎ গুরু-শিষ্য পরম্পরা এবং লৌকিক ধর্মসংগীত অর্থাৎ নিরপেক্ষ তথা স্বাধীন ধর্মসংগীত সাধনা—উভয় রীতিরই সাক্ষাৎ মেলে। তৎসহ হিন্দু ধর্মের বেদ আদি শাস্ত্রের বহির্ভূত ভাবনায় বিশ্বাস, মুসলিম ধর্মের ফকির, দরবেশী সাধনা ও সুফি মতবাদের সাঙ্গীকরণ, গৌড়ীয়-বৈষ্ণব মতবাদ ও সহজিয়া বৈষ্ণব মতবাদ ভাবমিশ্রণ প্রাক্-চৈতন্য ও চৈতন্য পরবর্তীযুগে বাউলসাধনা ও সংগীতকে পুষ্ট করেছে। বৌদ্ধধর্মের বজ্রযান ও কালচক্রযানে নিগূঢ় তান্ত্রিকতার প্রাধান্য আছে। কিন্তু সহজযানে তা ছিল না। তাই তা পুরাকালের (আনুমানিক দশম শতাব্দী, পাল সাম্রাজ্য) ধারা থেকে বিবর্তনের পথ ধরে যে যোগসাধনার (মিথুনাত্মক) সৃষ্টি করেছিল সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর বাউল সংগীত তারই শাখায়িত ফল রূপে গণ্য।[৩] বলাবাহুল্য, ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের মৃত্যুর পর (১৮৬০) বাংলার লোকসংগীতের ধারায় যে জোয়ার উঠেছিল বাউল তার পালে হাওয়া যুগিয়েছিল। ঊনবিংশ শতকের বাউল সংগীতে ইসলামি সুফি এবং বৈষ্ণব সহজিয়া ভাবনার যে অন্তরঙ্গ মিশ্রণ ঘটেছিল লালনের গানগুলিই তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

লালন ফকির তাঁর গানে বলেছেন 'মুরশিদ বিনে কি ধন আর আছে রে জগতে।' অর্থাৎ গুরুর অনুগ্রহ ও কৃপা ছাড়া এবং গুরুর প্রতি অবিচলভক্তি ও নিষ্ঠা ছাড়া জগৎ অচল। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে বৌদ্ধ সহজিয়া সদগুরুর বাহ্যিক বেশ-বাস ছিল এখনকার আউলের (গুরু আউলচাঁদ) ন্যায়।[৪] হিন্দু তান্ত্রিকধর্ম যথা শাক্ত, প্রকৃতিবর্জিত বৌদ্ধ যোগসাধনা যথা তান্ত্রিক সহজযান (যা থেকে পরবর্তীতে নাথধর্ম ও শৈবধর্মের উদ্ভব) এবং

বৈষ্ণব ধর্ম যথা সহজিয়া—প্রতিটি ক্ষেত্রেই সাধক অথবা তান্ত্রিক গুরুর স্থানকে সর্বোচ্চ মানা হয়। তন্ত্রশাস্ত্রে বলা হয়— 'ধর্ম্মান্ধর্ম্মকর্তা চ গুরুগুপ্রীষণে রতঃ।' সহজযানের মূলকথাও সদগুরুর উপদেশ। সহজযানের ভাষায়—

> ন বিনা বজ্রগুরুণা সর্বক্লেশপ্রহাণকম্।
> নির্বাণঞ্চ পদং শান্ত মবৈর্বত্তিকমাপ্নুয়াৎ॥

অর্থাৎ বজ্রগুরু ব্যতিরেকে নির্বাণপদ পাওয়া যায় না। যে নির্বাণে সকল ক্লেশের নাশ হয়, শান্তি যে নির্বাণের চরম ফল, সে নির্বাণে আর বিবর্ত থাকে না, অর্থাৎ কোনোরূপ পরিবর্তন হয় না, সে পদ গুরুর কৃপা ভিন্ন পাওয়া যায় না।[৫] আর বাউল গীতির কোথাও কোথাও এ গুরু স্বয়ং ঈশ্বর। লালনও তাঁর ঘরের কাছে দেখেছেন এক আরশিনগর আর সেখানে যে পড়শি বসত করে তিনিই তাঁর গুরু বা সাঁই। বাউল-সাধক ঈশ্বররূপী সেই গুরুকে ডেকে বলেন—

> আমি ডাকি তোমায় বারংবার
> এসে আমায় দেও গো দিদার
> তুমি বিনে কেউ নাই আমার
> ওগো মুরশিদ খোদা।

আবার বাউল মতে কখনো মানব-গুরুর মাধ্যমেই ঈশ্বর নামক পরম-গুরুর সন্ধান লাভ করা যায়। স্থূল মানব দেহের গৌরব তখনই হয় যখন সে দেহভাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডের খোঁজ মেলে। বাউলসাধনা স্থূলদেহভাণ্ডে পরম ব্রহ্মাণ্ডেরই আত্মানুসন্ধান। গুরুকে বাউলগণ ভবসংসারের কাণ্ডারি রূপে কল্পনা করেছেন। জগৎসংসার মাঝে গুরুই তাদের কাছে ঈশ্বরের একমাত্র প্রতিনিধি। শাক্তপদেও গুরুকে অন্যতম স্থান দেওয়া হয়েছে। কৃষ্ণানন্দ তন্ত্রসারে লিখেছেন—

> বৈষ্ণবে বৈষ্ণবে গ্রাহঃ শৈবে শৈবশ শক্তিকে।
> শৈবঃ শক্তোপি সর্ব্বত্র দীক্ষা স্বামী ন সংশয়ঃ॥

অর্থাৎ বৈষ্ণবের বৈষ্ণব, শৈবের শৈব ও শাক্ত গ্রাহ্য। শৈব ও শাক্ত সর্বত্রই দীক্ষা গুরু হতে পারে। গুরুকে আশ্রয় করে বাউল ধর্মসংগীতে আচারমূলক ব্রহ্ম সাধনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। বাউল গানে আছে—

> আত্মরূপে কৃষ্ণ তিনি, পরতত্ত্বে রাধারাণী, গুরুতত্ত্বে প্রেম বাখানি, কৃষ্ণ অধর বলে, মনোহর, নে যত্ন ক'রে, দিলাম তোরে তত্ত্ব বলে সাধনের এই নির্ণয়॥ (গান নং ৩৪৯)

যদিও লৌকিক ধর্মসংগীতে এই গুরু-শিষ্য পরম্পরাটি সর্বথা প্রচলিত নয়। বাউলের ক্ষেত্রেও এটি গণ্য। বাউল সাধনায় যেখানে গুরু-শিষ্য পরম্পরাটি প্রচলিত নয় সেখানে নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে তা বিকাশ লাভ করে। উপরন্তু বাউল সংগীতে যেহেতু বেদের আচার ও আনুষ্ঠানিকতা এবং শরীয়তি নিয়ম-কানুন মানা হয় না সেহেতু উক্ত স্বাধীনতাটিও সুদূরপ্রসারী হয়। সেখানে মানব-মন, সহজ-মানুষ, মনের-মানুষ, রূপের-মানুষ, ভাবের-মানুষ, সোনার-মানুষ, রসের-মানুষ, অধরা-মানুষ, সাঁই ইত্যাদি বিভিন্ন নামে অধ্যাত্ম ভাবনাটির দেখা মেলে। লালন তাঁর গানে বলেন—

> এই মানুষে সেই মানুষ আছে
> কত মুনি-ঋষি চারযুগ ধরে বেড়াচ্ছে খুঁজে।

'এই মানুষ' বলতে এখানে স্থূল মনুষ্যদেহ তথা মানব-ভাণ্ডের কথা বলা হয়েছে, যা বাউল সাধনার মূল আশ্রয়। আর 'সেই মানুষ' বলতে আত্ম বা ব্রহ্মাণ্ডের কথা বলা হয়েছে যার অবস্থান পঞ্চভূতে। লালন তাই বলেন—'যাহা আছে ভাণ্ডে তাহা আছে ব্রহ্মাণ্ডে।' অর্থাৎ স্থূল দেহ হল আত্মোপলব্ধির সোপান। আর স্থূলচরাচর অর্থাৎ আকাশ-বাতাস, নদী-পাহাড়, সমুদ্র-অরণ্য প্রভৃতি যা কিছু প্রকৃতির আদিম ও প্রাচীন সৃষ্টি—তারই মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে আছে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অসীম রহস্য। তাই সংসারত্যাগী বাউল এরই মাঝে ছুটে যেতে চায়, বিলীন হতে চায়, গান বাঁধে—ব্রহ্মের উপলব্ধির প্রয়াসে, উত্তীর্ণ হতে চায় রূপ থেকে স্বরূপে। রবীন্দ্রাদর্শের সঙ্গে বাউল জীবন-দর্শনের এখানে এক গভীর মিল খুঁজে পাওয়া যায়। বাউল সাধনা প্রাকৃত দেহধারকে অপ্রাকৃতে পরিণত করে তারই মধ্যে পরমতত্ত্বের অনুসন্ধান করে। তাই বাউল লালন বলেন—

রূপের ঘরে অটল রূপ বিহারে
চেয়ে দেখ না তোরা।

এই দ্বিতীয় রূপ বা 'অটল রূপ'ই হলো আসলে অরূপ বা স্বরূপ (প্রকৃতি স্বরূপা অনন্ত ব্রহ্ম)। এ হলো সেই অসীম যাকে প্রত্যক্ষ করা যায় না, শুধু অনুভব করতে হয়। লালনের অপর এক গানে দেখি—

রূপ দেখিলাম রে নয়নে
আপনার রূপ দেখিলাম রে নয়নে
আমার মাঝত বাহির হইয়া দেখা দিল আমারে।

আপনার আত্মাকে জানার এই অনুভূতিকে প্রাচীন শাস্ত্রে বলা হয় 'আত্মানং বিদ্ধি'[৬]। রবীন্দ্রনাথও তাঁর জীবনদর্শনে এই রূপ (সীমা)-কে অরূপ (অসীম)-এর সঙ্গে মেলানোর প্রয়াস করে গেছেন আর তাই তিনি তাঁর 'রূপ ও অরূপ' প্রবন্ধে বলেছেন—

> আধ্যাত্মিক সাধনা কখনোই রূপের সাধনা হইতে পারে না। তাহা সমস্ত রূপের ভিতর দিয়া চঞ্চল রূপের বন্ধন অতিক্রম করিয়া ধ্রুব সত্যের দিকে চলিতে চেষ্টা করে। ইন্দ্রিয়গোচর যে কোনো বস্তু আপনাকেই চরম বলিয়া, স্বতন্ত্র বলিয়া ভান করিতেছে, সাধক তাহার সেই ভানের আবরণ ভেদ করিযা পরম পদার্থকে দেখিতে চায়।[৭]

কবির নিজের ভাষায়—

সীমার মাঝে, অসীম, তুমি বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।

রবীন্দ্রনাথের সীমা-অসীমের ভাবসূত্রটুকু বাউলসাধনার সঙ্গে তাই অন্তরের মেলবন্ধনে জুড়ে যায়। বাউল সাধক লালন তাঁর গানে বলেছেন—

বেদে কি তার মর্ম জানে
যে রূপ সাঁইর লীলাখেলা
আছে যে এই দেহ-ভুবনে॥
পঞ্চতত্ত্ব বেদের বিচার
পণ্ডিতেরা করেন প্রচার,

মানব-তত্ত্ব ভজনের সার,
বেদ ছাড়া বৈরাগ্যের মানে।।

যান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি বিরূপ বাউল সাধক আরও বলেন—

তন্ত্র মন্ত্র বেদ পুরাণে, ঘুরায় কেবল নানান টানে,
যোগে যোগে তীর্থ স্নানে, সহজ মানুষ ধরে হারাই।

অনুরূপভাবে শাক্ত সাধকও অন্তরাত্মাকে বলেন—

মন কোরো না দ্বেষাদ্বেষি
যদি হবিরে বৈকুণ্ঠবাসী।
আমি বেদাগম পুরাণেতে করলাম কত খোঁজ তল্লাসী
ঐ যে কালী কৃষ্ণ শিব রাম সকল আমার এলোকেশী।

—রামপ্রসাদ সেন

অন্যদিকে তন্ত্র সাধকদের ন্যায় উপলব্ধি আছে ফকির নাসেরের গলায়। ফকির নাসের বলেন—

দেহের বিচে দেখ আছে আজব কারখানা
তিনশত ষাট দিয়ে জোড়া করেছে দেহ খাড়া
দুই খুঁটি, একটি আড়া—বেড়া চারখানা
দশ দরজা, আট কুঠুরি—চার কুতুব, ষোলো প্রহরী
বায়ান্ন গলি, তিপান্ন বাজার, তের নদী, সাত সমুদ্দর
তাহার মধ্যে চোদ্দটা ঘর, কেউ করে না তাহার খবর—
তিন উজির, তিন বাদশা তার, এক মনিব, দুই খরিদ্দার
দালাল তাহার দুই জনা।
দেহের খবর বড় খবর
তিন তারেতে হচ্ছে সব খবর।
বারো বুরুজ, সাত সিতারা
দেহের ভিতর আছে পোরা।

শক্তি সাধক কমলাকান্ত কিংবা রামপ্রসাদ সেন তন্ত্র নয় বরং ভক্তিচিত্ত মন নিয়েই জগজ্জননীকে কামনা করেছেন। শাক্তপদাবলীকার আপন চিত্ত মাঝারে চেয়ে বলেন—

আপনারে আপনি দেখ
যেওনা মন কারু ঘরে।
যা চাবে এইখানে পাবে
খোঁজ নিও অন্তঃপুরে।

—কমলাকান্ত

আয় মন বেড়াতে যাবি
কালী কল্পতরু মূলে চারি ফল কুড়ায়ে খাবি।

—রামপ্রসাদ সেন

আর বাউল সাধকেরাও আগম, পুরাণ, বেদ কিংবা তন্ত্রাচার নয়, মনেরই কাণ্ডারী। নব্বই-এর

দশকে প্রায় বাউলের সুরেই গাওয়া দিলরুবা খানের 'পাগল মন মনরে, মন কেন এত কথা বলে' গানের কথাতেও উঠে এসেছে সেই অন্তঃগহীন মনেরই খোঁজ।

বলাবাহুল্য, বাউল যেহেতু বেদ অথবা কোরাণ-নির্ভর নয়, দেহভাণ্ডই তার আত্মোপলব্ধির বাগান অথবা সোপান তাই বাউলদের বেদ বা কোরাণের ন্যায় কোনো ধর্মগ্রন্থও নেই। তা মৌখিকভাবে রচিত ও মুখে মুখেই তা শতাব্দীব্যাপী প্রচার লাভ করেছে। প্রবহমানতাই বাউলের প্রাণশক্তি এবং তা একপেশে আঞ্চলিকতার প্রভাব থেকেও মুক্ত। প্রবহমানতার ধর্ম কখনোই কোনো কিছুতে জীর্ণতা অথবা স্থবিরত্ব আনে না। নতুন যুগের আবহে তা নতুন উপকরণ সংগ্রহ করে ও নিজের শক্তিতেই আত্মরক্ষা করে চলে। বাউলের স্বভাবধর্মও অনেকটা তাই। প্রাবন্ধিক অপূর্ব কর বলেন—

> লালনের তিরোধানের (১৮৯০) প্রায় চার বছর পর ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার মৈত্র 'ভারতী' পত্রিকায় লিখেছিলেন, লালনকে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে তিনি স্বপ্রণীত গানেই তার উত্তর দিতেন। লালনের জীবনকথার প্রথম লেখক রাইচরণ দাশ বা বসন্ত রঞ্জন পাল সম্পাদিত ১৮৯০-এ 'হিতকরী' পত্রিকাতেও লেখা একই কথা।[৮]

বাউল তার উদার সাঙ্গীতিক সুরের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের চরণ স্পর্শ করতে চায়। সুর আর কথার বিন্যাসে মনেরমানুষের কাছে সাজায় তার হৃদয়ের নৈবেদ্য। রবীন্দ্রগানেও এমনটি দেখতে পাই। কবি বলেন—

দাঁড়িয়ে আছো তুমি আমার গানের ওপারে।
আমার সুরগুলি পায় চরণ, আমি পাইনে তোমারে।

আধুনিক গীতিকবিতার মতই প্রচ্ছন্ন এক সুরেলা মিলও যেন ফুটে ওঠে বাউল গানের কোনো কোনো কথায়। যেমন লালন বলেন—

যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র যারে
পায় না যোগ ধ্যান ক'রে
সেই কৃষ্ণ গোপীর দ্বারে রয়েছে কেনা।

এরই সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া যায় গীতিকবি বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল' কাব্যের সেই লাইন কটি যেখানে কবি বলেন—

কিরণ-মণ্ডলে বসি
জ্যোতির্ময়ী সুরূপসী
যোগীর ধ্যানের ধন ললাটিকা মেয়ে
নামিলেন ধীর ধীর,
দাঁড়ালেন হয়ে স্থির
মুগ্ধ নেত্রে বাল্মীকির মুখ পানে চেয়ে।

বাউলের সবচেয়ে অবিনাশী শক্তি বলে যা আমার মনে হয় তা হলো, এর আবহমানকালব্যাপী ব্যাপ্তির শক্তি। উৎসে মৌখিক হলেও আজ তা লোকমান্য সাহিত্য তথা লোক সংগীতের অন্যতম মুখ্য ধারা। গ্রামীণ অনুশীলনে সিদ্ধ হলেও লোকসংগীতের এ ধারা আজ যেমন লেখ্য সাহিত্যে তার স্বীকৃতি ও প্রাসঙ্গিকতা আদায় করে নিতে সক্ষম হয়েছে তেমনি অনুশীলনের

ব্যাপ্তিতেও তা আজ নাগরিক সমাজের বুকে এক ঐতিহ্যশালী ও সক্রিয়সংগীত মাধ্যম হয়ে উঠেছে। কিন্তু শুধুমাত্রই সাহিত্য অথবা সংস্কৃতিধর্মীতা নয়, বরং ধর্মসংগীতের বিষয়বস্তু হওয়ায় বাউল ভারতীয় জীবনদর্শনেরও অঙ্গ। জীবনাশ্রয়ী লোকসংগীত এবং তত্ত্বাশ্রয়ী ধর্মসংগীত এই দু'ধরনের স্বভাব লক্ষণই বাউলের মধ্যে বিদ্যমান। চৈতন্য-যুগ ও চৈতন্য-পরবর্তী যুগে রচিত পদাবলী সাহিত্যের ধারাতেও এমনই লৌকিক ও শাস্ত্রীয় ধর্মের সমন্বয়ীভাবনার সম্মিলনকে বিকশিত হতে দেখা যায়। বাউল সাধনার আর এক উল্লেখযোগ্য দিক হলো এর বৈরাগ্যের দিকটি। প্রসঙ্গত বলা যায়, লোকসংগীতের অন্যান্য ধারাতেও বৈরাগ্যের এ লক্ষণটিকে খুঁজে পাওয়া যায়। এ বঙ্গের বীরভূম, পুরুলিয়া, উত্তর-পশ্চিম মেদিনীপুর ও পূর্ববঙ্গের (অধুনা বাংলাদেশ) রাজশাহী ও পাবনা জেলাতে প্রচলিত ঢুয়া বা ধুয়া গানের মধ্যেও বৈরাগ্য আছে তবে তা ভাবের দিক দিয়ে বাউলের থেকে অনেকটাই আলাদা। বাউলসাধক লালন যখন সহজ মনের ধর্মে বৈষ্ণব কবিদের ন্যায় বলে ওঠেন—

যে ভাব গোপীর ভাবনা
সামান্যের কাজ নয় সে ভাব জানা॥
বৈরাগ্য ভাব বেদের বিধি
গোপীকা ভাব প্রেমের নিধি।
ডুবে থাকে তাহে নিরবধি রসিক জনা॥

তখন মনে হয় বাউলের কাছে প্রেম ও বৈরাগ্য উভয়ে একে অপরের বিপরীত, যেখানে প্রেমই গণ্য, বৈরাগ্য পরিত্যজ্য। কিন্তু সেই বাউল সাধকই যখন গেয়ে ওঠেন—

পিরীতের মানুষ যারা, আউলা-বাউলা হয় রে তারা।
হাসন রাজায় পিরীত কইরা, হইয়াছে বুদ্ধিহারা।

—হাসন রাজা

তখন বাউলের বৈরাগ্য-ভাবাশ্রিত মনটিকে সম্পূর্ণভাবেই সর্বপ্রকার সংসার-বাসনা মুক্ত বলেই মনে হয়। প্রথম জীবনে জমিদারি ও ভোগবিলাসে মত্ত থাকলেও হাসন রাজা শেষ দিকে সংসার-বৈরাগ্য অনুভব করেন। ফলে এই সময়ে রচিত তাঁর গানে বাউলের বৈরাগী ভাবটি তীব্রভাবে ফুটে উঠেছে। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণও সহজযানে বলেছেন—

> বাপু হে, সবই তো শূন্য—সংসারও শূন্য, নির্বাণও শূন্য— তবে যে আমি আমি বলিয়া বেড়াই, এটা কেবল ধোকা মাত্র।[৯]

সংসার জালের অন্ধকুহকী মায়ায় জর্জরিত শাক্তসাধক কবি রামপ্রসাদ যখন বলেন— 'এ সংসার ধোঁকার টাটি' তখন মনে হয় শাক্তগানও যেন সংসারচক্র ছেড়ে বৈরাগ্যের পথে চালিত। কিন্তু গভীরভাবে লক্ষ করলে বোঝা যায় শাক্তগানে সংসার ত্যাগের, বাসনা নয় বরং সংসার-সমুদ্রের মাঝে দাঁড়িয়ে সকল দুঃখজয়ের সাধনাই প্রধান হয়ে উঠেছে। পরম করুণাময়ী জগজ্জননীর কোলে আশ্রয় নেবার আকূতি নিয়ে শাক্তকবি জোর গলায় বলতে পেরেছেন—

সংসার আনিয়ে মা গো করলে আমায় লোহা পেটা

আমি তবু কালী বলে ডাকি, শাবাশ আমার বুকে পাটা!

কখনও সাধক কবি রামপ্রসাদ বলেন—

আমি কি দুঃখেরে ডরাই।
ভবে দেও দুঃখ মা, আর কত চাই॥
আগে পাছে দুঃখ চলে মা, যদি কোনখানেতে যাই।
তখন দুঃখের বোঝা মাথায় নিয়ে দুঃখ দিয়ে মা বাজার মিলাই॥

অন্যদিকে কোনো হাহাকার কিংবা আত্মগ্লানি ধারণ করে নয়, এক মহাপ্রেমের আকর্ষণে বাউলসাধক অনন্তের পথিক, ঘরছাড়া। মনের মানুষের খোঁজে পথের মানুষের ভিড়েই সে চিরকাল খুঁজে বেড়ায় তার চিরন্তন ঘরের আশ্রয়—তাই সে চিরপ্রেমিক, চিরবৈরাগী। সংসারজীবনে সুজন ও কুজন হল সেই দু'জন যারা বসত করে মানুষের মনে। শাক্ত ও বাউল দুই পদকর্তাদের পদেই এই সুজন-কুজনের পরিচয় পাওয়া যায়। লৌকিক পদকারও বলেন—'তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা, মন জান না।' সুজন হলো রসিক ও প্রেমিক। কুজন দেয় দুঃখ, কষ্ট, শোক-তাপ। ভববন্ধন-খণ্ডনে মাতৃভক্তিপরায়ণ ভক্তের ন্যায় আপন হৃদয়-দ্বার উন্মুক্ত করে শাক্তকবি মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহাতব বলতে পারেন—

নদী ও সময়, সমান উভয়,
ধীরে ধীরে বয়, লয়ে সমুদয়।
সচেষ্ট সুজন লভয়ে রতন,
জড় অভাজন, দুঃখভাগী হয়॥

আর কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত সর্বত্যাগী রসিক সুজনের মতোই যেন লালন বলতে পারেন—

যে জন গোপী অনুগত
জেনেছে সেই নিগূঢ় তত্ত্ব
লালন কয় রসিক মত্ত
পেয়ে সেই রসের ঠিকানা।

বৈরাগ্যের সুর হয় উদাত্ত। বাউলের উদারতার এই গুণ আবার পূর্ববঙ্গীয় ভাটিয়ালির সুরের সঙ্গে সঙ্গাতিপূর্ণ। প্রচলিত ভাটিয়ালি লোকসংগীতটি পূর্ববঙ্গের (অধুনা বাংলাদেশ) নদীপথে ভাঁটার টানে ক্লান্ত-মন্থর গতিতে দাঁড় টানা মাঝিমল্লাদের গান। কালক্রমে ভাটিয়ালি গানের বিষয়বস্তু আর সুরেও বাউলের তত্ত্বকথা এবং বৈষ্ণবীয় সহজিয়া ভাবনার মিলন ঘটেছে। যেমন—

আমার কালপাখী যায় গো উড়ে
ভালোবাসার শিকল ছিঁড়ে
আহা কি করবো গো প্রাণসখী,
শূন্য পিঞ্জর যত্ন করে।

—ভাটিয়ারি, দ্বিজ মৃণাল, শ্রীহট্ট

এ সুর বাউলের ন্যায়। কালক্রমে ভাটিয়ালিতে মুর্শীদ্যা ও মারফতির তত্ত্বকথা প্রবেশ করেছে। মানব জীবনের দুঃখ-বেদনার অভিব্যক্তিগুলিও সেই সঙ্গে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আবার দুঃখ-বেদনার অভিব্যক্তিগুলির প্রকাশে বাউল ও শাক্তগানের মধ্যে এক আশ্চর্য মিল খুঁজে পাওয়া

যায়। জীবনের আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুঃখ এবং আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব বাউলের এক অন্যতম লক্ষণ। তা বাংলার শাক্তপদ এবং টপ্পাগানেরও এক বিশেষ লক্ষণ। শাক্ত কবি রামপ্রসাদ লেখেন—

মা তোমারে বারে বারে জানাব আর দুঃখ কত
ভাসিতেছি দিবানিশি দুঃখ-নীরে স্রোতের শ্যাওলার মতো।

কিংবা শাক্তকবি মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহাতবের পদে দেখি—

সকলই তো গেছে যাতনা রয়েছে।
মনোসাধ মম, সব মিটে গেছে॥
পুত্র পরিবা, পিতা মাতা আর,
সকলই তো গেছে আছে, হাহাকার,
সুখ গেছে চলে, আছে তার স্থলে,
দুঃখের অনল, সতত জ্বলিছে॥'

আর ত্রিতাপ জ্বালায় কাতর বাউল ফকির নাসিরুদ্দিন ঈশ্বরকে উদ্দেশ্য করে সকাতরভাবে বলে ওঠেন—

তুমি দয়া কর দয়াময়
দীনহীনে ডাকে যে তোমায়
তোমার আশায় চিরদিন এ যৌবন বয়ে যায়
দিনে দিনে ফুরাল দিন,
আমার ভাবতে ভাবতে
তনু যে ক্ষীণ
আমায় কী ভাবেতে ভেবেছে ভিন,
আমি কী তোর কেহ নয় কত সহে জীবনে,
আমি পুড়ে মলাম আশকৎ আগুনে
দেবা পার কতদিনে—দীনহীন নসরে কয়।

এর সঙ্গে আর এক লৌকিক পদকার কাঙাল হরিনাথ মজুমদারের

হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হলো
পার করো আমারে

পদটিকেও মেলানো যায়। তবে বাউলগানের 'মনের মানুষ'-এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী। এই সর্বব্যাপীতার কারণেই বোধ হয় বাউলের প্রভাবে তা টপ্পাগানেও এসেছে। টপ্পাগানেও মানুষীমনের অনুসন্ধানী কথক বলেন—

'বাঁধা যার কাছে মন,—/সেই মোর প্রিয়জন, সে জনে দরশনে, সদা প্রয়োজন।' (টপ্পা, শ্রীধর কথক)। তবে জীবনের ধোঁকা নয়, আনন্দই হলো শেষ কথা। বাউলের আদিসূত্র সহজযানেও সিদ্ধাচার্যগণ বলেন—

এই ধোকার পশরা নামাইয়া ফেলো। তখন দেখিবে কিছুই কিছু নয়। সুতরাং আনন্দ করো। আনন্দই শেষ থাকিবে। আদিতেও আনন্দ, মধ্যেও আনন্দ, শেষেও আনন্দ।[১০]

তাই সহজযানেও বলা হয় যে, দুঃখ উপস্থিত হলে মন স্থির থাকবে না, আর মন স্থির না থাকলেও সিদ্ধিলাভ হবে না। আত্মার সঙ্গে আত্মার মিলনাকাঙ্ক্ষী ফকির দয়াল সাঁইও

বলেন—

একবার আয় দেখিরে, তোমায় নয়ন ভরে দেখি
তোমার মতন ভক্ত পেলে, আমি হৃদমন্দিরে রাখি।
আমি নিজ শক্তি তোমায় দিয়ে
থাকব তোমার অধীন হয়ে
আত্মা আত্মায় মিশায়ে হব আমি সুখী।

বাংলার আর এক প্রচলিত লোকসংগীত 'তর্‌জা'র (কবিগানের তৃতীয় পর্যায়ের অন্যতম অংশ) কোনো কোনো হেঁয়ালিতেও চাপান্‌-উতোর (অর্থাৎ প্রশ্নোতর)-এর ভঙ্গিমায় বাউল প্রসঙ্গ এসেছে। যেমন 'শ্রীচৈতন্যচরিত' কাব্যের একটি প্রাচীন তর্‌জায় উল্লেখ আছে—

বাউলকে কহিও লোক হইল আউল।
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল॥
বাউলকে কহিও কাজে না'হিক আউল।
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল॥[১১]

পদটি প্রমাণ করে ষোড়শ শতাব্দীর প্রণিধানযোগ্য বাংলা সাহিত্যেও বাউল প্রসঙ্গ কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

বাউলগানের বিষয়বস্তুতে রাধা-শ্যামের প্রণয়লীলা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে লীলার পথ-প্রদর্শক ও প্রত্যক্ষ-সহচর রূপে লীলাকীর্তনকারী গায়কেরও পরিচয় মেলে। সাধনমার্গের তত্ত্বগুলিও সেইসঙ্গে রূপক ও সংগীতের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। গঠন-ভঙ্গিমার দিক থেকে এটি চর্যাপদ ও বৈষ্ণবপদাবলীর সমধর্মী। বাউলসাধক ও ভক্ত কবিগণ বৈষ্ণবপদাবলীকারদের ন্যায় প্রধানত দাস্যভাবে ভাবিত হয়ে পরমলীলাময় প্রেমাস্পদের কাছে নিজেকে উজাড় করে দিতে চান। এ প্রসঙ্গে একটি গানের কথা বলা যায়। 'আজ পাশা খেলব রে শ্যাম' গানটির উৎপত্তি হয় ঊনবিংশ-শতাব্দীর সিলেটে, সেখান থেকে সেটি ক্রমশ ধর্মীয় ও ভৌগোলিক সীমা পেরিয়ে পূর্ববাংলার বুকে আজ একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় গানে পরিণত হয়েছে। অন্যান্য বৈষ্ণব বাউলসংগীতের মতো রাধারমণ দত্ত পুরকায়স্থের লেখা গানটিও মানুষের মনে ঈশ্বরকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাটুকুকে খেলার ছলে ব্যক্ত করে লেখা। গানটির পংক্তিগুলো আপাত দৃষ্টিতে সহজ ও গ্রাম্য মনে হতে পারে। কিন্তু ভেবে দেখলে দেখা যায় কী গভীর অর্থ এতে লুকিয়ে আছে। সাধক রাধারমণ দত্ত বলেন—

ও শ্যাম রে তোমার সনে
একেলা পাইয়াছি রে শ্যাম
এই নিঠুর বনে
আজ পাশা খেলবো রে শ্যাম
একেলা পাইয়াছি হেতা পলাইয়া যাবে কোথায়॥
চৌদিকে ঘিরিয়ারে রাখবো॥
সব সখি সনে
আজ পাশা খেলবো রে শ্যাম।

'পাশা' খেলার এই সহজ তাৎপর্যে সখারূপে ঈশ্বরকে হয়তো আমরা বাঁধতে পারি, কিন্তু

পাশাখেলায় জিতে তাঁকে সত্যিই পাওয়া কি তাঁরই ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল নয়? লৌকিক পদাবলীতেও পাওয়া যায়—

আমি ঠেকলাম রূপের ফান্দে-
গো সই, শ্যাম চান্দেরে।
মদনেরি পঞ্চবাণে পঞ্চশর বিন্দে,
ধইরয় না মানে চিত্তে যার লাগি কান্দে,
গো সই শ্যাম চান্দেরে॥ (ঢাকা)

এ পদেও বাউলের সঙ্গো সঙ্গো বৈষ্ণব পদের ভাবসূত্র চোখে পড়ে রাধা-কৃষ্ণের মিলনাকাঙ্ক্ষার সেই আর্তি, যেখানে ভক্ত ও ভগবানের মিলনাকাঙ্ক্ষাটিই হল মূল কথা। বৈষ্ণব পদাবলীর মতোই দাসরূপী ভক্তহৃদয়ের আবদার, গোহারী ও মিনতি চমৎকারভাবে ধরা পড়ে নাসিরুদ্দিনের একটি ফকিরি পদে যেখানে নাসের বলেন—

তুমি ভক্ত হতে প্রকাশিত, ভক্ত না থাকিলে কে ডাকিত
তুমি মনিব আমি যে দাস, আমা হতে তোমার নাম প্রকাশ।

ভক্তের প্রার্থনার ভঙ্গিমাটিও এখানে চোখে পড়ে বৈষ্ণবীয় প্রার্থনা-বিষয়ক পদের মতোই। এ প্রসঙ্গো মনের মানুষের সঙ্গো মিলিত হওয়ার গভীর আকাঙ্ক্ষা নিয়ে লালন ফকিরের একটি জনপ্রিয় গানের কথাও বলা যায়, যেখানে লালন বলেন—

মিলন হবে কত দিনে
আমার মনের মানুষের ও সনে॥
চাতক প্রায় অহর্নিশি
চেয়ে আছে কালো শশী
হবো বলে চরণ দাসী
ও তা হয় না কপাল গুণে।।
মেঘের বিদ্যুৎ মেঘে যেমন
লুকালে না পাই অন্বেষণ
কালারে হারায়ে তেমন
ঐ রূপ হেরিয়ে দর্পণে॥
যখন ও রূপ স্মরণ হয়
থাকে না লোক লজ্জার ও ভয়
লালন ফকির ভেবে বলে সদাই
প্রেম যে করে সে জানে।

গানটি লালন খুব সম্ভবত লিখেছিলেন প্রতিটি মানুষের অন্তঃস্থলে সেই রাধাকে দেখতে পেয়ে, যে তার চিরকালের প্রেমিক কৃষ্ণের জন্য আকুল হয়ে অপেক্ষা করে থাকে। আরাধ্যজনের প্রতি গভীর প্রেম ও ভক্তি নিয়ে লেখা এই গানটি। গানটি পরবর্তীতে Dr. Carol Salomon ইংরাজিতে অনুবাদ করেন। লালনের সমসাময়িক দ্বিজভূষণ রচিত আর একটি জনপ্রিয় বাউল গানেও বৈষ্ণব পদাবলীর লক্ষণীয়। গানটি হলো—

ভুবনো মোহনো গোরা, কোন মণিজনার মনোহরা

ওরে রাধার প্রেমে মাতোয়ারা চাঁদ গৌড়
ধূলায় যাই ভাই গড়াগড়ি
যেতে চাইলে যেতে দেবো না।
তোমায় হৃদয় মাঝে রাখিবো ছেড়ে দেবো না।
তোমায় হৃদ মাঝারে রাখিবো ছেড়ে দেবো না।
যাবো ব্রজের কুলে কুলে
আমরা মাখবো পায়ে রাঙ্গাধুলি
ওরো নয়নেতে নয়ন দিয়ে রাখবো তারে
চলে গেলে যেতে দেবো না
তোমায় হৃদ মাঝারে রাখিবো ছেড়ে দেবো না
তোমায় বক্ষ মাঝে রাখিবো ছেড়ে দেবো না

বাউল পদকর্তাদের সঙ্গে বৈষ্ণব রসসাহিত্যের সম্পর্ক যে নিগূঢ় ছিল তারও প্রমাণ মেলে অন্য আর একটি ঐতিহাসিক সূত্রেও। প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে যশোহর জেলার বাড়খাদিয়া গ্রামের মধুসূদন কিন্নর রাধামোহন বাউলের কাছে ঢপ্‌কীর্তন শিক্ষা করেন।[১২]

সাধনমার্গের পথে বৈচিত্র্যের মধ্যে একাত্মতা, তাত্ত্বিক পার্থক্যের মাঝেও একতা ও সমন্বয় সাধনই চিরকালীন স্বভাবধর্ম। সে কারণে হিন্দু বাউলের কণ্ঠে নবীর প্রেম ও ইসলামি জীবনদর্শন যেমন স্বাভাবিক তেমনটি মুসলিম ফকিরও হিন্দু-জীবনদর্শন ও রাধাকৃষ্ণ লীলাতত্ত্বকে আপন করে নেন কিংবা চৈতন্য বিষয়ক পদ নিয়ে সংগীত রচনা করেন। একই দেহের মাঝে ভগবান কিংবা আল্লার বসতি বাউল সাধনায় ধর্মের একলীনতাকে স্পষ্ট করে। ঈশ্বরের ক্রিয়ার রহস্যকে বুঝতে গিয়ে মানুষের অসহায়তার কথা তুলে ধরতে বাউল সম্রাট লালন সাঁই বলেন—

কে বোঝে মওলার আলেকবাজি।
করছে রে কোরাণের মানে
যা আসে যার মনের বুঝি॥
একই কোরাণ পড়াশুনা
কেউ মৌলবি কেউ মওলানা
দাহেরা হয় কত জনা
সে মানে না শরার কাজি॥

কিংবা লালনের পদেঃ

সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে
লালন ভাবে জাতের কীরূপ দেখলেম না এই নজরে।

আবার ফকির সাঁই বলেঃ

যখন গড়েছিল আদম, এক চিজ রেখেছে কম—এই ভালোবাসার কাম।
আর, জপতপ, ভজন সাধন, সে ধন বিনে সব অকারণ
আবার যদিও শুনি আলিফে লাম লুকায় যেমন, এই মানুষে সাঁই
আছে তেমন
জাতে আর সিফাতে খোদা, মিশে সদাই
এবং কুলুবেন মোমিন আরশ আল্লাতালা

কোরানেতে আছে খোলা
যেদিকে ফিরাই আঁখি, সেইদিকে তোমারে দেখি
যেখানে ফুল সেখানে বাস, থাকে মিশামিশি,
তবে কেন দেও না দেখা বলো, করি কী উপায়
সাঁই-এর আজব লীলা আমার বুঝার সাধ্য নাই।
আহাদে আমহদ হল মোহাম্মদে লুকাইল
আদমরূপে প্রকাশ হল, তিনে হল এক বরণ।

হিন্দু-মুসলমানের অভেদ বোঝাতে ফুলবাস উদ্দীন তাঁর ফকিরি গানে বলেন—

জাতী বিজাতি যে বাছে
তার চেয়ে আর বোকা কে আছে?
আর ব্রহ্মাণ্ডময় একই খোদা
এই মানুষ ছাড়া নয়কো জুদা
এক চিজেতে সবাই পয়দা,
ধাঁধায় পড়ে ঘুরতেছে।
বামুন কায়েত হাড় মুচি
একই জলে হলেন শুচি
সেখানে নাই বাছাবাছি
সকলে শুচি হচ্ছে।
আর চন্দ্র সূর্য নক্ষত্রগণ
এই মাটির উপরে সবারি আসন
এক মনিবের সব প্রজাগণ
ফুলবাস উদ্দীন ভাবতেছে।

আবার নাসিরের একটি পদে দেখিঃ

আমি দুগ্ধ, তুমি মাখন, আমি পাথর, তুমি আগুন
আমি ফুল, তুমি ঘ্রাণ—রাখছি জাত সিফাতে
চাঁদের চাঁদনি যেমন, সূর্যের মধ্যে ধূপের কিরণ।
আবের মধ্যে বিজলি গোপন, এইরূপে রয় জাত সিফাতে
জাত সিফাত সিফাতে জাত, আমি তুমি নয়কো তফাত
তুমি আছ নসরের সাথ, খেতে শুতে পথে যেতে।

পদটিতে এক সুমধুর কবিত্বের মধ্যে দিয়ে অভেদ তত্ত্বের সহজ কথাটি সুন্দরভাবে পরিবেশিত হয়েছে। আউল-বাউল সাহিত্যে এমন পদের সংখ্যা অসংখ্য। তুলনামূলকভাবে বাংলায় বৈষ্ণব বাউল শাখার সংখ্যা মুসলিম ফকির শাখার থেকে বেশি হলেও ধর্মগত বা আচারগতভাবে তা কখনও বাউল সংগীতকে সংকীর্ণ করতে পারেনি।

উৎসের সন্ধানে

১. সত্যজিৎ চৌধুরী সম্পাদনা : 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ', তৃতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্যদ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০০১
২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সঞ্চয়, 'রবীন্দ্র রচনাবলী, বৈদ্যুতিন সংস্করণ, ভাষাপ্রযুক্তি গবেষণা পরিষদ পরিবেশিত

৩. ড. গৌরী ভট্টাচার্য : 'বাংলার লোক সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গ', রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, মার্চ, ১৯৮৯
৪. ড. পি. জি. বক্সী : 'লোকশিক্ষার আলোয় শ্রীরামকৃষ্ণ', পুনশ্চ, আগস্ট ২০০৯
৫. আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'লোক সংগীত রত্নাকর', পশ্চিমবঙ্গ লোক সংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, কলকাতা, ১৯৬৬
৬. শশিভূষণ দাশগুপ্ত :'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ' দর্শনে ও সাহিত্যে, মুখার্জি অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৭০
৭. সুধীর চক্রবর্তী, 'ব্রাত্য লোকায়ত লালন', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ডিসেম্বর ১৯৯২
৮. শক্তিনাথ ঝা : 'লালন সাঁই'-এর গান, কবিতা প্রকাশ, কলকাতা, ২০০৫
৯. সুধীর চক্রবর্তী : 'গভীর নির্জন পথে', আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা, জুলাই ১৯৮৯
১০. প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায় : সম্পাদিত : 'ক্লেদজ কুসুম', বইমেলা, ১৪২২, ফেব্রুয়ারি, ২০১৬
১১. ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী : শাক্ত পদাবলী : সাধনতত্ত্ব ও রসবিশ্লেষণ', এস ব্যানার্জি অ্যাণ্ড কোং ও বামা পুস্তকালয়, কলকাতা, ১৯৮৮
১২. অমরেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত : 'শাক্তপদাবলী (চয়ন)', একাদশ সংস্করণ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ২০০২

তথ্যের সন্ধানে

১. অমরেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত : 'শাক্তপদাবলী (চয়ন)', একাদশ সংস্করণ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ২০০২
২. আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'লোক সংগীত রত্নাকর', পশ্চিমবঙ্গ লোক সংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, কলকাতা, ১৯৬৬
৩. ড. গৌরী ভট্টাচার্য : 'বাংলার লোক সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গ', রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, মার্চ, ১৯৮৯
৪. ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী : শাক্ত পদাবলী : সাধনতত্ত্ব ও রসবিশ্লেষণ', এস ব্যানার্জি অ্যাণ্ড কোং ও বামা পুস্তকালয়, কলকাতা, ১৯৮৮
৫. ড. পি. জি. বক্সী : 'লোকশিক্ষার আলোয় শ্রীরামকৃষ্ণ', পুনশ্চ, আগস্ট ২০০৯
৬. প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায় : সম্পাদিত : 'ক্লেদজ কুসুম', বইমেলা, ১৪২২, ফেব্রুয়ারি, ২০১৬
৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সঞ্চয়, 'রবীন্দ্র রচনাবলী, বৈদ্যুতিন সংস্করণ, ভাষাপ্রযুক্তি গবেষণা পরিষদ পরিবেশিত
৮. শক্তিনাথ ঝা : 'লালন সাঁই'-এর গান, কবিতা প্রকাশ, কলকাতা, ২০০৫
৯. শশিভূষণ দাশগুপ্ত :'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ' দর্শনে ও সাহিত্যে, মুখার্জি অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৭০
১০. সত্যজিৎ চৌধুরী সম্পাদনা : 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ', তৃতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্যদ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০০১
১১. সুধীর চক্রবর্তী, 'ব্রাত্য লোকায়ত লালন', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ডিসেম্বর ১৯৯২
১২. সুধীর চক্রবর্তী : 'গভীর নির্জন পথে', আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা, জুলাই ১৯৮৯

লালনের গান : মানুষ হওয়ার সাধনা

ড. সুব্রত পুরকাইত

'বাতুল' বা 'ব্যাকুল' শব্দ থেকে 'বাউল' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। যার অর্থ—ঈশ্বর প্রেমে যারা পাগল। আবার 'আউল' বা 'বাউর' শব্দ থেকেও 'বাউল' শব্দটির উদ্ভব হতে পারে বলে অনেকে মত পোষণ করেন। 'আউল' একটি আরবি শব্দ। যার অর্থ—যারা ঈশ্বরের একান্ত সেবক। 'বাউর' একটি হিন্দি শব্দ। যার অর্থ—বায়ু রোগগ্রস্ত। অর্থ—বায়ু রোগগ্রস্ত। অর্থাৎ বাতুল, ব্যাকুল, আউল, বাউর এবং বাউল শব্দগুলি দ্বারা ঈশ্বর প্রেমিক, স্বাধীন চিত্ত, নেশাভানকারী, সংসার সম্পর্কে উদাসীন মানুষ বা একদল মানুষকে বোঝানো হয়। যারা সপ্তদশ বা অষ্টাদশ শতাব্দীতে নিজেদের বাউল নামে প্রতিষ্ঠিত করে। 'বাউল' শব্দের প্রয়োগ 'চৈতন্যচরিতামৃত' কাব্যে লক্ষ্য করা যায়।

কহিবারে যোগ্য নয়, তথাপি বাউলে কয়
কহিলে বা কেবা পাতিয়ায়?

কিংবা

আমি তো বাউল আন্ কহিতে আন্ কহি।
কৃষ্ণের মাধুর্য স্রোতে আমি যাই বহি।।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ এখানে 'বাউল' শব্দটিতে মূলত—ঈশ্বর প্রেমে মাতাল, বাস্তব জ্ঞান বর্জিত, উদাসীন ভক্ত—এরূপ অর্থে ব্যবহার করেছেন। অদ্বৈত মহাপ্রভু শান্তিপুর থেকে পুরীধামে চৈতন্যদেবকে যে আর্যা পাঠিয়েছিলেন তাতে তিনি মহাপ্রভুকে 'বাউল' আখ্যা দিয়েছিলেন। মহাপ্রভুও চৈতন্যচরিতামৃতে ঈশ্বর ভক্ত অর্থে 'বাউল' শব্দ একাধিক বার ব্যবহার করেছেন। বাইরের দিক থেকে আচার আচরণ, ধর্ম-কর্ম ইত্যাদি অসঙ্গতিপূর্ণ ও রহস্যময় হলেও মনের গভীরে যাঁরা যথার্থ রূপে ঈশ্বর প্রেমে মাতাল হয়ে থাকেন তাঁরাই বাইরের লোকের চোখে বাতুল বা বাউল নামে পরিচিত।[১]

'বাউল' মতবাদের উদ্ভবকাল সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে নানান মতভেদ গড়ে উঠেছে। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মনে করেন আনুমানিক ১৬২৫ খ্রি. থেকে ১৬৭৫ খ্রি. এর মধ্যে বাংলায় বাউলধর্ম পূর্ণরূপে আবির্ভূত হয়েছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের মতে ১৪শ শতাব্দীর শেষভাগে কিংবা ১৫শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এর আবির্ভাব হয়। অন্যদিকে আহমদ শরীফ মনে করেন—মোটামুটিভাবে সতেরো শতকের দ্বিতীয় পাদ থেকেই বাউল মতের উন্মেষ ঘটেছে। এই সব মতের বাইরে আবার কেউ কেউ অনুমান করেন চৈতন্যদেবের (১৪৮৪-১৫৩৩) মৃত্যুর পর থেকেই বাউল ধর্ম তার নিজের

রূপ পরিগ্রহ করে। উপরোক্ত মতামতগুলির প্রতি সম্মান জানিয়ে আমরা বলতে পারি উনিশ শতকে লালন ফকির (১৭৭৪-১৮৯০) এর সাধনা ও সৃষ্টির মাধ্যমেই এই ঘরানার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে।[২] উদ্ভবের সময় থেকে বা উদ্ভবের পরবর্তী সময়ে লিখিত উল্লেখযোগ্য বাউল গানের পরিচয় তেমন একটা পাওয়া যায় না। তাই লালন ফকিরের সময়কালকে সকলেই প্রায় মেনে নিয়েছেন।

॥ ২ ॥

লালন তাঁর সাধনা, অতুলনীয় সংগীত প্রীতি এবং অর্জিত তত্ত্বজ্ঞানের সমন্বয়ে বাউলগানের একটি স্বতন্ত্র ঘরানা নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। যে গানের মধ্যে দিয়ে তিনি বাউলের প্রকৃত ধর্ম, তত্ত্ব, দর্শন, সাধনার পরিচয় দিয়েছেন। যদিও এই পরিচয় তিনি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আভাসে-ইঙ্গিতে দিয়েছেন। যে কারণে রহস্যবাদীরা লালনকে নিজেদের দলভুক্ত করতে চান।

রহস্যবাদের সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা পাওয়া যায় না। তবে রহস্যবাদের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে এর প্রকৃত রূপ আমরা অনুভব করতে পারি। এখানে রহস্যবাদের (জেমস্ প্রদত্ত) বেশ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হল—

ক. এটি প্রত্যক্ষ অনুভব, কিন্তু বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়। অন্যকে এর অনুভব করানো যায় না।

খ. এটি বুদ্ধি ও বিশ্লেষণের অতীত। এ অনুভব জ্ঞান নয় বোধি।

গ. সুতীব্র অনুভূতিটি স্বল্পস্থায়ী। এর স্মৃতি থাকে অস্পষ্টভাবে।

ঘ. রহস্যবাদীর নিজস্ব উদ্যোগ এবং ইচ্ছার অভাব থাকে। এ পন্থায় রহস্যবাদীর কর্তৃত্ব স্বীকার করা হয়। বিশ্বাসী ছাড়া কাউকে দলভুক্ত করা হয় না। এরা যুক্তিবাদী দর্শন অগ্রাহ্য করে।[৩]

বাউলদের জীবন সাধনার সঙ্গে উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির মিল লক্ষ করা যায়। বাউলদের সাধনা সাধারণ লোকচক্ষুর অন্তরালে সম্পাদিত হয়। এরা নিজস্ব গোষ্ঠী ছাড়া অন্যের সঙ্গে এসব তত্ত্ব বিষয়ক আলোচনা করতে চায় না। ফলে বাউলের সাধনতত্ত্ব সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না। তবে রহস্যবাদীদের সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে মিল থাকলেও বাউলদের রহস্যবাদী বলা যায় না। এর প্রধান কারণ হল এদের সাধনা দেহকেন্দ্রিক। এদের সাধনার অন্যতম সঙ্গী হল নারী। নারী-পুরুষের মিলিত দেহসাধনা হওয়ার কারণে এই সাধনা অন্যের দৃষ্টিতে অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট। বাউলরা নিজের চোখে দেখে এবং নিজে ক'রে তবে বিশ্বাস করে। ফলে বাউলেদের ধ্যান-ধারণার সঙ্গে বস্তুবাদের সংযোগ লক্ষ করা যায় এবং এই সূত্রে ভাববাদীদের সঙ্গে বিরোধ নজরে পড়ে।

ভারতীয় ভাববাদ ঈশ্বর কেন্দ্রিক। ঈশ্বর সর্বস্ব এই মতবাদে ইহ, দেহ, কামিনী, জাত-ধর্ম-প্রথা লঙ্ঘন ইত্যাদি বিষয় ছিল ঘোর অপরাধের। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য (বুদ্ধি, শক্তি ও অর্থের অধিকারী) প্রধান দেশে ভাববাদ যেমন ছিল প্রবল প্রতাপশালী তেমনি রাষ্ট্রীয় সমর্থনে তা হয়ে ওঠে বলশালী। সে তার অপার ক্ষমতাবলে লিখিত শাস্ত্রগুলিকে কাল্পনিক তথ্যে ভারাক্রান্ত করে ফেলে। ফলে বস্তুবাদের প্রতিবাদী ঐতিহ্যসমূহকে সে আক্রমণ করে নিজের দাম্ভিকতায়। ভাববাদের এই আগ্রাসী মনোভাবের সামনে শুধু লালন কেন, সেই সময়ের অন্য যে কোনো প্রতিবাদী মতবাদের টিকে থাকা সম্ভব ছিল না। লালন তাই এক সমান্তরাল জ্ঞানের পথনির্দেশ করলেন। যা ছিল মৌখিক পরম্পরায় গুপ্তভাবে রক্ষিত এবং গুরু পরম্পরায় বাহিত, পরীক্ষিত সত্যের অপার এক জ্ঞানভাণ্ডার।

ভাববাদের সঙ্গে সংঘর্ষে না গিয়ে এই বস্তুবাদী তথা ইহ-দেহবাদী মতবাদ তার নিজস্ব জীবনচর্যা অত্যন্ত গোপনে রক্ষা করে চলত। এই প্রসঙ্গে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের কথা স্মরণ করে বলা যায়—

> আচার বিচারের প্রহরী-ঘেরা বর্ণহিন্দুর সমাজের অচলায়তনে মুক্তমতি বাউলদের বাসা বাঁধবার কোনো সুযোগ ছিল না। এই 'মুক্ত ডানা' পাখির জাত ছিল সামন্ততন্ত্রী শেকলে বাঁধা মেহনতকারী মানুষের মুক্তি কামনারই প্রতীক ও প্রতিনিধি।[৪]

সম্ভ্রান্ত ও ঐশ্বর্যশালী ভাববাদের সঙ্গে নিম্নকোটির বস্তুবাদের এই বিরোধ একদিনের নয় বহুদিনের। লালনের কাছে জ্ঞান ও সত্য অলৌলিক বা ঐশ্বরিক নয়, বরং তা মানবগুরু কেন্দ্রিক। তবে একক গুরুর পক্ষে সমস্ত জ্ঞানের আধার হওয়া সম্ভব নয়। এরজন্য প্রয়োজন একাধিক সাধুগুরু সঙ্গ। এরূপ সদগুরু সঙ্গের মাধ্যমে অনন্ত জ্ঞানের অণুগুলি সংগ্রহ করতে হয়। তাই লালন পরলোক বা পরজন্ম নয়, ইহলোক তথা ইহজীবনকে স্বীকৃতি দেন এবং ইহজীবনেই সাম্য দাবি করেন। তাঁরকাছে জাত, সম্প্রদায়, বর্ণ, লিঙ্গভেদ এবং তজ্জনিত অধিকারভেদের কোনো গুরুত্ব নেই। মানুষ মাত্রেই একজাতি। সেখানে নর ও নারীতে কোনো পার্থক্য নেই। কারণ একই উপাদানে মনুষ্যদেহ গঠিত। নরের মধ্যেই রয়েছে নারীসত্তা। দৈহিক দিক থেকে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও উভয়ে উভয়ের পরিপূরক। মনুষ্যদেহে তথা শরীর মধ্যে স্নেহ, প্রেম, দয়া, মায়া, সহানুভূতি ইত্যাদি মানবিক গুণগুলি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। বাউলরা সাধনার দ্বারা নারীরূপে এই গুণগুলি লাভ করতে চায়। বাউলতত্ত্বে এদিক থেকে নারীর একটি উল্লেখযোগ্য অবস্থান রয়েছে। নারী এখানে পুরুষের সম্পত্তি নয়। সে স্বাধীন একক রূপে দীক্ষা দেয় আবার দীক্ষা নেয়। তার যৌন স্বাধীনতা সাধকরা স্বীকার করে। গৃহকর্মাদিতে সাধকরা সমানভাবে অংশ গ্রহণ করে থাকে।

॥ ৩ ॥

বিশ্বে মানবের অস্তিত্ব মূলত দৈহিক। লালন এই দেহকেই কেন্দ্র করে তাঁর তত্ত্ব নির্মাণ করেছেন। জীবজগতের ক্রমিক বিবর্তনে সৃষ্টি হয়েছে এই মানব দেহ। এই দেহ শুধুমাত্র দেহ নয়, এ এক ব্রহ্মাণ্ড। কারণ এককোশী প্রাণী ধীর পরিবর্তনে পঞ্চকোষে বিকশিত হয়ে এই দেহ নামক আধারটি গঠিত হয়েছে। সেখানে অণু আকারে তাবৎ জীব ও জড় জগৎ মিলেমিশে বিরাজ করছে। অনেকে তাই দেহকে মন্দিরের সঙ্গে তুলনা করেন। দেহ আবার বাউলের কাছে শাস্ত্রগ্রন্থও বটে। দেহ মনের ক্ষতি হয় এমন কিছু করাকেই তাঁরা পাপ বলে থাকেন। যা দেহ মনকে আনন্দে রাখে এবং আনন্দিত চিত্তে কাজকর্মের মধ্যে অর্জিত ফলরাশিকে তাঁরা পুণ্য বলে আখ্যায়িত করেন।

লালন দেহ মধ্যে প্রকৃত মনুষ্যসত্তাকে প্রস্তুত করতে চেয়েছেন। চন্ডীদাস সবার উপরে মানুষকে স্থাপন করে ত্রিবিধ মানবসত্তার কথা বলেছেন—যোনিজ, অযোনিজ এবং সংস্কারা। জৈব কামনা-বাসনায় লিপ্ত হয়ে যারা জীবন-যাপন করে তারা যোনিজ। কামনা-বাসনাহীন জীবদেহ হল অযোনিজ বা ঈশ্বর। অপরদিকে যারা রিপু ইন্দ্রিয়াদিকে সাধনার দ্বারা সংস্কার করে নিজেদের প্রয়োজন মতো নিয়ন্ত্রণ করতে পারে—তারাই সংস্কারা অর্থাৎ মানুষ। লালন মনুষ্যত্বের তিনটি স্তর লক্ষ করেছেন। প্রথম স্তরটি হল ত্যাগী-অকামী স্তর। যা জৈবধর্মের বিপরীত স্তর। দ্বিতীয় স্তরটি হল সহজিয়া স্তর। চর্যাকাররা যাকে 'সহজ' স্তর নাম দিয়েছেন। যে সমস্ত মানবিক গুণাবলী জৈবধর্মের চাপে মাথা তুলতে পারে না তাদের বিকশিত করা হয় এই স্তরে। তৃতীয় স্তরটি হল 'সংস্কৃত' স্তর।

জীবদেহে অবস্থিত লোভ, হিংসা, বিদ্বেষ, স্বার্থপরতা ইত্যাদি লুপ্ত করে স্নেহ, প্রেম, দয়া-মায়া, করুণা, ভালোবাসা, দয়ার স্তরে উন্নীত করাই হল এই স্তরের কাজ।[৫] অর্থাৎ 'সংস্কারা' বা 'সংস্কৃত' এই স্তর অতিক্রম করেই প্রকৃত মানুষ হতে হয়। এই মানুষই হয় মনুষ্যত্বসম্পন্ন। এই মানুষ সৃষ্টি করা যায় না। হয়ে উঠতে হয়। এমন মনুষ্যত্ব বিশিষ্ট মানুষই পারে আরেক মনুষ্যত্ব বিশিষ্ট মানুষের জন্ম দিতে। এই মানুষ যোনিজ নয়। চৈতন্যের উদ্বোধনে অযোনিজ পদ্ধতিতে নতুন মানুষের জন্ম হয়। এই মানুষকে বিভিন্নভাবে আস্বাদন করা যায়। তাই কেউ এই মানুষকে বলেন 'অচিন মানুষ', কেউ বলেন 'সোনার মানুষ', আবার কেউ বা বলেন 'মনের মানুষ'। এরা সকলেই দেহাশ্রিত সত্তা।

॥ ৪ ॥

বাউলের সাধনতত্ত্ব প্রতিফলিত হয়েছে লালনের সংগীতে। দেহকে আশ্রয় করে গুরুর সহায়তায় অন্তর প্রদীপ জ্বালানোর মধ্যে দিয়ে মানবের মনুষ্যত্ব বোধ জাগানো, কিংবা মানুষের দ্বারা মানুষের মধ্যে মানুষকে অনুসন্ধান তথা মনের মানুষকে খুঁজে বেড়ানোর যে সাধনা তা বিভিন্নভাবে ধরা পড়েছে লালনের গানে। লালনের কয়েকটি বহুল প্রচলিত গানের মধ্যে দিয়ে এর সত্যতা যাচাই করে নিতে পারি। তবে এই আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে বাউল গানের প্রকৃত রূপ সম্পর্কে, বাউল চর্চার অন্যতম পথিকৃৎ সুধীর চক্রবর্তীর কথা আমরা স্মরণ করতে পারি। তিনি বলেছেন—

> লালন গীতির নির্ভরযোগ্য সঠিক পাঠ পাওয়া কঠিন। মতিলাল দাস, মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন ও আবু তালিবের সংগ্রহকে আমি অবলম্বন করেছি। প্রয়োজনে শান্তিনিকতনে ও রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত লালন পাণ্ডুলিপির পাঠও মিলিয়ে দেখেছি। তবু শেষ পর্যন্ত লালন গীতির প্রকৃত পাঠ সম্পর্কে সংশয় ও সন্দেহ যাবার নয়।[৬]

লালন গীতির মূলপাঠ সম্পর্কে এরূপ সংশয়জনক কথা মাথায় রেখে বর্তমান প্রবন্ধে আবুল আহসান চৌধুরীর 'লালন সাঁই' গ্রন্থে[৭] সংকলিত গানগুলি থেকে উদ্ধৃতি গ্রহণ করা হয়েছে এবং গ্রন্থটিতে লেখক যে ক্রমিক সংখ্যা ব্যবহার করেছেন আলোচনায় সেই ক্রমিক সংখ্যা বজায় রাখা হয়েছে।

বাউলের সাধনায় গুরু একমাত্র কাণ্ডারী। সদগুরুই পারেন মানুষকে প্রকৃত মানুষে পরিণত করতে। বাউল গানে তাই শোনা যায়—

> যে সাধন-জোরে কেটে যায় কর্ম ফাঁসি
> যদি জানবি সে সাধনের কথা হও গুরুর দাসী। (১৬৯ সংখ্যক)

গুরুর দেখানো পথ অনুসরণ করে যদি ঠিকমত সাধনা করা যায় তবে সোনার মানুষের বা মনের মানুষের সন্ধান পাওয়া যায়।

> মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি
> মানুষ ছাড়া খ্যাপারে তুই মূল হারাবি। (২১ সংখ্যক)

অমূল্যনিধি স্বরূপ মনের মানুষকে পাওয়াই বাউলের একমাত্র লক্ষ্য। তাকে পেতে গেলে আগে মানুষ হতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন ভজনের—

> সহজ মানুষ ভজে দেখরে মন দিব্যজ্ঞানে

পাবিরে অমূল্য নিধি বর্তমানে। (২২ সংখ্যক)

কিন্তু মানুষ হওয়া সহজ কাজ নয়। তার জন্য সাধনার দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হয়। আর সাধারণ মানুষ তো চোখ থাকতেও কানা। লালন আক্ষেপ করে বলেন—

এ সব দেখি কানার হাটবাজার
বেদ বিধির পর শাস্ত্র কানা
আর এক কানা মন আমার।
পণ্ডিত কানা অহঙ্কারে
সাধু কানা আনবিচারে। (১২৮ সংখ্যক)

মনের মানুষকে চোখে যদি সত্যিই দেখতে হয় তবে সাধনার প্রদীপ জ্বালাতে হবে অন্তরে। অন্তরের আলোয় মন-চোখ আলোকিত না হলে বাইরের চোখ দিয়ে তাকে দেখা যায় না। তাকে দেখার জন্য, অনুভব করার জন্য, সর্বোপরি তাকে পাওয়ার জন্য তাই অন্তরে ব্যাকুল হতে হবে—

আমি কোন সাধনে তারে পাই
আমার জীবনেরও জীবন সাঁই। (১৫১ সংখ্যক)

বাউল-লালন, সাধনার প্রদীপ জ্বেলে মানুষের মধ্যে সন্ধান করেন সেই পরমকে। তিনি যে শুধু একাই এ কাজ করেন এমন নয়। যুগ যুগ ধরে সাধু ঋষিরা এই কাজই নিরন্তর করে চলেছেন। তাদের পথ আলাদা হলেও গন্তব্যস্থল এক—

এই মানুষে সেই মানুষ আছে
কত মুনি-ঋষি-যোগী-তপস্বী
তারে খুঁজে বেড়াচ্ছে। (১৫৪ সংখ্যক)

মানুষের মাঝে খুঁজতে খুঁজতে কখন যে আপন মনের গভীরে তিনি ডুব দেন, তার খেয়াল থাকে না। পাগল মন, ব্যাকুল মন পরমের উদ্দেশ্যে বলে ওঠে—

মিলন হবে কত দিনে
আমার মনের মানুষের সনে
চাতক প্রায় অহর্নিশি
চেয়ে আছে কালো শশী
হব বলে চরণ দাসী
ও তো হয় না কপাল গুণে। (৪২ সংখ্যক)

শাশ্বত এই আকাঙ্ক্ষা বাউলের। দেহকে আশ্রয় করে এ হল দেহীর অপূর্ব এক সাধনা। মানুষ হয়ে মানুষের মাঝে সাধনার দীপ জ্বালিয়ে সন্ধান করতে করতে নিজের মাঝে খুঁজে পাওয়ার এ এক অদ্ভুত সাধনা। এ সাধনা লালনের তথা বাউলের সাধনা।

॥ ৫ ॥

লালন কবিত্ব ও দার্শনিকতা দিয়ে নির্মাণ করেছিলেন বাউলের শাশ্বত এক সাধন প্রণালী। যা অনুসরণ করে গগন হরকরা, মনমোহন গোস্বামী, হাসন রাজা, দুদ্দুশাহ, পাঞ্জুশাহ, যাদুবিন্দু, কুবির গোঁসাইরা নতুন নতুন পালক সংযোজন করে সাধন প্রণালীকে আরো পুষ্ট করেছিলেন। সে ধারা সেই প্রণালী আজও বর্তমান।

প্রবহমানতা অনেক কিছুর বদল ঘটায়। যুগোপযোগী হয়ে চলার প্রয়োজনে সেখানে এমন

অনেক পরিবর্তন সাধিত হয় যা দেখে আমরা (সকলে অবশ্যই নয়) আঁতকে উঠি। আজও বাউল গান রচিত হয়, পরিবেশিত হয়। তবে রচনার ভাষায় ও বিষয়ে যেমন পরিবর্তন হয়েছে তেমনি পরিবেশনের সুরে, বাদ্যযন্ত্রে এবং পোশাকে ঘটেছে বিস্তর রূপান্তর। বাউল গান আজ অনেকের কাছে পেশা স্বরূপ। কেন্দুলির মেলা, শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলা, ঘোষপাড়ার সতীমায়ের মেলা, দধিয়া বৈরাগীতলার মেলা ইত্যাদি মেলায় বছরের বিভিন্ন সময়ে বাউলদের সমাগম ঘটে। এইসব বাউলদের সিংহভাগই প্রচারের আলোয় আসতে চায়।

রবীন্দ্রনাথ প্রথম অন্তেবাসী, প্রচার বিমুখ বাউলদের জনসমক্ষে এনেছিলেন। সেই শুরু। তারপর কালের নদীতে বহু জোয়ার-ভাঁটা এসেছে, আবার ফিরেও গেছে। বাউল তার একতারা হাতে বিদেশে পাড়ি জমিয়েছে। বাউল আজ গানে, কবিতায়, উপন্যাসে, নাটকে, এমনকি চলচ্চিত্রেও তার পসার জমিয়েছে। বাউলের আজ প্রচার ও প্রসার ঘটেছে বিস্তর। কিন্তু যার জন্য বাউলের বাউল হয়ে ওঠা—সেই সাধনা আজ রাহুগ্রস্ত। গ্রামবাংলার অভ্যন্তরে, অচিনপুরে কোনো বাউল আজও হয়তো তার মনের মানুষের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। আমরা তাদের খবরও রাখি না। মেলায়, ট্রেনে, রাস্তায়, টেলিভিশনের রিয়্যালিটি শো-য় সাধনাহীন, প্রচারমুখী ভেক বাউলদের দেখতে দেখতে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। সত্যিকারের বাউলদের আজ বড় প্রয়োজন। কারণ তারা মানুষ তৈরি করে। তারা ভারতের এক উল্লেখযোগ্য সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখে। তারা আমাদের ভাবায়। তারা আমাদের শেখায়।

উৎসের সন্ধানে

১. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত'; ৩য় খণ্ড, ২য় পর্ব; মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রা. লি.; ২০০৯-১০; পৃ. ৩৬০

২. আবুল আহসান চৌধুরী : 'লালন সাঁই'; গাঙচিল; ২০১৩; পৃ. ৩৭

৩. দ্র. Varieties of Religious Experience; p- 371-73

৪. হেমাঙ্গ বিশ্বাস : 'বাউল প্রসঙ্গে', সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত, 'বাংলার বাউল ফকির', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ৩৫৯

৫. সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত : 'বাউল প্রসঙ্গে হেমাঙ্গ বিশ্বাস'; মূলগ্রন্থ-বাংলার বাউল ফকির; পুস্তক বিপণি; ২০০৯; পৃ. ৩৫৯

৬. শক্তিনাথ ঝা : 'লালনের মানুষ তত্ত্ব'; লোকশ্রুতি; পঞ্চদশ সংখ্যা, ভাদ্র ১৪০৬; পৃ. ৩৯

৭. সুধীর চক্রবর্তী : 'ব্রাত্য লোকায়ত লালন'; পুস্তক বিপণি; ২০১৪; 'আত্মপক্ষ' অংশে তিনি এরূপ মন্তব্য করেছেন।

৮. আবুল আহসান চৌধুরী : 'লালন সাঁই; গাঙচিল; ২০১৩; পৃ. ১৬০-২৭৪

বাউল দর্শনে মিলন ভাবনা ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ড. স্বরাজ কুমার দাশ

বাউলদের সাধনা মুখ্যত দুই প্রকার—জ্ঞানমার্গীয় যোগসাধনা ও মিথুনাত্মক যোগসাধনা। আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধ মূলত এই মিথুনাত্মক যোগসাধনা নিয়ে। ড. আনোয়ারুল করিম তাঁর 'বাংলাদেশের বাউল সমাজ' গ্রন্থে বলেছেন, প্রাচীন প্যালেস্টাইনে রাসসামরায় (বা' আল) নামের একজন প্রজনন দেবতার উপাসনা করা হত। এই উপাসনার লোকেরা মৈথুন যৌনাচারে বিশ্বাসী ছিলেন। এই বা'আল ধর্ম পরবর্তীকালে এই উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করে। ইসলাম সুফিবাদী মতবাদের প্রচার-প্রসারের পর ইসলাম ও পৌত্তলিকতার সংমিশ্রণ ঘটে। এই সংমিশ্রণ থেকে তৈরি হয় নতুন লোকধর্ম। তন্ত্র ও যোগ নির্ভর দেহ সাধনাই এই লোকধর্মের অস্তিত্বে বর্তমান। আনোয়ারুল করিমের মতে এই বা'আল লোকধর্মই পরবর্তী কালে বাউল লোকধর্মে রূপান্তরিত হয়েছে। করিম সাহেবের এই মত কতখানি যুক্তিসঙ্গত ও গ্রহণযোগ্য তার আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু বাউল দর্শনের মূলে যে মিথুনাত্মক যোগসাধনা আছে, তার স্পষ্ট সমর্থন মিলবে আনোয়ারুল করিমের এই অভিমতে। নারী-সংসর্গকে সাধন-সঙ্গিনী ও নারী সম্ভোগকে যোগসাধনার অঙ্গ হিসাবে ধরা হয় বাউল দর্শনে।

বাউল দর্শনে 'চারিচন্দ্র ভেদ' একটি উল্লেখযোগ্য প্রক্রিয়া। বহু বাউল গানে এই 'চারিচন্দ্রভেদ'-এর উল্লেখ আছে। এই চারটি চন্দ্র হল—শুক্র, রজঃ, বিষ্ঠা ও মূত্র। দেহ থেকে নিঃসৃত এই চার পদার্থকে 'চারিচন্দ্র' বলা হয়। এই চার পদার্থের মিশ্রণে 'প্রেমভজা' নামক একপ্রকার পদার্থ তৈরি করে তা ভক্ষণ করে বাউলেরা। বাউলদের বিশ্বাস কুমারী মেয়ের রজঃ পান করলে শরীরে রোগ প্রতিরোধ তৈরি হয়। রজঃপান তাঁদের কাছে একটি সাধারণ ঘটনা। রোগমুক্তির জন্য বাউলেরা স্বীয় মূত্র ও স্তন দুগ্ধ পান করে। একাধিক সেবাদাসীর মধ্যমণি হয়ে থাকেন বাউল। সেবাদাসীদের অধিকাংশই কম বয়সের মেয়ে। পরকীয়া প্রেমের মধ্যে মোক্ষ সাধনাই বাউলদের লক্ষ্য। যৌন সঙ্গমই বাউলদের কাছে পূজা। শুধু অবাধ যৌনসঙ্গমই নয়, সেই সাথে চলত মদ্যপান ও গাঁজা সেবন। লালনের সবচেয়ে মেধাবী শিষ্য ছিলেন দুদ্দু শাহ। তিনি গাঁজা সেবনকে গর্বের কাজ মনে করতেন। সবচেয়ে বড় কথা হল বাউলেরা এই যৌনসঙ্গম, মদ-গাঁজা সেবনকে কোনো পাপ কাজ বলে মনে করতেন না। মানুষের দেওয়া ভিক্ষা আর জৈবিক চাহিদার জন্য সাধনসঙ্গী খোঁজা—এটাই তাঁদের লক্ষ্য। বাউলদের গানের পরিভাষাগুলিও যৌনাত্মক। যেমন অমাবস্যার অর্থ নারীর ঋতুকাল, বাঁকা নদীর অর্থ নারীর যোনী, লতার অর্থ সন্তান, কুমিরের অর্থ কাম, চন্দ্রসাধন মানে মল-মূত্র-রজঃবীর্য পান

করা। কুশ্রী কামসাধনা ও ব্যাভিচার সংস্কৃতির কথা বারংবার বাউলদের গানে ব্যক্ত হয়েছে। লালনের একটি গানে আছে—

করি কেমনে শুদ্ধ প্রেম রসের সাধন
প্রেম সাধিতে কেঁপে ওঠে কাম নদীর তুফান...।
বলবো কী হইলো প্রেমের কথা
কাম হইলো প্রেমের লতা
কাম ছাড়া প্রেম যথা, তথা নাইরে আগমন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর 'চৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থে বলেছিলেন—

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥

গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্র যেখানে 'আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা'-র কামকে অপসারিত করতে চেয়েছে, সেখানে বাউল সাধনায় কামকে সাদরে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। অবশ্য সহজিয়া বৈষ্ণবধর্ম কামকেই প্রাধান্য দিয়েছে। অনেকের মতে এই বাউলদের উদ্ভব সহজিয়া বৈষ্ণবধর্ম থেকে। বৌদ্ধ সহজিয়ারাও দেহ বা কামকে অস্বীকার করেনি। চর্যাপদগুলি তার প্রমাণ। দেহের মধ্যে তাঁরা বুদ্ধ বা সহজ বা শূন্যতাকে খুঁজেছে। সহজ বা শূন্যতাকে তাঁরা নারী রূপে কল্পনা করে,তার সাথে সাধক প্রেমিক রূপে মিলিত হয়েছে। কাম ও দেহবাদের নিরিখে চর্যার সাথে বাউল সাধনার যে সাদৃশ্য আছে তার সমর্থন মিলবে সমালোচকের উক্তিতে—

> চর্যাপদের সমসময় থেকে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে গুপ্ত এক দেহসাধনাকে বিশিষ্ট এক কাব্যভাষায় প্রকাশ করার রীতি গড়ে উঠেছিল।...লালনের বাউলগানের ভাষা আঞ্চলিক কথ্য ভাষা বা বাউলগোষ্ঠীর নিত্য ব্যবহার্য ভাষা নয়। এটি একটি সাহিত্যিক ভাষা। সর্বভারতীয় পরম্পরার সঙ্গে, প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে-এর যোগ রয়েছে। দেহসাধনামূলক ধর্মীয় সাহিত্যে এ ভাষাভঙ্গি খুঁজে পাওয়া যায়। প্রচলিত কাব্যভাষা থেকে পৃথক এ ভাষারীতি অনুসৃত হয়েছে চর্যাপদে, বাউল গানে।[১]

সহজিয়া বৌদ্ধদের মত বাউল সাধকেরাও দেহের মধ্যেই 'মনের মানুষ'-কে খুঁজেছেন। দেহের মধ্যেই রয়েছেন সাঁই (স্বামী), অচিন পাখি, অন্য এক মানুষ। সেই মনের মানুষের অন্বেষণের আকাঙ্ক্ষা দৈহিক যৌনাচারের ভাষা লাভ করেছে। বাউলদের প্রেম তাই আকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ, কামনায় তীব্র।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে সহজিয়া বৈষ্ণবধর্মের সাথে বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে গভীর সাযুজ্য রয়েছে। সহজিয়াদের বিশ্বাস সাধনার মোক্ষ দেহের মধ্যেই আছে। দেহ তাদের কাছে এক প্রকার ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড। পরকীয়া প্রেম বা দৈহিক সাধনার মধ্য দিয়েই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব। গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা পরকীয়া প্রেমের মধ্যে সাধনার রূপককে খোঁজেন। সহজিয়া-বৈষ্ণবেরা মনে করেন নর-নারীর দৈহিক মিলনেই রয়েছে মোক্ষ। প্রত্যেক নরের মধ্যে আছে কৃষ্ণ, নারীর মধ্যে আছেন রাধা। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনে প্রেম থেকে কামকে বাদ দিয়েছেন, সহজিয়া বৈষ্ণবেরা কামকে প্রেম হিসাবে গ্রহণ করেছেন। বাউল গবেষক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেছেন, বাউলগণ পুরুষের বীজরূপী সত্তাকে ঈশ্বর বলেন। এই বীজসত্তা বা ঈশ্বররস ভোক্তা লীলাময় ও কামক্রীড়াশীল। গুরু রতিসাধন

করে বা গুরুর বীর্য মল মূত্র বা রজঃপান করে বাউল ধর্মে দীক্ষা নিতে হয়। লালনের গানে উল্লিখিত আছে, 'গুরু রতি সাধন কর'। প্রেম ও যৌনতা বাউল সাধনায় যে একই সাথে উচ্চারিত হয় তার দৃষ্টান্ত মেলে বহু বাউল গানে—

জেন্তেমরা প্রেমসাধন কি পারবি তোরা
যে প্রেমে কিশোরা কিশোরী হয়েছে হারা।।
শোষায় শোষে না ছাড়ে বান ঘোর তুফানে কয় তরী উজান
ও তার কাম নদীতে চর পড়েছে প্রেম নদীতে জল পোরা।।
হাটতে মানা আছে চরণ মুখ আছে তার খাইতে বারণ
ফকির লালন কয় এ যে কঠিন করণ তা কি পারবি তোরা।।

এই গানে লালন ফকির স্পষ্টই বুঝিয়ে দিয়েছেন যে সাঁই-অনুভাবের অন্তরায় আসলে 'কাম নদীতে চর' পড়া আর 'প্রেম নদীতে জল পোরা'। সহজিয়া ভাবনার সাথে বাউল-দর্শনের যে গভীর মিল আছে তার প্রমাণ মিলবে এখানে—

পক্ষান্তরে দেখ একবার দিব্যচক্ষু প্রকাশ করে
দ্বিপক্ষেতে খেলছে খেলা নরনারী রূপ ধরে।।

সাঁই-এর সত্তানুভব যে নরনারীর মিলনের মধ্যেই রয়েছে তার কথা উল্লিখিত হয়েছে এখানে। বাউলরা বলছেন সাঁইকে পেতে হলে প্রেমরসিক হতে হবে—

শুদ্ধ প্রেমরসিক বিনে কে তারে পায়ঃ।
যার নাম আলেক মানুষ আলেকে রয়ঃ।।

বাউলদের যৌনাত্মক প্রেম-মিলন রূপক-সংকেতে ব্যক্ত হয়েছে বারংবার। যেমন—

একদিনো পারের কর্তা (কথা) ভাবলি না রে।
পার হবো হীরের সাঁকে কেমন করে।।

এখানে 'পার' ও হীরের সাঁকো' সংকেত যৌনাত্মক। 'পার' নাভির ছ-আঙুল নীচের মূল বস্তু "দেহ মিলনে স্খলন না করে নারীকে তৃপ্তি দিলেই সে অটল দেহামিলন 'পার'।[২] আর হীরের সাঁকো—"নারীর যোনিতে এর অবস্থান; পুং শুক্র খণ্ড হয় এখানে।"[৩] আবার একটি বাউল গানে যখন বলা হয়, "কি শোভা দ্বিদলের পরে", তখন এই 'দ্বিদল' হয়ে ওঠে যোনির প্রতীক। আবার একটি গানে বলা হয়েছে "লালন বলে নারদকাঠি বাজলে ওমনি নেচে ওঠ তাতেঃ।" এখানে 'নারদকাঠি' হল কামোন্মদনায় পুংলিঙ্গের প্রতীক।

রবীন্দ্রনাথ বাউল-দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। লালনের গান সংগ্রহ করে তিনি প্রথম প্রকাশ করেন। লালন সাঁইয়ের সাথে দেবেন্দ্রনাথের নিবিড় আত্মিক যোগ ছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যখনই শিলাইদহে যেতেন, তখনই লালন সাঁইকে ডেকে পাঠাতেন ও তাঁর বাউলগান শুনতেন একাগ্র চিত্তে। ১৮৯১ থেকে ১৯০১ সাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথও শিলাইদহ অঞ্চলে এসেছিলেন। ১৯০১-এ শান্তিনিকেতনে আশ্রম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর বাউলের ও লোকসংগীতের প্রতি আকৃষ্ট হন। কিন্তু মনে রাখতে হবে বাউলদের আত্মতত্ত্ব, গুরুতত্ত, যোগতত্ত্ব, প্রকৃতি পুরুষতত্ত্ব, কায়সাধনাতত্ত্ব ইত্যাদিকে রবীন্দ্রনাথ নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন। বাউলদের প্রভাব রবীন্দ্রনাথে পড়লেও বাউলদের দেহ-সম্ভোগের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রদর্শন দূরে থেকেছে। বাউলরা যাকে 'মনের

মানুষ' বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ তাকেই বলেছেন 'জীবনদেবতা'। সীমার মধ্যে যে অসীমের সুর সেটার মধ্যে রয়েছে বাউলদের প্রভাব। কিন্তু কোথাও দৈহিকতার এমন চরম উন্মাদনা নেই। রবীন্দ্রনাথ রূপ-সাগরে ডুব দেন অরূপ-রতন পাবেন বলে। কামনার মধ্য দিয়ে কামনাকে অতিক্রম করার কথা বলে বাউল-দর্শন; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অরূপ-রতন ভাবনায় কামনার কোনো ছিঁটে-ফোঁটাও থাকে না। সমর্পণের মধ্যে দিয়ে মিলনসুধা আস্বাদন করা উভয়ক্ষেত্রে দেখা গেলেও যৌনতার প্রসঙ্গে বাউল-দর্শনের সাথে রবীন্দ্র-দর্শনের এখানেই পার্থক্য।

উৎসের সন্ধানে

১. শান্তিনাথ ঝা : 'লালন সাঁই-এর গান', কবিতা পাক্ষিক, ১ম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৫, পৃ. ১৪
২. তদেব, পৃ. ১৭৭
৩. তদেব, পৃ. ১৭৭

তথ্যের সন্ধানে

১. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য : 'বাংলার বাউল ও বাউল গান', ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১৩৬৪
২. ক্ষিতিমোহন সেন : 'বাংলার বাউল', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৫৪
৩. ওয়াকিল আহমেদ : 'লালনগীতি সমগ্র', গতিধারা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৪
৪. সনৎকুমার মিত্র : 'লালন ফকির : কবি ও কাব্য', সাহিত্য প্রকাশ, কলকাতা, ঝুলনযাত্রা ১৩৯৬
৫. সুধীর চক্রবর্তী : 'ব্রাত্য লোকায়ত লালন', পুস্তকবিপণি, কলকাতা, ডিসেম্বর ১৯৯২
৬. সুধীর চক্রবর্তী : 'বাউল ফকির কথা', লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, মার্চ ২০০১
৭. শক্তিনাথ ঝা : 'ফকির লালন সাঁই : দেশ কাল এবং শিল্প', সংবাদ, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫
৮. সুধীর চক্রবর্তী : 'লালন', প্যাপিরাস, কলকাতা, শ্রাবণ ১৪০৫
৯. শক্তিনাথ ঝা : 'বাউল-ফকির ধ্বংসের আন্দোলনের ইতিবৃত্ত', সুবর্ণরেখা, কলকাতা ১৪০৮
১০. সনৎকুমার মিত্র (সম্পাদিত) : 'বাউল লালন রবীন্দ্রনাথ', লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫

আন্তর্জালিক তথ্য

১. shoncharon.com > দেহতত্ত্ব
২. blog.bdnews24.com> বাউলদের সম্পর্কে লোমহর্ষক তথ্য
৩. baulbare.com >চারচন্দ্র ও রতিসাধন "চারচন্দ্র" ভেদ... বাউলবাড়ি

একবিংশ শতকে বাঁকুড়ার বাউল

ড. সুমন্ত মণ্ডল

বাংলার লোকসংস্কৃতির ভাণ্ডার বিশাল, বাউল সংগীত সেই বিশাল ভাণ্ডারের একটি অঙ্গ। অন্যদিকে মানবতাবাদী এক সম্প্রদায়ের সংগীত হল বাউল সংগীত। বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতি, ধর্ম, বর্ণের কোনো বিরোধ নেই। হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ধর্মীয় আদর্শ বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনো বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। তাদের সাধনা হল মানব সাধনা। সাধনার জন্য মন্দির-মসজিদ-গীর্জার প্রয়োজন হয় না। বাউল নিজেই, আর তার সাধনার স্থল হল মানব, তাদের সাধনার বিষয়বস্তু হল মনের মানুষের সন্ধান। উদাস আত্মভোলা বাউলের মনের গভীরে, হৃদয়ের গভীরে বাউলের বাস। বাউলের কাছে মানব প্রেমই বড়ো কথা। সম্প্রীতিই হল বাউলের ভিত, বাউলের আদর্শ। আমরা জানি যে সংগীত বিশেষ কোনো জাতের কথা বলে না, বিশেষ কোনো ধর্মের কথা বলে না, কোনো সম্প্রদায়ের কথা বলে না। সমস্ত মানব সমাজের কথা বলে। মানব কল্যাণের কথা বলে, ছন্দে, তালে, সুরে সবাইকে একটি তারে বাঁধে সেই হলো বাউল সংগীত।

বিংশ শতকের শেষেও একবিংশ শতকের দোড়গোড়ায় বাঁকুড়া জেলায় ১৮ মার্চ ও ১৯ মার্চ ২০০০ খ্রিস্টাব্দে আকাদেমির মুক্ত মঞ্চে বাউল বিষয়ে একটি আলোচনা চক্রের আয়োজন করে রাঢ় আকাডেমির সদস্যবৃন্দরা। আলোচনা চক্রে ৫টি গ্রুপ করে আলোচনা অগ্রসর হয়। আলোচনার বিষয়গুলি ছিল—

১. ভোগ বাদ ব্যতিরেকে বাউল সংগীত অধ্যাত্মবাদের অগ্রদূত।

২. সম্প্রীতিরক্ষা ও গণশিক্ষা প্রসারে বাউল সংগীত।

৩. অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সুস্থ সংস্কৃতি রক্ষায় বাউল সংগীত।

৪. বর্তমান আর্থসামাজিক ব্যবস্থায় বাউল সংগীত ও বাউল শিল্পীর অবস্থান।

৫. বাউল সংগীত ও বাউল শিল্পীদের মর্যাদা রক্ষায় সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা। ৬২ জন বাউল শিল্পী এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এদের মধ্যে ৫৬ জন গৃহবাসী ও ৬ জন আশ্রমবাসী। ২০ থেকে ২৯ বৎসর বয়স্ক শিল্পীর সংখ্যা ১১ জন, ৩০ থেকে ৩৯ বছরের শিল্পী ২১ জন, ৪০ থেকে ৪৯ বছরের ১৬ জন, ৫০-এর বেশি বয়স্কের সংখ্যা বাকিজন। গৃহবাসী ৫৬ জনের মধ্যে ৫১ জন বিবাহিত ও ৫ জন অবিবাহিত। এদের মধ্যে ৫ জনের গৃহ আছে মাটির দেওয়াল খড়ের ছাউনি, শিল্পীদের মধ্যে ২ জন চাকুরি করেন,

২ জন পৌরহিত্য, ১ জন দোকান কর্মচারি, ১ জন মাছের ব্যবসা, তবে বেশির ভাগেই দিন মজুর, খেত মজুর, ক্ষুদ্র বা প্রান্তিক কৃষক, রিক্সা চালক, মাধুকরী। তবে এদের মধ্য থেকে কেউ কেউ মাধ্যমিক পাশ করলেও এদের ছেলে মেয়েরা সবাই কিন্তু ইস্কুলে পাঠরত। দারিদ্র্য এদের নিত্য সঙ্গী হলেও ঐতিহ্যবাহী বাউল সংগীতের ধারক-বাহক কিন্তু এরাই। এরাই অধ্যাত্মবাদের জনশিক্ষা প্রসারের, দেহতত্ত্বের, গুরু তত্ত্বের সম্প্রতি রক্ষার অপসংস্কৃতি রোধ করার গান শোনান। এরাই বিদেশে পাড়ি দিয়ে বিশ্ববাসীকে বাউল সংগীত শোনান। বাউল শিল্পীদের জীবন জীবিকা বিষয়ে সমীক্ষা করার জন্য তাদেরকে ১৮টি প্রশ্ন একটি কর্মের আকারে দেওয়া হয়েছিল সেটি হল এইরকম—

১. নাম :
২. পিতার নাম :
৩. ঠিকানা :
৪. বয়স :
৫. শিক্ষার মান :
৬. বিবাহিত/অবিবাহিত :
৭. আশ্রমবাসী না গৃহবাসী :
৮. আশ্রমবাসী হলে আশ্রমের নাম ও ঠিকানা :
৯. পরিবারের অন্য কেউ বাউল সংগীত চর্চা করেন কি না? করলে কয় জন?
১০. শিল্পীর নিজস্ব জমি আছে কি না? থাকলে পরিমাণ?
১১. শিল্পীর গৃহ আছে কি না?
১২. শিল্পীর চাষ বা অন্য কোনো ব্যবসা থাকলে তার নাম :
১৩. শিল্পীর ছেলে মেয়েদের শিক্ষার মান :
১৪. শিল্পীর বাৎসরিক আয়—প্রসঙ্গিত চর্চার মাধ্যমে অন্যান্য :
১৫. ধর্ম :
১৬. জাতি : তপশিলি/তপশিলি উপজাতি/সাধারণ :
১৭. ভারতবর্ষের বাইরে সংগীত পরিবেশন করলে সেই সব দেশের নাম :
১৮. বাউল সংগীতের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শিল্পীর মতামত :
১৯. শিল্পীর প্রিয় বাউল সংগীত কোনটি তা লিখে দিন পৃথক কাগজে...।

শিল্পীর স্বাক্ষরসহ এই ফর্ম সব শিল্পীরাই পূরণ করেন। তবে ৬২ জন শিল্পীর মধ্য থেকে ৩৭ জন শিল্পী তাদের প্রিয় গানটি লিখে দেন এবং এর সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই মত বিনিময় করেন। বাউল শিল্পীর বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্বন্ধে তাদের মতামত ও তাদের গানগুলি তুলে ধরা হল এই প্রবন্ধে যা তাঁরা উল্লেখ করেছিলেন—

॥ ১ ॥

সুধাংশু দাস বৈরাগী, মেজিয়া বাঁকুড়া, তাঁর মতে বর্তমান বাউল সংগীতের মান খুব নীচে না নামলেও শিক্ষা ও দীক্ষা গুরুর পাশে না গিয়ে শিল্পীরা লোকগীতি, পল্লিগীতির গানে ও সুরে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তবে বাউল গান গাইতে সদগুরুর আশ্রয়ে বাউল গানের

মর্মার্থ জেনে পরিবেশন করাটাই ঠিক। বাউল একটি ধর্ম। বাউলের ধর্মকর্ম জেনে সংগীত সাধনা বা সংগীত পরিবেশন করাটাই যথার্থ বাউল গান গাওয়া। বাউল একটি জাতির কথা ও পরকীয়া তত্ত্বের মাধ্যমে জানতে হয় বাউল গানের তত্ত্বকথা। শিল্পীর প্রিয় বাউল সংগীতটি হল—

শমন ভয় এড়াবি কিসে
রমনেতে দিয়ে সই
মরবার সাধ সদাই দেখি
বাঁচতে চাইলি কই।
নিত্যমৃত্যু হচ্ছে জীবের তিনটি দফা তার
নামে-ঘুমে-কামে-ফেলে-করলে দফা রফা তার
এই তিনের মাঝে ঘুরে ফিরে ডাঙ্গায় বসে টানছ মই।
অসৎ সঙ্গা করেরে মন, রূপকে মারিলি
কামের বশে মায়ের পাশে নিজেই মরিলি
নিদ্রায় পড়ে মায়ার ঘোরে
ছেঁড়া কাঁথাই ঢালছ দই।

॥ ২ ॥

নবীন মাজি, তেলিবেড়িয়া, বাঁকুড়া— তাঁর মতে বর্তমান বাউল সংগীতের মান ক্রম হ্রাসমান। এই সংগীত ভবিষ্যতে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যাতে করে ছড়িয়ে পড়ে সেদিকে আমাদের প্রত্যেকের নজর রাখা উচিত বলে আমি মনে করি। শিল্পীর প্রিয় সংগীতটি হল—

চুনো পুঁটি বাউল আমি
বেদ পুরাণের কি জানি?
তাই বাউল গান শোনাব একখানি।
বাঁশ গাছেরই জন্ম, বেনু, বৃক্ষ নাম,
কখন সৃষ্টি মধুর হবে কৃয় নাম?
কোথায় ছেলে রূপে আসে
হেরে চাঁদ বদন খানি।
মাকে বিয়ে করল কেবা কোথায় দেখা যায়?
মা বেটাতে করল প্রেমের ভাবে কখন পিরীত।
আমার গুরু বলে বেদ পুরাণে আছে গো লেখা।
অমাবস্যার গভীর রাতে পূর্ণিমা চাঁদ যায় গো দেখা।
এসব দ্বন্দ্ব শুনে লাগে সন্দেহ ঘুচাও মনের গ্লানি।
তাই বাউল গান শুনাবো একখানি।

॥ ৩ ॥

জয়ন্ত ভদ্র, বড়জোড়া বাঁকুড়া, শিল্পীর মতে একজন বাউল শিল্পীর কাছে বাউল গান অমূল্য সম্পদ। এই গানের বর্তমান ও ভবিষ্যত খুবই উজ্জ্বল বলে মনে করি। তাঁর প্রিয় বাউল সংগীতটি হল—

আমার একলা যেতে ভয় করে
চল গুরু যাই দু'জন পারে।
এভাবে যেতে গুরু আসতে গুরু
গুরু আমার যা করে।
পারের নাবিক আছে ছয়জনা
পারের কড়ি না থাকিলে নৌকায় নেবে না।
ভবপারে যাই কি করে
আমার দেহ ছিল শ্মশান সমান
গুরু এসে মন্ত্র দিয়ে করল ফুলবাগান
এখন সেই বাগানে ফুল ফুটেছে
সেথায় অধর চাঁদ বিরাজ করে।

॥ ৪ ॥

গোপাল চন্দ্র উপাধ্যায়, কাপিষ্টা, গঙ্গাজলঘাটি, বাঁকুড়া শিল্পীর মতে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষে বাউল সংগীত একটি অমূল্য সম্পদ। কিন্তু আমি মনে করি এই আঙ্গিকটিকে যথার্থভাবে প্রচার করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। বাঁকুড়া জেলায় বহু বাউল সংগীত শিল্পী আছেন। কিন্তু সরকারি ও বেসরকারি অবহেলায় শিল্পটি দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত। সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে শিল্পীদের যদি অংশ গ্রহণের সুযোগ করে দিয়ে শিল্পীদের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া হয়, তাহলে বাউল সংগীত ও বাউল শিল্পী এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বহন করতে পারবে। শিল্পীর প্রিয় বাউল সংগীতটি হল—

ওরে হরির ভজন করবি যদি ছাঁচার জল মড়কচাতে ওঠা
হরির ভজন বড় লেঠা...হরির ভজন বড় লেঠা
ওরে মন চোরে চুরি করে থাকত চাবি আঁটা
ভাইরে থাকত চাবি আঁটা
আবার সেই চোরকে যে ধরতে পারে সেইতো বাপের বেটা
হরির ভজন বড় লেঠা...

॥ ৫ ॥

বলরাম মণ্ডল—নাচনকেন্দা, সাবড়াকোন, বাঁকুড়া, শিল্পীর মতে বর্তমানে বাউল সংগীত ছোট্ট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ। বড় শিল্পীর ভূমিকা পালনে বঞ্চিত। এই সংগীতের মধ্যে বেঁচে থাকার আশাবাদী রূপটিই প্রকট। আশাবাদী রূপটি কর্মক্ষেত্রে রূপায়িত করতে চাই। প্রিয় বাউল সংগীতটি হল—

চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে আমরা ভেবে করব কি?
ঝিয়ের পেটে মায়ের জন্ম তারে ভেবে করি কি?
ছয় মাসের এক কন্যা ছিল, নয় মাসে তার গর্ভ হল গো
এগারো মাসে তিনটি সন্তান কোনটি করব ফিকিরি।
চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে...

॥ ৬ ॥

সুবোধ চন্দ্র রায়—পড়াশীডাঙ্গা, নাচনা, বাঁকুড়া, শিল্পীর মতে অতীত অপেক্ষা বর্তমানে বাউল সংগীত দুর্বল। ভবিষ্যতে আরও দুর্বলতর হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ শ্রোতার রুচি ও শিল্পীকে উৎসাহ দানে ঢিলেমি। সরকারি নজরে শিল্পীদিগকে ছোটো করে দেখা শিল্পীর প্রিয় বাউল সংগীতটি হল— (বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল সম্বন্ধে)

আমার-গোবিন্দের গোবিন্দনগর
ও দয়াল-হেথায় স্বর্গ হেথায় নরক
হেথায় আছেন মহেশ্বর
এটাই আমার গোবিন্দের গোবিন্দনগর
নার্স, ডাক্তার, নাইটগার্ড
তারাই নিল জীবন ভার
শত্রু মিত্র না করে বিচার
তারাই যমরাজ
কখন হয় ধর্মরাজ
এখানেই হয় পাপ পুণ্যের বিচার...

॥ ৭ ॥

অনিল বরণ পটিকার—দেমুশন্য, সাতপাটা, বাঁকুড়ার শিল্পীর মতে বর্তমান বাউল সংগীত মানুষের খুব প্রিয় হয়ে উঠেছে। আশা করি উপযুক্ত ব্যবস্থা পেলে বাউল সংগীত সমাদৃত হবে। শিল্পীর প্রিয় সংগীতটি হল—

যে রোগেতে আমার বাবা মরেছে
সে রোগ আমায় ধরেছে।
আমি হবার আগে আমার বাবা মরেছে
বাবা মায়ে এক সাথে মরলে।
যেদিন আমার জন্ম হল
পাড়ার লোক সব দেখতে এল
বলে ছেলেটা কালো হয়েছে
বাউলের আজগুবি কথা
জীবের হল দুই দিকে মাথা
এক মুখেতে বলছে বুঝি
আর মুখে বংশ কত বাড়তেছে।
দ্বিতীয় গর্ভে জন্ম হল যে আমার
চর্ম, মাংস, অস্থির হইল হাড়
জন্মের পরে সেই প্রচার পাগল রামদাসে তা কইতেছে।

॥ ৮ ॥

সুনীল পাল, কুমার পাড়া, রানিবাঁধ, বাঁকুড়া-তাঁর মতে বাউল সংগীতের বৈশিষ্ট্য শিল্পীদের সচেতনতার উপর নির্ভর করে। বাউল সংগীতের পরিবেশনে শিল্পীর শুধু আত্মবিনোদন ঘটে না। অপরকেও আনন্দমুখর করে তোলাই প্রধান লক্ষ্য। বাউল সংগীতের মধ্যে অধ্যাত্মিক চেতনা লুকিয়ে থাকে। আনন্দ বিনোদনের মধ্য দিয়ে জনজীবনে মানবতাবোধ ও সামাজিক সচেতনতার বিকাশ ঘটে। ক্ষয়িষ্ণু জগতে সংগীত ও কবে কখন এই সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট থেকে হারিয়ে যাবে বলা যায় না। তাই এই শিল্পটিকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব সবার। শিল্পীর প্রিয় বাউল সংগীতটি হল—

ভবে আমি বা কার কে বা আমার
তাই ভাবি অন্তরে।
আমি ভবের হাটে মরলাম ছুটে আমার
আমার করে।
দুদিনেরই রঙ্গশালায় কত আপন
সংসার খেলায়
আমার শেষের দিনে কেউ নাই সাথী
দেখি পিছন ফিরে ভবের হাটে
শোন অবুঝ মন বলি তোরে
যাবি যদি ভব পারে
একবার বদন ভরে ডাক না রে মন হরে কৃষ্ণ হরে
শোন গো প্রণবাচারী পাই যেন গো তোর চরণ ধরি
আজ অধম দয়াল কাঁদছে বসে ঐ চরণের তরে
আমি ভবের হাটে মরলাম ছুটে আমার আমার করে।

॥ ৯ ॥

তন্ময় মজুমদার—লোখেশোল, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া— তাঁর মতে বাউল এবং লোক সংগীত, লোক শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম এবং সমাজ চেতনার মূল পথ নির্দেশক। শিল্পীর প্রিয় বাউল সংগীতটি হল—

যেন মরণ হলে জন্ম নিয়ে এই মাটিতেই আসি
লাল মাটির বাঁকুড়াকে বড়ই ভালোবাসি।
বাঁকুড়ার এই জয়রামবাটি মহা পুণ্যধাম
ওই খানেতে মা সারদামণির জন্মস্থান।
আবার বাঁকুড়ার ওই ছাতনা গ্রামে চণ্ডীদাসের লীলাভূমি।
বিষ্ণুপুরের মদন মোহন করে গেছেন লীলা,
সোনামুখীর রাম নবমীর মনোহরের মেলা
আবার মেলায় আসে কত লোক আর সাধু সন্ন্যাসী।

॥ ১০ ॥

মলয় রায়, বদড়া, জুনবেদিয়া, বাঁকুড়া—শিল্পীর মতে বাউল সংগীতের বর্তমানে অবস্থা খুব যে খারাপ তা বলা যায় না। জেলার বিভিন্ন স্থানে যে সকল মোচ্ছব হয় বা বাউলের আখড়া বসে তা দেখে বা শুনে মনে হয় বাউল সংগীতের সুরের ছোঁয়ায় সাধারণ মানুষ আজও বাউল সংগীতে আপ্লুত। এর ভবিষ্যত হল, যদি বেশি করে বাউল সংগীতের আসরগুলি চিন্তাভাবনা করি তাহলে আমাদের বাউল শিল্পীগণ বাউল সংগীতকে ধরে রাখতে পারবে। শিল্পীর প্রিয় বাউল সংগীতটি হল—

সুখে থাক তোমরা সবাই
(হায় গো) এবার আমি চলে যাই।
স্নেহের ভাজন জনে
টুসি ও শিশুমনে
গুরুজনে প্রণাম জানাই
যত ভুল দোষ ত্রুটি পদে মোর এই মিনতি
ক্ষমা করো এই অভাগায়
হায় গো... যাই।...

কাজলে কি হবে অন্ধচোখে
মুকুটে কি হবে যদি মাথা না থাকে
শ্রীগুরু গোবিন্দ হী কুসঙ্গে কাটিল দিন
দেবী বলে বড়ো অসহায়
হায় গো... যাই।

॥ ১১ ॥

দুলাল ঘোষ—ভালুকাপাহাড়ি, পোস্ট-পিড়রাবনী, জেলা-বাঁকুড়া, শিল্পীর মতামতটি হল—বর্তমানে বাউল শিল্পীগণ ভারতবর্ষের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত সুস্থ সংস্কৃতির পক্ষে সাম্প্রদায়িকতার বিপক্ষে গণশিক্ষার প্রসারে সংগীতের মাধ্যমে প্রচার করে চলেছে। স্বাস্থ্য, পরিবার কল্যাণ বিষয়ে ও সংগীত পরিবেশন করেন। সরকারি বা বেসরকারি ভাবে যদি বাউলদের প্রতি একটু নজর দেওয়া হয় তাহলে সকলের মঙ্গাল। শিল্পীর প্রিয় বাউল সংগীতটি হল—

এক তারার ওই বাউল সুরে যেজন ভিখারী
তাদের নাইকো বাড়ি, জমিদারি, করে না বাবুগিরি।
অজানাকে সে জেনেছে, বাউল বলি তারে
তাদের নাই কোনো আশ, গাছ তলায় বাস
বেড়ায় ঘুরে ঘুরে
শুধু গেরুয়া পরলে হয় না মানুষ
রাখলে চুল দাড়ি।
এই মাটিতে জন্ম মোদের এই মাটিতেই মরি।

॥ ১২ ॥

আনন্দ দাস মহন্ত—গ্রাম-ফপসা, পোস্ট শুশুনিয়া, জেলা-বাঁকুড়া, তাঁর মতে বাউল সংগীত সম্ভাবনাময়। শিল্পীর জীবন, জীবিকা উন্নয়নে চাই সরকারি উদ্যোগ। শিল্পীর প্রিয় বাউল সংগীতটি হল—

ও ভাই উলি হাতু আতঃর মাঝে
আসল রে কোন ভগবান
ডাক দিয়েছে হড় মিতালে
উলগুলান ভাই উলগুলান।
বীর বুরর এই বীর সন্তান
বীরসা মুণ্ডা নামে প্রমাণ
লড়াই করে বীরের পারা
জাগাই গেল হড়ের প্রাণ
রাঢ়ের কবি কৃষ্ণ দুলাল
বলে বীরসা ছিলেন বীরের কাঙ্গাল
ভারত মায়ের মুক্তি লাগে
গাইল মায়ের জয়গান।

॥ ১৩ ॥

মনি মোহন দাস— গোস্বামী পাড়া, পোস্ট-বিষ্ণুপুর, জেলা-বাঁকুড়া, শিল্পীর মতামতটি হল—বাউল ও লোকসংগীত জনশিক্ষা এবং সচেতনতা বৃদ্ধির প্রধান অবলম্বন, বাউল সংগীতের আলোচনা, প্রচার ও প্রসার একান্ত প্রয়োজন। প্রিয় বাউল সংগীতটি হল—

মন্দিরেতে নাই ভগবান আছে এই ঘরে
ওরে মন মাটির মতন মাটি করে খুজলে পাবি অন্তরে।
ওগো আমার বিচার নাই তার আচার বিচার নাই
ক্ষিতি, অব তেজু মরূ বোমে থাকেন গোলক মাঝে।
ভগবান পঞ্চভৌতিক দেহ ঘরে সর্ব্বদাই বিরাজ করে।
ওগো ব্রহ্ম সনাতন তারে পায় না পণ্ডিতগণ,
পেয়েছে যে করেছে যে নিষ্কাম প্রেম সাধন
কতজন জ্ঞান বিজ্ঞানের যুক্তি নিয়ে
এজগৎ ঘুরে মরে।
তাই বলে দাস মণিমোহন সর্বজীবকে
সেবা কর মন শিবজ্ঞানে জীব না দেখিলে
পাব না সেই ধন।
তাঁরে এমন প্রাণ সঁপে দিলে থাকবে
হৃদয় মন্দিরে।

॥ ১৪ ॥

ধর্ম দাস বৈরাগী— মায়াকানন, কেশিয়াকোল, বাঁকুড়া, শিল্পীর মতামতটি হল—বর্তমানে বাউল সংগীত তার মূল ধারা হতে বিচ্ছিন্ন প্রায়। এইভাবে চলতে থাকলে বাউল সংগীতের অস্তিত্ব একেবারে লোপ পেয়ে যাবে। শাস্ত্র এবং আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে, বাউল গান সম্বন্ধে সচেতন হউন। তাঁর প্রিয় বাউল সংগীতটি হল—

কোথা থেকে এলে বাউল
কোথায় আমার ঘর?
কতদিন ভ্রমিতেছ
সংসার ভিতর?
কোথায় তোমা ঘর?
কোথা থেকে বাউল
কোথায় যাওরে মন
কি আকারে কি প্রকারে কোন তিথিতে
মায়ের গর্ভে কর আগমণ
কোথায় যাও রে মন?

॥ ১৫ ॥

শংকর বাগদী (দাস) গ্রাম-উত্তর পতসপুর, পোস্ট-হদল নারায়ণ পুর, জেলা-বাঁকুড়া। তাঁর মতে বাউল শিল্পী, বাউল গান অতীতে যা ছিল বর্তমান কাঠামোতে এই বাউল শিল্পী ও বাউল গান সমাজে বিশাল অগ্রাধিকার লাভ করেছে। আগামীদিনে এই বাউল সংগীত সকল দিক থেকে সহযোগিতা পেলে আরো উন্নত হবে। তাঁর প্রিয় বাউল সংগীতটি হল—

আমার আমার আমার বলে
কেন গৌরব কর ভাই।
আমার বলতে এ ভুবনে
কোনো কিছু নাই।।
গাড়ি বাড়ি দালান কোঠা
কত আশা করে,
গড়ে তোল থাকবে বলে
সারা জীবন ধরে।
এক নিমেশে মরণ এসে
করে দেবে ছাই।
গুরুর চরণ বিনে, এই ভুবনে
আর যে কিছুই নাই।
আমার আমার আমার বলে
কেন গৌরব কর ভাই।

এবার আমরা দেখব আলোচনা চক্র থেকে বিভিন্ন বিষয়ের উপর যে সিদ্ধান্তগুলি উঠে এসেছে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার চালচিত্রের নিরিখে তা হল এই যে—

১. প্রথম বিষয় ভোগবাদ ও অধ্যাত্মবাদ। ভোগবাদ বাউল সাধনার এক বড় অন্তরায়। ভোগবাদকে দূরে না সরালে বাউল সংগীত অধ্যাত্মবাদের অগ্রগতি ঘটাতে পারে না। ভোগবাদ অহংকারের জন্ম দেয়। অন্যদিকে অধ্যাত্মবাদ হলো ত্যাগের মাধ্যমে পরমপিতা শ্রীগুরুর কৃপালাভ এবং পরম সুখলাভ। সাধারণ মানুষের মতো দেহ বা জীবন ধারণের জন্য যেটুকু অহংশূন্য ভোগ দরকার বাউলদের কেবলমাত্র সেটুকুই করা প্রয়োজন। আত্মার উপলব্ধির জন্য এবং মানব জীবনকে সুন্দরভাবে উপলব্ধি করার জন্য দেহ রক্ষার প্রয়োজন আছে, অনেকে আবার বাউল সংগীতের শিল্পী এবং বাউল সাধকদের সমার্থক করে ফেলেন। কিন্তু এই দুয়ের ব্যবধান অনেক। প্রকৃত বাউল সাধক যিনি, তিনিও শিল্পী হতে পারেন। তবে তিনি ভোগবাদের ধার ধারেন না। তিনি দেহ ধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন তাতেই সন্তুষ্ট থাকেন। তাই বাউলকে অধ্যাত্মবাদের পথিকৃৎ বললেও অত্যুক্তি হয় না।

২. সম্প্রীতি রক্ষায় ও গণশিক্ষা প্রসারে বাউল সংগীত-সম্প্রীতি রক্ষায় বাউল সংগীত উচ্চু ক্ষমতা সম্পন্ন। তাইতো বাউল বলে—

ধলেছে সেই দোকানের ঠিকানা
যেথা আল্লা, হরি, রাম, কালী গড্
এক থালাতে খায় খানা।

বাউল যেহেতু বিশেষ কোন ধর্ম্মীয় সাম্প্রদায়িক বিষয় নয়, যে কেউ বাউল ভাবাপন্ন হতে পারেন তাই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় বাউল এবং বাউল গানের গুরুত্ব অসীম।

যখন কোনো হিন্দু, মুসলমান বা খ্রিস্টান বাউল সংগীত গেয়ে ওঠেন, তখন জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সব মানুষ এক হয়ে পড়েন, এই সবই বাউল গায়কের গানের আবেদন। ভারতবর্ষে গ্রামে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা অধিক। শতকরা ৭৫ ভাগ মানুষ গ্রামে বাস করেন। আর্থিক, শিক্ষা, দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমাজে পিছিয়ে পড়া শ্রেণির মানুষ। এদের মধ্যে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সচেতনতার অভাব বিদ্যমান। কুসংস্কারের শিকার হচ্ছে এই সব মানুষ।

এসব মানুষের উন্নতি ছাড়া দেশের উন্নতি সম্ভব নয়। যুগ যুগ ধরে লোকশিক্ষা বা গণশিক্ষা প্রচারে লোক আঙ্গিক ভাদু, টুসু, ঝুমুর, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি তথা কবিগান, যাত্রা প্রভৃতির ভূমিকার গুরুত্ব অসীম। তেমনি বাউল সংগীতও একটি শক্তিশালী গণমাধ্যম। বাউল কথা, সুর, তাল, লয় এবং গায়কীর আবেদন তার সঙ্গে বাউল তত্ত্ব, দেহ তত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব এবং সৃষ্টিতত্ত্ব যুক্ত হওয়ায় মানুষের মনে এবং হৃদয়ে দাগ কাটে বেশি। কাজেই গণশিক্ষা প্রসারে বাউল সংগীত একটি উত্তম মাধ্যম। লোক শিক্ষায় সম্প্রীতি সুরক্ষায় এবং ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ণ রাখতে বাউল এক বিশেষ হাতিয়ার।

১৯৯০ সাল থেকে বিভিন্ন জেলায় সাক্ষরতা অভিযান শুরু হয়। বাউল সংগীতের আঙ্গিককে বজায় রেখে বাউল সুরে বহু গান শোনা যায়। শঙ্কর দাস বৈরাগীর গাওয়া একটি বাউল সংগীতে শুনি—

নাম লেখালে হয় নারে ইস্কুলে যাওয়া চাই।
ফাঁকি দিলে-পড়বি ফাঁকে মরবি নানা যাত নায়॥
বলছ তুমি পড়ি আমি অমুক ইস্কুলে
তোমার পুঁথি বগলে
পড়ার নামে লবডঙ্কা আড্ডা গাছ তলে।
তুমি গুটি খেলে দিন কাটালে
পড়াশুনা হয় কি তায়
নাম লেখালে হয় নারে ইস্কুলে যাওয়া চাই।

৩. অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে এবং সুস্থ সংস্কৃতি রক্ষায় বাউলসংগীত-বঙ্গসংস্কৃতির অর্থ হল হিন্দু-মুসলমানের যৌথ সংস্কৃতি বা যৌথ সম্পদ। অবিভক্ত বাংলাদেশ। বিশাল এলাকা। সেই বিশাল এলাকার মানুষের সংস্কৃতি বঙ্গ সংস্কৃতি। বঙ্গ সংস্কৃতির সংকট শুরু বাংলা বিভক্ত করণের দিন থেকে। ষোল আনা সম্পত্তি আট আনা হল। সীমারেখার ওপারে ভাটিয়ালি আর এপারে বাউল। বর্তমানে আমাদের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি তথা লোকসংস্কৃতি এক ভয়ঙ্কর সংকটের সম্মুখে। আমাদের সুস্থ সংস্কৃতির উপর আক্রমণ সিনেমা, গানে বিজ্ঞাপন প্রচারে, প্রত্যন্ত গ্রামে ভিডিওর দাপট, মার্কিন সংস্কৃতি, বিশ্বায়নের বিষক্রিয়ার প্রভাব আমাদের গোটা সমাজকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে, যুবসম্প্রদায়কে এক অনিশ্চিত তমসাময় গহ্বরে নিক্ষেপ করেছে। আমাদের অতীতের গৌরবের কথা ভুলে যাচ্ছি। তাই বাংলার সংস্কৃতি বিপর্যস্ত বিপদাপন্ন।

আমাদের সংস্কৃতিকে, আমাদের ঐতিহ্যকে, আমাদের গৌরবকে ফিরিয়ে আনতে হবে। সংস্কৃতির উপর আক্রমণকারী পশু শক্তিকে পরাস্ত করতে হবে। সেই পশু শক্তি বা অশুভ শান্তির বিরুদ্ধে আমাদের লড়তে হবে। সেই লড়াইয়ে আমাদের বীর সৈনিক হলেন লোকশিল্পী সমাজ। লোকশিল্পীদের হাতিয়ার হল লোকসংগীত ভাদু, টুসু, ঝুমুর, বাউল ও ভাটিয়ালি প্রভৃতি। বাউল সংগীতের মধ্যে যাদু আছে। নিরক্ষর সাধারণ মানুষের কাছে বাউল সংগীত অতীব প্রিয়। বাউল গান তাদের হৃদয়ের গান, প্রাণের গান, কণ্ঠের সুর, বাউল গানের মাধ্যমে বাউল গানের বিষয়বস্তুকে তারা অতি সহজেই গ্রহণ করে। বাউলের সহজ সরল অনাড়ম্বর, জীবন-যাপন, পোশাক-পরিচ্ছদ, হাতে একতারা, ত্যাগী মনোভাব গণশিক্ষা বা লোকশিক্ষা প্রসারে খুবই সহায়ক। কাজেই আমাদের সমাজে যত্রতত্র গজিয়ে ওঠা অপসংস্কৃতির আগাছাকে নির্মূল করতে বাউল সংগীত একটি শক্তিশালী গণমাধ্যম। বাউল সংগীত একদিকে অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করবে অপরদিকে মানুষের মনে সুস্থ সংস্কৃতির পরিবেশ গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। এটাই ছিল বাউল শিল্পীদের অভিমত।

৪. বর্তমান আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় বাউল সংগীত ও বাউল শিল্পীর অবস্থান-সমীক্ষালব্ধ বিষয় থেকে জানা যায় বাউল শিল্পীগণ কেউ ভূমিহীন, খেতমজুর, দিনমজুর, ক্ষুদ্রকৃষক, রিক্সা চালক বা কেউ ছোটো ব্যবসায়ী। সমাজে একবারে নীচের তলার মানুষ শিল্পীগণ। তাদের মাথাপিছু নগদ আয় দু'ধরনের—

১. সংগীত চর্চার মাধ্যমে।

২. অন্যান্য উপায়ের মাধ্যমে।

সংগীত চর্চার মাধ্যমে শিল্পীগণ মাথাপিছু গড় আয়ের পরিমাণ ২০০০ টাকা, অন্যান্য উপায়ে মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ ৪০০০ টাকা মোট বাৎসরিক আয় ৬০০০ টাকা। এই আয় থেকেই বোঝা যায় লোক শিল্পীগণের অবস্থান। অবশ্য বাস্তবে (চাল, ডাল, তরকারি, কাপড়চোপড়, পোশাক-আশাক) পাওয়া এর সঙ্গে ধরা হয়নি।

বাউল শিল্পীগণের আর্থিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া গেল। শিল্পীগণ সমাজের সবচেয়ে দরিদ্র শ্রেণির মানুষ। কিন্তু সমাজে বাউল শিল্পীদের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা-ভালোবাসা এবং হার্দিক টান আছে। একজন বাউল শিল্পী পরণে গেরুয়া সাজ, মাথায় পাগড়ি, একহাতে একতারা অন্যহাতে ডুগি, পায়ে নুপুর মঞ্চে উঠে নাচতে নাচতে যখন উদাত্ত কণ্ঠে গান ধরেন এবং যে গান মানুষের জীবনের গান, হৃদয়ের গান, প্রাণের গান, সেই গানে সবাই মুগ্ধ হয়, হাত তালি দেয় বাউলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কিন্তু সেই শিল্পীর বাস্তব জীবনের কথা ক'জন জানে? কোথায় থাকে? কেমন থাকে? কি খায়? হাঁড়ির খবর ক'জন আর রাখে?

লোকশিল্প বেঁচে থাকে মানুষের সহযোগিতায়, সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির উপর। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির কারণে সিনেমা দূরদর্শন ভিডিও ক্যাসেট সিডি প্রভৃতির ফলে মনোরঞ্জনের মাধ্যমে বৃদ্ধি পেয়েছে। আগেকার মতো শিল্পীদের তেমনভাবে ডাকা হয় না, আর ডাকলেও লোকশিল্পীদের টাকা দিতে হলে উদ্যোক্তাদের ভালো চোখে দেখে না। অবশ্য কিছু খ্যাতনামা বাউল শিল্পী আমন্ত্রণে বিদেশে পাড়ি দিয়েছেন। আমাদের গৌরবময় ঐতিহ্যকে বিদেশিদের কাছে তুলে ধরেছেন। এজন্য আমরা গর্ববোধ করতে পারি। কিন্তু বাউল সংগীত তথা লোকসংগীতকে ঐ কয়েকজন খ্যাতনামা শিল্পী বাঁচিয়ে রাখতে পারবেন না। বাঁচিয়ে রাখবেন জেলায় জেলায় গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য শিল্পী সমাজ। আর শিল্পী সমাজকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব সকলের। যারা নিজেদের দুঃখ, জীবনের যুদ্ধের যন্ত্রণার কথা ভুলে, মানুষের জন্য, মানুষের আনন্দের জন্য গান গায় তাদের জন্য সমাজের ও কিছু করতে হবে। নতুবা আমাদের গর্বের বস্তু আমাদের ঐতিহ্য লোকশিল্প এবং শিল্পী সমাজ ধ্বংস হয়ে যাবে।

৫. বাউল সংগীত ও বাউল শিল্পীদের মর্যাদা রক্ষায় সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা—পশ্চিমবঙ্গে লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানের চর্চা, সমীক্ষা, গবেষণা শুরু হয়েছে ব্যাপকভাবে ৮০-র দশকে। লোকসংস্কৃতি পর্ষদ পরবর্তীকালে আদিবাসী ও লোকসংস্কৃতি কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। দেশের মধ্যে একমাত্র কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে লোকসংস্কৃতি বিষয়ে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পড়াশোনার ব্যবস্থা আছে। কিছুদিন জেলায় জেলায় লোকসংস্কৃতির আয়োজন করা হতো। কিন্তু বর্তমানে বিশ্বায়নের যুগে লোকশিল্পীদের রক্ষা করতে লোকশিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। শ্রেণিসংগ্রামে তথা সমাজ বিপন্ন লোকশিল্পীদের যুক্ত করতে হবে। লোকশিল্পীদের সহায়তায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। যথা—

১. লোকশিল্পীদের পরিচয় পত্র।

২. দুঃস্থ ও মহিলা লোকশিল্পীদের বাদ্যযন্ত্র ও প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করা।

৩. লোকশিল্পীদের ট্রেনে, বাসে, যাতায়াতের বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা করা।

৪. স্থানে স্থানে লোকমঞ্চ বা লোকসংস্কৃতি কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে।

৫. লোকশিল্পীদের জীবনবীমা ও স্বাস্থ্যবীমার আওতায় আনতে হবে।

৬. সরকারি সহায়তায় লোকশিল্পীদের জন্য ভবিষ্যনিধি প্রকল্প চালু করতে হবে।

৭. ষাটোর্ধ্ব কর্মক্ষম লোকশিল্পীদের বার্ধক্য ভাতার ব্যবস্থা করতে হবে।

৮. জন কল্যাণমূলক কর্মসূচীতে লোকশিল্পীদের কাজে লাগাতে হবে।

৯. সরকারিভাবে লোকশিল্প মেলা আবার চালু করতে হবে।

এর সঙ্গে সঙ্গে বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, দুর্গাপূজা কমিটি, কালীপূজা কমিটি, ক্লাব, লাইব্রেরি, বিভিন্ন উৎসব কমিটি লোকশিল্পীদের অনুষ্ঠানের জন্য বাজেটের কিছু টাকা ব্যয় করতে পারে।

বাংলা লোকগীতির যে বিচিত্র সম্ভার সেখানে তত্ত্বসংগীতের নিরিখে বাউল গানের গুরুত্ব অপরিসীম। বাউল পদকর্তারা হলেন লৌকিক সাধক, প্রচারক আর গীতিকাররা হলেন জীবনপ্রেমী ও ইহবাদী। কল্পিত কোনো অলৌকিক ও অবাস্তব বিষয়ে বা ব্যক্তিতে তাদের বিশ্বাস নেই তা হতে পারে ঈশ্বর হতে পারে, স্বর্গ-নরক কিংবা হতে পারে বৃন্দাবন-মথুরা-মক্কা, এজাতীয় ধারণায় যারা বিশ্বাসী তাঁদের লোকায়ত বর্গের সাধকরা বলেন অনুমানপন্থী আর তাঁরা নিজেদেরকে মনে করেন বর্তমানপন্থী বাউল। তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ দিয়ে, তাঁর চলন-বলন দিয়ে তাঁর আচরণ দিয়ে, তাঁর হাতের একতারার সুর দিয়ে কণ্ঠের সুরে-ছন্দে-তালে, নৃত্যে পরকে করে আপন, জয় করে মানুষের হৃদয়, মানুষকে ভালবাসাই হল বাউল দর্শন। বাউলের জীবনই বাউলের দর্শন-মানব প্রেম বিশ্বপ্রেম—

আছে মানুষ এই মানুষেতে
মানুষ আছে হুঁশেতে
মানুষ ডুবে মানুষ ভাসে
মানুষ কাঁদে আর মানুষ হাঁসে
মানুষ যায় আর মানুষ আসে
শুধু কর্ম প্রকাশ করিতে।
বাউল বলে
এক তারাটা একটি তারে
পরকে যে আপন করে
সেই আপনার আপন যেজন
সেই তো হয় বাউল।

তথ্যের সন্ধানে

১. অচিন্ত্য জানা : 'সমীক্ষা-বাউল ও বাউলের জীবন', রাঢ় আকাডেমি, কাটজুড়িডাঙ্গা, বাঁকুড়া, ডিসেম্বর ২০০৬

২. শক্তিনাথ ঝা সম্পাদিত : 'বাউল ফকির পদাবলী', প্রথম খণ্ড, মনফকিরা, হাওড়া, ২০০৯

৩. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : 'বাংলার বাউল ও বাউল গান', দীপান্বিতা, কলকাতা

৪. সুধীর চক্রবর্তী : 'বাউল ফকির কথা', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৪

মনের মানুষ

ড. মধুমিতা সরকার

জগতে চারিদিকে অচিন্তনীয় অপরিসীম রহস্য আর তার মধ্য দিয়েই চলে জীবনযাত্রা নানা রহস্যের মাঝে এগিয়ে চলা জীবন যেন নিঃসীম অন্ধকারে স্রোতে ভাসানো প্রদীপের মতো। এই অতল অন্ধকারের কোনো কূল কিনারা নেই। শুধু প্রদীপের শিখা খানিক আলোর দিশা দেয়, দেয় ভরসা। রহস্যপূর্ণ জীবন ও জগতে পথ দেখায় হৃদয় জ্যোতি-মানুষের মনের মানুষ। যাকে বস্তু জগতে লাভ করা যায় না, নাগালের মধ্যে পাওয়া যায় না, আয়ত্তে আনা যায় না, স্পর্শ করা যায় না, শুধু অনুভব করা যায়। ইনি গোপনে প্রতি মানুষের অন্তরে বিরাজমান, যাঁকে ভালোবাসার ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষার দ্বারা অনুভব করে গভীর এক ঐশ্বরিক আনন্দে মগ্ন হওয়া যায়। এই আপন মনের মানুষকে হারিয়ে তাঁকে বাইরে খুঁজতে গিয়ে মানুষের যত দুর্গতি হয় আপনকে পর করে দিয়ে লোভ, অর্থ, খ্যাতি, ভোগে নিজেকে এবং তার সঙ্গে তাঁকে খুঁজে ফেরে মানুষ প্রাপ্তির প্রত্যাশায়-কিন্তু প্রাপ্তির ভাণ্ডার থাকে অপূর্ণ। কান্না, বিবাদ, বেদনায়, অপ্রাপ্তিতে ভরে যায় মানুষ হয়ে পড়ে বিক্ষিপ্ত। কারণ মানুষের মনের মানুষ আসলে সকল মনের মানুষ। আপন মনের মধ্যে তাঁকে দেখতে পেলে সকলের মনের মধ্যেই তাঁকে পাওয়া যায়। কারণ সকল অনুভূতি সকল অভিজ্ঞতার কেন্দ্রে সেই মনের মানুষের অধিষ্ঠান। এই মনের মানুষের সন্ধানে, তাঁকে পাওয়ার অন্বেষণ যে ধর্মের মূল বিষয় তা বাউল সম্প্রদায়ের ধর্ম—

> বাউল/সুর বেঁধে নিল আপন একতারাতে/ডেকে বেড়ালো নিরুদ্দেশ মনের মানুষকে/অনির্দেশ্য বেদনার খ্যাপা সুরে।[১]

এই মনের মানুষের কোনো ধ্যানরূপ বা কোনো মূর্তিতত্ত্ব নেই। মনের মানুষ বাউলের আদর্শ। এই মনের মানুষকে তাঁরা খোঁজ করেন আপন মনের গহন আনন্দে, গুরু বন্দনায়।

বাউলরা মন মানেন-মনের মধ্যে একটি পরম মন আছে বলে তাঁদের ধারণা। এই পরম মনের স্পর্শ পাওয়ার জন্যই তাঁরা ব্যাকুল 'মনের মধ্যে মনের মানুষ করো অন্বেষণ'—এই অন্বেষণের তাড়ণায় বাউল খুঁজে ফেরে ক্ষ্যাপার মতো। লালনের একটি গানে বাউলতত্ত্ব ও মনের মানুষের তত্ত্ব সুন্দরভাবে প্রকাশিত—

> আমার এ ঘরখানায় কে বিরাজ করে
> আমি জনমভর একদিন দেখিলাম নারে।

নড়েচড়ে ঈশান কোণে
দেখতে পাইনি এ নয়নে।
হাতের কাছে যা ভাবের হাটবাজার
ধরতে গেলে হাত পাইনে তারে
সবে বলে প্রাণ-পাখি
শুনে চুপে চুপে থাকি।
...বলব কি সেই পড়শির কথা।
ও তার হস্ত-পদ-স্কন্ধ-মাথা নাইরে।
ওসে ক্ষণেক থাকে শূন্যের উপর
আবার ক্ষণেক ভাসে নীরে।[২]

বাউলরা এক ধর্ম সম্প্রদায়ের অধীনস্থ এমন এক গোষ্ঠী যাদের একটি নির্দিষ্ট ধর্ম-জীবন আছে। বিশিষ্ট আচার-আচরণ আছে, আছে গূঢ় সাধন প্রণালী। বাংলার নানা স্থানে ছড়িয়ে থাকা বাউলের মধ্যে হিন্দু ও মুসলিম উভয়ই রয়েছে যারা একই প্রকারের সাধনায় নিযুক্ত। কালের প্রবাহে বাংলার ইতিহাসের নানা প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ গতি স্রোতে সমাজের নানা রূপান্তরের পলে এই ধর্মের উদ্ভব ও বিস্তার যা আজ সমাজের রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় বিলোপের পথে। বাউল ধর্ম হলো গণধর্ম—নিতান্ত সাধারণ মানুষের ধর্ম এবং এর উদ্ভবের পেছনে কোনো বিশিষ্ট সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক পটভূমিকা ছিল। স্মার্ত মতের প্রাধান্য বর্ণ-জাতিভেদ, ধনী-বড়ো মানুষের অত্যাচার, পরিবেশ ও রাষ্ট্রনৈতিকগত সমস্যা ও প্রতিকূলতা বাউলধর্মের উদ্ভব ও বিকাশের পেছনে ক্রিয়াশীল ছিল বলেই মনে হয়। বাউলধর্মের উদ্ভব সম্বন্ধে একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ণয় করা সম্ভব নয়। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলার বাউল ও বাউল গান' নামক গবেষণাধর্মী সুবিশাল জনপ্রিয় প্রামাণ্য গ্রন্থে নানা যুক্তিপূর্ণ তথ্যাদি উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে বাউলধর্মের উদ্ভব ও প্রসার সম্পর্কে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন—

> ১৬২৫ খ্রিস্টাব্দ হইতে ইহার উদ্ভব হইয়া ১৬৭৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইহার পূর্ণরূপ ধারণ এবং ১৭০০ খ্রিস্টাব্দ এতক একটি নির্দিষ্ট সাধন পদ্ধতি বিশিষ্ট হিন্দু বৈষ্ণব ও মুসলমান ফকিরের মিলিত ধর্ম হিসেবে সমগ্র বঙ্গো ইহার প্রসার সহজভাবেই অনুমান করা যায়।[৩]

'বাউল' শব্দটি এসেছে সংস্কৃত 'বাতুল' শব্দ থেকে যার অর্থ উন্মাদ বা পাগল। 'বাতুল' অর্থাৎ উন্মাদ বা ভাবোন্মাদ অর্থ থেকে পরবর্তীকালে

> একটি বিশিষ্ট ভাবের নিরন্তন আবেগে বাহ্যজ্ঞান শূন্য বা ভাবোন্মাদ বা ধর্মোন্মাদ, বেশ-বাস ও আচার-ব্যবহারে প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতির বন্ধনমুক্ত, লোকাচার পরিত্যাগী, আত্মকর্ম-সমাহিত, উদাসীন সাধকগণ বাউল নামে পরিচিত হইয়াছে।[৪]

অর্থাৎ একটি বিশেষ ধর্মের লোকদিগকে বাউল বলে যাঁরা বাতুল বা পাগল, যাদের আচার-আচরণ সাধারণের তুল্য নয়, এই সাধারণ সমাজ-বহির্ভূত আচার-ব্যবহার সম্বন্ধ ধর্মসম্প্রদায় হলো বাউল। আমাদের সংস্কৃতিতে 'পাগল' এক বিশেষ, আদরের সম্বোধন যার আলাদা আধ্যাত্মিক তাৎপর্য বর্তমান-ঈশ্বরপ্রেমে মাতোয়ারা যাঁরা। তাই বাউল মানে অপ্রাপ্যনীয়কে, অধরাকে ধরতে চাওয়ার দুর্নিবার টান বা মায়াবী টান। সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে অরূপের আকাশে মিলনের প্রত্যাশায় ডানা মেলে উড়ে যাওয়ার ক্ষ্যাপামি বাউলের সম্বল। এ এক মুক্তির বোধ অহং থেকে মুক্তি।

বাউলের সাধনা হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত সাধনা। এই ধর্ম-চিন্তায় রয়েছে উদারতা ও

অসাম্প্রদায়িক বিচার ধারার প্রকাশ যেখানে কোনো ভেদাভেদ নেই। আর গান তাঁদের সাধনার একটা বড়ো অঙ্গ। এই গানের মধ্য দিয়ে বাউলদের ধর্ম-সাধনার ও তত্ত্বাদির ইঙ্গিত থাকে, তাদের গভীর আত্মজিজ্ঞাসারও প্রকাশ ঘটে। বাউলদের নির্দিষ্ট সাধন মার্গের তত্ত্ব, বিধি ও নিষেধ, সাধনমার্গের নানা অভিজ্ঞতা প্রভৃতি তাদের গানের প্রধান বিষয়বস্তু। শাস্ত্র বা দর্শন বা তত্ত্ব বিবরণ বলে আলাদা কিছুই নেই বাউলদের। তাদের যা কিছু তা সবই গানের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত তত্ত্ব-দর্শন-সাধনা সমস্তই। শাস্ত্রীয় প্রথা, আচার-আচরণ মানে না বাউলরা, প্রতিমা পূজাতেও বিশ্বাসী নয়। এরা দেবতাকে মানুষের থেকে আলাদা করে দেখে না। মানুষের অন্তরতম সত্তার মধ্যেই সেই চিরন্তন মানুষের সন্ধান করে এরা, যাকে এরা বলে মনের মানুষ। এই মনের মানুষকে অন্বেষণ করে, জাগিয়ে তুলতে চায়।

মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত বা শিক্ষিত সম্প্রদায় বাউলদের সামাজিক জীবন ও সাধনাকে নিজেদের সমাজ জীবনে গ্রহণ করেনি, বরং বাঁকা দৃষ্টিতেই দেখেছে। ফলে কোনো আর্থিক বা সামাজিক আনুকূল্য ছাড়াই যুগ যুগ ধরে বাউলরা নিজ-অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রেখেছে এবং নিজেদের ধর্ম সাধনাকে অটুট রেখেছে। বাউলদের সাধনার মূল কথাই হচ্ছে 'মনের মানুষ' তত্ত্ব। বাউলরা তাদের মনের মানুষকে খুঁজে বেড়ায়। এই মনের মানুষ তাদের অন্তরে বাস করে যেন লুকোচুরি খেলে বেড়ায় বাউলদের সঙ্গে। সকল অভিজ্ঞতা, সকল অনুভূতির কেন্দ্রে থাকে যে তাকেই পাগলের মতো খুঁজে বেড়ায় বাউল। তাদের মতো আপনাকে জানতে হবে—যখন আপনাকে জানা যাবে তখন আপনার মধ্যে তাঁকে পাওয়া যাবে—এটাই তাদের ধর্মের মূল বিষয়। বাউলের মধ্যে চিরন্তন প্রশ্ন রয়েছে—অন্তরতর পরমাত্মা বা মনের মানুষ যখন তাঁদের মনের মধ্যে গোপনে রয়েছেন তখন তাঁকে কী প্রকারে জানা যায়, পাওয়া যায়—এই ব্যাকুলতায় তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় বাউলকে। প্রাপ্তির অনুভবে বাউল যদি তার উপলব্ধিকে নিশ্চলতার বন্ধনে বেঁধে ফেলে তখন সে সম্পদকে হারায়, প্রাপ্তির ঝুলিতে পড়ে থাকে বন্ধন। কারণ সন্ধান এবং প্রাপ্ত হওয়া একসঙ্গে চলে—যখনই সন্ধানের অবসান ঘটে তখনই উপলব্ধির বিকৃতি ও বিনাশ হয়। উপনিষদের 'আত্মানাং বিদ্ধি' (অর্থাৎ নিজেকে জানো) কথার সঙ্গে বাউলদের আপনাকে জানার এবং আপনাকে জানার মধ্য দিয়ে তাঁকে জানার সাম্য খুঁজে পাওয়া যায়। বাউলরা এমন একজন মানুষের কথা চিন্তা করে যিনি গোপনে প্রতি মানুষের অন্তরে বিরাজমান। অপরদিকে উপনিষদের মানুষ যিনি নিরাকার এবং সর্ব মানবের অন্তরে বিরাজ করেন—সেই রূপ মানুষের সন্ধানে বাউল মগ্ন থাকে-যাঁকে প্রেমের দ্বারা, ভালোবাসার ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষার দ্বারা অনুভব করে গভীর এক ঐশ্বরিক আনন্দে মত্ত হওয়া যায়। উপনিষদের মর্মবাণীর সঙ্গে বাউলের সাধনার মর্মবাণীর সাম্য রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করে। তিনি অনুভব করতেন-মনের মানুষ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে তাঁকে খুঁজে বেড়ানোই বাউল ধর্ম সাধনার মূল মন্ত্র। আর বাউলের এই মূল কথাই উপনিষদের ভাষায় শোনা গিয়েছে—'তাং বেদ্যং পুরুষং বেদ মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ'—অর্থাৎ যাকে জানবার সেই পুরুষকেই জানো নইলে মরণবেদনা। অপণ্ডিত বাউলগণ একথা বলে সহজ ভাবে—যাঁকে সকলের চেয়ে জানবার তাঁকেই সকলের চেয়ে না জানবার বেদনা কাজ করে যায়। 'অন্তরতর হৃদয়াত্মা'—উপনিষদের এই বাণী বাউলের মুখে 'মনের মানুষ' বলে প্রতিধ্বনিত হয় যা রবীন্দ্রনাথকে বিস্মিত করে।[৫] বাউল সাধনার মূল

দর্শন রবীন্দ্রনাথ নিজের জীবন দর্শন দিয়ে উপলব্ধি করেছেন এবং বাউল ধর্ম-দর্শন ও সংগীতকে পাদপ্রদীপের আলোয় আনার প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গে নিজের নানা রচনায়, প্রবন্ধে, আলাপ-আলোচনায়, বক্তৃতায় বাউল নিয়ে মতামত প্রকাশ করেছেন। শুধু তাই নয়, নিজের ধর্ম চিন্তায় গ্রহণ করেছিলেন বাউলের 'মনের মানুষ' অন্বেষণের বাণী জীবনদেবতার মধ্যদিয়ে।

বাউলরা গুরুবাদে বিশ্বাসী, গুরুর সহচর্যেই অধ্যাত্ম সাধনা, পরমাত্মার অন্বেষণ এবং জীবনের সকল প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করার প্রয়াস করে। গুরুই সকল শক্তির উৎস। এই গুরুর উপদেশ গোড়ায় নিজেকে জানতে হবে। যখন নিজেকে জানা হয়, তখন সেই আপনার মধ্যে তাঁকে পাওয়া যায়। তবে বাউল-গুরুরা নির্বিচারে সকলকেই সাধন প্রণালী শেখান না। তাঁদের ধর্ম-বিশ্বাসের স্তর আছে যা বিশেষভাবে গোপনীয়। বাউল ও তাঁদের গুরু উভয়েই অত্যন্ত রক্ষণশীল। আপন ধর্ম সাধনার সামান্য বিচ্যুতিও এঁরা মেনে নেন না। বাউলের সাধনা, আচার-ব্যবহার, জীবন-যাপন সাধারণ মানুষের কাছে (শিক্ষিত মানুষও) অস্বাভাবিক বলে মনে হয়, ফলে বাউলরা নিজেদের সাধনা, সাধন-পদ্ধতি, মতবাদ গোপন রাখে, হেঁয়ালিপূর্ণ ভাষায় গানে উপস্থাপন করে। তবে স্বতন্ত্র থাকার চেষ্টা করলেও বাইরে তাঁরা সাধারণ রীতি-নীতি মানার ভাব দেখায়, লোকাচার পালনের অভিনয় করে—আর সমস্তটাতেই তাঁদের গুরুর নির্দেশও তাই থাকে। শুধু গুরু বা গুরুভাইদের মধ্যে তাঁদের যথাযথ আত্মপ্রকাশ। তাই বাউলের দুটি জীবন-একটি বহির্জীবন ও অন্যটি অন্তর্জীবন। একটি ব্যবহারিক অপরটি সাধক জীবন যা পাশাপাশি অবস্থান করে। তবে অন্তর্জীবনই প্রকৃত। মনের মানুষের অন্বেষণ। তারা নিরন্তর একটা ভাবের ঘোরে জীবন কাটায়। এই ভাবের ঘোরে সংসার ও সমাজকে উপেক্ষা করে নিজের মনের সঙ্গেই লীলা করে, কখনো উন্মত্ত ও ক্ষিপ্তের মতো অবস্থান করে—

মহাভাবের মানুষ হয় যে জন্য
তারে দেখলে যায় রে চেনা।
(ও) তার আঁখি দুটি ছল ছল
মৃদু হাসি বদন খানা।

বাউলের জীবনে চলে মরমি অন্বেষণ—মনের মানুষ সন্ধান করার গভীর নির্জন পথে এগিয়ে যায় বাউল। তাঁদের সাধনার মূল নির্যাস 'মনের মানুষ'-এর অন্বেষণেই নিহিত। সমাজের রক্তচক্ষু ও নাসিকা কুঞ্চনের ফলে নিজস্ব অনুভবকে গোপনে রাখতে বাধ্য হয় বাউলরা, প্রকাশ করে হেয়ালিপূর্ণ ভাষায় আড়াল করে, যার অর্থ বই বা পুথি পড়ে জানা সম্ভব নয়, জানতে হয় সেই সম্প্রদায়ভুক্ত হয়ে সাধনার পথে এগিয়ে অথবা ক্ষেত্র সমীক্ষার দ্বারা প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসে।

অন্তর্গত ভালোবাসার টানে বাউলরা 'মনের মানুষে'র খোঁজে ব্যাকুল হয়ে ফেরে, গেয়ে ওঠে—'আমি কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যে রে।' তাদের সাধনার পথে পরমাত্মার প্রতি জীবাত্মার ব্যাকুলতা অসাধারণ রূপ নেয়, উপনিষদ যাকে বলেছে পরমাত্মা তাই বাউলের মনের মানুষ, ইনিই মানুষের অন্তরতম সত্তা। দেহটা খাঁচা আর সেই অন্তরতম সত্তাই 'অচিন পাখি', যা জাতি-ধর্ম-গোত্রহীন। সমস্ত মানবের মধ্যে যে চিরন্তন সত্য তার প্রকাশ ঘটে বাউল সাধনার প্রধান অঙ্গ বাউল গানে। বাউলরা সাধারণ হয়েও অসাধারণ। অরূপ মূর্তি রূপের

আড়ালে—এই সত্যটাই প্রতিষ্ঠা করে বাউল সম্প্রদায়।

বাউল ধর্ম নিজেকে জানার ধর্ম, শাস্ত্রাচারহীন মহা মিলনের ধর্ম, ভাবপ্লাবী হৃদয়বৃত্তির ধর্ম। তারা 'সোনার মানুষ' গড়তে চায় যারা মানুষে মানুষে ভেদাভেদ সৃষ্টিতে বিশ্বাসী নয়। তাদের মতে এই সোনার মানুষ গড়তে পারলে মনের মানুষ পাওয়া সহজ হবে। এ কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের কথা নয়, বরং সমস্ত মানুষের মধ্যে যে চিরন্তন সত্য আছে এ হলো তার আহ্বান। মানুষ আপনার সমস্ত কিছুর মধ্যে আপনার চেয়ে বড় কাউকে অনুভব করে। আপনার সমস্ত সীমার মাঝে সীমার অতীত সেই অচেনাকে ক্ষণে ক্ষণে জানতে পারা ও সেই অসীমকেই আপন করতে পারার জন্য প্রাণের ব্যাকুলতার প্রকাশ ঘটে বাউলের মনের মানুষের অন্বেষণে। সকল বেড়ার বাইরে সহজ ভক্তির আলোকে খ্যাপার মতো খুঁজে বেড়ায় বাউল তাঁর মনের মানুষকে। তাঁর মনে একটাই ব্যাকুল জিজ্ঞাসা—'মিলন হবে কতো দিনে আমার মনের মানুষেরই সনে'—যা তাড়িয়ে বেড়ায় তাঁকে সারাজীবন। এই মনের মানুষের সন্ধানেই বাউলের দীর্ঘ পথ পরিক্রমা চলে অখণ্ড মানবধর্মের সঞ্চয় থেকে গ্রথিত জীবনমন্ত্রকে পাথেয় করে শাস্ত্রের শাসনকে অগ্রাহ্য করে।

উৎসের সন্ধানে

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'পঁচিশে বৈশাখ', ''শেষ সপ্তক'', সঞ্চয়িতা, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০০২, পৃ. ৩৩৯
২. শান্তি সিংহ : 'বাউল গান প্রসঙ্গে', পুস্তক বিপণি; প্রথম প্রকাশ মার্চ, ২০১৮, পৃ. ২৩-২৪
৩. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : 'বাংলার বাউল ও বাংলা গান', ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, প্রথম প্রকাশ ১৩৬৪, পৃ. ১১০
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭
৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'বাউলগান, সংগীত চিন্তা', বিশ্বভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৪১১, পৃ. ৩৪

তথ্যের সন্ধানে

১. লীনা চাকী সম্পাদিত : 'রবীন্দ্রনাথ ও বাউল', পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ ২০১১
২. সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত : 'নির্বাচিত ধ্রুবপদ' (৩), গাংচিল, প্রথম প্রকাশ মে ২০১০
৩. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ : 'সংগীতচিন্তা', বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ ১৪১১
৪. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : 'বাংলার বাউল ও বাউল গান', ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, প্রথম প্রকাশ ১৩৬৪

দেহতত্ত্বের দুই ভিন্ন ধারার সাধন-সংগীত তুকথা ও বাউল

ড. পবিত্র রায়

বাউল গান মূলত বীরভূম, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া প্রভৃতি জেলায় অধিক পরিচিত হলেও বর্তমানে প্রায় সমগ্র বাংলায় একটি পরিচিত সাধন-সংগীত। অপরদিকে তুকথা গান মূলত উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিম সীমান্ত অসমের একটি প্রাচীন সাধন সংগীত এবং তা এই অঞ্চলের বাইরে প্রায় অপরিচিত। তুকথা গানের সঙ্গে বাউল গানের অনেক ক্ষেত্রে মিল আছে। দুই ধারার সংগীতই সাধন-সংগীত, উভয় প্রকার গানই দেহতত্ত্বমূলক, তাই স্বভাবতই গুরুমুখী। সেজন্য অনেকে মনে করেন যে, 'তুকথা' হল উত্তরবঙ্গের বাউল গান। কিন্তু ঐতিহ্যগত প্রেক্ষাপট বিচার করলে দেখা যায়, 'তুকথা' গান বাউল অপেক্ষা প্রাচীনতর। আলোচ্য দুই ধারার সংগীতের মধ্যে যেমন যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে, তেমনি এদের মধ্যে ঐতিহ্য, তাত্ত্বিক পরিসর ও গায়েন রীতিতে রয়েছে পার্থক্য। সুতরাং এই দুই প্রকার সংগীত ধারার মধ্যে একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা যেতেই পারে।

উদ্ভব, বিকাশ ও তত্ত্ব : উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের 'বাংলার বাউল ও বাউল গান' গ্রন্থ এবং সুধীর কুমার চক্রবর্তী, শক্তিনাথ ঝাঁ প্রমুখ বাউল বিশেষজ্ঞের আলোচনা থেকে বাউল সম্প্রদায়ের উদ্ভব সম্পর্কে যা জানা যায়, তার সারকথা এই যে, বাংলার বাউল সম্প্রদায় মূলত সহজিয়া বৈষ্ণব সমাজ থেকে এসেছে। তার সঙ্গে মিলিত হয়েছে মুসলিম মরমিয়া সাধক সুফি সমাজ। এই দুই সম্প্রদায় জাতপাতের ঊর্ধ্বে গিয়া বাউল সমাজের উদ্ভব ঘটায়। কিন্তু তথাপি 'বাউল' ও 'ফকির' পরিভাষা দুটি আলাদা ভাবে প্রয়োগ হয়ে থাকে। সুতরাং অনুমান করা যায় যে, যাঁরা সহজিয়া বৈষ্ণব সমাজ থেকে এসেছেন তাঁরা 'বাউল' নামে পরিচিত। অপরদিকে যারা মুসলমান সমাজ থেকে এসেছেন তাঁরা 'ফকির' নামে পরিচিত। উভয় সমাজের মধ্যে নামগত ও ঐতিহ্যগত পার্থক্য থাকলেও তাদের মতাদর্শে বিশেষ পার্থক্য নেই। তাই অনেক ক্ষেত্রেই বাউল-ফকির কথাদুটি একসঙ্গেই উচ্চারিত হয়। এ বিষয়ে বিস্তৃত বিশ্লেষণ আমাদের লক্ষ্য নয়, আমাদের লক্ষ্য তুকথা ও বাউলের তুলনামূলক বিশ্লেষণ। তাই সেদিকেই মনোনিবেশ করা যাক।

তুকথা গান সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচিত বিভিন্ন প্রবন্ধ বা গ্রন্থ থেকে সন্তোষজনক ধারণা পাওয়া যায় না। এর প্রধান কারণ এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ইতিহাস সম্পর্কে তথ্যের অস্পষ্টতা। যেমন আমরা ড. নির্মলেন্দু ভৌমিকের কথাই ধরতে পারি। তিনি তাঁর "প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের

লোকসংগীত" গ্রন্থে 'ভক্তিগীতি' নামক দশম অধ্যায়কে তুকখা, দেহ-তত্ত্ব, গুরুর উদ্দেশ্যে, হেঁয়ালি প্রভৃতি ভাগে বিভক্ত করে বিচ্ছিন্ন ভাবে এই গানগুলোকে আলোচনা করেছেন। সেক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টি ছিল খণ্ডিত। তাঁর দু-একটি মন্তব্য উদ্ধার করলেই বিষয়টি বোঝা যাবে। তিনি দেহতত্ত্বমূলক গান সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হিন্দু, বৌদ্ধ, নাথ, সহজিয়া বৈষ্ণব, বাউল প্রভৃতি তন্ত্রসাধক সম্প্রদায়ের গানের সঙ্গে 'প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের' দেহতত্ত্ব গানের তুলনা করে বলেছেন—

> বর্তমান সংকলনের ৪১০ হইতে ৪১৫ সংখ্যক দেহতত্ত্বমূলক গানগুলির মধ্যে হিন্দুতন্ত্রের সাধারণ ধারণাগুলি ব্যক্ত হইয়াছে। অন্যান্য দেহতত্ত্বমূলক গানগুলির ব্যাখ্যা যাহার জানা তাঁহার নিকট ইহা কিছুই নতুন ঠেকিবে না।[২]

আবার 'গুরুর উদ্দেশে' গান সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন—

> আলোচ্য 'গুরুর উদ্দেশে' গুচ্ছের গানগুলি কোনো বিশেষ একটি ধর্মপন্থীর রচনা নহে। ইহা বাউলের গুরুবাদ হইতে পারে, সহজিয়া বৈষ্ণবের গুরুবাদ হওয়াও আশ্চর্যের নহে। সুতরাং কোনো বিশেষ একটি ধর্মমতকে পটভূমিকা রাখিয়া, সেই ধর্মমতের আলোকে বর্তমান 'গুরুর উদ্দেশে' গানগুলি বিচার করিতে যাওয়া সঙ্গত হইবে বলিয়া মনে হয় না। কাজেই সাধারণভাবে, ভারতের সকল ধর্মের প্রধান ও অপ্রধান ধর্মে গুরুর গুরুত্ব ও ভূমিকা কি ও কেমন, সেই হইতেই বর্তমান গানগুলির বিচার করিব।[২]

উপরের উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, ড. ভৌমিক মনে করছেন উত্তরবঙ্গের দেহতত্ত্ব বা গুরুবাদী গানগুলো কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের নয়; সেখানে গৌড়ীয় বৈষ্ণব বা বাউল প্রভৃতি যে কোনো ধারার প্রভাব থাকতে পারে। কিন্তু ক্ষেত্র-সমীক্ষা ও অপরাপর তথ্য থেকে দেখা যায় যে, দীর্ঘদিন পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতিতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ও বাউলের প্রভাব পড়েনি। এমনকি বর্তমানেও উত্তরবঙ্গের লোকসংগীতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের বিশেষ কোনো প্রভাব দেখা যায় না, যতটুকু দেখা যায়, সেটা গৌড়ীয় বৈষ্ণব প্রভাব নয়, লৌকিক বৈষ্ণবীয় ধারার প্রাচীন কৃষ্ণকথার ঐতিহ্য। উত্তরবঙ্গের লোকসংগীতে রাধার কথা পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সে রাধা গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ত্বের চিরন্তন কিশোরী নন, একেবারেই গ্রাম্য রাজবংশী যুবতী।

প্রাচীনকালে উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিম অসম ছিল প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত। কামরূপ ছিল যোগসাধনার দেশ, তার উল্লেখ রামায়ণ, মহাভারত, বিভিন্ন পুরাণাদি, যোগিনীতন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে আছে। সেই রাজ্যের অন্তর্গত যে অঞ্চল, সেখানকার লোকসংগীতে যোগ সাধনা বা তন্ত্রের ধারা বাইরে থেকে আমদানী করতে হবে, সেরকম চিন্তা করা কিছুটা অস্বাভাবিক, বরং উল্টো ঘটাই স্বাভাবিক। তুকখা, দেহতত্ত্বমূলক, গুরুর উদ্দেশে প্রভৃতি গানগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণির গান ধরে নেওয়ায় ড. ভৌমিকের দৃষ্টিভঙ্গি খণ্ডিত হয়েছে। আমরা প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্য ও ক্ষেত্র সমীক্ষা থেকে বুঝতে পারি যে, এগুলো আসলে সবই তুকখা গানের অন্তর্গত।

'তুকখা' শব্দটি সম্ভবত একট বোড়ো মূলীয় শব্দ। বোড়ো ভাষায় 'থুকখা' শব্দের অর্থ হল কোনো কাজের জন্য দেহ-মনকে প্রস্তুত করা।[৩] তুকখা-সাধনার মূল কথা হল দেহ ও মনকে সাধনার জন্য প্রস্তুত করা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, তুকখা গানগুলো দেহবাদী ও মনোবাদী।

দেহবাদী গান দেহতত্ত্ব আর মনোবাদী গান মনোশিক্ষা নামে পরিচিত। কিন্তু এই দুই ভাগ কেবল চিন্তার ক্ষেত্রেই দেখা যায়। মূলে সেগুলো প্রায় একই। গুরু ছাড়া দেহতত্ত্ব বোঝা যায় না, মনোশিক্ষাও হয় না।

তুকখা গানগুলো কবে কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে, তা বলা কঠিন। প্রাচীন গানগুলিতে ধর্মীয় কোনো বিশিষ্ট মতধারার উল্লেখও পাওয়া যায় না। আমরা জানি সেন আমলে বৌদ্ধ ধর্মের উপরে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছিল। তার অনেক আগে থেকেই চর্যাগানগুলি রচিত হয়ে আসছিল। কিন্তু তার পরেও যে চর্যাগান লিখিত হয়েছে, বাংলার অনেক গবেষক পণ্ডিতই তার সন্ধান পেয়েছেন। কিন্তু সেগুলো পাওয়া গেছে নেপালে। বাংলায় বৌদ্ধ ধর্ম প্রায় একপ্রকার লুপ্ত হওয়ার মতোই অবস্থা তৈরি হয়েছিল। তবে গৌড়ে বৌদ্ধ ধর্ম নিষিদ্ধ হলেও কামরূপে তার প্রভাব কতটা পড়েছে, তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। সম্ভবত সেই ধারা কামরূপে গুপ্তভাবে প্রবহমান ছিলই। কিন্তু সেখানেও ক্রমান্বয়ে অনেক পরিবর্তিন ঘটে গেছে।

তারই সূত্র ধরে পরবর্তীকালে নাথযোগী, তুকখা প্রভৃতি যোগ সাধনার ধারার উদ্ভব হয়েছে বলে অনুমান করা যায়। আলোচ্য অঞ্চলের যোগীগণ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে হয়তো হিন্দুধর্মের মধ্যপন্থা অবলম্বন করে থাকবেন। কেন না তুকখা গানগুলি থেকে কোনো বিশিষ্ট মতধারা পাওয়া যায় না। শোনা যায় তুকখা-সাধকদের অনেকে মহামায়ার উপাসক ছিলেন। কিন্তু শক্তি-সাধনার বৈশিষ্ট্য তুকখা গানে বিশেষ পাওয়া যায় না।

জানা যায় প্রাচীনকালে তুকখা-সাধকদের 'খ্যাপা' বলা হতো। যিনি গুরু, তিনিই খ্যাপা। বাকিরা শিষ্য। এই অঞ্চলে গুরু-শিষ্য পরম্পরায় যে দেহ-সাধনা হত, তারই তত্ত্ব-কথা গানগুলিতে স্থান পেয়েছে। যেহেতু খ্যাপাদের গান, তাই এগুলো খ্যাপার গান নামেও পরিচিত ছিল। অপরদিকে যেহেতু এগুলো গুরু কর্তৃক শিষ্যকে মনোশিক্ষা দানের গান, তাই এগুলো মনোশিক্ষা নামেও পরিচিতি লাভ করে। তবে সামগ্রিকভাবে এগুলোকে 'তুকখা' গান বলা হত।

গানগুলো বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, তাঁরা সনাতন হিন্দু মতে সর্বদেবে বিশেষ করে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর—এই ত্রি-নাথের স্মরণে সাধনা করতেন। হরি বা কৃষ্ণের কথা তুকখা গানে পাওয়া গেলেও, সেখানে গৌড়ীয় বৈষ্ণব বা বাউলদের প্রভাব দেখা যায় না। বৈষ্ণব সহজিয়ারও প্রভাব নেই। সাধারণ লৌকিক দৃষ্টিকোণ থেকে উক্ত প্রধান তিন দেবতার যে ধারণা পাওয়া যায়, তারই কথা কিছু গানে পাওয়া যায়। তবে একেবারে হাল আমলের গানগুলোতে বৈষ্ণব প্রভাব দেখা যায়। এই ভাবধারা মূলত আধুনিক গায়ক-খ্যাপাদের দ্বারা আমদানিকৃত। খ্যাপা বা সাধকগণ শিষ্যকে সাধনার তত্ত্বকথা ও মার্গ সম্পর্কে যে নির্দেশ দিতেন, তাই গানগুলোতে প্রতিফলিত। কিন্তু তত্ত্ব কথা তো সবার সামনে প্রকাশ করা যায় না, তাই সে সব তত্ত্বমূলক গানগুলোর ভাষা ছিল হেঁয়ালিপূর্ণ। চর্যাগীতির সঙ্গে এগুলোর গভীর সংযোগ আছে বলে মনে হয়।

বহু প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষে দেহসাধনার উল্লেখ পাওয়া যায়। কখনও কেবল যোগসাধনা, কখনও সাধন-সঙ্গিনীর সঙ্গে সাধনা প্রচলিত ছিল। সম্ভবত আদিতে দেহসাধনায় সঙ্গিনী ছিল না। কেন না, চর্যায় সাধন সঙ্গিনীর স্পষ্ট কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। সে

সমস্ত গানে কামবৃত্তি বা যৌনাচারের যে সব কথা পাওয়া যায়, সেগুলো বাহ্যিক অর্থ মাত্র; সেগুলোর আভিপ্রায়িক অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন; সেগুলো সম্পূর্ণ রূপে যোগ সাধনার গুহ্য কথা, যা সাধকের নিজ দেহেরই অন্তর্গত। নিজেদের সাধন তত্ত্বকে সাধারণ মানুষের বোধ থেকে আড়াল করার জন্যই এই সন্ধ্যা ভাষার প্রয়োগ।

নাথ-যোগীদের সাধনাতেও কাম-সাধনার ব্যাপার নেই। দেহ সাধনার ধারায় এ দুটি পন্থাই প্রাচীন। তবে শক্তি সাধনায় সাধন সঙ্গিনীর কথা পাওয়া যায়, যার মূল ভিত্তি ছিল তন্ত্র। পরবর্তীকালে বৈষ্ণব সহজিয়া ও বাউল সাধনায় সঙ্গিনীর কথা পাওয়া যায়। কিন্তু প্রাচীন যোগ সাধনায় সঙ্গিনীর স্থান ছিল না। কেবল দেহ-মন-চিত্তকে একাগ্র করে কুণ্ডলিনী শক্তিকে সহস্রারে মিলিত করাই ছিল প্রাচীন যোগ সাধনার প্রধান লক্ষ্য। এর জন্য বাহ্যিক কোনো দ্বৈত-রূপের প্রয়োজন ছিল না। রামায়ণেও কুণ্ডলিনী যোগের উল্লেখ আছে। রাজ-কুলগুরু বশিষ্ট মুনি ছিলেন একজন যোগগুরু। সেখানেও কায়া-সাধনায় সঙ্গিনীর কোনো ইঙ্গিত নেই। সুতরাং সাধন-সঙ্গিনীর সংযোগ তন্ত্রোক্ত।

আমাদের আলোচ্য তুকথা-গানেও সাধন-সঙ্গিনীর কোনো স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় না। অন্তত সাধন-সঙ্গিনীর সঙ্গে যৌনাচার কেন্দ্রিক সাধনার কোনো প্রসঙ্গ পাওয়া যায় না। সেদিক তেকে বলা যায় যে, তুকথা গানগুলো যতটা বৌদ্ধ ও নাথ যোগীদের কাছাকাছি, ততটা সহজিয়া বৈষ্ণব বা বাউলদের নয়। সুতরাং অনুমান করা যায় যে, তুকথা গানগুলো তন্ত্র-সাধনা নয়, যোগ-সাধনার গান, যা চর্যা ও নাথপন্থীদেরই সহযাত্রী। আমরা উপরে উল্লেখ করেছি যে, আলোচ্য অঞ্চলে মাতৃকা সাধনার প্রচলন ছিল। সেদিক থেকে মনে হতে পারে শক্তি সাধনার ধারাই এখানে প্রধান ছিল। কিন্তু এও দেখা যায় যে, এ অঞ্চলের বেশ কিছু নিদর্শন এখনও প্রাচীন বৌদ্ধ সাধনার চিহ্ন বহন করে চলেছে। তাছাড়া এ অঞ্চলে প্রাপ্ত বিভিন্ন মাতৃমূর্তিগুলি দেখে মনে হয়, সেগুলো সম্ভবত বৌদ্ধ দেবীরই মূর্তি। হয় তো তারই উত্তরাধিকার বহন করছে ময়নাগুড়ির 'জল্পেশ মনসা' বা 'পেট-কাটি মাও'।

এ অঞ্চল পরবর্তীকালে মূলত শৈবক্ষেত্র হিসাবেই পরিচিতি লাভ করেছে। কখন, কীভাবে এই ধর্মীয় পরিবর্তন ঘটল, তার কোনো ধারাবাহিক ইতিহাস মেলে না, ফলে তার সদুত্তরও কোথাও পাওয়া যায় না। বিভিন্ন তথ্য প্রমাণাদি থেকে অনুমান করা যায় যে, শাসক শ্রেণি যেহেতু শৈবপন্থী ছিলেন, ফলে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের উত্তরসুরীদের এ অঞ্চল ছেড়ে পালাতে হয়েছিল অথবা মত পরিবর্তন করতে হয়েছিল। সম্ভবত বৌদ্ধ সাধনারই পরিবর্তিত রূপের গুপ্ত স্রোত বইছে তুকথা গানগুলির মধ্যে।

দেহতত্ত্ব : যোগ-সাধনার প্রধান অবলম্বন হল দেহ। এই সাধনার মূল পন্থা দেহকেন্দ্রিক। তাঁদের মতে দেহভাণ্ডই ব্রহ্মাণ্ড। দেহের প্রধান তিনটি নাড়ি—ইড়া, পিঙ্গালা ও সুষুম্না। ইড়া-পিঙ্গালার গতি নিম্ন দিকে ও সুষুম্নার গতি ঊর্ধ্বমুখে। ইড়া ও পিঙ্গালার নিম্ন গতিকে রোধ করে তাকে সুষুম্নার ঊর্ধ্বমুখী প্রবাহে যুক্ত করাই সাধকের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু তার জন্য দেহ ও মনকে প্রস্তুত করতে হয়, দেহতত্ত্ব ভালো করে জানতে হয়। আর সেটা জানা যায় গুরুর কাছে জ্ঞান লাভ করে।

জ্ঞান সব সময় ধর্ম পথে চলতে বলে, আর মন সব সময় প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। প্রবৃত্তির

অনুসরণই অজ্ঞানতা। তাই গুরু-রূপ-জ্ঞান শিষ্য-রূপ মনকে সব সময় অজ্ঞানতা থেকে সরে আসতে বলে। এই তত্ত্বকথার মধ্যে চর্যাগীতির প্রতিধ্বনি শোনা যায়। চর্যার তত্ত্বেও জ্ঞান-অজ্ঞানের কথা আছে, আছে চিত্ত-চাঞ্চল্যের কথা—

কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।
চঞ্চল চীএ পইঠো কাল।।
দিঢ় করিঅ মহাসুহ পরিমাণ।
লুই ভণই গুরু পচ্ছিঅ জাণ।।
সঅল স(মা) হিঅ কাহি করিঅই।
সুখদুখেতেঁ নিচিত মরিআই।।
এড়িএই ছান্দকে বান্ধ করণক পাটের আস।
সুন্ন পাখ ভিড়ি লাহু রে পাস।।
ভণই লুই আমহে ঝাণে দিঠা।
ধমণ চমণ বেণি পিণ্ডি বইঠা।।[৪]

[বাচ্যার্থ—কায়া (রূপ) তরুবর। পাঁচটি (তার) ডাল। চঞ্চল চিত্তে কাল প্রবিষ্ট হয়েছে। দৃঢ় করে মহাসুখ পরিমাণ কর। লুই ভনে গুরুকে জিজ্ঞাসা করে জান। সমাধি সকল দিয়ে কি হবে, সুখদুঃখে নিশ্চিত ভাবে মরতেই হবে। (অতএব) ছন্দের বন্ধন ও করণের (ইন্দ্রিয় ক্রিয়ার) পটুত্বের আশা এড়াও। শূন্যতা পক্ষের দিকে ভিড়ে পাশ নাও। লুই ভনে, আমরা ধ্যানে দেখেছি। ধমন-চমন (নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস) দুই পিঁড়িতে বসেছি।]

এই চর্যা গানটিতে বলা হচ্ছে যে, মানুষের শরীর হল একটি তরু স্বরূপ। পাঁচটি তার ডাল থাকে। এই পাঁচটি ডাল পঞ্চ ইন্দ্রিয়। চিত্ত চঞ্চল হয়েছে বলে তাতে কাল প্রবেশ করেছে। কালের হাত থেকে উদ্ধার পেতে গেলে চিত্তকে দৃঢ় করতে হবে; তাকে মহাসুখের সঙ্গে বিলীন করতে হবে। এর পন্থা গুরুকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিতে হবে। বিবিধ ধ্যান-সমাধির দ্বারা কিছু লাভ করা যায় না। কেন না তার ফলেও দুঃখভোগ ও মৃত্যু নিশ্চিত। অতএব সর্ববিধ ইন্দ্রিয়-ভোগের আশা পরিহার করে শূন্যতার পক্ষ অবলম্বন করতে হবে। লুই বলছেন ধমন ও চমন নাড়িদ্বয়ের নিম্নগামী প্রবাহকে নিয়ন্ত্রিত করে অবধূতীমার্গে (সুষুম্না) প্রবাহিত করেছেন এবং ধ্যানের দ্বারা এই অবস্থা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন।

তুকথা গানেও জ্ঞানরূপী গুরু মনকে সকল প্রকার ইন্দ্রিয়-কামনা থেকে নিবৃত্ত হতে বলে। সেই নিবৃত্তির স্বরূপ জানতে চায় মন এবং গুরু তার উত্তর দেন। তুকথা গানেও দেহকে বৃক্ষরূপে কল্পনা করা হয়েছে। যেমন একটি গানে পাচ্ছি—

বিরখের মূলে তে-ধারা নোধী উজান পাখে সোত চলে
হিমন বিরখো হরিহর সিজ্জিলেক কি বাদে।
আর সদায় নধীর তরঙঅ উঠে
দিবা নিশি দুইটা মানষি সাতারো কাটে।
ওহো নধী না ধরে বৈঠা।
উজান পাখে সোত চলেছে নধীর উঠেছে ফ্যাপেনা।

আর আধাবুজা ঝলসা কানা হুটা
খুটার লৌকা চান্দাছ্য
খুটা খুটি না হয় হুটা মারগোতে আছে।
ও সাধু ভাই জানিয়াও জানেন না।
লৌকাতে চরিয়া দ্যাখো মইধ্যোতে কানা।[৫]

এই গানের অর্থ হল—বৃক্ষের মূলে ত্রি-ধারা নদী, উজানের দিকে স্রোত চলে। এমন বৃক্ষ হরিহর কোন সৃজন করলেন। আর সদাই নদীর তরঙ্গ ওঠে, দিবা-নিশি দুটো মানুষ সাতার কাটে, এই দুটো মানুষ হল জ্ঞান ও মন। নদী এতই উথাল-পাথাল যে, বৈঠা চালানো মুশকিল। উজান দিকে স্রোত চলছে, নদীর ফেনা উঠছে। আর আধা বোঝা (যে পুরো বোঝে না, অবোধ মন) ঝলসিত কানা লোকটি কাঠের নৌকা চাইছে, কিন্তু কাঠ-কুঠ নয়, সেটা মার্গেই আছে। ও সাধু ভাই জেনেও না জানার ভান করছেন, নৌকাতে উঠে দেখুন মাঝখানে তার কানা।

মনের (শিষ্যের) এই প্রশ্নের মধ্যেই দেহতত্ত্বের কথা পাওয়া যাচ্ছে। এই বৃক্ষ হল দেহবৃক্ষ এবং ত্রিধারা নদী হল প্রধান তিনটি নাড়ি, যা মানবদেহে উল্লম্ব ভাবে প্রবাহিত। কিন্তু উজান বেয়ে চলা মুশকিল, বিপরীত চাপ সব সময় পেছনের দিকে ঠেলে দেয়। অজ্ঞান ব্যক্তি তা পেরোতে কাঠের নৌকা অর্থাৎ সহজ উপায় খোঁজে। কিন্তু এই পারাপারের তত্ত্ব কেবল সাধন মার্গেই পাওয়া যায় অর্থাৎ ঊর্ধ্বমুখে যাওয়ার উপায় দেহের মধ্যেই বর্তমান, সেটা 'আধা-বুঝা' মন বোঝে না। তাই মন বলছে নৌকার মধ্যে ফুটো রয়েছে। ফুটো থাকলে নৌকা ডুবে যায়। সেটা বন্ধ করার মার্গ দর্শন কেবল গুরুই করাতে পারেন। সুতরাং সাধন না জানলে আভিপ্রায়িক লক্ষ্যে পৌঁছানো যায় না। সে পথ কেবল গুরুই দেখাতে পারেন।

দার্শনিক তত্ত্ব : তুকথা তত্ত্বে আত্মার পুনর্জন্মে বিশ্বাস করা হয়। আত্মা তার কর্মফল অনুসারে ধরাধামে বার বার জন্ম নেয়। কিন্তু এই ধরাধামে এসে সে সংসার মায়ায় আবদ্ধ হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর জ্ঞান রূপ চেতনা জাগ্রত না হয়, ততক্ষণ সে, সেই মায়ায় আবদ্ধ থাকে। তাই জগত সংসারের সম্পর্কগুলোকে সে আপন বলে ভাবে। কিন্তু আত্মার একমাত্র আত্মীয় পরমাত্মা; সংসার কেবল দু-দিনের পরিচিত অপর জন মাত্র। মৃত্যুর পর আত্মার সঙ্গে সংসারের আর কোনো যোগ থাকে না। কিন্তু সেই আত্মাই আবার মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সংসারে জন্মগ্রহণ করে। তাই জগৎ সংসারকে মায়ার ফাঁদ রূপে দেখা হয়। একটি বিখ্যাত গানে এই তত্ত্ব কথা বলা হয়েছে, যা এখন ভাওইয়া গান হিসাবে পরিচিত। গানটি হল—

আজি ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে।
ফান বসাইছে ফান্দি রে ভাই পুঠি মাছ দিয়া,
মাছের লোভে বোকা বগা পড়ে উড়াও দিয়া রে।
ফান্দতে পড়িয়া বগা করে হায়রে হায়।
হায় হায় রে দারুণ বিধি সাথি ছাড়িয়া যায় রে।
ফান্দতে পড়িয়া বগা করে টানাটুনা,
হায় হায় রে কুজ্জুরার সুতা হলু লোহার গুনা রে।
উড়িয়া যায় চকোয়ারে পঙ্খী বগিক কয় রে ঠারে।

তোমার বগা বন্দি হইসে ধরলা নদীর পারে রে।
এই কথা শুনিয়া রে বগি দুই পাঙ্খা মেলিল।
ধরলা নদীর পারে যায়া দরশন দিল রে।
আজি বুগিক দেখিয়া বগা কান্দেরে,
আজি বগাক দেখিয়া বুগি কান্দে রে।[৬]

এখানে 'ফান' অর্থাৎ ফাঁদ হল জগৎ সংসার, ফান্দি হল মায়া, 'পুঠিমাছ' হল বিষয়-বাসনা। বগা হল অজ্ঞান চেতনা, 'বুগি' হল জ্ঞান এবং 'চকোয়া পঙ্খী' হল গুরু। ফাঁদে পড়ার পর জ্ঞান রূপী বুগি বগাকে ফাঁদ থেকে উদ্ধার করার চেস্টা করছে, কিন্তু অজ্ঞান চেতনা সেই ফাঁদ থেকে বেরতে পারছে না। তার কাছে মায়ার বন্ধন হয়ে গেছে 'লোহার গুনা', যা থেকে মুক্তি পাওয়া প্রায় অসম্ভব। তাই উভয় রূপ চেতনা, একে অপরের অবস্থা দেখে কান্না করছে।

মায়ার এই অটুট বন্ধন থেকে মুক্তির উপায় একমাত্র গুরু দিতে পারেন। তাই গুরু শিষ্যকে মনোশিক্ষার জ্ঞান দান করেন। সেই জ্ঞান লাভ করার পর সাধক বুঝতে পারেন তাঁর আত্মা কেন বার বার ধরাধামে জন্মগ্রহণ করে। তাই সচেতন মন আকুল হয়ে হরির কাছে প্রার্থনা করে বলছে—

হরি ভব কর রে পার, হরি ভব কররে পার
ওরে আমি অধম দুরাচার জানি না সাতার
হরি আর মোরে অধমের এই বাসনা
মরিলে ভবে যেন আর আসি না।
এ-যাতনা সহে না বারে বার।
হরি আর পুরাণে সুইনাছি আমি
পতিতেরো বন্ধু তুমি
তাই জানিয়া দিয়াছি সাতার
আমি মরিলে কলঙ্ক রহিবে জগতে তোমার।[৭]

বৌদ্ধ-দর্শনে বলা হয়, বোধিলাভ করলে, আত্মার পুনর্জন্ম হয় না। আর সেটা সম্পূর্ণ নির্ভর করে মানব জন্মের কর্মফলের উপর। তাই বৌদ্ধ সাধকগণ আত্মার সম্পূর্ণ মুক্তির আশায় সাধনা করেন। আমাদের উদ্ধৃত তুকখা গানটিতেও সেই বাসনারই আভাস পাওয়া যায়। সাধক হরির কাছে মিনতি করছেন ভব-পারের আশায়, যাতে তাঁকে আর পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করতে না হয়। সাধক নিজের দুরাচারের কথা হরির কাছে স্বীকার করে, তাঁকে পাপমুক্ত করার জন্য মিনতি করছেন, কেন না, হরি হলেন পতিত-পাবন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, গানটিতে বৌদ্ধ প্রভাব রয়েছে।

তুকখা গানের বর্তমান অবস্থা : বর্তমানে তুকখা গান প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। মূল সাধক খ্যাপাদের এখন খুঁজে পাওয়া যায় না। বর্তমানে কিছু গায়ক খ্যাপা আছেন, যাদের কাছে সামান্য কিছু পুরনো তুকখা গান পাওয়া যায়। কিন্তু বর্তমানে তাঁরা বাউল, বৈষ্ণব প্রভৃতি ভাবধারার বাহ্যিক প্রভাবে প্রভাবিত। তাই তাঁদের গান সেগুলোর প্রভাবে অনেকটাই পরিবর্তিত হয়েছে।

শোনা যায় অনেক সময়ই উত্তরবঙ্গের সাধু বা খ্যাপাদের সঙ্গে কোনো বৈষ্ণব সাধক

বা বাউল সাধকের তত্ত্বগত তর্ক-বিতর্কও হত। খ্যাপাদের কেউ তত্ত্বকথায় হেরে গেলে, বিজয়ী বাউল বা বৈষ্ণবকে 'গুরুদায়' দিয়ে গুরু পদে বরণ করেন। এভাবে অনেক সাধকের মতো পরিবর্তিত হয়েছে বলে জানা যায়। ধীরে ধীরে অনেক সাধক 'বোষ্টোমে' (বৈষ্ণব সাধক) পরিণত হন। এই বোষ্টমদের 'গোঁসাই' বলা হয়। প্রত্যেক গোঁসাইর একজন করে সাঁই থাকে। এই গোঁসাই-এর অনেক শিষ্য-প্রশিষ্যও থাকে। এখনও এরকম সাধক উত্তরবঙ্গে অনেক দেখা যায়। খ্যাপার লড়াইয়ে এই সব তত্ত্ব কথাও ঢুকে পড়েছে।

যাই হোক পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তুকথা গানের মধ্যে বিভিন্ন নতুন বিষয় প্রবেশ করায় এর বিষয় বিস্তার ঘটেছে। যেমন মনোশিক্ষা, দেহতত্ত্ব, গুরুবাদী প্রভৃতির পাশে বিচ্ছেদ, সন্ন্যাস প্রভৃতি বিষয় প্রবেশ করেছে। নিচে একটি বিচ্ছেদমূলক গানের কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হল—

আজি নানান কাথা ফম পড়্যাছ্যা বিছিনাত থাকিয়া
ওরে গুলগুলাছ্যা নারীর মন মোর নিন্দে ধরে না।
ও মোর সুবল সুবল রে
ওরে তুইরে সুবোল নাকারিস আও
জ্বল্যাছ্যা মোর নারীর গাও
কুনঠে গেলে মুই কালার নাগাল পাও।[৮]

বঙ্গানুবাদ : আজি নানান কথা মনে পড়ছে বিছানায় শুয়ে। ওরে নারীর মনটা আমার গুলগুল করছে, ঘুমই ধরে না (আসে না)। ও আমার সুবোল সুবোল রে, তুই রে সুবোল কথা বলিস না, আমার নারী-শরীর জ্বলছে। কোথায় গেলে কালার দেখা পাব?

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা গেল যে তুকথা গান দেহতত্ত্বমূলক সাধন সংগীত হলেও তার সঙ্গে বাউল গানের বেশ পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্য বিভিন্ন ধরনের—ঐতিহ্যগত, সাধ্য-সাধন তত্ত্বগত, দেহতত্ত্বগত—এরকম বিভিন্ন ধরনের পার্থক্য খুঁজে পাওয়া। নিচে কয়েকটি প্রধান পার্থক্য তুলে ধরা হল।

১. বাউল তত্ত্বে পুনর্জন্মে বিশ্বাস থাকলেও নির্বাণ লাভের মতো কোনো লক্ষ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু তুকথা গানে সেরকম ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

২. বাউল সাধনার একটি বিশেষ তত্ত্ব হল রূপ-স্বরূপ তত্ত্ব। যারা রূপজগতে সাধারণ নর-নারী, তারাই স্বরূপ ধামের রাধা-কৃষ্ণ। যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের মধ্যে রূপ-জগতের কামনা-বাসনা, রাগ-দ্বেষ, মোহ ইত্যাদি থাকে, ততক্ষণ তারা নর-নারী। কিন্তু তাদের প্রেম সম্পর্ক যখন এ সব কিছুর ঊর্ধ্বে গিয়ে নিষ্কাম অবস্থাপ্রাপ্ত হয়, তখন তাঁরাই স্বরূপ ধামের রাধাকৃষ্ণে পরিণত হয়। এ জন্যই একজন সাধন সঙ্গিনীর প্রয়োজন হয় বাউল সাধকের। অপরদিকে তুকথা তত্ত্বে এরকম কোনো তত্ত্ব নেই। সেখানে সংসারকেই রূপ জগৎ বলা হয়েছে। জীবন ও মৃত্যুর মাঝে রয়েছে ভবসাগর। মৃত্যুর পরে যাতে আবার ধরাধামে ফিরে আসতে না হয়, তার জন্যই তাদের সাধনা। তার জন্য কোনো সাধন সঙ্গিনীর প্রয়োজন নেই।

৩. বাউলের আর একটি বিশেষ তত্ত্ব হল মনের মানুষ খোঁজা। নারীর ঋতুকালকে বাউলের পরিভাষায় বলা হয় জোয়ার, বন্যা ইত্যাদি। আর যোনিকে ত্রিবেণীর ঘাট বলা হয়। সাধক নারীর ঋতুধর্মের তিনদিন মনের মানুষ খোঁজেন ত্রিবেণীর ঘাটে। তুকথা-সাধনায় এরকম কোনো তত্ত্ব নেই। সেখানে কেবল ঈশ্বরের দয়া কামনা করা হয়। ঈশ্বরকে ভবপারের কাণ্ডারী হিসেবে

গণ্য করা হয়।

৪. বাউল হল রসের সাধনা, প্রেম রসই হল এর প্রধান উপায়। অপরদিকে তুকখা হল জ্ঞানের সাধনা, অবোধ মনে জ্ঞানের উদয় হলেই সে অজ্ঞানতা জনিত সংসার মায়া থেকে মুক্তিলাভ করবে বলে তাঁদের বিশ্বাস।

খুঁজলে এরকম আরও অনেক পার্থক্য পাওয়া যাবে। কিন্তু স্থানাভাবে আমরা সেদিকে অগ্রসর হতে পারছি না। যাইহোক, উপরের আলোচনা থেকে আশা করি বাউল ও তুকখা তত্ত্বের মূল পার্থক্য সম্পর্কে অনেকটা স্পষ্ট ধারণা পাওয়া গেছে। যদি আমাদের এই আলোচনা অনুসন্ধিৎসু পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে, তাহলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে বলে গণ্য করব।

উৎসের সন্ধানে

১. নির্মলেন্দু ভৌমিক : 'প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসংগীত', অঞ্জলি পাবলিশার্স, কলকাতা, জুলাই, ২০১১, পৃ. ২৮৮
২. তদেব : পৃ. ২৮৯
৩. দীনেশ রায় : 'বহু ছোটো নদী মিশে গেল ভাওয়াইয়া সমুদ্রে', স্মরণিকা, ১৫তম রাজ্য ভাওয়াইয়া সংগীত প্রতিযোগিতা, দেওয়ানহাট, কোচবিহার, ২০১৪, পৃ. ৮১
৪. নির্মল দাশ : 'চর্যাগীতি পরিক্রমা', দে'জ, কলকাতা, ১৯৯৭, অষ্টম সংস্করণ, ২০১২, পৃ. ১১৩
৫. সাক্ষাৎকার : তথ্যদাতা-দীপ্তি রায়, স্ত্রী, রাউত পল্লী, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি, ৩০.০৮.২০১৫
৬. সাক্ষাৎকার : তথ্যদাতা : সিদ্ধেশ্বর রায়, পুরুষ, গ্রাম-ভোটপাড়া, ধূপগুড়ি, জেলা-জলপাইগুড়ি, ২৮.৮.২০১৫
৭. সাক্ষাৎকার : তথ্যদাতা : কৃষ্ণকান্ত রায়, পূর্ব মাগুরমারি, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি, ১২.৭.১৬
৮. সাক্ষাৎকার : তথ্যদাতা : জিতেন্দ্রনাথ রায়, পুরুষ, গ্রাম-ডাকের কামাত, পোঃ-মাণিকগঞ্জ, জেলা-জলপাইগুড়ি।

তথ্যের সন্ধানে

১. সত্যবতী গিরি : 'বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ', দে'জ, কলকাতা, প্রথম দে'জ সংস্করণ ২০০৭
২. সুধীর চক্রবর্তী : 'বাউল ফকির কথা', আনন্দ, কলকাতা ২য় সংস্করণ, ২০১০
৩. সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত : 'বাংলার বাউল ফকির', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৯
৪. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : 'বাংলার বাউল ও বাউল গান', ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী, কলকাতা, ১৩৬৪
৫. সুরজিত সেন : 'ফকিরনামা', গাঙচিল, কলকাতা, ২০০৯

বাংলার বাউল সাধনায় সুফি ও বৈষ্ণব সাধনার প্রভাব

মমতা খাঁ

পল্লীর জীবনপ্রবাহের সঙ্গে বাউল বৈষ্ণবী ও ফকিরদের একটা যোগসূত্র আছে। সকালবেলায় কখনো হাতে 'একতারা', কখনো কোমরে 'ডুগি', কখনো 'গুবগুবি' আবার কখনো বা বগলে 'সারিদা' বা 'বেহালা' নিয়ে বাউলরা পল্লীর গৃহে গৃহে ভক্তিমূলক, দেহতত্ত্বের গান, রাধাকৃষ্ণের বা গৌরলীলার গান করে ভিক্ষাবৃত্তি করে বেড়ায়। কালের প্রবাহে বাংলার ইতিহাসের নানা প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ গতিস্রোতে সমাজের নানা রূপান্তরের ফলে বাউল সাধনার উদ্ভব হয়েছিল এবং তার বিস্তৃতিও ঘটেছিল। আবার সমাজের গতিস্রোতধারা পথে তার বিলোপায়ত ঘটেছে সমাজের রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে। বাউল সাধনার উদ্ভবের মূল যদি ধরা হয় গুপ্তযুগ পূর্ব তাহলে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলার ও বাঙালি জাতির ধর্ম ও সংস্কৃতিতে, ইতিহাসে, জাতির গঠনের উপাদানে ও তার বৈশিষ্ট্যে বাউলদের সন্ধান পাওয়া যাবে। বাউল সম্প্রদায়ের ধর্মানুষ্ঠান বৈষ্ণব সহজিয়া সম্প্রদায়, সুফি আউলিয়া সম্প্রদায় এবং শৈব নাথধর্ম, যোগতন্ত্র, হঠযোগ প্রভৃতি ধর্ম ও উপধর্মের 'কায়াসাধনা' তত্ত্ব অবলম্বনে হয়ে থাকে। বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতপাতের ভেদাভেদ না থাকার ফলে সহজিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়, সহজিয়া হিন্দু বাউল ও সুফি পন্থি মুসলমান ফকির বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা আত্মীয়তার যোগ লক্ষ করা যায়। বাউল ধর্ম সাধারণ লোকধর্ম। তাই এর পশ্চাতে একটা বিশিষ্ট রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক পটভূমিকারও ইঙ্গিত আছে। এই সমস্ত যোগসূত্রের কথা চিন্তা করে বাংলার বাউল সাধনায় সুফি ও বৈষ্ণব সাধনার প্রভাব সম্পর্কিত ভাবনার প্রচেষ্টা রাখা হল সমীক্ষাটিতে। সমীক্ষার স্বল্প পরিসরে বিষয়ালোচনা দীর্ঘায়িত হবার সুযোগ নেই। তাই বিশেষ বিশেষ দিকগুলিকে তুলে ধরার প্রয়াস রইলো।

বাউল ধর্মের উদ্ভব সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট সময় নির্ণয় করা যায় না। সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলার ধর্ম ও সংস্কৃতির এবং সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ দৈন্যতার জন্য তা পাওয়াও অসম্ভব। তবুও অনুমানসিদ্ধভাবে ঐতিহাসিক তথ্যানুযায়ী একটা মত ধরা হয় তা হল 'সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই বৈষ্ণব সহজিয়াধর্মের প্রবল বিস্তারের যুগ আরম্ভ। মূল সাধনাঙ্গ এক হওয়ায় সহজিয়া মুসলমান ফকিরদের মিলনে ১৪২৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাউলধর্মের উদ্ভব। তারপর আরো পঁচিশ বছরে সহজিয়া বৈষ্ণব ও ফকিরের মিলিত সাধনায় মোটামুটি ভিত্তি স্থাপিত।[১] মুসলমান ফকিররাই বাউল সাধনার আদি প্রবর্তক বলে মনে করা হয়। আবার এটাও ভাবা হয় বাউল সাধনার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য খুব সম্ভবত ফকিরদের কাছ থেকেই এসেছে। আবার বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের বাউল মহলে একটা জনশ্রুতি আছে যে—

> নিত্যানন্দ পুত্র বীরভদ্র, যাঁহাকে বাউলরা তাহাদের সম্প্রদায়ের আদি প্রবর্তক মনে করে, তিনি 'মাধববিবি' মানে এক মুসলমান মহিলার কাছ থেকে এই ধর্মে দীক্ষিত হন। আউলচাঁদ নামে এক মুসলমান ফকির পশ্চিমবঙ্গে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের আদি প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া প্রচারিত। তিনি স্বয়ং চৈতন্যদেব আউলচাঁদ রূপে নূতন ধর্মশিক্ষা দেবার জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন বলে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের পুস্তকে প্রকাশ ('১৬২৫ খ্রিস্টাব্দ হইতে ইহার উদ্ভব হইয়া ১৬৭৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইহার পূর্ণরূপ ধারণ এবং ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে তক একটি নির্দিষ্ট সাধন পদ্ধতি বিশিষ্ট হিন্দু বৈষ্ণব ও মুসলমান ফকিরের মিলিত ধর্ম হিসাবে সমগ্র বঙ্গে ইহার প্রসার সঙ্গতভাবে অনুমান করা যায়)।[২]

ধর্মের ইতিহাসের মধ্যেই ভারতের প্রকৃত ইতিহাস নিহিত। বৈদেশিক আক্রমণ, বিভিন্ন রাজ্যের উদ্ভব ও বিলয়, সম্রাটদের রাজ্যবিস্তার ও বিজয় অভিযান প্রভৃতি এক একটি ঘটনাবলী ভারতের বুকে ঘটে গেছে। ধর্মের মধ্যেই ভারতের সর্বজনীন ঐক্য ও বৈশিষ্ট্য নিহিত আছে। আর এই ঐক্য ও বৈশিষ্ট্যকে ভিত্তি করেই এর বিরাট ও বহু বিচিত্র সভ্যতা গড়ে উঠেছে। তাই ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ধ্বংস হয়ে যায়নি কোন রাজশাসনের আধিপত্যে। এর প্রধান কারণ ভারতের সুদৃঢ় আধ্যাত্মিক আদর্শ বা ধর্মীয় উদ্দেশ্য, যা বিচিত্র বাহ্যরূপের মধ্যে ঐক্য ভিত্তি স্থাপিত করেছে।

মুসলমান ফকিররাই বৌদ্ধ সহজ সাধনার ধারাটি বহুদিন সঙ্গোপনে রক্ষা করে এসেছিল। আর বাউল ধর্মের বৈশিষ্ট্যগুলি মুসলমান ফকিরদের কাছ থেকেই গৃহীত। বাউল ধর্মের তত্ত্ব ও দর্শনের কোনো স্বতন্ত্র গ্রন্থ যদিও পাওয়া যায় না তবুও মোটামুটিভাবে বৈষ্ণব সহজিয়াদের নানা গ্রন্থের তত্ত্ব ও দর্শনই বাউলধর্মের তত্ত্ব ও দর্শন বলে মনে করা হয়। বাউলগানে সাধন পদ্ধতির কথাই বেশি পাওয়া যায়। বাংলার ধর্মের ক্রমপরিণতিতে বাউলধর্মের স্থান নির্দেশক একটি ছক প্রদর্শন করা হল।

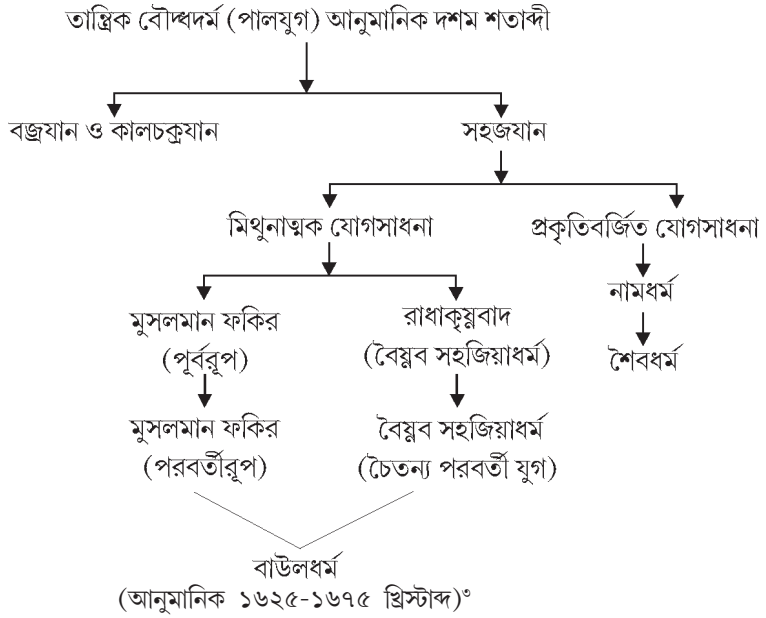

বাউল সম্প্রদায়ের সাধকেরা কোনপ্রকার শাসন রীতিনীতির অধীন নয়। তারা গতানুগতিক ভাবধারায় বিশ্বাসী নয়। তাই এদেরকে বলা হয় 'Non conformists'[৪] অর্থাৎ যেখানে বাক্য আর অর্থ প্রকাশ করতে পারে না সেখানে আসে কবিতা, কবিতা যেখানে ভাবের নাগাল পায় না সেখানে আসে গান। বাউলদের মরমিয়া অনুভব সেইজন্য গানের আকারেই প্রকাশ পায়। এঁদের সাধনার অঙ্গ গান। এঁরা সমাজে 'মৃতকল্প'[৫] হয়ে বাস করতে চায়। এই জীবন্মৃত অবস্থাকে সুফি সাধকেরা 'ফানা' আর বৈষ্ণব সাধকেরা 'জীবন্মুক্ত' বা প্রাপ্ত 'ব্রহ্মলয়' বলে থাকেন। আলোচনার সূত্র ধরে বলা যায়, সুফি সাধন প্রক্রিয়ার সাধকরা মরমিয়া পন্থায় তাঁদের শুদ্ধ ধর্মাচার পালন করেন। এর চারটি অবস্থা আছে। যথা—তিনি আছেন এই বিশ্বাসে স্থির থাকা অর্থাৎ ঈমান, অদৃশ্য বস্তুর অনুসন্ধান অর্থাৎ ত্বলব, অনুসন্ধান থেকেই সেই অদৃশ্যকে অন্তরে উপলব্ধি অর্থাৎ ইরফান আর অদৃশ্য বস্তুর মধ্যে বিলীন হওয়া বা সৃষ্টি ও স্রষ্টার বিভেদ রেখা লুপ্ত হওয়া অর্থাৎ ফানাফিল্লাহ।

> সুফি সাধক মরমীয়াবাদে মারেফতী বা গোপনীয় সাধনায় প্রেমিক-প্রেমিকা বা ঈশ্বর অন্বিষ্ট। তাদের ভাষায় আসেক (প্রেমিক) মাশুক (প্রেমিকা)। এই প্রেম সাধনা গভীর ও গূঢ়।[৬]

বাংলা সাহিত্যে বিশেষ করে চর্যাপদে, বৈষ্ণবসাহিত্যে, বাউলগানে এই ধরনের গূঢ়ার্থবাচক অধ্যাত্মতত্ত্বের বা সাধনতত্ত্বের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। সুফির মরমিয়া ও মিষ্টিক সাধনা এবং কায়সাধনা বাউলদের প্রেমমার্গীয় সাধনা। বাউলরা জাত-পাত-বর্ণ সম্প্রদায়গত গন্ডির উর্ধ্বে। তাই বাউল সাধক গান করেন—

বল কি সন্ধানে যাই সেখানে।
মনের মানুষ যেখানে॥
(ওরে) আঁধার ঘরে জ্বলছে বাতি।
দিবা রাতি নাই সেখানে।।[৭]

মনের মানুষ ধরার জন্য বাউল লালন সহজিয়াপন্থী। এই মনের মানুষকে অধ্যাপক গোপাল হালদার বলেছেন—'Spiritual সত্তা বা Divinity'।[৭ক] চণ্ডীদাস যাকে দেহের মূলসত্তা বলেছেন। বিদ্যাপতির সহজিয়া বিষয়ক পদে মানুষ ভজনার মধ্য দিয়ে মনের মানুষ ভজনার কথা আছে। চণ্ডীদাসের রাধা বলেন—'পুলকে আকুল দিক নেহারিতে সব শ্যামময় দেখি।'[৭খ] আর সুফি অনুভবের কাহিনির নায়ক মজনু ঈশ্বরকে খুঁজে পান তাঁর প্রিয়া লায়লার মধ্যে—'আল্লা ভি মজনু কো লয়লা নজর আতা থা।'[৭গ] বাউলদের মনের মানুষ মানব দেহের অভ্যন্তরে বিরাজমান। তিনি সচ্চিদানন্দের সত্তা অর্থাৎ সম্বিৎ বা চেতনা সত্তারূপ আত্মা। বাউলগণ সহজিয়াদের ছাড়িয়ে আর এক ধাপ এগিয়ে প্রেমসত্তাকে পুরুষ প্রকৃতি, নরনারী, রাধাকৃষ্ণ এরূপ দ্বৈতভাবে না দেখে নূতন এক দৃষ্টিকোণে প্রত্যক্ষ করেন অর্থাৎ দেহের মধ্যে মনের মানুষ খোঁজেন—

ব্রজপুরে রূপনগরে যাবি যদি মন/তবে করগে যা স্বরূপ সাধন।
স্বরূপের রূপ রূপের স্বরূপ/স্বরূপ দেহে হয় মিলন।

সুফি সাধকরা যেহেতু প্রেমসাধক তাই তাঁরা অদৃশ্য সত্তাকে প্রেমের মাধ্যমে পেতে চান। এখানেই বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে একটা অন্তরযোগ লক্ষ করা যায়। সহজিয়া বৈষ্ণব ও বাউলদের

তত্ত্বকথা দাদু, কবির, নানক, রুইদাস, রজ্জব প্রভৃতি মধ্যযুগীয় উত্তরাপথের সাধকদের দোঁহায় পাওয়া যায়। বৈষ্ণবগণ ও ব্যক্তিসত্তার বিলোপসাধন করে কৃষ্ণপ্রীতিতে আত্মমগ্ন হন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে আছে—

আত্মেন্দ্রীয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলে কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রীয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥[৮]

এই দর্শনই সর্বোত্তম। বৈষ্ণব কবিদের ঈশ্বরের সঙ্গো সম্পর্ক প্রেমিক প্রেমিকার। সুফি সাধক কবিরাও বৈষ্ণব কবিগণের ন্যায় ঈশ্বরের লীলা বিলাসের তদ্‌গতচিত্ত দর্শকমাত্র। বৈষ্ণব কবিরা যখন মন্তব্য করেন—

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ
তবু হিয়া জুড়ন না গেল।[৯]

সুফিবাদে মরমিয়া সাধনা হল অদৃশ্য সত্তার সন্ধান করা। অচিন পাখি মানবদেহস্থিত আত্মা। খাঁচার ভিতর অচিন পাখির যাতায়াতকে কবির ব্যাখ্যা করেছেন—

যা তরিবরমেঁ এক পখেরা
ভোগ সরস রহ ডোলৌরে।[৯]

সমগ্র গানটির ব্যাখ্যা করলে দাঁড়ায় তরুশাখার ঘনছায়ার মাঝে যে পাখি নীড় বাঁধল যে সন্ধ্যায় ফিরে আসে আপন কুলায়। আবার প্রত্যুষে উড়ে যায় দূরদূরান্তে। এখানে তত্ত্ব নেই আছে শুধু আত্মজিজ্ঞাসা, আধ্যাত্মিক আকুলতা।

চৈতন্যদেব ও রাধাকৃষ্ণ লালনের গানেও জীবনে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। লালনের অনেক বৈষ্ণবপদ অসামান্য। একটি পদে লালন ভেক সন্ন্যাসের প্রসঙ্গ তুলেছেন। কুল পরিত্যাগ করে, আচলা ঝুলি, ডোরকৌপীন গ্রহণ করে লালন নিজের পরিচয় দিয়েছেন—'গৌরবালা' অর্থাৎ গৌরাঙ্গের কন্যা বা প্রেমিকা বা দাসী।[১০] পদটি হল—

যদি গৌরচাঁদকে পাই
গেলো এ ছাড় কুল তাতে ক্ষতি নাই
...ছিলাম কুলের কুলবালা কান্দে নেলেম আচলা ঝোলা
নালন বলে গোউর বালা আর কারে ডরাই।[১১]

বৈষ্ণব মঞ্জরীভাবনার সাধকরা নিজেকে নারী এবং উপাস্যকে পুরুষ প্রেমিকরূপে কল্পনা করে নিয়েছেন। লালনের গানেও সখীভাব ও মঞ্জরীভাব লক্ষ করা যায়। বৈষ্ণব সমাজে নানাধরনের কৃষ্ণের একক বিগ্রহ এবং রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তির উপাসনা হয় এবং ইষ্টরূপে ভজনা হয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবান্দোলনে চৈতন্য কৃষ্ণ হিসাবে এবং রাধাকৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহ হিসাবে গৌর পারম্যবাদ এবং নদীয়া নাগরীভাবের সৃষ্টি। এই ভাবনায় সুফি ভাবনার আসেক মাশুক প্রসঙ্গ এবং রাধাকৃষ্ণ কথার আপাত সামঞ্জস্য আছে। গৌরাঙ্গ ভজনার সূত্রধররা বিশেষত নিত্যানন্দ, গৌরনাগরীভাবের উপাসক নরহরি, লোচনদাস মানতেন—

> কৃষ্ণ, গৌর, গুরু অভেদ হয়ে গেলেন... এবং গুরুস্থান পেলেন কৃষ্ণ বা গৌরেরও আগে। বিধিমার্গের বৈষ্ণবতা কৃষ্ণ বা চৈতন্যের চাইতে গুরুকে অধিক মর্যাদা দিতে নারাজ হলো। লালন গুরু পারম্যবাদী। তাঁর পদে আল্লা, আদম, নবী বা গৌর-কৃষ্ণ-বৈষ্ণব তিনে এক গুরু রূপে বর্তমান থাকে।[১২]

লালন মূর্তি পূজায় বিশ্বাসী নন। নবী বা চৈতন্য এ দেহে মিশে আছে এইরূপ সাকাররূপে বিশ্বাসী লালন। গুরু গৌরকে, কৃষ্ণকে, আল্লাকে দেখান। তার শিষ্য হয়ে একটি পদে উল্লেখ করেছেন—

গুরু দেখায় গৌর তাই দেখি কি গুরু দেখি।
গৌর দেখতে গুরু হারাই কোনরূপে দেই আখি।
গুরুগৌর রহিল দুই ঠাঁই কি রূপে একরূপ করি তাই।[১৩]

অবশ্য লালনের এই গৌরবাদী জাতিভেদ অস্বীকার করেছিল। এতে গৌরপূজার প্রাধান্য বেশ গুরুত্ব কম। লালন বলে, 'গুরু ছেড়ে গৌরভজি এতে নরকে মজি।'[১৪] লালনের সঙ্গে বৈধী বৈষ্ণবতার যোগ তেমন ছিল না। চৈতন্য উত্তর বৈষ্ণব সম্প্রদায় রক্ষণশীল হয়ে পড়লে মুসলমান সমাজগত মানুষের সেখানে কোন স্থান থাকে না। লালনের প্রধান শিষ্য দুদ্দুই নিজেকে বৈষ্ণবদের থেকে পৃথক ভাবত। তিনি জানিয়েছিলেন—যে বৈষ্ণবদের সাম্প্রদায়ক আচরণাদি, মূর্তিপূজা জপতপ এসব থেকে লালনপন্থী বাউলরা আলাদা—'বাউল বৈষ্ণব ধর্ম এক নহে তো ভাই।'[১৫]

বাংলাদেশে বাউল সম্প্রদায়ের অনুসন্ধান করলে দেখা যায় খ্রিস্টিয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শঙ্করাচার্যের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পুরী সম্প্রদায়ের একজন সন্ন্যাসী মাধবেন্দ্রপুরী কতকগুলি বিশেষ ও অসাধারণ গুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি সর্বদা উন্মনা থাকতেন। তিন কখনো নির্জনে বসে হাসতেন, কখনো কাঁদতেন। এটা দেখে লোকে তাকে বাউল বলত। কিন্তু লোকে তাঁর সঙ্গে আলাপ করলে বুঝতে পারত যে তাঁর 'বাহ্য বাতুলতার অন্তরে শাস্ত্রজ্ঞান ও বিচারশক্তি বিদ্যমান আছে।'[১৬] এই পুরী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা অদ্বৈতবাদী এবং ব্রহ্মজ্ঞানী। বিজ্ঞ লোকেরা ভাবত পুরী গোঁসাইয়ের বাউলভাব তাঁর অন্তরের প্রগাঢ় প্রেমভক্তিরই বাহ্যবিকাশ। কিন্তু সাধারণের কাছে তিনি বাউল নামেই পরিচিত ছিলেন। তাঁর ভক্তিবাদী বৈষ্ণবদলের প্রধান শিষ্য ঈশ্বরপুরী ও অদ্বৈতাচার্য বাউল নামে অভিহিত ছিলেন। নিমাই পণ্ডিত ঈশ্বরপুরীকেই গুরু স্বীকার করেন এবং বৈষ্ণবমন্ত্রে তাঁর কাছে দীক্ষা নেন। তিনি ক্ষেপা নিমাই নামেই পরিচিত হন। তারপর কেশবভারতীর কাছে সন্ন্যাসগ্রহণ করার পর কৃষ্ণচৈতন্য নামধারণ করেন। এরপর থেকে চৈতন্য মহাপ্রভু আদি বাউলদের প্রধান হয়ে ওঠেন। নিত্য সহচর নিত্যানন্দও মাধবেন্দ্রপুরীর দলভুক্ত বলে তিনিও মহাবাউল নামে পরিচিত—'তাঁহার আচার বিধি নিষেধের পার।'[১৭] অদ্বৈতাচার্য ও চৈতন্যদেব যে বাউল ছিলেন তা অদ্বৈতাচার্যের নিজের স্বীকারোক্তির মধ্যে পাওয়া যায়—

তরজা প্রহেলি আচার্য্য কহে ঠারে ঠারে।
প্রভু মাত্র বুঝে, কেহ বুঝিতে না পারে॥
বাউলকে কহিও লোক হইল বাউল।[১৮]

এখন বাংলাদেশে যে বাউল সম্প্রদায় আছে তা মহাপ্রভু চৈতন্যদেবকেই সম্প্রদায়ের আদি প্রবর্তক ঘোষণা করে। বাউল সম্প্রদায়ের অপর শাখা নেড়ানেড়ী সম্প্রদায়ভুক্ত নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরভদ্র বা বলভদ্র গোস্বামীকে আদি প্রবর্তক ভাবেন। বঙ্গদেশে দশম শতাব্দীতে অর্থাৎ চৈতন্যদেবের পাঁচশত বৎসর পূর্বে সহজিয়া মতের প্রচারক নাথপন্থের ৮৪ সিদ্ধ পুরুষের অন্যতম নাঢ় পণ্ডিত ও তাঁর পত্নী নাড়ী ছিলেন। এর থেকেই নেড়ানেড়ী সম্প্রদায়ের উৎপত্তি। সহজিয়া বৈষ্ণবরা বলেন 'নাঢ়া'দের আদিগুরু হচ্ছেন চৈতন্যদেবের পার্ষদ স্বরূপ দামোদর, তাঁর

শিষ্য রূপ গোস্বামী, তাঁর শিষ্য রঘুনাথ দাস, রঘুনাথ দাসের শিষ্য 'চৈতন্যচরিতামৃত' প্রণেতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ, কৃষ্ণদাসের শিষ্য মুকুন্দ দাস। আর মুকুন্দ দাসের চারশিষ্য থেকে চার ধর্ম সম্প্রদায়ের উদ্ভব যথা—আউল, বাউল, সাঞ্রী, দরবেশ।

সহজভাবে জীবনযাপন করা, ধর্মসাধনা করাই বাউলদের আদর্শ। এঁরা প্রত্যেকে নিজের বিবেক-বুদ্ধির নির্দেশ মেনে চলে। প্রভু নিত্যানন্দকে সামনে রেখে চণ্ডীদাস বলেছেন—

বেদবিধি পার
ভ্রমণ আচার' যাজন করিবে যে॥
ব্রজের নিত্যধন
পায় সেইজন
তাহার উপরে কে?[১৯]

বাউলরা বলেন—

তাইতে বাউল হইনু ভাই।
এখন লোকের বেদের
ভেদ বিভেদের
আর তো দাবী দাওয়া নাই।[২০]

বাউলরা নানারকম লোকবিরুদ্ধ আচার অনুষ্ঠান করে থাকে। এর কথা 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র আদিলীলা ৪র্থ পরিচ্ছেদে পাই—

লোকধর্ম্ম দেহধর্ম্ম বেদধর্ম্ম কর্ম্ম।
লজ্জা ধৈর্য্য দেহসুখ আত্মসুখ মর্ম্ম।।
... স্বর্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণেশ্বর ভজন।[২১]

এই জন্য বাউলরা নিজেদের সাধনপ্রণালী সহজে প্রকাশ করে না। 'আপন ভজন কথা না কহিবে যথা তথা।[২২] এরা লোকালয়ে লোকাচার পালন করলেও নিজেদের চক্রের ভেতর সামাজিক হিসেবে অনাচার করে। সকল জাতির লোকের সঙ্গে পান ভোজন করে। এর ফলে কোথায় যেন বৈষ্ণবদের থেকে আলাদা হয়ে যায়।

বাউলমতের উদ্ভবের পিছনে একটা বড় কারণ বর্তমান। বাংলাদেশে একসময়ে সামাজিক অত্যাচার অনুশাসনকে এড়ানোর জন্য নাথ এবং সহজপন্থীরা আশ্রয় নিয়েছিলেন কেউ ইসলামধর্মে কেউ বৈষ্ণব ধর্মে। এঁদের মধ্যে যারা মুসলিম তাঁদের পক্ষে কোরাণ অনুমোদিত পথ ছেড়ে তন্ত্র নির্ভর দেহসাধনা করা সম্ভব হত না। যাঁরা হিন্দু সহজিয়া রসসাধক তাঁরা সম্পূর্ণভাবে পূর্বেকার সম্প্রদায়গত সাধনা ত্যাগ করতে পারেনি। এঁরাই বাউল ধর্মে দীক্ষিত হন। বাউলধর্মে মূলত এঁদের সাধনা প্রবেশ করে। হিন্দু-মুসলমান উভয়ই তাঁদের নিজ নিজ বিশ্বাসের জায়গা থেকে বাউল সাধনা করতে থাকে। বলা যায় বাউলমত কোন নির্দিষ্ট ধর্মাবলম্বীদের মতো নয়। একটা মিশ্র মত। সুলতানি আমল থেকেই ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর উত্তর ভারতে ধর্ম ও সংস্কৃতির সমন্বয়ের ধারা প্রবাহিত হয়। হিন্দুধর্মের ভক্তিবাদ, ইসলামের সুফিবাদের প্রেরণা, দক্ষিণ ভারতের ভক্তিধর্ম, উত্তর ভারতের সন্তধর্ম আর তার সঙ্গে যুক্ত হল বাংলার চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্ম। এছাড়া পীর দরবেশ, আউলিয়া প্রবর্তিত সুফি ধর্মের সম্মিলিত প্রয়াসে তৈরি হল বাউল ধর্ম। বাউলধর্ম হিন্দু-মুসলমান, কৃষ্ণ-আল্লা,

মক্কা-বৃন্দাবনকে একসূত্রে বাঁধল। তবে বাউল মতে প্রাধান্য পেল মৈথুন ও যোগতত্ত্ব এখান থেকে আলাদা হয়ে গেল সুফি বাউলরা তারা যতটা সম্ভব এগুলো পরিহার করে চলতেন। হিন্দু বাউল কবিরা রাধাকৃষ্ণের ভজনা করতেন। সুফি বাউলদের গানে 'লা শরীক আল্লাহ'কে অন্বেষণ করার ব্যাকুলতা থাকত। কিন্তু রাধাকৃষ্ণকেও তারা প্রাধান্য দিত। তারা রাধাকৃষ্ণকে আশিক মাশুকের প্রতীক রূপে দেখতেন। তাই বাংলার বাউলমত গড়ে উঠেছিল ঔপনিষদিক অধ্যাত্মচিন্তার ধারায়, তান্ত্রিক যোগসাধনার ধারায়, সহজিয়া ধারায় এবং গৌড়ীয় প্রেমতত্ত্বের সংমিশ্রণে গড়ে ওঠা মিশ্র মতবাদে। আবার বলা যায় বাউলমত গড়ে উঠেছিল বৈষ্ণব সহজিয়া সুফি মতবাদের বাহ্যিক বাতাবরণে।

'বাংলার বাউল সাধনায় সুফি ও বৈষ্ণব সাধনার প্রভাব' সম্পর্কিত আলোচনায় বলা যায় বাউল সাধক সর্বদাই অন্বেষণ করে চলেছে পড়শিকে। যার বাস 'আরশীনগরে'। এই 'পড়শি' হল বাউল সাধকের সাধনার সিদ্ধি বা চরমধন। দেহের মধ্যেই সেই পরমাত্মা বা সিদ্ধি লুকিয়ে আছেন। সাধন ভজনে তাকে অন্বেষণ করছেন বাউল সাধক। আচার-আচরণগত, পদ্ধতিগত মিল-অমিল, যাই যাক না কেন একই ভূমিতে দাঁড়িয়ে আছে সুফিদর্শন ও বৈষ্ণবদর্শন। সাধনার দ্বারা জীবাত্মার পরমাত্মায় লীন হয়ে যাওয়ার জন্য অন্বেষণ যেমন বৈষ্ণব দর্শনে আছে তেমনি সুফি দর্শনেও ঈশ্বর বা পরমাত্মায় বিলীন হয়ে যাওয়ার জন্য মানবের নিত্য সম্পর্ক স্থাপন। আমিত্ব লোপ। পরমাত্মার সঙ্গে বিলীন হয়ে যাওয়ার জন্য ঈমান, ত্বলব, ইরফান, ফানা ফিল্লাহ, বাকা রূপ সাধন পথের অন্বেষণ। তত্ত্ব ও সাধন পদ্ধতির বৈচিত্র্য থাকলেও পরমাত্মার অনুসন্ধানই সব মতের ও পথের শেষ কথা।

উৎসের সন্ধানে

১. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : 'বাংলার বাউল ও বাউলগান', ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১৩৬৪, কলকাতা-৭০০ ০০৯, নিবেদনপত্র
২. তদেব, পৃ. ১৩৩
৩. তদেব, পৃ. ২৯০
৪. শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বাউল', প্রবাসী পত্রিকা, ১৩৩৯ মাঘ, পৃ. ৪৯৭
৫. তদেব, পৃ. ৪৯৭
৬. মমতা খাঁ : 'সুফি ভাবনা ও বাংলা সাহিত্য', সঞ্চয়ন, আরামবাগ টাইমস্ পত্রিকা, ১২ জানুয়ারি ২০১৬, গ্রন্থমেলা, পৃ. ১১
৭. ড. ব্রতীশ ঘোষ : 'লালনগীতিকা', ১ম গান, ৮৫, উৎস, বাংলার সুফি ধর্ম ও সাহিত্য, অচিন প্রকাশনী, ২০০৮, পৃ. ২০২
   (ক) তদেব, পৃ. ২০২
   (খ) ড. লায়েক আলি খান, প্রসঙ্গ : 'বৈষ্ণব সাহিত্য', তপতী পাবলিশার্স, ১৪০২, পৃ. ২২৬
   (গ) তদেব, পৃ. ২২৬
   (ঘ) ড. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : 'বাংলার বাউল ও বাউল গান', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৩
৮. রামদুলাল বসু সম্পাদিত : কৃষ্ণদাস কবিরাজ : 'চৈতন্য চরিতামৃত', আদিলীলা ৪র্থ পরিচ্ছেদ,

গ্রন্থবিকাশ, ১৯৯১, পৃ. ৪৭
৯. শ্রী সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : সম্পাদিত 'বৈষ্ণব পদাবলী', মডার্ণ বুক এজেন্সী, ১৯৮৩, পৃ. ৩৫
(ক) ড. ব্রতীশ ঘোষ : 'বাংলার সুফি ধর্ম ও সাহিত্য', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯
১০. শক্তিনাথ ঝা : 'ফকির, লালন সাঁই, দেশ কাল এবং শিল্প', সংবাদ, ১৯৯৫, পৃ. ২০৮
১১. তদেব, পৃ. ৩২
১২. তদেব, পৃ. ২০৮
১৩. তদেব, পৃ. ৫৩
১৪. তদেব, পৃ. ২০৯
১৫. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : 'বাংলার বাউল ও বাউল গান', প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১১
১৬. শ্রী চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : 'প্রবাসী পত্রিকা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০১
১৭. তদেব, পৃ. ৫০২
১৮. তদেব, পৃ. ৫০২
১৯. তদেব, পৃ. ৫০৩
২০. তদেব, পৃ. ৫০৩
২১. তদেব, পৃ. ৫০৩
২২. তদেব, পৃ. ৫০৩

খ্যাপা খুঁজে ফেরে পরশপাথর

সুস্মিতা ঘোষ

বেদাচার বহির্ভূত ধর্মসাধনরীতির ফল্গুধারা বাংলাদেশের সমাজে সুদূর অতীত থেকেই ছিল প্রবহমান। নবম-দশম শতাব্দীতে রচিত বাংলা সাহিত্যের আদিতম নিদর্শন চর্যাগানগুলির মধ্যে আমরা বৌদ্ধসহজিয়া সাধকদের এই রকম সমাজবহির্ভূত ধর্ম পদ্ধতির ইঙ্গিত পাই। অতঃপর পৌরাণিক ধ্যানধারণার ক্রমাগ্রসরতার ফলে অধিকাংশ বেদ বহির্ভূত হিন্দুধর্মের ছত্রছায়ায় গুহ্যসাধন আসীন হয়ে নিজেদের শাস্ত্রীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে। তথাপি এই শাস্ত্রীয়ধর্মের প্রবল স্রোতের আড়ালে বাংলার লোকসমাজের নিজস্ব সাধনরীতি ও সাধনসংগীতগুলি ক্ষীণ ধারায় বহমান হয়ে নিজ নিজ অস্তিত্ব অটুট রেখেছে। বাউল-কর্তাভজা-মারফতী-গুরুসত্য প্রভৃতি এই ধরনের গুহ্যসাধনমূল গীতি। এগুলির মধ্যে অন্যতম হল বাংলার বাউলসংগীত। গ্রামবাংলার সরস মৃত্তিকাতেই এই মরমি সাধনার জন্ম ও বিকাশ।

বাউলসাধকদের উদ্ভব সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য না পাওয়া গেলেও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে বাউল শব্দের একাধিক প্রয়োগ লক্ষিত হয়। পঞ্চদশ শতকে লেখা শাহ মুহম্মদ সগীরের 'ইউসুফ জোলেখা', মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়', ষোড়শ শতকে বাহরাম খানের 'লায়লী মজনু'তে 'বাউল' শব্দের প্রয়োগ আছে। সর্বোপরি বৈষ্ণব সমাজের মহাগ্রন্থ 'শ্রী শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত'-এর অন্ত্যলীলায় দেখি অদ্বৈতাচার্য নিজেকে এবং মহাপ্রভুকে 'বাউল' অভিধায় ভূষিত করেছেন—

বাউল কে কহিও লোকে হইল আউল।
বাউল কে কহিও হাটে না বিকায় চাউল।
বাউল কে কহিও কাজে নাহিক আউল।
বাউল কে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল॥

এ থেকে সহজেই অনুমেয় অন্তত খ্রিস্টিয় পঞ্চদশ শতক থেকেই বাংলাদেশে বাউল সম্প্রদায় সুপরিচিত ছিল। তবে বাউলাঙ্গের সাধনার ইতিহাসের পুবদিগন্তে চোখ মেললে আমরা দেখি সুদূর মধ্যপ্রাচ্যের সুফি মতবাদ তুর্কিবিজয়ের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল বাংলার লোকসমাজে। এই সুফিসাধনার পরম লক্ষ্যই ছিল স্রষ্টা বা পরম সত্তার সঙ্গে মিলন। তার জন্যে সাধককে পাড়ি দিতে হয় অনেকটা পথ-সে পথের প্রদর্শক হলেন মুর্শিদ বা পীর বা গুরু। আত্মসংযমী হয়ে, প্রেমের মধ্যে দিয়ে আল্লার সান্নিধ্য পাওয়াই ছিল এই সুফিসাধকদের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা। ক্রমে ক্রমে সুফিসাধকদের এই প্রেমমূলক ভক্তিবাদ ও বৌদ্ধসহজিয়া সাধকদের আদর্শ মানবতাবাদ সম্মিলিত হয়ে রূপান্তরিত

হয় বাউল নামক ভাব সাধনায়। বিশিষ্ট বাউল বিশেষজ্ঞ যথার্থ মন্তব্য করেছেন—

> বাউল মতবাদের আদি উদ্ভব বাংলায় বৌদ্ধসমাজে। বজ্রযানী বৌদ্ধসহজিয়ারাই বাংলার 'আদি বাউল'। পরবর্তীকালে এই মতবাদ—শাক্তমত ও ইসলামি সুফি ভাবধারার আড়ালে আত্মগোপন করে প্রবাহিত হতে থাকে এবং এর একটি শাখা সপ্তদশ শতকে বীরভদ্রের দ্বারা বৈষ্ণব সহজিয়া জনসামাজে প্রবাহিত হয়। অষ্টাদশ শতকে লালন শাহ বৌদ্ধসহজিয়ার বাউল সাধনার মূল ধারাটি সোহরাওয়ারদিয়াতীরকার 'সদা সোহাগিনী' গোরোর ফকির সিরাজ শাহের নিকট থেকে লাভ করেন।[১]

তবে বাউল সংগীতগুলি বাংলার লোকসমাজে প্রত্যক্ষ ভাবে প্রচলিত ও জনপ্রিয় হয়ে ওঠার পশ্চাতে সক্রিয় হয়েছে অষ্টাদশ শতকের সামাজিক বিশৃঙ্খলা, রাজনৈতিক অরাজকতা, অর্থনৈতিক বিপর্যয়। আঠারো শতকের রাজনৈতিক ইতিবৃত্ত শাঠ্য-ষড়যন্ত্র-গুপ্তহত্যা-নীচতায় কালিমালিপ্ত। বিদেশি বণিক ও মুসলমান সুবাদার, দেওয়ানদের শোষণে সুবা বাংলার অর্থনৈতিক জীবন তখন হয়ে পড়েছিল বিশীর্ণ। উপরন্তু বর্গী হামলায় শস্যশ্যামলা বাংলা কার্যত পরিণত হয়েছিল শ্মশানে। এরই সমান্তরালে বিলাসী-উচ্ছৃঙ্খল-দুর্নীতিপরায়ণ মুসলিম শাসকদের ব্যভিচারের সমাজ— হানিকর দৃষ্টান্ত ক্ষয়িষ্ণু করে তুলেছিল জনমনের নৈতিক ভিত্তি। এই ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ সমাজপ্রতিবেশে, শঙ্কা সংশয়তার দোলাচলে যখন বিপন্ন হয়ে পড়েছিল মানব জীবন, সমাজ-ধর্ম-মনুষ্যত্ব যখন ধ্বংসোন্মুখ, তখন যাবতীয় দুর্বিপাক থেকে মুক্তির আশায় মানুষ একদিকে যেমন শরণ নিয়েছে আদ্যাশক্তি মহামায়ার, অপরদিকে তেমনি উন্মুখ হয়েছে চৈতন্যোদয়ের আকাঙ্ক্ষায়। আত্মগ্রাসী পঙ্কিলতার আবর্ত থেকে উত্তরণের আশাতে, যাবতীয় সঙ্কট থেকে আত্মরক্ষণের আকুতিতেই এই সময় শাক্ত সাধকদের কণ্ঠে ধ্বনিত হল মাতৃগীতিকাগুলি। তেমনি বাউল সাধকদের একতারার সুরে স্বতোৎসারিত হল মরমি সংগীত। বাংলার মানুষের অশান্তি, ক্লান্তি, দীর্ঘনিশ্বাসের পথ অতিক্রম করে লালন ফকির, গগন হরকরা, প্রমুখ বাউল সাধকরা একতারা হাতে প্রেমের গান শোনালেন, জাগিয়ে তুললেন 'আত্ম চেতনার আর্তি'—বাংলার দগ্ধচিত্তে শান্তিবারি সিঞ্চিত হল।

বাউল সাধনাতে আত্মোপলব্ধির কথাই প্রধান। সত্যজ্ঞানে জ্ঞানী হয়ে নিজ স্বরূপ অনুভব করে আপন সত্তার প্রতিষ্ঠাই এই ভাবমূলক সাধনার মর্মকথা। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মনের মানুষ' উপন্যাসে সিরাজ সাঁই সেই গূঢ়তত্ত্বই লালনকে বুঝিয়েছেন সহজ কথায়—

> ফকির বললেন,... সকলের আগে খুঁজে বের করতে হবে, তুমি কে? ভাইটি, মনে রেখো, সব খোঁজাখুঁজির মধ্যে বড় হল নিজেকে খোঁজা।
>
> লালু বলল, আমি কে? খুঁজতে হবে?[২]

আত্ম চৈতন্যের মধ্যে দিয়েই আত্মশুদ্ধি হয়। এর ফলেই মানুষ দিব্যজ্ঞানী হয়—'আত্মতত্ত্ব যে জেনেছে, দিব্য জ্ঞানী সেই হয়েছে।' বাউল তত্ত্বে বলা হয় সৃষ্টির মধ্যেই পরমাত্মা লীন হয়ে থাকেন। জীব যখন অজ্ঞতার আব্রু ঘুচিয়ে জ্ঞানলোকে প্রবেশ করে তখনই জীবাত্মা-পরমাত্মার ভেদ লুপ্ত হয়। জীব তখন নিজেকে পরমপুরুষের অংশরূপে বুঝতে পারে। বাউলসাধক যাদবেন্দুর গানে সেই মধুর মিলনেরই প্রকাশ—

মেলে তায় খুঁজলে আপনার দেহ-মন্দিরে।
ও সেই জগৎপিতা কচ্ছে কথা

অতি মিষ্ট মধুর স্বরে॥

মানুষের অন্তরস্থিত এই পরমসত্তাকে বাউল সাধকেরা 'মনের মানুষ' বলে অভিহিত করেন। এই মনের মানুষের অন্বেষণই বাউলদের চিরজন্মের সাধন। একটি গানে লালন ফকির 'মনের মানুষ' কে 'পড়শি' রূপে সম্বোধন করেছেন—

আমি এক দিন ও না দেখিলাম তারে
আমার বাড়ির কাছে আরশীনগর
ও এক পড়শি বসত করে।
গ্রাম বেড়িয়ে অগাধ পানি
ও তার নাই কিনারা নাই তরণী পারে
আমি বাঞ্ছা করি দেখব তারি
আমি কেমনে সে গাঁয়ে যাই রে।

প্রতিটি মানুষের শুদ্ধ চিত্তেই ঈশ্বর বাস করেন—তিনিই আরশীনগরে বাস করা পড়শি। কিন্তু বিষয় বাসনার মোহজালে আটকে থাকা মানুষ কিছুতেই তাঁর নাগাল পায় না। নিরাকার সেই পরমের সন্ধান পেলে পার্থিব দুঃখ শোক থেকে মুক্তি পাওয়া যায় কিন্তু ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের পথ সহজলভ্য নয়। সাংসারিক মোহমুগ্ধতা, ইন্দ্রিয়সুখ থেকে বিরত থাকতে পারলে তবেই পড়শিকে ছোঁয়া যায়। জাগতিক বিষয়ের সকল চাওয়া-পাওয়া অবসানের এই স্তরে উন্নীত হওয়াকেই সুফি সাধনায় বলে 'ফানা' আর বাউল ধর্মে একেই বলে 'জ্যান্তে মরা'।

মানুষ যতই পরমমানবের স্বতঃ প্রকাশ রূপে নিজেকে চিনতে পারে ততই বিশ্ব নিখিলের সঙ্গে তাঁর আত্মার যোগ সুদৃঢ় হয়। এভাবে সে যেমন অন্তরে অন্তরে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে তেমনি ক্ষুদ্র আমিত্বের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিশ্বমানবাত্মা রূপে নিজেকে অনুভব করতে পারে। বাউলসাধক ও নিজ অন্তরের জরা-মৃত্যু-শোকের অতীত সেই মহান আত্মার সন্ধানী। আর তাঁকে জানা যায় আপন মনের গহীনে ডুব দিয়ে। অথচ সাধরণ মানুষ তাঁকে খোঁজে বহির্জগতে, পরিণামে মেলে হতাশা–

আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে
দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে। (গগন হরকরা)

রবীন্দ্রনাথের লেখনীতেও সেই চিরন্তন সত্যের প্রকাশ দেখি—

> আপনারই পরমকে না দেখে মানুষ বাইরের দিকে সার্থকতা খুঁজে বেড়ায়। শেষকালে উদ্ভ্রান্ত হয়ে ক্লান্ত হয়ে সে বলে, কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম। মানুষের দেবতা মানুষের মনের মানুষ। জ্ঞানে কর্মে ভাবে যে পরিমাণে সত্য হই সেই পরিমাণেই সেই মনের মানুষকে পাই- অন্তরে বিকার ঘটলে সেই আমার আপন মানুষকে মনের মধ্যে দেখতে পাইনে। মানুষের যত কিছু দুর্গতি আছে সেই আপন মনের মানুষকে হারিয়ে, তাঁকে বাইরের উপকরণে খুঁজতে গিয়ে, অর্থাৎ আপনাকেই পর করে দিয়ে।[৩]

তবে বাউলরা একদিকে যেমন অধ্যাত্মমার্গে বিশ্বাসী, অর্থাৎ শুদ্ধ মনোমার্গে সর্বশক্তিমানকে অনুভব করার প্রয়াস করেন তেমনি দেহমার্গেও রহস্যাবৃত অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধির মধ্যে আনতে চান। বাউল মতে 'দেহ মন্দিরে' এই সব কিছুর সন্ধান পাওয়া যায়। বাউলদের সাধনা

তাই দেহবাদী সাধনাও বটে। মানবদেহের মধ্যেই যেহেতু মূলতত্ত্ব বা ঈশ্বরের অবস্থান তাই দেহকে আশ্রয় করেই পরম প্রাপ্তি সম্ভব—

আপন দেহের খবর জান রে মন।
আছে তোর এই দেহে চোদ্দ ভুবন॥ —অজ্ঞাত

কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় মিলে যে দশ ইন্দ্রিয় তাঁকে করায়ত্ত করেই আত্মচৈতন্যকে জাগ্রত করতে হয়। বাউলরা নিজ দেহের ভিতর গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর অধিষ্ঠান কল্পনা করেছেন। এই তিন নদী হল যথাক্রমে বামগা নাড়ি ইড়া, দক্ষিনগা নাড়ি পিঙ্গলা, ও মধ্যগা নাড়ি সুষুন্না—এই ত্রিনাড়ির মিলনই হল 'ত্রিবেণী'। এই ত্রিবেণীর উপর প্রেমের নৌকা বেঁধে নির্দিষ্ট সরণী বেয়ে সন্তর্পণে গমন করতে হয়। তবেই সাধনলক্ষ্যে পৌছনো যায়। বাউলসাধকের এই দেহতত্ব আমাদের সহজেই স্মরণ করিয়ে দেয় চর্যাগানে উল্লিখিত গুহ্যসাধনরীতির কথা—

রাম দাহিন চাপি মিলি মাগা
বাটত মিলিল মহাসুখ সঙ্গা॥ —কম্বালম্বর পা

বৌদ্ধসহজিয়া সাধকদের কায়সাধনায় বামগা ও দক্ষিণগা নাড়ির নিম্নমুখী ধারাকে মধ্যনাড়িতে রুদ্ধ করে নাভিচক্রে উদ্ভূত কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে যেভাবে মস্তিষ্কে সহস্রদলচক্রে আনয়ন করে 'সহজানন্দ' লাভ করার কথা বলা হয়েছে, তেমনি বাউল সাধনাতেও একই ভাবে আত্মোপলব্ধির লক্ষ্যে শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণপূর্বক নিম্নদেহাংশকে ঊর্ধ্বগামী করে তোলার কথাই বলা হয়েছে।

তবে, বাউল সাধকের সাধনা মনোমার্গীয় হোক বা দেহমার্গীয় তাতে প্রেমের ব্যঞ্জনা গভীর। শুদ্ধ প্রেমই বাউলদের সিদ্ধিগঞ্জের প্রবেশদ্বার। প্রেমকে শিরোধার্য করে যথার্থ রসিক হয়েই বৃহত্তর প্রেম-সাগরে পাড়ি দিতে হয়। অন্তরাত্মার সঙ্গে মধুর মিলনের মধ্যে দিয়েই নিজ অস্তিত্ব অনুভূত হয় এবং আত্মজ্ঞানী হয়ে ওঠা যায়। ধর্ম সাধনার ত্রিপথ কর্ম, জ্ঞান ও প্রেমের মধ্যে প্রেমই সর্বোত্তম। তাই অন্তরের নিঃশর্ত সমর্পণ দিয়েই প্রাণের নিধিকে লাভ করা যায়। রাধাশ্যাম বাউল তাই গেয়েছেন—

সেই প্রাণের নিধি আছেন নিরবধি
ধরবি যদি কর সাধনা।
তিনি আত্মা রূপে থাকেন সহস্রারে
কেউ চেনে কেউ চেনে না।

যে মনের মানুষের সন্ধানে বাউল সাধকরা ব্যাকুল তাঁকে পেলেই বিশ্বজগৎকে চেনা যায়, সত্যোপলব্ধি হয়, আত্মা শান্তি পায়। তাই 'হৃদয়রতন'-এর সঙ্গে মিলনাকাঙ্ক্ষা বারবার ধ্বনিত হয়েছে বাউল গীতিকায়। রসের সাগরে ডুব দিয়েই সে রতনকে সেঁচে আনতে হয়, শাস্ত্রের তন্তর মন্তর সেখানে নিষ্ফল—

যে রূপে সাঁই আছে মানুষে
শুদ্ধ রসিক নইলে কি পাবি তার দিশে
বেদী ভাই বেদ পরে সদাই
আসলে গোলমাল বাধায়
রসিক ভাই ডুবে
হৃদয় রতন পায় সে। —অজ্ঞাত

বাউল ধর্মে ব্যক্তিমানুষ ও পরমপুরুষ একীভূত হয়ে গেছেন। বাউলদের আরাধ্য পরমাত্মা তো কোন শাস্ত্রীয় দেবতা নন। শাস্ত্র যেখানে বাহ্যিক ধর্মাচরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করে, বাউলরা সেখানে বলে অন্তরধর্মের কথা। বাউলদের সাঁই বিশ্বলোকে ব্রহ্মসত্তারূপে ও মানবদেহে আত্মারূপে বিরাজমান। তাদের জীবনদেবতা যেহেতু সকল মানবদেহেই বাস করেন তাই মনুষ্যজীবন ও মনুষ্যদেহ কোনটিকেই তাঁরা অবহেলা করেন না। সকল কু-প্রবৃত্তি ধ্বংস করে নিজেকে 'সোনার মানুষ' রূপে গড়ে তুলতে হয়– তবে 'মনের মানুষ'কে পাওয়া সহজ হয়। মানুষের মাঝেই বাউলসাধক মানুষ রতনকে খুঁজে পেতে চায়। আর তাঁকে পাওয়ার শ্রেষ্ঠ মার্গ 'মাধুর্য ভজন'। প্রেমভক্তি দিয়েই তাঁকে লাভ করা যায়। প্রেম তাঁদের সাধনপদ্ধতি ও দেহ তাঁদের সাধনমন্দির। জ্ঞান অপেক্ষা প্রেমই তাঁদের কাছে শ্রেয় ও কাম্য।

বাউলদের সাধনায় এই প্রেমের অভিব্যঞ্জনার সূত্র ধরেই কৃষ্ণপ্রসঙ্গ এসেছে বারংবার; কারণ কৃষ্ণপ্রেমের মাধুর্য জগতকে করেছে অমৃতময়। এই অধ্যাত্ম প্রেমের মর্ম যিনি বোঝেন তিনি কৃষ্ণের চরণে ঠাঁই লাভ করেন—

কৃষ্ণের আনন্দপুরে
কামিলোভী যেতে নারে
শুদ্ধ ভক্তি ভক্তের দ্বারে
সে চরণ কমল নিকটে যায়।। —লালন ফকির

শ্রীরাধা যেমন সর্বত্যাগী হয়ে কৃষ্ণ প্রেমে আত্মহারা হয়ে ছিলেন, তেমনি একাগ্র চিত্তে গভীর আত্মপ্রেমে মগ্ন হলেই সাঁই এর দেখা পাওয়া সম্ভবপর—

যে প্রেমে রাই হরে কৃষ্ণের মন
অকৈতব সেই প্রেমের করন
যোগ্য অনুসার, মর্ম জানে তার
অযোগ্য পাত্রে কি ঠাট।। —লালন ফকির

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধে মানবধর্মের সারবত্তা বর্ণন করতে গিয়ে বলেছেন—

> মানুষ কী করে হবে মানুষের মত তাই নিয়ে বর্বর দশা থেকে সভ্য অবস্থা পর্যন্ত তাঁর চিন্তা ও প্রয়াসের অন্ত নেই। সে বুঝেছে, সে সহজ নয়, তার মধ্যে একটা রহস্য আছে; এই রহস্যের আবরণ উদ্ঘাটিত হতে হতে তবে সে আপনাকে চিনবে। শত শত শতাব্দী ধরে চলেছে তার প্রয়াস। কত ধর্মতন্ত্র, কত অনুষ্ঠানের পত্তন হল; সহজ প্রবৃত্তির প্রতিবাদ করে নিজেকে সে স্বীকার করাতে চায় যে, বাইরে সে যা ভিতরে ভিতরে তার চেয়ে সে বড়ো। এমন কোন সত্তার স্বরূপ সে মনের মধ্যে গ্রহণ করবার চেষ্টা করেছে, আদর্শ রূপে যিনি তার চেয়ে বড়ো অথচ তার সঙ্গে চিরসম্বন্ধযুক্ত।[৪]

বাউলদের 'অরূপরতন' এর সন্ধান ও সেই নিজ অন্তরস্থিত মহামানবের অন্বেষণ, নিজ মানবত্বের অনুভব।

সৃষ্টি ব্যতীত স্রষ্টা শূন্য। তাই বাউলদের কাছে মানুষই সর্বোত্তম। কারণ সকল মানুষের মধ্যেই ঈশ্বর বিরাজমান। চণ্ডীদাসের মহান বাণী 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'—এই বাণীই ধ্বনিত হয়েছে বাউল গানে—

এমন মানব আর কি হবে
মন যা করো ত্বরায় করো এই ভেবে।
অনন্ত রূপ ছিষ্টি করলেন সাঁই
শুনি মানবের উত্তম কিছুই নাই
দেব দেবতাগণ করে আরাধন
জন্ম নিতে মানবে।[৫]

বাউলদের মনের মানুষের সন্ধানের জন্য লাগে না কোন জাতের গরিমা, তন্ত্র-মন্ত্র। তাই যাবতীয় সংস্কার দূরীভূত করে সাধন পথে অগ্রসর হয় বাউল সাধক। জাতি বিদ্বেষ-বৈরিতা দূর করতে পারলে, হিন্দু-মুসলমান ভেদ জ্ঞান বিস্মৃত হতে পারলে তবেই প্রকৃত মানুষের সন্ধান পাওয়া যায়। সমস্ত কিছুর মূলে তো রয়েছেন এক জনই—তিনি সর্বশক্তিমান। তাঁর নাগাল পেতে গেলে জাতি ভাবনা বিসর্জন দিয়ে একাগ্র চিত্তে সাধন করতে হয়–

ভবে মানব গুরু নিষ্ঠা যার
সর্ব—সাধন সিদ্ধ হয় তার॥
নদী কিংবা বিল, বাঁওর, খাল–
সর্ব তরে একই সে জল
একা মোর সাঁই
আছে সর্ব ঠাঁই
মানুষে মিলে সে হয় রূপান্তর॥[৫]

জাতপাতের সংকীর্ণতায় মন সীমাবদ্ধ হয়ে থাকলে কখনই প্রকৃত মানুষের সন্ধান মেলে না। উঁচু জাত নিচ জাত নয়, হিন্দু-মুসলমান নয়, সাঁই ধরা দেন বিশুদ্ধ ভক্তের কাছে। লালন তাঁর গানে বলেছেন—

ভক্তির দ্বারে বাঁধা আছেন সাঁই
হিন্দু কি যবন বলে
তাঁর কাছে জাতের বিচার নাই॥
ভক্ত কবীর জেতে জোলা,
প্রেম-ভক্তিতে মাতোয়ালা
ধরেছে সেই ব্রজের কালা
দিয়ে সর্বস্ব ধন তাঁর।

বাংলার বাউল সম্প্রদায় এই রূপে যাবতীয় শাস্ত্রীয় আচার-অনুষ্ঠান, ধর্মীয় বিধি-নিষেধকে অগ্রাহ্য করে পরিপূর্ণ অন্তর্মুখী সাধনায় আত্মনিমগ্ন হয়েছেন। জাত-পাতের অর্থহীন বেড়াজাল ছিন্ন করে তাঁরা মানুষের ভগবত্তা ঘোষণা করেছেন। বৈষ্ণবধর্মীয় কান্ত– কান্তার মধুর সম্পর্কের মতই মনের মানুষের সঙ্গে মিলন রসে নিমজ্জিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় নিঃস্বার্থ আত্মসমর্পণ করেছেন সাধনায়। অরূপকে দর্শনের আকুল আকাঙ্ক্ষায় তাঁরা ডুব দিয়েছেন রূপসাগরে। সৃষ্টির মধ্যেই খুঁজে পেয়েছেন স্রষ্টার অস্তিত্ব। সাকার দেহের মধ্যে নিরাকার আনন্দ স্বরূপকে উপলব্ধি করার নিরন্তর অন্বেষণে রত হয়েছেন। খুঁজে বেরিয়েছেন সেই পরশপাথর যার পরশে হৃদয় হবে খাঁটি সোনা।

উৎসের সন্ধানে

১. ড. এস. এম. লুৎফর রহমান : 'লালন শাহ : জীবন ও গান', বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা কার্তিক ১৩৯০, পৃ. ৮৯-৯০
২. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় : 'মনের মানুষ', আনন্দ পাবলিশার্স, জানুয়ারি, ২০০৮, পৃ. ১২
৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'মানুষের ধর্ম', রবীন্দ্ররচনাবলী, দশম খণ্ড, বিশ্বভারতী প্রকাশনা, পৌষ ১৩৯৬, পৃ. ৬৩১
৪. তদেব : পৃ. ৬২৪
৫. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : 'বাংলার বাউল ও বাউল গান', পৃ. ৫৪৭
৬. ড. সঞ্জয় প্রামাণিক : 'বাউল গানের তত্ত্বকথা ও ভাষা', অক্ষর প্রকাশনী, এপ্রিল ২০১২, পৃ. ৬৫

রবীন্দ্রজীবন ও সৃষ্টিকর্মে বাউল প্রেরণা

নাজিমুল হক

দেখেছি একতারা হাতে চলেছে গানের ধারা বেয়ে
মনের মানুষকে সন্ধান করবার
গভীর নির্জন পথে।...
কবি আমি ওদের দলে—
আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন।

রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী ও বিবর্তনধর্মী প্রতিভার প্রেরণা ছিল নানা মাত্রিক। তাঁর জীবন ও সৃষ্টিকর্মে সর্বাধিক প্রাধান্য পেয়েছে মানুষ। তাই দেশ-বিদেশের মানবতাবাদী ধর্ম-দর্শন, সমাজ-সভ্যতা, সাহিত্য-সংস্কৃতি থেকে তিনি প্রেরণা লাভ করেছেন। মানবমুখী বাংলার বাউল সাধনাও তাঁকে অনুরূপভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। ড. আবদুল ওয়াহাবের ভাষায়—

> জাত-সম্প্রদায়, ধনী-গরিব, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মানুষকে ভালোবাসার মন্ত্র বাউল দর্শন। কোনোপ্রকার অনুমানে তাদের বিশ্বাস নেই, তারা বস্তুনির্ভর—তাদের মানবতাবাদী চেতনার রসদ-উপাদান বস্তুজগত তথা লোকজগত থেকে নেওয়া। ...বাউল দর্শন বাংলার লোকায়ত দর্শন। এটা একান্ত বাংলার। যোগ-তন্ত্র-সংখ্যা, বৌদ্ধ সহজিয়া, বৈষ্ণব সহজিয়া, সুফি চিন্তার সমন্বয়ের হাজার বছরের বাংলায় লোকায়ত চিন্তার জারক রসে জারিত হয়ে এর উদ্ভব-বিকাশ। মানবতাবাদী এই দর্শনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আত্মিক পরিচয় ঘটেছিল। ...চলনে বলনে, কথা-বার্তায়, বেশ-ভূষা ও লেখা-লেখি থেকে আমরা এই সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে, রবীন্দ্রনাথের বাউল হওয়ার শখ ছিল আজন্ম।

এমনকি, তিনি অকুণ্ঠ চিত্তে নিজেকে 'রবীন্দ্র-বাউল' বলেও অভিহিত করেছেন। আবুল আহসন চৌধুরীর কথায়—

> বাউলের গানের সুর, বাণী ও তত্ত্বকথা যেমন তাঁকে আকৃষ্ট করেছে, তেমনি বাউলের বেশভূষায়ও তিনি প্রভাবিত হয়েছেন—বাউলের আলখাল্লা তাঁর পোষাকের প্রতীক হয়ে উঠেছিল।

(রবীন্দ্রনাথ ও শিলাইদহের বাউল-সম্প্রদায়' : শ্রীসনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত 'বাউল-লালন-রবীন্দ্রনাথ')।

নিজের আচার-বিচারহীন উদার ধর্মবোধ, একেশ্বরবাদী দর্শন, সর্ব সংস্কারমুক্ত মানবতাবাদের

সঙ্গে সাযুজ্যের কারণেই রবীন্দ্রনাথের এই বাউল-প্রীতি। অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এ বিষয়ে যথার্থই বলেছেন—

> বাউলরা যেমন প্রচলিত শাস্ত্রাচার মানে না, কোনো দেব-দেবীর উপাসনা করে না, বা কোনো প্রচলিত ধর্মের অনুষ্ঠান করে না, রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও ইহার যথেষ্ট প্রবণতা ছিল এবং তাঁহার ধর্মমতে তিনি বাউলদের মতোই একটা স্বাতন্ত্র্য অনুভব করিতেন। রবীন্দ্রনাথের ধর্ম-চেতনা মূলত ঈশ্বর-প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত। সে-প্রেম নানারূপ লইয়া তাঁহার অনুভূতি ও কল্পনাকে বিচিত্র পথে চালিত করিয়াছে এবং একটা অভিনব সাহিত্য-সৃষ্টিরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

মানবমুখী জীবনদর্শনের পাশাপাশি রোমান্টিক চেতনা এবং মিস্টিসিজমের প্রতি আকর্ষণও তাঁকে বাউলদের প্রতি আকৃষ্ট করে তুলেছিল। গৈরিক আলখাল্লায় আসক্তিহীন বৈরাগ্য, একতারার ধ্বনি-ঝংকারে বাংলার আকাশ-মাটি-নদী-নালা-মাঠ-ঘাটের উদাসী আহ্বান, পথিক-সাধকের উদাত্ত কণ্ঠে অজানা মনের মানুষের চির অন্বেষণ—এ সবই বিশ্বকবিকে বাউল হতে প্রণোদিত করেছিল। রবীন্দ্রজীবন ও সৃষ্টিকর্মে তার প্রভূত প্রমাণ ছড়িয়ে আছে।

'সঙ্গীত-সংগ্রহ বাউলের গাথা' নামক একটি গ্রন্থ হাতে পেয়ে রবীন্দ্রনাথ বাউল গান-বিষয়ে অত্যন্ত কৌতূহলী এবং আকৃষ্ট হয়ে ওঠেন। ১২৯০ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'বাউল গান' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি উক্ত গ্রন্থের সমালোচনা করতে গিয়ে তাঁর বাউল প্রীতি ব্যক্ত করেন। বাউল মুগ্ধ কবি লেখেন—

> তোমরা বাঙ্গালা করিয়া সর্বত্র খুঁজিয়া বেড়াইতেছ, সংস্কৃত, ইংরেজি সমস্ত, ওলট পালট করিতেছ, কেবল একবার হৃদয়টার মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া দেখ নাই। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থে একটি গান আছে—
>
> আমি কে তাই জানলেম না,
> আমি আমি করি কিন্তু আমি আমার
> ঠিক হইল না।
> কড়ায় কড়ায় কড়ি গণি
> চার কড়ায় এক গণ্ডা গণি,
> কোথা হইতে এলাম আমি তারে কই গণি!
>
> আমাদের ভাব আমাদের ভাষা যদি আয়ত্ত করিতে চাই, তবে বাঙালি যেখানে হৃদয়ের কথা বলিয়াছে, সেইখানে সন্ধান করিতে হয়।

আবার মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের বাউল গীতি-সংকলন 'হারামণি'র প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় তিনি বলেছেন—

> আমাদের দেশের ইতিহাস আজ পর্যন্ত, প্রয়োজনের মধ্যে নয়, পরন্তু মানুষের অন্তরতর গভীর সত্যের মধ্যে মিলনের সাধনাকে বহন করে এসেছে। বাউল-সাহিত্যে বাউল সম্প্রদায়ের সেই সাধনা দেখি—এ জিনিস হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই, একত্র হয়েছে অথচ কেউ কাউকে আঘাত করেনি। এই মিলনে সভা-সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়নি;— এই মিলনে গান জেগেছে, সেই গানের ভাষা ও সুর অশিক্ষিত মাধুর্যে সরস। এই গানের ভাষায় ও সুরে হিন্দু-মুসলমানের কণ্ঠ মিলেছে

> কোরাণ পুরাণে ঝগড়া বাধেনি। এই মিলনেই ভারতের সভ্যতার সত্য পরিচয়, বিবাদে-বিরোধে বর্বরতা।

জমিদারির কাজে শিলাইদহে থাকার সময়ে রবীন্দ্রনাথ বাউলদের ঘনিষ্ঠ সংসর্গ লাভ করেন। মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের বাউল গীতি-সংকলন 'হারামণি'র দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় তিনি নিজেই বলেছেন—'শিলাইদহে যখন ছিলাম, বাউলদের সঙ্গে আমার সর্বদাই দেখাসাক্ষাৎ ও আলাপ আলোচনা হতো।'

এই সময় তিনি গগন হরকরা, কাঙাল হরিনাথ, গোঁসাই রামলাল, গোঁসাই গোপাল, সর্বক্ষেপী বোস্টমী এবং লালনের শিষ্যদলের সঙ্গে বাউল গান ও সাধনা বিষয়ে আলাপ আলোচনায় মগ্ন থাকতেন। এই ঘনিষ্ঠতার সুবাদেই তিনি বাংলার বাউল ও তাঁদের সাধন-সংগীতকে শিক্ষিত সুধীসমাজে পরিচিত করান। শিলাইদহ, ছেঁউড়িয়া ইত্যাদি অঞ্চল থেকে লোকসাহিত্য ও লোকশিল্পকলার নানা উপকরণ-নিদর্শনের পাশাপাশি লালন ফকির ও গগন হরকরার বেশ কয়েকটি গানও তিনি সংগ্রহ করে প্রচার করেন।

রবীন্দ্রনাথের লালন-প্রীতির প্রথম প্রকাশ সম্ভবত গোরা উপন্যাসে। ১৩১৮ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে 'ভারতী' পত্রিকায় এই উপন্যাসের প্রথম কিস্তি প্রকাশিত হয়। তাতে প্রারম্ভ অংশে বর্ষাশেষের রৌদ্রোজ্জ্বল প্রভাতী কলকাতার রাজপথে এক উদাস ভাবময় বাতাবরণ গড়ে তুলতে তিনি লালন ফকিরের সেই বিখ্যাত 'খাঁচার ভিতর অচিন্ পাখি কমনে আসে যায়' গানটি ব্যবহার করেছেন। এই গানটির সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা যেন সমগ্র উপন্যাস-কাহিনির মূলভাবের মুখবন্ধ হয়ে উঠেছে। বাউল সাধকেরা যেমন করে ধর্ম-সমাজ-সংস্কারের ক্ষুদ্র সীমাকে ডিঙিয়ে 'পরম শেষের' সন্ধান করে ফেরেন, এই গানের মধ্যেও সেই উপলব্ধি ব্যঞ্জিত হয়েছে।

'গোরা' উপন্যাসে কেবল নয়, জীবনস্মৃতি গ্রন্থের 'গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ' অধ্যায়েও এই গানের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেখানে তিনি লিখেছেন—

> সেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিশ্ববিমোহিনী বিদেশিনীর দ্বারে আমার গানের সুর আমাকে আনিয়া উপস্থিত করিল এবং কহিলাম—
>
> ভুবন ভ্রমিয়া শেষে
> এসেছি তোমারি দেশে
> আমি অতিথি তোমারি দ্বারে, ওগো বিদেশিনী।
>
> ইহার অনেকদিন পরে একদিন বোলপুরের রাস্তা দিয়া কে গাহিয়া যাইতেছিল—
>
> খাঁচার মাঝে অচিন পাখি কমনে আসে যায়,
> ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতেম পাখির পায়।
>
> দেখিলাম বাউলের গানও ঠিক ঐ একই কথা বলিতেছে। মাঝে মাঝে বন্ধ খাঁচার মধ্যে আসিয়া অচিন পাখি বন্ধনহীন অচেনার কথা বলিয়া যায়—মন তাহাকে চিরন্তন করিয়া ধরিয়া রাখিতে চায় কিন্তু পারে না। এই অচিন পাখির নিঃশব্দ যাওয়া-আসার খবর গানের সুর ছাড়া আর কে দিতে পারে!

১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় দর্শন মহাসভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'The Philosophy of our people' শীর্ষক ভাষণে লালনের উক্ত গানের উল্লেখ করেন। প্রসঙ্গক্রমে এই গানের সঙ্গে ইংরেজ কবি শেলির তুলনা টেনে তিনি শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা

বাংলার মরমি কবিকেই দিয়েছেন। ১৩৪১ বঙ্গাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত 'ছন্দের প্রকৃতি' নামক প্রবন্ধে তিনি লালনের দুটি সম্পূর্ণ গান ও একটি গানের অংশবিশেষ উল্লেখ করে তার ছন্দের নির্মাণদক্ষতা সম্পর্কে প্রশংসামূলক মন্তব্য করেন। তাঁরই উদ্যোগে প্রবাসী পত্রিকায় ১৩২২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাস থেকে লোকসংগীত-সংগ্রহ প্রকাশের জন্য 'হারামণি' নামে একটি নতুন বিভাগ চালু হয়। এই বিভাগে ১৩২২ বঙ্গাব্দের আশ্বিন থেকে মাঘ মাসের মধ্যে চার কিস্তিতে রবীন্দ্রনাথ লালনের সাড়ে উনিশটি গান সংগ্রহ করে প্রকাশ করেন।

লালন ফকিরের পর গগন হরকরার গানে রবীন্দ্রনাথ সর্বাধিক অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। লালনের 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি' গানটির মতোই গগনের 'আমি কোথায় পাব তারে, আমার মনের মানুষ যে রে' গানটিও কবিকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। এই গানটিকে সংগ্রহ করে এটিকে দিয়েই তিনি 'প্রবাসী' পত্রিকায় 'হারামণি' বিভাগের সূচনা করেন। মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের বাউল গীতিসংকলন 'হারামণি'র দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় তিনি গানটি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন—

> কথা নিতান্ত সহজ, সুরের যোগে এর অর্থ অপূর্ব জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। এই কথাটিই উপনিষদের ভাষায় শোনা গিয়েছে, 'তৎ বেদ্যং পুরুষং বেদ মা বো মৃত্যু পরিব্যথাঃ'—যাঁকে জানবার সেই পুরুষকেই জানো, নইলে যে মরণ-বেদনা। পণ্ডিতের এই কথাটিই শুনলুম, তাঁর গেঁয়ো সুরে, সহজ ভাষায়—যাঁকে সকলের চেয়ে জানবার তাঁকেই সকলের চেয়ে না-জানবার বেদনা-অন্ধকারে মাকে দেখতে পাচ্ছে না যে শিশু, তারই কান্নার সুর—তার কণ্ঠে বেজে উঠেছে। 'অন্তরতর হৃদয়াত্মা' উপনিষদের এই বাণী এদের মুখে যখন 'মনের মানুষ' বলে শুনলুম আমার মনে বড় বিস্ময় লেগেছিল।

হিবার্ট লেকচার, কমলা বক্তৃতা, 'An Indian Folk Religion' শীর্ষক বক্তৃতা, শান্তিনিকেতন গ্রন্থের 'ছোটো বড়ো' প্রবন্ধ ইত্যাদি নানা জায়গায় গগনের গান উদ্ধৃত করে তিনি তার তত্ত্ব-রস ব্যাখ্যা করেছেন। শুধু লালন কিংবা গগনের কথাই নয়, সর্বক্ষেপী, কাঙাল হরিনাথ, গোঁসাই রামলাল, গোঁসাই গোপাল প্রমুখের কথাও তিনি নানা প্রসঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় বলেছেন। মূলত শিলাইদহ ও ছেঁউড়িয়া অঞ্চলের বাউল সম্প্রদায়ের সঙ্গে নৈকট্য-সূত্রেই তাঁর জীবনের একতারা বাউলের সুরে পূর্ণতা পেয়েছে। 'Creative Unity', 'মানুষের ধর্ম' ইত্যাদি গ্রন্থে কিংবা 'লোকসাহিত্য', 'আত্মবোধ' প্রভৃতি প্রবন্ধে অথবা 'Religion of Man' বক্তৃতাগুলোতেও বারবার ফিরে এসেছে বাউল ভাব-দর্শনের প্রতি নিজস্ব বিশ্বাসের কথা।

সমালোচক গোলাম মুরশিদের মতে, 'গীতাঞ্জলি' কাব্য রচনার সময় থেকে বাউল-দর্শন রবীন্দ্রনাথের কবিভাবনাকে আলোড়িত করে তোলে। 'গীতাঞ্জলি'র কবিতাতেই প্রথম বাউল-চিন্তার ছাপ স্পষ্ট হয়েছে। তিনি অনুমান করেছেন যে, 'গীতাঞ্জলি'-'গীতিমাল্য'-'গীতালি' পর্ব-পরবর্তী সময়ে রবীন্দ্রনাথের মনে শাস্ত্রীয় ও লৌকিক ধর্মের যে দ্বন্দ্ব চলছিল, বাউল ও অন্যান্য সহজিয়া ধর্মের দর্শন তাঁকে সেই অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি দিয়েছিল। তাই পরবর্তীকালে ক্রমে রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা ও কাব্য-নাটক-গানে বাউল ভাব-ভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন যে, রবীন্দ্রনাথের কবিচেতনার গভীরে নিহিত দ্বিতীয় সত্তা, যা মানসসুন্দরী-লীলাসঙ্গী-অন্তর্যামী হয়ে জীবনদেবতায় বিবর্তিত, বাউলের 'মনের মানুষ'-এর

সঙ্গে তার নিগূঢ় যোগ আছে। আবুল আহসান চৌধুরী রবীন্দ্রনাথ ও বাউলের প্রাণধর্মের প্রেরণাগত উৎসের সাদৃশ্য নির্দেশ করে বলেছেন—

> তাঁর প্রাণধর্মের প্রেরণা আর বাউলের প্রেরণার উৎস ছিল অভিন্ন। তাই বাউলের 'মনের মানুষ' তত্ত্বের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'জীবনদেবতা'র একটি ঐক্য ও সাযুজ্যবোধ সহজেই আবিস্কার করা সম্ভব। বাউলগানের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মানববাদী জীবনচেতনার প্রেরণা অনুভব করেছিলেন। ...তাঁর আত্মজৈবনিক কবিতার ভাষ্যেও বাউল-চেতনার সঙ্গে একাত্মতার পরিচয় ঘোষিত হয়েছে—
>
> তরুণ যৌবনের বাউল
> সুর বেঁধে নিল আপন একতারাতে,
> ডেকে বেড়ালো
> নিরুদ্দেশ মনের মানুষকে
> অনির্দেশ্য বেদনার খেপা সুরে। ('পঁচিশে বৈশাখ' : "শেষ সপ্তক")

তিনি আরও বলেছেন—

> রবীন্দ্রনাথের বাউলচিন্তা ও মরমিভাবনা তাঁর জীবনচেতনার অন্তর্গত বিষয় হিসেবে বিবেচিত। ...বাউলের মতো রবীন্দ্রনাথও বাহ্যিক সাম্প্রদায়িক ধর্মকে অগ্রাহ্য করে অন্তরের ধর্মকেই আপন ধর্ম বলেন মানতেন। ...ক্ষ্যাপা বাউলের মতো রবীন্দ্রনাথও সারাজীবন ধরে খুঁজেছেন তাঁর মনের মানুষকে। 'সকল বেড়ার বাইরে সহজ ভক্তির আলোকে' তাঁকে খুঁজেছেন। দেবালয় থেকে বহুদূরে তিনি পেলেন তাঁর মনের মানুষ 'জীবনদেবতা'কে। অখণ্ড মানবধর্মের সঞ্চয় থেকে গ্রথিত জীবন-মন্ত্রের একখানা মালা দিয়ে তিনি অবশেষে তাঁর পূজা সমাপন করলেন—
>
> আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন—
> সকল মন্দিরের বাহিরে
> আমার পূজা আজ সমাপ্ত হল
> দেবলোক থেকে
> মানবলোকে,
> আকাশে জ্যোতির্ময় পুরুষে
> আমার মনের মানুষে আমার অন্তরতম আনন্দে। ('পনেরো' : "পত্রপুট")

অধ্যাপক পল্লব সেনগুপ্তের অভিমতও অনেকখানি অনুরূপ। 'পত্রপুট' কাব্যের পনেরো সংখ্যক কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি এবং হিবার্ট বক্তৃতার অংশ বিশেষ প্রাসঙ্গিকভাবে উদ্ধৃত করে তিনি বলেছেন—

> সীমারূপের অতীত ঐ অন্তরসত্তা—যা বাউল তত্ত্বে অনুকল্পিত—তাকেই তিনি 'জীবন দেবতা' রূপে ধার্য করেছেন ঐ হিবার্ট বক্তৃতার মধ্যেই। জীবনদেবতা যখন তাঁর জীবনের শেষ দশকের সৃষ্টির জগতে এসে গণদেবতায় রূপান্তরিত হলেন, তখনও কিন্তু বাউল-ভাবধারার অনুপ্রেরণা নিজের মনের গভীরে খুঁজে পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ : 'পত্রপুট'-এর উল্লিখিত কবিতায়ই এর বৃহত্তম প্রমাণ।

লালনের গান সংগ্রহ করে ১৩২২ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ যখন প্রবাসী পত্রিকায় তা প্রকাশ করছেন, সে সময়ে তিনি 'ফাল্গুনী' নাটকে অন্ধ বাউলের চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। শুধু তা-ই নয়, কলকাতায় এই নাটকটি অভিনয়কালে তিনি নিজে সেই অন্ধ বাউলের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। আরও লক্ষণীয় হল, নাটকটির উৎসর্গ পত্রে তিনি লিখেছেন—

> যাহারা ফাল্গুনীর ফাল্গুনদীটিকে বৃদ্ধ কবির চিত্তসরোবর তলদেশ হইতে উপরে টানিয়া আনিয়াছে তাহাদের এবং সেই সঙ্গে বালকদলের সকল নাটের কাণ্ডারি আমার সকল গানের ভাণ্ডারি শ্রীমান দীনেন্দ্রনাথের হস্তে এই নাট্য-কাব্যটিকে কবি বাউলের একতারার মতো সমর্পণ করিলাম।

বলা বাহুল্য, এক ধরনের বাউল চরিত্র রবীন্দ্রনাথের অনেক নাটকেই দেখা যায়। উদাস বিবাগী অথচ প্রাণোচ্ছল—এই বিশেষ ধরণটাই বাউলের চরিত্রকে উদ্ভাসিত করে। এই ধরণেরই বাউল চরিত্রকে আশ্রয় করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর (একাধিক নাটকের পরিণামকে সূচিত করেছেন। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে ঠাকুরদা, ধনঞ্জয় বৈরাগী, গুরু, বিশু পাগল ইত্যাদি চরিত্রের কথা। এদের চলনে-বলনে-কাজে-কর্মে বাউলের ভাবমূর্তিই প্রতিফলিত হয়। এই চরিত্রগুলির ভাবপরিচয় ধরা পড়ে লিপিকা কাব্যের মেঘলাদিনে কবিতায়—

> আমার ভিতর মহলের ব্যাথা আজ গেড়ুয়াবসন পরেছে! পথে বাহির হতে চায়, সকল কাজের বাহিরের পথে, সে পথ একটি মাত্র সরল তারের একতারার মতো, কোন্ মনের মানুষের চলায় বাজছে।

রবীন্দ্র-নাটকের 'আঁধার ঘরের রাজা' চিত্রকল্পটিকে রবীন্দ্রনাথের বাউল-দর্শনের ফল বলে মনে করেন অধ্যাপক পল্লব সেনগুপ্ত। তিনি বলেছেন—

> বাউল-দর্শনের পরিণামে যে আধ্যাত্মিক অনুভূতির উদ্ভাস ঘটে, তারই অনুসঙ্গে সাধকের অন্বিষ্ট যে 'সাঁই' বা স্বামী/প্রভু-তাঁর সম্বন্ধে বাউলেরা বলেন—'কথা কয় রে দেখা দেয় না'—'খেয়া', 'রাজা', 'অরূপরতন', 'শাপমোচন' অবধি যে সুদীর্ঘ সময়কাল, তার মধ্যে বারংবারই ঐ ভাবনার প্রতিবিম্বন ঘটেছে। তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে 'রাজা'-র চিত্রকল্পটি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে হয়েছে আবর্তিত; এর অন্তর্নিহিত তাত্ত্বিক প্রেরণাটি বরাবরই ক্রিয়াশীল না থাকলে সেটি সম্ভব হতো না।

রবীন্দ্রনাথের বাউল-চেতনা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তাঁর গানের মধ্যেই সবচেয়ে বেশি করে প্রতিফলিত হয়েছে। তত্ত্বভাবনা, বাণী-বিন্যাস, সুর-সৃজন ইত্যাদিতে তিনি বাউল গানের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন। তিনি নিজেই বলেছেন—

> আমার অনেক গানেই আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি এবং অনেক গানে অন্য রাগ-রাগিনীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত-অজ্ঞাতসারে বাউল সুরের মিলন ঘটেছে। এর থেকে বোঝা যাবে, বাউলের সুর বাণী কোন্ এক সময়ে আমার মনের মধ্যে সহজ হয়ে মিশে গেছে।

তবে সেই সঙ্গে তিনি আমাদের সচেতন করে দিয়ে বলেছেন—

> আমার অনেক গান বাউলের ছাঁচের, কিন্তু জাল করতে চেষ্টাও করিনি, সেগুলো স্পষ্টত রবীন্দ্র-বাউলের রচনা।

প্রাবন্ধিক সুধাংশুশেখর শাসমল মনে করেন যে, 'চিত্রা' কাব্যের অন্তর্যামীতত্ত্ব আরও সহজ ও বিশদ হয়েছে রবীন্দ্রনাথের কাব্যসংগীতে—যেখানে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে তিনি ক্ষ্যাপা বাউলের মতো 'মনের মানুষ' বা অন্তর্যামীকে সন্ধান করে ফিরছেন। তাঁর মতো, এই বাউল ভাবনা গদ্য-প্রবন্ধ-নাটক-কবিতায় প্রকট হলেও রবীন্দ্রনাথের সংগীত ভাবনায় তা অত্যন্ত অনুভূতিবেদ্য, রসাভিব্যক্ত ও মর্মস্পর্শী। যেমন—

১. 'কে তুমি কোথা রয়েছো গোপনে
আমি মরিতেছি খুঁজে'।

২. ‘কে তুমি গোপনে চালাইছ মোরে
আমি যে তোমাকে খুঁজি।’

৩. ‘আবার এমনি বেদনার মাঝে
তোমারে ফিরিব খুঁজি।’

৪. ‘চিরদিবসের মর্মের ব্যথা
শতজনমের চিরসফলতা
আমার প্রেয়সী, আমার দেবতা
আমার বিশ্বরূপী।

আবার এক সময় সদানন্দময় বৈরাগী বাউলদের সহজিয়া মরমী ভাববোধ তাঁকে ‘রবিবাউল’ করে তুলেছে। তাই বেদ-উপনিষদের তত্ত্বাদর্শ ছেড়ে তিনি গানের বাণীতে ও সুরে বাউলের মতো বলেছেন—

১. ‘আমি তারেই খুঁজে বেড়াই যে রয় মনে আমার মনে।’

২. ‘আমি কান পেতে রই, আমার আপন হৃদয় গহন দ্বারে
কোন গোপনবাসীর কান্নাহাসির গোপন কথা শুনিবারে।’

৩. ‘মন যখন জাগলি নারে
তোর মনের মানুষ এলো দ্বারে।’

বঙ্গাভঙ্গের সময় স্বদেশি আন্দোলন রবীন্দ্রনাথকে স্বদেশি সংগীত রচনায় অনুপ্রাণিত করেছিল। এই সময়ে রচিত গানগুলির অনেকগুলিই বাউল সুর-বিশিষ্ট। সুধাংশুশেখর শাসমলের মতে—“দেশাত্মবোধক ও উদ্দীপক এইসব বাউল-সুরের গানের লোকায়ত ভাষার ঢঙ্ আলাদা করে দেখার মতো। বাণীর সঙ্গে বাউল সুরের লৌকিক ঢঙ্ যথাযথ খাপ খেয়েছে।” দৃষ্টান্ত হিসেবে তিনি দশটি গান এবং অন্য আরও চারটি বাউল আঙ্গিকের গান, মোট চোদ্দটি গানের উল্লেখ করেছেন। এগুলি হল—

১. ‘ছি ছি চোখের জলে ভেজাস নে আর মাটি’
২. ‘তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে’
৩. ‘যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে’
৪. ‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি’
৫. ‘ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা’
৬. ‘ওরে তোরা নাই বা কথা বললি’
৭. ‘ঘরে মুখ মলিন দেখে গলিস নে’
৮. ‘মা কি পরের দ্বারে পাঠাবি তোর ঘরের ছেলে’
৯. ‘যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক আমি তোমায় ছাড়ব না মা’
১০. ‘যে তোরে পাগল বলে তারে তুই বলিস নে কিছু’
১১. ‘নিশিদিন ভরসা রাখিস হবেই হবে’
১২. ‘আপনি অবশ হলি তবে বল দিবি তুই কারে’
১৩. ‘এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে’
১৪. ‘জোনাকি কি সুখে ওই ডানা দু’টি মেলেছে’

বঙ্গভঙ্গ-পরবর্তীকালেও গীতিকার-সুরকার রবীন্দ্রনাথের গানে বাউল গানের প্রতিফলন ঘটেছে, বিশেষত নাটকের গানে। ধনঞ্জয় বৈরাগী, দাদা ঠাকুর, ঠাকুরদা, অন্ধ বাউল, বিশু পাগল ইত্যাদি বাউল ধাঁচের চরিত্রগুলির কণ্ঠে তিনি বাউল আঙ্গিকের অনেক গান ব্যবহার করেছেন। এই গানগুলির ভেতর দিয়েই নাটকের মূল তত্ত্ব ও রস-পরিণাম ব্যঞ্জিত হয়েছে। যেমন—

১. বিসর্জন : নাটকের 'আমারে কে নিবি ভাই', 'গোড়ায় গলদ' নাটকের 'ওগো তোমরা সবাই ভালো'।
২. শারদোৎসব : নাটকের 'আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায়', 'আমারে ডাক দিল কে', 'মেঘের কোলে রোদ হেসেছে', 'শরতে আজ কোন তিথি'।
৩. প্রায়শ্চিত্ত : নাটকের 'আমাকে যে বাঁধবে ধরে', 'ওরে আগুন আমার ভাই', 'গ্রাম ছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ', 'আমি ফিরবনা আর'।
৪. রাজা : নাটকের 'আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে', 'বসন্তে কি শুধু কেবল', 'তোরা যে যা বলিস ভাই', 'আমি যখন ছিলেম অন্ধ'।
৫. অচলায়তন : নাটকের 'এ পথ গেছে কোনখানে', 'সব কাজে হাত লাগাই মোরা', 'ওরে ওরে ওরে আমার মন মেতেছে', 'সকল জনম ভরে ও মোর দরদিয়া'।
৬. ফাল্গুনী : নাটকের 'তোমায় নতুন করে পাব বলে', 'ভালো মানুষ নইরে মোরা', 'আমাদের খেপিয়ে বেড়ায় যে'।
৭. মুক্তধারা : নাটকের 'আমি মারের সাগর পাড়ি দেবো', 'আমাকে যে বাঁধবে ধরে', 'আমারে পাড়ায় পাড়ায় খেপিয়ে বেড়ায়'।
৮. রক্তকরবী : নাটকের 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে', 'তোমায় গান শোনাবো'।
৯. বাঁশরী : নাটকের 'না চাহিলে যারে পাওয়া যায়'।
১০. তাসের দেশ : নাটকের 'আমার মন বলে চাই চাই গো' ইত্যাদি।

সুতরাং চিন্তাদর্শের সাদৃশ্যের কারণেই রবীন্দ্রনাথ বাউল সাধনা ও সংগীত থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের বাউলচারী মানসের দিকে তাকিয়ে মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী তাঁর রবি-পরিক্রমা গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন—

> রবীন্দ্রনাথও ছিলেন আসলে এমনই এক খ্যাপা বাউলকবি। জোড়াসাঁকোর অভিজাত পরিবারে না জন্মে...কুষ্টিয়া কি পাবনায় জন্মগ্রহণ করলে তিনিও হয়তো অমনি একতারা হাতে গান গেয়ে খ্যাপার মতো ঘুরে বেড়াতেন। কেননা বাউলদের অন্তরের প্রেরণা এবং রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা যে একই।

এই মন্তব্যে যুক্তির চেয়ে ভাবাবেগই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। জীবন ও সৃজনে রবীন্দ্রনাথ দেশ-বিদেশের মানবতাবাদী ধর্ম-দর্শন, সমাজ-সভ্যতা, সাহিত্য-সংস্কৃতি থেকে যেভাবে প্রেরণা লাভ করেছিলেন, বাউলভাবনা থেকেও তিনি সেটুকুই গ্রহণ করেছেন—বাউল হওয়া তাঁর উদ্দেশ্য নয়। সমালোচক গোলাম মুরশিদের মন্তব্য দিয়ে শেষ করা যাক—

> বাউলদের যে তত্ত্বকেও রবীন্দ্রনাথ নিজের মতো করে গ্রহণ করেছেন, সরাসরি বাউল তত্ত্ব নয়, অথবা তত্ত্বের সবটাও নয়। যেমন, বাউল দর্শনের সঙ্গে দেহতত্ত্বের যে নিগূঢ় যোগাযোগ তা রবীন্দ্রনাথ আদৌ স্বীকার করেননি, স্বীকার করার প্রশ্নই ওঠে না। ...আসলে

বাউল গান তাঁর অনেক অস্ফুট চিন্তাকে হয়তো পরিস্ফুট হতে সহায়তা করেছে।

তথ্যের সন্ধানে

১. রবীন্দ্র রচনাবলী প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় খণ্ড, ষষ্ঠ খণ্ড, নবম খণ্ড, ত্রয়োদশ খণ্ড, পঞ্চদশ খণ্ড, ষোড়শ খণ্ড, সপ্তদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা।
২. 'গীতবিতান' অখণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা।
৩. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : 'রবীন্দ্র-জীবনী', দ্বিতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা।
৪. প্রমথনাথ বিশী : 'শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লি., কলকাতা।
৫. আহমদ শরীফ : 'বাউলতত্ত্ব', পড়ুয়া, ঢাকা, বাংলাদেশ।
৬. অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : 'বাংলার বাউল ও বাউল গান', ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা।
৭. গোলাম মুরশিদ : 'রবীন্দ্রমানস ও সৃষ্টিকর্মে পূর্ববঙ্গ', অবসর, ঢাকা, বাংলাদেশ।
৮. শ্রীসনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত : 'বাউল-লালন-রবীন্দ্রনাথ', আর. মিত্র, পরিবেশক : পুস্তক বিপণি, কলকাতা।
৯. শিশিরকুমার দাশ : 'আত্মজীবনী : জীবনী ও রবীন্দ্রনাথ', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।
১০. ড. আবদুল ওয়াহাব : 'বাংলার বাউল সুফি সাধনা ও সংগীত', মওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, বাংলাদেশ।

বাউল দর্শনে মরমিয়া সাধকেরা

ড. সৌমিত্র মুখোপাধ্যায়

আমার মনের মানুষ যে রে,
আমি কোথায় পাব তারে,
হারায়ে সেই মানুষে দেশ-বিদেশে
বেড়াই ঘুরে ঘুরে।

এই বাউল গান বাংলার বিশিষ্ট সম্পদ। এই গান যেমন শিল্পরসের বিচারে গীতিরসযুক্ত ও প্রতীকধর্মী তেমনি এই সংগীতের পেছনে আছে এক ধরনের আচার আচরণমূলক কৃত্য ও সাধনা।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সপ্তদশ বা অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাউল নামে ধর্ম সম্প্রদায়ের উদ্ভব, যাদের ধর্মমতের তত্ত্ব ও দর্শন রাধা-কৃষ্ণের বা প্রকৃতি পুরুষের যুগল তত্ত্ব, উপনিষদ ও সুফি-ধর্মের পরমাত্মবাদ এবং ব্যক্তিগত ভগবানের মিশ্রণ-সাধনাংশটি প্রধানত বৌদ্ধ সহজিয়া মতের বা রূপান্তরিত বৈষ্ণব সহজিয়া মতের। বাতুল, ব্যাকুল, আউল (আরবি), বাউর (হিন্দি) প্রভৃতি শব্দ থেকে বাউল নিষ্পন্ন অর্থাৎ ঈশ্বরপ্রেমে মাতোয়ারা ও বাহ্যিক ব্যাপারে উদাসীন ব্যক্তিকে বাউল বলা হতো।

বাউল সাধনার লক্ষ্য 'মনের মানুষ' খোঁজা। সহজিয়া সাধনার মাধ্যমে মানুষকে জানা হল বাউলদের সাধনা। এঁদের সাধনার মধ্যে একটি সমন্বয়ী সুর আছে। উপনিষদ, বৈষ্ণব সহজিয়া মতাদর্শের সঙ্গে বাউল গানের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। তাই শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন—

> In the conception of the 'Man of the heart' of the Baul, we find a happy mixture of the conception of the paramatmana of the Upanishadas, the Sahaja of the Sahajiyas and Subistic conception of the Beloved.[১]

বাউল গানের সামাজিক পটভূমি বলতে এককথায় বলা যায়, সমসাময়িক জীবনের জাতিভেদ ও বর্ণবৈষম্য যুক্ত সমাজব্যবস্থা। এই সামাজিক বৈষম্য, জাত-পাত-সংস্কারের বেড়াজাল ভেদ করতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সাধকের আবির্ভাব ঘটে। বাউলরাও ছিল সেই শ্রেণির মরমিয়া সাধক যাঁদের দর্শনের সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যায় ষোড়শ শতাব্দীর শ্রীচৈতন্যের প্রধান বাণীর—

জন্ম বড় কথা নয়,

কর্ম-ই মানুষকে বৃহৎ করে॥

তাই বাউল সাধকদের আবির্ভাব বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সময়ে অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল। তাই তাঁরা মাঝে মাঝেই নিজের মনে আপন খেয়াল খুশিতে গেয়ে ওঠে,

আছে যার মনের মানুষ আপন মনে।
সে কি আর জপে মালা।

বাউল সাধকদের উদার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রেমবোধ হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে পারস্পরিক বিদ্বেষ তৈরি হয়েছিল তাকে দূর করে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ করল। তাই তো স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বাউলদের সম্পর্কে যথার্থই বলেছেন—

> এই গানের ভাষায় ও সুরে হিন্দু-মুসলমানের কণ্ঠ মিলেছে, কোরাণে পুরাণে ঝগড়া বাঁধেনি। এই মিলনেই ভারতের সত্য পরিচয়, বিরোধে বিবাদে বর্বরতা বাংলাদেশের গ্রামের গভীর চিত্তে উচ্চ সভ্যতার প্রেরণা ইস্কুল কলেজের অগোচরে আপনা-আপনি কি রকম কাজ করে এসেছে, হিন্দু-মুসলমানের জন্য এক আসন রচনার চেষ্টা করেছে, এই বাউল গানে তারই পরিচয় পাওয়া যায়।

সমকালীন জীবনের মনুষ্যত্ববোধের অভাব বাউল সম্প্রদায়ের মানুষদের মনকে পীড়ন করতো প্রতিনিয়ত। তাই তাঁরা গানে বেঁধেছিল—'বল কি সন্ধানে যাই সেখানে মনের মানুষ যেখানে।' তাই অনুমান করা হয়, চৈতন্য সমকালে বাস্তবজীবনে উদাসীন, বাইরের দিক থেকে অসম্বন্ধ—এমন এক ঈশ্বরভক্ত সম্প্রদায় সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের সমাজে বাউল হিসেবে পরিচিত ছিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' বলা হয়েছে—

বাউলকে কহিও লোকে হইল আউল।
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল॥

বাউল ধর্ম একটি সমন্বয়মূলক ধর্ম। এর মূল সাধনপদ্ধতি তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। তার উপর শিবশক্তিবাদ, রাধাকৃষ্ণবাদ, বৈষ্ণবসহজিয়াতত্ত্ব, সুফি দর্শন ও তত্ত্ব, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মতত্ত্ব প্রভৃতির প্রভাব পড়েছে এবং এর সঙ্গে কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে ইহা একটি বিশেষ ধর্মরূপে গঠিত হয়েছে।

বাউল সংগীত সাধনারই অঙ্গীভূত। তাঁরা মনে করেন প্রতি মানুষের মধ্যেই 'অধরচাঁদ' আছেন। তাঁকে আবিষ্কার এবং ভূতদেহে তাঁকে উপলব্ধি করতে পারলে সাধকের মোক্ষ-নির্বাণ-মুক্তি, আলেখ নূরের (পরম জ্যোতি) আসঙ্গ লাভ হয়। তখন তাদের পার্থিব সত্তা (সুফি মতে 'ফানা') ধ্বংস হয়ে গিয়ে সাধক ঈশ্বর সাযুজ্য (সুফি মতে 'বাকা') লাভ করেন অর্থাৎ সীমাবদ্ধ জড়সত্তাকে বিনাশ করে দেহে ও মনে মুমুক্ষু হয়ে ওঠা বাউল সাধনার মূল কথা। তাঁরা মনের মানুষের সন্ধান করেন। হিন্দু বাউল স্বচ্ছন্দে সুফি সাধনার পরিভাষা ব্যবহার করেন, সুফি বাউল ও নির্দ্বিধায় যোগতন্ত্রের শব্দানুশীলন করেন। বাউলগণ তাঁদের মর্ত্যসত্তার মধ্যেই 'সাঁই' অর্থাৎ স্বামী বা ভগবানকে উপলব্ধি করতে চান। তাঁকে উপলব্ধি করতে পারলেই বাউলের সীমাবদ্ধ সত্তার বিনাশ হয়, তিনি অসীমের সঙ্গলাভ করেন। এই তত্ত্বকথাটি বাউল গানে নানা উপমা-রূপক ও আভাস-ইঙ্গিতের সাহায্যে বলা হয়েছে।

বাউলগণ যে অধ্যাত্ম সাধনায় বিশ্বাসী ছিলেন, তাকে যেমন বিশুদ্ধ মনোমার্গে উপলব্ধি করতেন, তেমনি আবার স্থূল দেহমার্গেও নানা প্রকার রহস্যময় অনুশীলনের দ্বারা তাকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধির মধ্যে আনতে চাইতেন। নর-নারীর দেহই সে সাধনার যজ্ঞবেদী, নানা রহস্যময় প্রতীকের সাহায্যে সেই কথার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। আর এই প্রতীক হল তাঁদের হাতে থাকা একটি তার দিয়ে তৈরি যন্ত্র যা 'একতারা' নামে সকলের কাছে পরিচিত। এই 'একতারা' যন্ত্রটি তাঁদের মতে শান্তি ও একতার প্রতীক।

লালন শাহ ফকির (১৭৭৪-১৮৯০)

বাংলার বাউল সাধনা ও সংগীতের ইতিহাসে লালন ফকিরের নাম অনন্য। মনের মানুষ সাধনায় জীবন জগৎকে কারাগার ভেবে সেখান থেকে ঐকান্তিক মুক্তির কথাই লালনের বাউল গানের তত্ত্বকথা। দেহ অতিরিক্ত আত্মতত্ত্বলাভই তাঁর প্রথম ও প্রধান উপদেশ। লালনের গানে তত্ত্বকথার ঝংকার। সেইসঙ্গে আত্মনিবেদন ও আত্মসমর্পণের আকুতি, যেন গীতারই শরণাপত্তির অমৃত কথা। যেমন, কবি ভাগবতের কৃষ্ণলীলার আদর্শে চমৎকার পদ রচনা করেছেন—

কোথা কানাই গেলি রে প্রাণের ভাই।
একবার এসে দেখা দে রে প্রাণে জুড়াই।

বাংলার বাউল সাধনার ইতিহাসে জনশ্রুতির কিংবদন্তী নায়ক লালন। রবীন্দ্রনাথ লালন ফকিরের যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন। শিক্ষিত সমাজ বাউল গানের প্রতি তখন থেকেই কৌতূহল প্রকাশ করতে শুরু করে। কবিগুরু ১৩২২ বঙ্গাব্দের 'প্রবাসী'-তে 'হারামণি' শীর্ষক সংগ্রহে লালনের কুড়িটি গান প্রকাশ করেন।

লালন ফকিরের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কোনো কোনো সমালোচক মনে করেন, তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৭৭৪-'৭৫ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে। কুষ্ঠিয়ার কুমারখালি গ্রামের নিকট ভাঁড়রা গ্রামে হিন্দু কায়স্থ কর বংশে তাঁর জন্ম হয়। বাল্যকালেই তাঁর মনে ধর্মভাবের উদয় হয়। বিবাহের পর তিনি তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে মুমূর্ষু অবস্থায় পথিমধ্যে পরিত্যক্ত হন। পরে এক নিষ্ঠাবান মুসলমান দম্পতি তাঁকে বাঁচিয়ে তোলেন। দেশে ফিরলে তাঁর সামনে হিন্দু সমাজের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়। তখন তিনি তাঁর জীবনদাতা সিরাজ সাঁই-এর কাছে দীক্ষা নিয়ে ফকিরি ধর্ম গ্রহণ করে লালন শাহ ফকির নামে পরিচিত হন এবং বাউল সাধনায় ডুবে যান। মুসলমান মোমিন সম্প্রদায়ের অনেকে তাঁর শিষ্য হয়েছিল।

লালনের গানের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল লৌকিক মতবাদ। লোকজগৎ সত্যি। সকল কিছুর মূল বস্তু। বস্তুই সার। বস্তুই দেহ। বস্তুই চেতনার উৎস। এই চেতনার উৎস দেহেই খুঁজতে হবে, অন্য কোথাও খুঁজলে তাঁর হদিস মিলবে না। শাস্ত্র, ধর্ম, তীর্থ ইত্যাদি সকল প্রবচনই মানুষতত্ত্বকে, লোকজগৎকে অস্বীকার করে। ফলে এইসব পরিচয় একান্তই প্রয়োজন। তাই তিনি বলেন—

শাস্ত্র-ধর্ম তীর্থ আদি সর্ব প্রবচন।
সকল ছাড়িয়া দিলেন মানুষ ভজন।

লালনের মতে—মন্দির, মসজিদ যদি বলতে হয় তবে বলব, দেহই সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির কিংবা

মসজিদ। এই দেহকে সাধন করলেই আত্মার সাধন হয়। দেহের মধ্যে দেহের মাধ্যমেই আত্মার উপলব্ধি ঘটে। কারণ চৈতন্যময় দেহই আত্মা। এইভাবে লালন দেহাত্মবাদের প্রচার করেছেন সকল সময়—

উপাসনা নাই গো তার
দেহের সাধন পর্বসার
তীর্থ ব্রত যার জন্য
এ দেহে তার সবই মিলে।

আধ্যাত্মিকতার মুখোশ ছিঁড়ে তিনি শুধু যে মানুষতত্ত্বকে প্রধান করেছেন তা নয়, তাঁর গানে শ্রেণিশোষণ, বিচ্ছিন্নতা, নারীর নিগ্রহ, সামন্তশোষণ বিষয় হয়ে উঠেছিল ও সেই সঙ্গো মানুষের জীবনকে স্থবির এবং সেইসঙ্গো বিষাদ-নৈরাশ্যে ডুবিয়ে রেখেছিল। সমাজের এমনই এক অন্ধকারময় পরিস্থিতিতে সৌম্য-শান্ত এই মরমি সাধকের হাতে একতারার বদলে উঠল বাঁশের লাঠি। বাউল বুঝিয়ে দিলেন অন্যায়-অত্যাচারের প্রতিবাদ করা, সত্য-ন্যায়ের পথে থাকা, মানুষের সম্ভ্রম-সম্মান রক্ষাই মানুষের ধর্ম। 'মানুষ সত্য' এটাও সাধনার অঙ্গ। শুধুমাত্র সেদিন লালনের জন্য জমিদারের লাঠিয়ালদের হাত থেকে প্রাণরক্ষা হয় তাঁরই প্রাণের দোসর প্রজাদরদি কাঙাল হরিনাথের। বাউলেরা যে সমাজবিচ্ছিন্ন নন, নির্জন সাধনাতেই যে শুধু তাঁদের জীবন কাটে না, তার প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায় লালনের প্রতিবাদ-বেদনা মিশ্রিত লেখনীতে—

রাজ্যেশ্বর রাজা যিনি
চোরেরও শিরোমণি
নালিশ জানাব কার কাছে।

অত্যাচার-নিপীড়নের মুখে জীবন-ভৌমিক চেতনায় ঋদ্ধ হয়ে ঋজু শব্দ নির্মাণ করে, ক্ষেপামীর ভাঁড়ামোকে নিষ্ঠীবন ছিটিয়ে, বিশ্বমানবতাবোধের বাণীকে একতারায় বেঁধে লালন গেয়েছেন—

নানা বরণ গাভীরে ভাই
একই বরণ দুধ
জগৎ ভরমিয়া দেখিলাম
একই মায়ের পূত।

ফকির লালন বুঝেছিলেন, মানুষকে সমস্ত জাত-পাত, হিংসা-দ্বেষ ও সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে তুলতে না পারলে মানুষের পূর্ণ স্বরূপ জাগ্রত হবে না। তাই তিনি তাঁর গানে গেয়েছেন—

সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে।
লালন বলে জাতের কি রূপ দ্যাখলাম না এই নজরে।
জগৎ বেড়ে জাতির কথা
লোকে গল্প করে যথাতথা
লালন করেন জাতির ফাৎনা
ডুবিয়েছি সাত-বাজারে।

এরপরও অতৃপ্ত জাত-সন্ধানীদের জাত-পাতের অসারতার কথা জানাতে যুক্তি দিয়ে তিনি বোঝালেন—

বিবিদের নাই মুসলমানী
পৈতা নাই যার সেও তো বাওণী
বোঝ রে ভাই দিব্যজ্ঞানী
লালন তেমনি জাত একখান।

মধ্যযুগের সন্ত-সাধকেরা, যেমন—কবির, রামদাস, তুলসীদাস, দাদু সবাই তুচ্ছ করেছেন জাতধর্মকে আর তাদেরই উত্তরসূরী ছিলেন লালন। তাই কবির যখন মনের ধন্দ কাটিয়ে বলেন—'ভরম সব ভাগা, এক নিরঞ্জন সু মন লাগা।' আর তাঁর কয়েক শতক পরে বাংলা মুলুকে এক ফকির বাউল তারই সূত্র ধরে বলেন—

যে যা ভাবে সেই রূপে সে হয়।
রাম-রহিম-করিম-কালা এক আত্মা জগৎময়।

আজ থেকে দুশো বছর আগে বাংলার লোকজ মরমি বাউল সাধনা ও সংগীতে নারী তার আপন মর্যাদায় ভাস্বর হয়ে উঠেছিল। নারী বা প্রকৃতি ছিল বাউলের সাধনসঙ্গিনী। বাউল মতের উদ্ভবের সঙ্গেও মাধববিবি নামের এক নারীর সম্পর্ক ছিল বলে জানা যায়। নারীই সৃষ্টির আধার। লালন তাই বলেন—'সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি করলেন সবারি'—কিন্তু যুগে যুগে মাতা হন যোগেশ্বরী। লালন আরো বলেছেন—

সাগরে ভাসে জগৎমাতা।
লালন বলে মা'র উদরে পিতা জন্মে।

প্রেম-প্রত্যাশী পুরুষকেও যে কখনো কখনো নারীর কাছে মাথা নত করতে হয়, তারই তুলনা দিতে লালন শ্রীকৃষ্ণের কথা বলেছেন—

কোন প্রেমে বল গোপীর দ্বারে
কোন প্রেমে শ্যাম রাধার পায়ে ধরে...

নারীর সম্মান, মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব ও দৃঢ়তার পরিচয় প্রকাশ পায় লালনের এই গানে—

মায়েরে ভজিলে হয় সে বাপের ঠিকানা
নিগম বিচারে সত্য গেল তাই জানা।

এই বাণী সমাজে পুরুষের প্রাধান্যকে চূর্ণবিচূর্ণ করেছে। পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরকের ধারণাকে তিনি 'দেশাচার' বলে মনে করেন যা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর অমোঘ বাণীতে—

পাপ-পুণ্যের কথা আমি কারে বা শুধাই
এই দেশে যা পাপ গণ্য অন্য দেশে পুণ্য তাই।

কালের অগ্রগামী পুরুষ তাই অন্ধকার পাঁকে ডুবে যাওয়া সমাজের মানুষকে দিশা দেখাতে সুসময়ের জন্য অপেক্ষা করতে বলেন তাঁর আশা জাগানো বাণীতে—

কবে হবে সজল বরষা,
রেখেছি মন সেই ভরসা।

লোকসঙ্গীত হিসেবে লালনের বাউল গানের গুরুত্ব অপরিসীম। সহজিয়াযানের এই বাউল সাধকরা কোনো আচার-বিচার, কোনোরকম শাস্ত্রীয় নির্দেশ মানেননি। তিনি সাধনার মাধ্যমে ঈশ্বরকে উপাসনার পক্ষপাতী ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ লালনের মানবতাবোধের প্রশংসা করে তাঁকে উপনিষদের ঋষির সঙ্গে তুলনা

করেছেন। বাংলার লোকসংস্কৃতির পুরোধা লালন প্রকৃতপক্ষে ছিলেন একজন 'Prophet of humanity'।

বাউল কবিদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য ছিলেন লালন ফকির। কবিত্ব ও ধর্মতত্ত্বের অপূর্ব মিশ্রণ ঘটেছে তাঁর গানে। যেমন—

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কমনে আইসে যায়।
(আমি) ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতেম পাখির পায়।

কিন্তু, এত কবিত্ব ও রসবোধ সত্ত্বেও বিকারগ্রস্ত সমাজমনের অবজ্ঞা-নিন্দা-বিদ্বেষের হাত থেকে লালন রেহাই পাননি। তাই না জানি কী ভেবে তিনি এঁদের সম্পর্কে আগেই লিখে গিয়েছিলেন—'পণ্ডিত কানা অহংকারে'। তবে পাষণ্ড, ব্রাত্য, ন্যাড়া—এসব আরোপিত গালমন্দ সমকালে বা উত্তরকালে যে সময়েই হোক না কেন বিবেকবান মানুষের সুবিবেচনার জন্য লালনের নিন্দাই তাঁর গৌরবচিহ্ন হয়ে উঠেছিল। তাই তো শওকত ওসমান লালনকে নিয়ে গল্প লিখেছেন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় উপন্যাস লিখেছেন, শামসুর রহমান কবিতা লিখেছেন ও সম্প্রতি গৌতম ঘোষ ছবি বানিয়েছেন, যেখানে বাউল মরমিয়া সাধক লালনকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে অসাম্প্রদায়িক চেতনার এক মানবতীবাদী দার্শনিক, সাধক ও কবি হিসেবে। লালন পরবর্তী অন্যান্য বাউল সাধকদের মধ্যে সর্বাগ্রে স্মরণে আসে কাঙাল হরিনাথ মজুমদারের কথা।

কাঙাল হরিনাথ মজুমদার (১৮৩৩-১৮৯৬)

সাংবাদিক, কবি এবং গায়ক হিসেবে সুপরিচিত কাঙাল হরিনাথ মজুমদার কুষ্ঠিয়া জেলার কুমারখালি গ্রামে ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি মূলত বাউল গান গেয়ে দেশকে মাতিয়ে দিয়েছিলেন এবং তাঁর রচিত বিভিন্ন পদে 'কাঙ্গাল', 'ফিকিরচাঁদ' প্রভৃতি ভণিতা ব্যবহার করেছেন। নির্ভিক, স্বদেশপ্রেমিক এই কবি ১৮৬৩ সাল থেকে 'গ্রামবার্তা' নামে একটি প্রকাশ করতেন মাসিক পত্রিকা। কাঙাল হরিনাথের উদ্যোগে ১৮৫৬ সালে কুমারখালি গ্রামে মেয়েদের জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। হরিনাথ ছিলেন সমাজ-সংস্কারক এবং সারাজীবন তিনি সাধারণ মানুষের কল্যাণার্থে সংগ্রাম করে গেছেন। কাঙাল হরিনাথের 'গ্রামবার্তা' পত্রিকাটির মূল বিষয় ছিল তৎকালীন জমিদারদের সাধারণ কৃষকদের প্রতি নিপীড়নের প্রতিবাদ।

হরিনাথ ১৮৮০ সালে একটি বাউল দল গড়ে তোলেন, তার নাম দেন 'কবগল ফিকির চাঁদের দল'। তিনি প্রচুর জনপ্রিয় বাউল গান গেয়েছিলেন। তার সুর ছিল ভীষণ সহজ কিন্তু তত্ত্বকথা ছিল ভীষণ গভীর। তাঁর একটি বিখ্যাত গান হল—

হরি দিন তো গেল, সন্ধ্যা হল, পার কর আমারে।
তুমি পারের কর্তা শুনে বার্তা ডাকছি হে তোমারে॥

১৮৮৩-১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে, হরিনাথ তাঁর সমস্ত গানগুলিকে ১৬টি খণ্ডে কাঙাল ফিকিরচাঁদ ফকিরের গীতাবলী নামে প্রকাশ করেন। হরিনাথ মজুমদার ছিলেন আধুনিক বাউল গানের আদি গুরু। তিনি মোট ১৮টি গ্রন্থ করে ছিলেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

'বিজয়বসন্ত' : ১৮৫৯, 'চারুচরিত্র' : ১৮৬৩, 'কবিতাকৌমুদী' : ১৮৬৬, 'বিজয়া' : ১৮৬৯, 'কবিকল্প' : ১৮৭০, 'অক্রুর সংবাদ' : ১৮৭৩, 'সাবিত্রী নাটিকা' : ১৮৭৪, 'চিত্তচপলা' : ১৮৭৬, 'কাঙালের ব্রহ্মাণ্ডভেদ' : ১৮৮৭-'৯৫, এবং 'মন্ত্রমহিমা' : ১৮৯৬। সপ্তদশ-অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর বাউল গীতিকারদের মধ্যে এমন অনেকে রয়েছেন, যাঁদের গীতিকর্ম একালে শিক্ষিত মনকেও স্পর্শ করে যায়। এঁদেরই একজন ছিলেন শিলাইদহের গগন হরকরা।

গগন হরকরা (১৮৪৫-১৯৯০)

'হরকরা' শব্দের প্রকৃত অর্থ হল পোস্টমাস্টার। এটি ছিল তাঁর জীবিকা। তিনি তাঁর মিস্টিক বাউল সংগীত 'আমি কোথায় পাব তারে'-এর জন্য বিখ্যাত ছিলেন। গগন হরকরা কুষ্ঠিয়ায় কুমারখালি উপজেলার কসবা গ্রামে বসবাস করতেন। প্রকৃত নাম ছিল গগনচন্দ্র দাম। তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (শিলাইদহে থাকাকালীন) বেশিরভাগ চিঠিপত্র বিশেষত ইন্দিরা দেবীকে লেখা 'ছিন্নপত্র'-এর চিঠিগুলি সংগ্রহ এবং সরবরাহ করতেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই প্রথম গগন হরকরার বাউল গানগুলিকে 'প্রবাসীর পত্র' নামে একটি পত্রিকার প্রকাশ করেন। গান হরকরার দুটি গান খুবই বিখ্যাত ছিল—১. 'আমি কোথায় পাব তারে'—যার অনুপ্রেরণায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত রচনা করেছিলেন—'আমার সোনার বাংলা।' ২. 'আশার মাঝে ভুলে রবে'। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে গগন হরকরার সমস্ত গান সংগ্রহ করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গগন হরকরার জীবনের কিছু অংশ নিয়ে 'পোস্টমাস্টার' নামক গল্পটি লেখেন এবং সত্যজিৎ রায় সেই গল্প নিয়ে সিনেমা তৈরি করেন।

হাসন রাজা (১৮৫৪-১৯২২)

অবিভক্ত ভারতবর্ষ অর্থাৎ বাংলাদেশের সিলেটের একজন বাঙালি কবি, মিস্টিক দার্শনিক এবং বাউল সংগীত রচয়িতা ছিলেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজের বক্তৃতায় হাসন রাজার গানের সম্বন্ধে বলেন, তখন তিনি আন্তর্জাতিক বাউল সাধক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। একটি ভারতীয় দর্শন সভায় কবিগুরু হাসন রাজা সম্পর্কে লিখেছিলেন—

> পূর্ববঙ্গের একটি গ্রাম্য কবির গানে দর্শনের একটি বড় তত্ত্ব পাই সেটি এই যে, ব্যক্তি-স্বরূপের সহিত সম্বন্ধসূত্রেই বিশ্ব-সত্য।

তিনি গাইলেন—

> মন আঁখি হইতে পয়দা আসমান জমীন।
> শরীরে করিল পয়দা শক্ত আর নরম,
> আর পয়দা করিয়াছে ঠান্ডা আর গরম।
> নাকে পয়দা করিয়াছে খুস্‌বয় বদবয়।

অর্থাৎ এই সাধক কবি দেখিতেছেন যে, শাশ্বত পুরুষ তাঁহারই ভিতর হইতে বাহির হইয়া

তাঁহার নয়ন পথে আবির্ভূত হইলেন।

ফকির পাঞ্জ শাহ্ (১৮৫১ খ্রিস্টাব্দ)

ফকির পাঞ্জ শাহ্ ছিলেন অধ্যাত্মমার্গের একজন বাউল সাধক। তাঁর বাউল গানগুলি ছিল গূঢ় সংকেতময়, ভক্তিরস, অধ্যাত্মচেতনা ও কবিত্বশক্তিতে ভরপুর। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জ শাহ্ যশোহর জেলার শৈলকূপা গ্রামে জনৈক মুসলমান বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছোটোবেলা থেকেই বৈষ্ণব সাধক, হিন্দু বৈদান্তিক ও ফকিরদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি ফকিরের বৈরাগ্যবেশ ধরে সাধন-ভজনে প্রবৃত্ত হন। তিনি তাঁর বাউল সাধনার নিগূঢ় তত্ত্ব রূপকের ছলে নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন—

ত্রিবেণীর তীরে ধীরে সুধারে জোয়ার আসে।
সুখসাগরে মানুষ খেলে বেহাল বেশে॥

রবীন্দ্রনাথ নবনী দাস বাউলকে ‘ক্ষ্যাপা’ আখ্যা দেন। বর্তমান যুগের বাউল সাধকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম হল—

১. বাবুকৃষণ দাস
২. দিবাকর দাস
৩. লক্ষ্মণ দাস
৪. মন্মথ দাস
৫. গৌর ক্ষ্যাপা
৬. ননী ক্ষ্যাপা
৭. সনাতন দাস
৮. ধনঞ্জয় ক্ষ্যাপা
৯. রাধেশ্যাম দাস
১০. দোয়েল ক্ষ্যাপা
১১. ভক্ত দাস

এছাড়াও গোষ্ঠ গোপাল দাস ও বাউল সম্রাট পূর্ণদাস বাউল। বাউল সাধকদের ধারাকে অত্যন্ত জনপ্রিয়ভাবে বিশ্বের দরবারে আজও তুলে ধরেছেন। বাউল গানগুলি সপ্তদশ-অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে রচিত হলেও ভাবের দিক থেকে তা ছিল মধ্যযুগের অবশেষ। তাই এই সমস্ত গান মধ্যযুগের বৈশিষ্ট্য যেমন খুঁজে পাওয়া যায়, তেমনি খুঁজে পাওয়া যায় মানবতার আদর্শ। গুরু সাধনার দিক থেকেও বাউল গানগুলির গুরুত্ব আছে। তাই বাউল গানে বলা হয়েছে—

সুজন সুমতি ভাইরে পাগলা নদীর খেওয়া।
বড় মুইটে ধরিও কাণ্ডার চলাইতে হাওয়া॥

উৎসের সন্ধানে

১. ড. দেবেশ কুমার আচার্য : ‘বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস’, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, কলকাতা, তৃতীয় প্রকাশ, জুন, ২০০৯, পৃ. ৫৫৫

২. তদেব, পৃ. ৫৫৬
৩. শ্রী ভূদেব চৌধুরী : 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস', প্রথম পর্যায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, আগস্ট ২০০৯, পৃ. ৩৯২৪

গানের গুরু, প্রাণের গুরু : কুবির গোঁসাই ও শাহ আব্দুল করিম

পুষ্পেন্দু মজুমদার

আরবি 'আউর' ও হিন্দি 'বাউল' শব্দের অর্থ 'বায়ুরোগগ্রস্ত'। লোকসংগীতের অন্যতম ধারা বাউল গান। বিষয়বস্তুর দিক থেকে বাউল গান নিঃসন্দেহে উৎকৃষ্ট সৃষ্টি। বাউল গান বাংলাদেশের, বাংলা সাহিত্যের নিজস্ব সম্পদ। চৈতন্য পরবর্তীকালে বৈষ্ণব সহজিয়া ধর্ম ও সহজিয়া মুসলিম পরবর্তী সময়কালে বাউল সাধনার জন্ম একথা বলা যায়। বাউল সাধকরা বিশেষ 'অধরা' মানুষের সন্ধান করেন। বাউলের মূল সাধনা মর্মানুসারী, তাই তাঁরা 'মরমিয়া'। বাউল সাধকরা নিজেদের কোনো প্রকার জাতপাতের গণ্ডিতে আবদ্ধ না রেখে, মানুষ হিসেবে দেখতেই পছন্দ করেন। মনুষ্যত্বের পরম উপলব্ধিই এ সাধনার অঙ্গ। ভেতরের 'আমি'-র সঙ্গে বাইরের 'আমি'-র চমৎকার মেলবন্ধন লক্ষিত হয় বাউল সাধনায়। বাউল গানের সাধনায় তাই ধ্বনিত হয়—

আছে যার মনের মানুষ আপন মনে
সে কি আর জপে মালা।
নির্জনে সে বসে বসে দেখছে খেলা।

বাংলাদেশে অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাউল সাধকদের আবির্ভাব ঘটেছিল। বাউল গানের পথিকৃৎ লালন ফকির। বাউল গানের ধারাটি অত্যন্ত নিভৃতভাবে এপার-ওপার বাংলা জুড়ে বহমান এবং সৃজনশীল। বর্তমানে পার্বতী বাউল, সাধনদাস বৈরাগী, মাকি কাজুমি, মনসুর ফকির, কালাচাঁদ দরবেশ, নিগার সুলতানা পপি, খইবর উদাসদের গানে, সাধনায় বাউল গানের ঐতিহ্যটি সযত্নে লালিত ও সমৃদ্ধ হচ্ছে। বাউল সাধক হিসেবে, বাউল গানের রচয়িতা হিসেবে অন্যদের সঙ্গে কুবির গোঁসাই এবং ওপার বাংলার শাহ আব্দুল করিমের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয়। দু'জন ভিন্ন সময়ের বাউল সাধক, দু'জনের গানের ধারাও ভিন্ন। অথচ একটা বিষয়ে দু'জনের ক্ষেত্রেই ভীষণ সাদৃশ্য—কুবির গোঁসাই এবং শাহ আব্দুল করিমের লেখা ও সুরারোপিত বাউল গানগুলি দীর্ঘদিন প্রচারের আলোর বাইরে থেকে গিয়েছিল। বাউল গানের এই অমূল্য সম্পদগুলি লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকেছে দীর্ঘদিন। এই দু'জন শিল্পীর গানগুলি জনপ্রিয় হয়েছে অনেক পরে।

কুবির গোঁসাই-এর প্রকৃত নাম কুবির সরকার। লালন ফকিরের চেয়ে তের বছরের কনিষ্ঠ কুবির গোঁসাই (লালনের জন্ম আনুমানিক ১৭৭৪)। নদিয়া জেলার চুয়াডাঙ্গার মধুপুর গ্রামে

১৭৮৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। বাউল সাধক হিসেবে লালনের নাম আমাদের কাছে অতিপরিচিত হলেও কুবিরের নাম হয়তো বা অনেক পাঠকের কাছেই অপরিচিত বা স্বল্প পরিচিত।

প্রথম জীবনে কুবির গোঁসাই ছিলেন বঁদ গানের প্রসিদ্ধ গায়ক। পরবর্তীকালে তিনি নদীয়ার চাপড়া থানার অন্তর্গত বৃত্তিহুদা গ্রামে উপস্থিত হন। ঐ গ্রামেই তাঁর সঙ্গে পড়িয়ে ঘটে সাহেবধনী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা চরণপালের। তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন কুবির। কুবির সরকার থেকে নতুন নাম হয় কুবির গোঁসাই। নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন—

আমার নাম কুবির কবিদার,
এই দেশে দেশে বেড়াচ্ছে করে রোজ্জার।

কুবিরের রচিত গানের সংখ্যা ১২০৯ টি। তাঁর গানে মানুষের জয় ঘোষিত হয়েছে সর্বত্র। কুবির জাতিভেদ মানেননি, তাঁর গানের মাধ্যমে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির বাণী প্রচার করেছেন। প্রাকৃতিক ও সামাজিক উভয়ক্ষেত্রেই ছুঁয়ে গেছে কুবিরের গান। প্রাণময়তা ও হৃদয়বৃত্তির প্রাধান্য কুবিরের গানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাঁর গানে পরমেশ্বর বা সচ্চিদানন্দ হলেন মানুষ। কুবিরের বাউল দর্শনটি হল— মানুষ ভজন কর, মানুষের চাইতে বড়ো আর কিছু নেই। 'সহজ হও, সরল হও, মানুষ ধরো, মানুষ হও'। কুবির রূপসাগরে ডুব দিয়েছিলেন, পরম রত্ন ধনও পেয়েছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাঁর সময়ের চেয়ে অনেক আধুনিক ছিলেন গোঁসাই। ধর্মের মোহান্ধতাকে দূরে সরিয়ে রেখে তাই তো আল্লা ও কৃষ্ণকে একত্রে রেখে মহা মিলনের গান গাইতে পেরেছেন কুবির—

একের সৃষ্টি সব পারি না পাকড়াতে
আল্লা আল জিহ্বায় থাকেন আপন সুখে
কৃষ্ণ থাকেন টাকরাতে।

একজন সাধক ও কবি একই দেহে কীভাবে দুটি ভিন্ন সত্তায় পরস্পরের পরিপূরক হতে পারেন, তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত কুবির গোঁসাই। এতবড়ো একজন সাধক-কবি প্রচারের আলো থেকে দূরে ছিলেন দীর্ঘদিন। কুবির সংগীত অমূল্য সম্পদ। ১৮৮৪ সালে স্বয়ং রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ভক্তদের নিজকণ্ঠে গেয়ে শুনিয়েছিলেন কুবির গোঁসাই রচিত 'ডুব ডুব ডুব ডুবসাগরে আমার মন...'গানটি। 'কথামৃতে'র ১৪২ সংখ্যক পৃষ্ঠায় গানটি আছে। বলা যেতে পারে এটাই কুবিরের প্রথম মুদ্রিত গান। কুবির রচিত গানগুলি প্রায় একশো বছর অজ্ঞাতেই থেকে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে গানগুলি 'কুবির সঙ্গীত' নামে পরিচিতি লাভ করেছে। বৃত্তিহুদা গ্রামে নিজের আখড়ায় কুবির তাঁর রচিত গানগুলি খাতায় লিখে রাখতেন। অন্য কোথাও 'কুবির সঙ্গীত' খুব বেশি প্রকাশিত হয়নি। সম্প্রতি গবেষক নিমাইচাঁদ রায়ের প্রচেষ্টায় 'হালফিল' পত্রিকায় কুবিরের অনেকগুলি গান পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত হয়েছে। কুবির গোঁসাই এবং কুবির সঙ্গীতকে বাঁচিয়ে রেখেছে নদিয়ার প্রত্যন্ত গ্রাম বৃত্তিহুদা। সেখানে প্রতিবছর বৈশাখী পূর্ণিমায় কুবির সংগীতের আসর বসে। বৃত্তিহুদা গ্রামের কুবির সংগীত শিল্পী সম্প্রদায়ের প্রধান গায়ক জুলফিকার আলি আনসারি পরমনিষ্ঠার সঙ্গে গানগুলি গেয়ে চলেছেন। বৃত্তিহুদা গ্রামেই ১৮৭৯ সালে ৯২ বছর বয়সে কুবির গোঁসাই-এর তিরোধান ঘটে।

বিংশ শতাব্দীর বাংলা বাউল গানের একজন কিংবদন্তী ওপার বাংলার বাউল সাধক শাহ আব্দুল করিম। ১৯১৬ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের সিলেট ডিভিশনের সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই থানার উজালবিল গ্রামে জন্ম আব্দুল করিমের। পিতা-ইব্রাহিম আলি, মাতা-নাইওরজান। জীবনের একটা বড়ো অংশ তিনি লড়াই করেছেন দারিদ্রতার সঙ্গো। দারিদ্র ও জীবনসংগ্রামের সঙ্গো বড়ো হওয়া আব্দুল করিমের সংগীত সাধনা শুরু শৈশবকাল থেকেই। কিশোর বয়স থেকেই গান লিখলেও করিমের গান কয়েকবছর আগে পর্যন্ত শুধুমাত্র ভাটি অঞ্চলের মানুষের কাছেই পরিচিত ও জনপ্রিয় ছিল। মৃত্যুর কয়েক বছর আগে 'সাউন্ড মেশিন' নামক একটি সংস্থা করিমের ১২টি গানের অ্যালবাম প্রকাশ করে (২০০৬ সালে), মূলত তখন থেকেই সারা বাংলাদেশব্যাপী জনপ্রিয় হয় সিলেট সম্রাট করিমের গান। ভাটি অঞ্চলের মানুষের জীবনের সুঃখ-দুঃখের পাশাপাশি করিমের গান কথা বলে অন্যায়, কুসংস্কার, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে। তাঁর গানে আছে একইসঙ্গো মরমি অনুভূতি ও প্রতিবাদের আগুন। দারিদ্রতার কারণে চাষবাস করতে হয়েছে, শ্রমব্যয় করতে হয়েছে, কিন্তু তাঁর কলম থেমে থাকেনি। আব্দুল করিম শুধুমাত্র বাউল গানের চর্চা করেননি। শরিয়তি, মারফতি, নবুয়তসহ অন্যান্য ধারায় গানের চর্চাও করেছেন। তাঁর রচিত ও সুরারোপিত গানের সংখ্যা ১৫০০-এর ওপর। বাউল সম্রাটের সংগীতের প্রেরণা। তাঁর স্ত্রী আফাতাবুনেসা। যাকে তিনি ডাকতেন 'সরলা' বলে।

আব্দুল করিম তাঁর গানের অনুপ্রেরণা পেয়েছেন লালন, পঞ্জু শাহ, দুদ্দু শাহের দর্শন থেকে। তাঁর গানগুলি সংকলিত হয়েছে ৬টি গ্রন্থে।—'আফতাব সংগীত' (১৯৪৮), 'গান সংগীত' (১৯৫৭), 'কালিনীর ঢেউ', 'ধলমেলা' (১৯৯০), 'ভাটির চিঠি' (১৯৯৮), 'কালিনীর কূলে' (২০০১)। বাংলা আকাডেমি তাঁর ১০টি গান ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেছে। 'বন্দে মায়া লাগাইছে', 'কোন মেস্তরি নাউ বনাইছে', 'আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম', 'মন মজাইলে ওরে বাউলা গানে' প্রভৃতি তাঁর বিখ্যাত গান। ২০০৯ সালে এই মহান শিল্পীর প্রয়াণ ঘটে। সংগীত জগতে অসামান্য অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার আব্দুর করিমকে 'অমর একুশে' পদকে সম্মানিত করেছে। ২০১৬ সালে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে আব্দুল করিমের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপিত হয়েছে। শাকুর মজিদ আব্দুল করিমকে নিয়ে 'ভাটির পুরুষ' নামে একটি তথ্যচিত্র নির্মাণ করেছেন।

তথ্যের সন্ধানে

১. দেবেশকুমার আচার্য : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস
২. হালফিল পত্রিকা
৩. মাটির টানে পত্রিকা
৪. ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে গ্রন্থ

দেহের দেহলীতে অমৃতের আরাধনা : বাউলের পরম অভীষ্ট

দীপায়ন পাল

মূলত অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই স্পষ্ট রূপে প্রত্যক্ষ করা যায় বাংলার মাটিতে বাউল সম্প্রদায়ের আত্মপ্রকাশ। হরিনাথ মজুমদার, যিনি সর্বসাধারণের কাছে 'কাঙাল হরিনাথ' নামে পরিচিত—তিনিই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে সর্বপ্রথম এই ধারার প্রতি আকৃষ্ট হন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে অবস্থানকালে লালন ফকিরের বাউল গানের সংস্পর্শে আসেন এবং এর অনাবিল স্বতঃস্ফূর্ততায় মুগ্ধ হয়ে ঐ গীতাবলি সংগ্রহ ও প্রকাশ করেন। কবিগুরুর সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল লালনের অন্যতম শিষ্য গগন বাউলের। তাঁর 'ফাল্গুনী'তেও অন্ধ বাউলের গানে রয়েছে লালন ফকিরেরই সুস্পষ্ট অনুপ্রেরণা। এই সম্প্রদায়ের সাধনা ও সঙ্গীত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সুচিন্তিত মন্তব্য—

> আমাদের দেশের ইতিহাস আজ পর্যন্ত প্রয়োজনের মধ্যে নয়। পরন্তু মানুষের অন্তরতর গভীর সত্যের মধ্যে মিলনের সাধনাকে বহন করে এসেছে।

অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী, মনসুরউদ্দিন আহমদ, ড. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, শশীভূষণ দাশগুপ্ত প্রমুখ বিভিন্ন সময়ে বাউলগান সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। 'বাউল' শব্দের আক্ষরিক অর্থ বাহ্যজ্ঞানশূন্য। সম্ভবত 'বাতুল' বা 'ব্যাকুল' শব্দ থেকে 'বাউল' শব্দের উৎপত্তি। অবশ্য অনেকে মনে করেন, আরবি 'আউল', যার অর্থ ঈশ্বরের একনিষ্ঠ সেবক—তা থেকেও 'বাউল' কথাটির জন্ম হতে পারে।

বাউল তত্ত্বের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায় সুস্পষ্ট তিনটি পর্যায়—আত্মতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব আর দেহতত্ত্ব। এই শেষোক্ত বিষয়টি যেমন নানাভাবে তাদের নিন্দিত করেছে, তেমনি এই অনুন্মোচিত যৌন যোগের রহস্যময় অন্তর্গূঢ় বাউল জীবন সম্পর্কে সভ্য-শহুরে মানুষকে করে তুলেছে বিশেষ কৌতূহলী। চারিচন্দ্র ভেদ অর্থাৎ মল, মূত্র, রজ ও বীর্যপান যেমন বাউল সম্প্রদায়কে সভ্য, রুচিসম্পন্ন সমাজের থেকে স্বতন্ত্র করে রেখেছে, তেমনি তাদের দেহ সাধনা তথা যৌন জীবন তথাকথিত উন্নত জীবনবোধসম্পন্ন মানুষের কাছে একই সঙ্গে গর্হিত ও কৌতূহলপ্রদ। এই রহস্যময় যবনিকাই অপসারিত করে সেই আলো-আঁধারি দোলাচলের মরমি জীবনকে বুঝি প্রথম পাঠকের সামনে কিছুটা মেলে ধরেছেন সুধীর চক্রবর্তী তাঁর 'গভীর নির্জন পথে' গ্রন্থটিতে।

'বাউলদের যৌন জীবন ও জন্ম নিয়ন্ত্রণ' শীর্ষক একটি রচনা প্রকাশিত হয়েছে ওপার বাংলা

থেকে। ঐ নিবন্ধে বাউলদের একটি বিশেষ ধারণার কথা ব্যক্ত করেছেন রচয়িতা—

> বীর্যপানরত পুরুষ নিজের বীর্য দ্বারাই শরীরে অ্যান্টিবডি উৎপন্ন করবে এবং তাতে শুক্রাণুর উৎপাদন অবশ্যই অল্প হবে। তাই দেখা যায় বাউলদের সন্তান সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। তবে স্মরণযোগ্য। নারী কখনো এই বীর্য পান করে না।

গুরুর নির্দেশেই নিয়ন্ত্রিত হয় বাউলের যৌন যোগাচার এবং সেই প্রক্রিয়ার যথোপযুক্ত প্রয়োগের কারণেই জন্ম নেয় না বাউলের উত্তর প্রজন্ম। সেক্ষেত্রে শিষ্যরাই বহন করে চলে প্রাক্তনের পরম্পরা। আপন দেহকে সম্যকভাবে জানা, তাকে পরিপূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করা এবং তারই মধ্য দিয়ে আনন্দরূপ অমৃতের আস্বাদ গ্রহণ—এই হল বাউল সাধনার অন্যতম অভীষ্ট। তাদের অগণিত সংগীতের মধ্যে ব্যাপৃত হয়ে আছে সেই উপলব্ধিরই নিদর্শন। দেহভাণ্ডে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিরূপ অবলোকন করেই মোক্ষলাভে ব্রতী হয়েছেন তারা। কখনো তাঁরা লেখেন—

দেহের দলপদ্ম যার
উপাসনা নাই তার
কোথা কি মেলে।
তীর্থব্রত যার জন্য
এ দেহে তার সব মিলে।।

কিংবা

কোন রসে কোন রতির খেলা,
জানতে হয় এই বেলা।।
সাড়ে তিন রতি বটে
লেখা যায় শাস্ত্রপাঠে
সাধ্যের মূল তিন রসে ঘটে
তিনশ ষাট রসের বালা।
জানলে সে রসের মরম
রসিক তারে যায় বলা।।...
আমি উজাই কি ভেটেল পরি
ত্রিপিনীর তীর নালা।।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বাউলের দেহতত্ত্বে রয়েছে জোয়ার-ভাঁটার রূপক। এই জোয়ার ভাঁটাই আঞ্চলিক ভাষায় 'উজান ভেটেল' বলে উল্লেখিত হয়। বাউল তত্ত্বানুসারে, 'উজান' শব্দের অর্থ— রতিক্রিয়ার সময় বীর্যের ঊর্ধ্বগমন ক্রিয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা। এই অভ্যাস গঠিত হলে অর্থাৎ বীর্যের ঊর্ধ্বগমন স্থিতি লাভ করলে সাধনায় অর্জিত হয় সিদ্ধি। শারীরিক ও মানসিক শক্তি তখন বৃদ্ধিলাভ করে। পক্ষান্তরে, 'ভেটেল' বা ভাঁটার অর্থ বীর্যপাত ও তার মাধ্যমে সন্তানের জন্ম। এই স্খলনের ফলে লব্ধ হয় না বাউলের আকাঙ্ক্ষিত সিদ্ধি। তাই সিদ্ধ গুরুর কাছে বাউলকে নিষ্ঠাভরে শিক্ষা করতে হয় 'উজান-ভেটেল'-এর সাধনা প্রক্রিয়া। তাই বাউলের শিক্ষা ও সাধনা কামকে অস্বীকার করে নয়, অতিক্রম করে প্রেমানন্দ অর্জনের তপস্যা। অপক্ক দেহকে পক্ক করাই তাদের অভীষ্ট। ধ্যান, জপ, মন্ত্রোচ্চারণের পরিবর্তে শরীরী সাধনাকেই তারা গ্রহণ করেছে মোক্ষলাভের পন্থা রূপে। বাউল সাধনার ক্ষেত্রে তাই গুরুর সুস্পষ্ট

নির্দেশ—'কামে থেকে হও নিষ্কামী'।

'গভীর নির্জন পথে' গ্রন্থটি পুস্তকাকারে আত্মপ্রকাশ করেছিল ১৯৮৯ সালে। এর পরবর্তী পর্যায়ে বাউল ফকিরদের নিয়ে নিরন্তর অন্বেষণ আর অনুসন্ধিৎসায় সদা সক্রিয় থেকেছেন অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তী। তারই ফলশ্রুতি স্বরূপ ১৯৯৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের তৎকালীন সচিব চন্দনকুমার চক্রবর্তী তাঁর ওপর ন্যস্ত করলেন এক গুরু দায়িত্ব। পশ্চিমবঙ্গের বাউল ফকিরদের নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ তথ্যানুসন্ধানের প্রকল্প রূপায়ণের ভার অর্পিত হল তাঁর ওপর। সেই সুকঠিন ও সনিষ্ঠ কর্মযজ্ঞই 'বাউল ফকির কথা' নাম নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে গ্রন্থাকারে। শুধু বীরভূম নয়, সমগ্র বঙ্গদেশে ব্যাপৃত বর্তমান প্রজন্মের বাউল সম্প্রদায়ের জীবনচর্যা-দৃষ্টিভঙ্গি এবং ধর্মাচরণ সম্বন্ধে এটি এক নির্ভরযোগ্য রচনা। বাউলদের জীবন ও সাধনা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে তাদের সাধন পদ্ধতির ক্ষেত্রে শরীরী মিলন বা যৌনতার দিকটিকেও আপন পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার নিরিখে প্রাঞ্জল ভাবে উপস্থাপিত করেছেন তিনি। তত্ত্বালোচনার সমান্তরালে সেই গ্রন্থেরই কিছু বর্ণনাত্মক অংশ এখানে উদ্ধৃতি স্বরূপ গৃহীত হল—

> গুরুর আদেশে পরেশ আর অনুরাধা একটি যেন মিথুনমূর্তি। সকলের উঁকিঝুঁকির মধ্যে পরেশ অনুরাধাকে গভীর চুম্বন করল। কিন্তু গুরু গোঁসাই জানেন সময় পরিমাণ। তাঁর ছোটো ছোটো হাততালির শব্দে তিনি ওদের ভগ্নতা ভেঙে দিলেন। ওরা বিচ্ছিন্ন হল।

এমনিভাবে দেহসাধনার কঠিন সরণীতে শিষ্যকে পদাতিক করে নেন গুরু। তাকে যেমন তিনি সাহস দেন, তেমনি সতর্কও করেন পদে পদে। গুরু শিষ্যকে নির্দেশ দেন যে—

> নারী হচ্ছে আনন্দ সহচরী। সে এক মহামায়া। তিনিই সৃষ্টি ও স্থিতির জননী। আবার লয় বিলয়ের মহাশক্তিরূপিনী। সেই নারীর সঙ্গে লীলা সহজ কথা নয় বাবা। না বুঝে তার সঙ্গ করলে মূলে নাশ হয়ে যাবি। তাই সাবধানে, ধীরে ধীরে, সুস্থিরে। যখনই বুঝবি উত্তেজনা তোকে গ্রাস করছে। কুম্ভক করবি। দম ধরে পিতৃধন রক্ষা করবি।

শরীরী মিলনের এই শিক্ষাদানের জন্য বহুক্ষেত্রেই গুরুর সামনে সঙ্গমরত হয় সাধক ও তার সাধন সঙ্গিনী। মিলনান্তে কোনো বর্ষীয়সীর দ্বারা পরীক্ষা করা হয় ঐ সাধিকা বা সাধনসঙ্গিনীর যোনিদেশ। সুদীর্ঘ সঙ্গমের পরও যদি সেখানে বীর্যপাতের কোনো চিহ্ন না থাকে, তবেই এই কায়া সাধনায় ঐ সাধককে সিদ্ধ বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়।

কখনো গুরু দেহতত্ত্বের গান শোনান। আবার কখনো সেই তত্ত্বকথাকে ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করেন তিনি। গভীর জলে অষ্টদল পদ্মের কথা এমনি ভাবেই শিষ্য কার্তিকদাসকে শুনিয়েছিলেন গুরু জীবন গোঁসাই। সেই পঙ্কজের আটটি দলকে প্রথমে অনুভব করতে হবে আপন রসনার মাধ্যমে। অনুধাবন করতে হবে যে, সেই পদ্মের মৃণাল পেরিয়ে ফুল ঘিরে ফল জমাট বাঁধে। সেখানেই বিরাজ করে মানুষ। জীবন গোঁসাইয়ের নির্দেশ অনুসারে নারী সঙ্গার সময় এই ধ্যানটি সদা স্মরণীয়।

সঙ্গম কিভাবে সাধনার ক্ষেত্রে উন্নীত হয়, কার্তিকদাস তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দিয়ে তা উপলব্ধি করেছেন। সেই অবিস্মরণীয় স্মৃতি রোমন্থন করে তার বিবৃতি ও অন্তঃস্থ উপলব্ধির কথা এখানে তাঁরই জবানিতে উল্লেখিত হল—

> গুরু কৃপায় আমরা সেই বালিচরের উপর খুলে ফেললাম আমাদের গায়ের যত পোশাকের ছাল। লতা, যার সঙ্গে আমার দেহ সম্পর্ক আগে হয়েছে, এ যেন সে নয়। সে এক মোহ, প্রেম। আমি তার চুল, কপাল, ঠোঁট...তার মনোহর শরীরের সব জায়গা চুমাতে ভরিয়ে চললাম। তারপর গুরু নির্দেশিত প্রক্রিয়ায় আরম্ভ হল আমাদের কাজ। আমরা দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরেছিলাম। সেই যেমন গানে আছে—'দেখে এলাম মর্ত্যে/একটি গর্তে/দুই সাপের জড়াজড়ি' সেইরকম। সে জিনিস বোঝানো যাবে না, করে দেখতে হবে। জীবনে তাকে পেতে হবে। সে জিনিসকে অনুভব করতে হবে। ভাবের জগতে বুঝতে হবে। ধ্যানে থাকতে হবে...।

এমনিভাবেই ইহবাদী ও বস্তুময় পথ ধরে অগ্রসর হতে থাকে বাউলের সাধনা। সেখানে লোভ, মোহ ও প্রলোভন পদে পদে বিচ্যুতির সম্ভাবনাকে স্পষ্ট করে তোলে। সাধক বাউল ও তার সাধনসঙ্গিনীকে গভীর সংযমের সঙ্গে প্রতিহত করতে হয় যাত্রাপথের সেই প্রবল অন্তরায়কে। কায়, সংযম ও চার চন্দ্র সাধনের মাধ্যমে এমনি ভাবেই স্তর পরম্পরায় উত্তরণ ঘটে সাধকের। বাউলের এই সাধনতত্ত্ব যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে শুধুমাত্র সাধক বাউলই। এ প্রসঙ্গে কালু ফকিরের সুস্পষ্ট অভিমত—

> বাবা, এ জিনিস মুখে বলে বোঝানো যায় না—আচরণ করে বুঝতে হয়, তার জন্যে গুরু-মুর্শেদ লাগে, সময় লাগে, ধৈর্য্য লাগে, লেগে থাকতে হয়।

যাকে অবলম্বন করে বাউল উত্তীর্ণ হয় তার অভীষ্ট সিদ্ধির উপান্তে—সেই সঙ্গিনীই বাউলের মনের মানুষী। সেই সঙ্গিনীর মধ্যেই রাধারূপে আরোপ করে সাধনা করে বাউল। নারীর কাছেই যে লুকনো আছে তার সাধনার চাবিকাঠি। এই নারীর সহৃদয় সহযোগিতা ব্যতীত পরীক্ষিত হতে পারে না। শুদ্ধ প্রেম সাধনার প্রকৃতি। তাই তো বাউল তার পরম প্রেয়সীর চরণ স্পর্শ করে বলে—'কৃপা কর মোরে'। গভীর আবেগ আর পরম নির্ভরতার সঙ্গে সে উচ্চারণ করে—

তুমিই আমাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারো।
মরণও তোমার হাতে।

দয়িতের সেই ভজনায় আর গভীর আত্মসমর্পণে, গর্বে, অহংকারে ও আত্মতৃপ্তিতে পল্লবিত হয়ে ওঠে নারী। বাউল সংগীতের মধ্যে মূর্ত হয়ে ওঠে সেই প্রগাঢ় প্রেমেরই বার্তা—

বলি সাধনের রীতি
লয়ে প্রকৃতি সতী অগ্নিপারাতে গতি
উভয়রীতি থাকতে যদি পার
তবে সেই মানুষকে সঙ্গে করে
রঙ্গে ভঙ্গে ফের॥

. যেকোনো বাউল মেলায় গেলেই অনায়াসে প্রত্যক্ষ করা যাবে বাউল আর তার সঙ্গিনীর পারস্পরিক প্রেম আর নির্ভরতার পরম মধুর দৃশ্য। হাজার মানুষের ভিড়েও তারা মগ্ন থাকে নিজেদের মধ্যে। কখনো বাউল-সঙ্গিনী তাঁর গোঁসাইয়ের চুল আঁচড়ে দেয়, তেল মাখিয়ে দেয় সারা শরীরে; আবার কখনো প্রজ্জ্বলিত ধূপকাঠি নিয়ে ভক্তি ভরে আরাধনা করে তাকে। বাউলও তার সঙ্গিনীকে ছাড়া গ্রহণ করে না আপন আহার্য। একই সঙ্গে খাওয়া। একই কাঁথার নীচে ঘনিষ্ঠ আলিঙ্গনে থেকে তাদের নিশ্চিন্ত নিশিযাপন। গোঁসাই একতারা হাতে তুলে নিলে তার সহচরীর হাতে ওঠে করতাল। বাউল যখন বাণী বিতরণ করেন আপন শিষ্যদের, তখন তার

গরবে গরবিনী প্রেয়সী একাগ্র তন্ময় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তার গোঁসাইয়ের দিকে। এ যেন তার ঈশ্বর দর্শন। ঈর্ষনীয় এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেই হয়তো কোনো বাউলের রাধারাণী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ঘর ছাড়ে-অপ্রাপ্তির যন্ত্রণায় জর্জরিত কোনো নারী। সামাজিক অনুশাসনের সব অবরোধ ভেঙে এই বাধা-বন্ধনহীন প্রেম মার্গ যেন মুক্তির এক মহা দিশা।

কিছু মতান্তর থাকলেও মূলত অষ্টাদশ শতাব্দীকেই বাউল সম্প্রদায়ের জন্মলগ্ন বলে ধরা হয়। হিন্দু ও মুসলিম সমাজের প্রবল রক্ষণশীলতাই উদ্ভব ঘটিয়েছে তাদের অস্তিত্বের। প্রচলিত শাস্ত্রধর্ম অনুসারে তখন যৌনতা সম্পর্কে পালিত হতো কঠোর বিধিনিষেধ। বিবাহ বন্ধন ব্যতীত নর-নারীর প্রেম ছিল সামাজিক ও নৈতিক দিক থেকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। বিধবা বিবাহের প্রচলনও তখন হয়নি। তাই স্বামীর জীবনান্তের সঙ্গে সঙ্গে নারী জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ অধিকারের সঙ্গে হারাতো তার যৌন অধিকারও। ইসলামে বিবাহ ব্যতীত যৌন সম্ভোগে বেত্রাঘাত থেকে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত শাস্তির বিধান প্রদত্ত হয়েছে। এমন শৃঙ্খলারূপ শৃঙ্খলের নিগড়ছিন্ন করতে, অচলায়তনের গগনচুম্বী প্রাচীর ভাঙতেই জন্ম নিল বাউলরা। দেহ সাধনার অঙ্গ রূপে নর-নারীর মিলনকে ধর্মীয় স্বীকৃতি দিল এই সম্প্রদায়। নারী পণ্য নয়, পুতুল নয়, সন্তান ধারণের যন্ত্র নয়। আজীবনের সাধন সঙ্গিনী রূপে পরম প্রেম ও মর্যাদার সঙ্গে তাকে গ্রহণ করে এই পরম সত্যকেই স্বীকৃতি দিল বাউল।

তথ্যের সন্ধানে

১. সুধীর চক্রবর্তী : 'বাউল ফকির কথা', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০১
২. সুধীর চক্রবর্তী : 'গভীর নির্জন পথে', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৯
৩. ড. মো. আব্দুল করিম মিয়া সম্পাদিত : 'বাংলার বাউল ফকির সাধনা ও দর্শন' (প্রথম খণ্ড), নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৬
৪. ওয়াকিল আহমেদ : 'বাংলা লোকসংগীতের ধারা', বাতায়ন প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৫

আধুনিক কবিতা ও বাউলমন

রিয়া ঢোল

বাউল ধর্ম সম্পূর্ণই বেদবহির্ভূত ধর্ম। রিপুর উত্তেজনা থেকে দৈহিক মিলন ও তার দ্বারা কাঙ্ক্ষিত বাসনার তৃপ্তি এবং সন্তানলাভ-বৈদিক বাণের এই যে রীতি তা সম্পূর্ণতই অগ্রাহ্য হয়ে থাকে বাউলতত্ত্বে। লালন-গুরু সিরাজসাঁই বলে গেছেন—"এই রীতি অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিলে কাম-বিপুর হাতে নিশ্চিতরূপে পরাজিত হইতে হইবে" লালন তাঁর গানেও বলেছেন—

বৈদিক মেঘে ঘোর অন্ধকার,
উদয় হয়না দিনমনি।

তবে কি দৈহিক কামনাকে সম্পূর্ণই বিসর্জনের ইঙ্গিত দেয় বাউলতত্ত্ব? না ঠিক তা নয়, কোন রতি-ক্রিয়ার বিরুদ্বাচরণ নয়, বরং কামের মধ্যে দিয়ে প্রেমের আহরণই এই তত্ত্বের একমাত্র লক্ষ্য। অটল প্রচেষ্টা এর একমাত্র মাধ্যম। দেহেই পরমাত্মার উজ্জ্বল উপস্থিতি, তাই তাকে আশ্রয় করে সাধনায় রত হয়েছেন বাউল সম্প্রদায়। বাউলদের সাধনা দৈহিক ও অবশ্যই ঊর্ধ্বগামী। এরাও সহজ পথে সাধনা করে। এই 'সহজ' কথাটি দুইভাবে ব্যবহৃত। একটি যা সঙ্গে সঙ্গেই জন্মায়। জীব ও জড়ের বাহ্যরূপের সঙ্গে সঙ্গে তার ভিতরেও একটি শাশ্বত স্বরূপের জন্ম লাভ। এই উপলব্ধি প্রণালীই সহজপথ। আবার অন্যদিকে 'সহজ' হল যা মানুষের স্বভাবের অনুকূল। এই পথেই আত্মোপলব্ধির চেষ্টা সহজিয়া মতের লক্ষ্য। গুরুর উপদেশ ও সহজ সাধনা এই দুয়ের উপর ভিত্তি করেই সিদ্ধিলাভ—এই হল সহজিয়া মতের মূল কথা। এর থেকে গড়ে উঠেছে সহজিয়া ধর্ম ও সহজিয়া সাহিত্য। সহজিয়ারা দুই ভাগে বিভক্ত বৌদ্ধ সহজিয়া ও বৈষ্ণব সহজিয়া। বৌদ্ধ সহজিয়াদের উদ্ভব বজ্রযানী বৌদ্ধদের থেকে এবং তাদেরই অনুকরণে বৈষ্ণবদের একটি অংশ। আঠারো শতকে বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে এই সহজিয়া ধর্মমতের সম্প্রসারণ ঘটে। এই পথ ধরেই তারা জীবনের স্বরূপ উপলব্ধিতে বিশ্বাসী। তাদের এই উপলব্ধি ও বিশ্বাসের কথা নানা বাউলগানে বিধৃত হয়েছে। এই পথ ধরেই তারা অধ্যাত্ম সাধনা, পরমাত্মার অন্বেষণ ও সংগ্রাম করে। বাউল কথার অর্থ পাগল। প্রকৃত অর্থে তারা প্রেম ভাবের পাগল। তারা মনে করেন দেহের মধ্যেই আত্মা আছে, আর বিশ্বে রয়েছেন পরমাত্মা। মানব দেহস্থিত আত্মাই বাউলের কাছে 'মনের মানুষ'। ঈশ্বর কল্পিত স্বর্গলোকে বসবাস করেন না, তাঁর অধিষ্ঠান মানুষের নিভৃতলোকে মনের গহনকোণে। প্রেমভক্তির পথে দেহসাধনার মাধ্যমে তাকে পাওয়া সম্ভব-তারা এইরকমই মুক্তমন ও স্বাধীন চিন্তার অনুসারী। অন্যান্য তন্ত্রযোগ সাধনায় বা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বৈরাগী বোষ্টমীদের মত এরাও

সাধন-সঙ্গিনী হিসেবে নারী সম্ভোগকেই বেছে নিয়েছেন। এই ধারণা তাদের ধর্মসাধনার সোপান। কিন্তু নারী সেখানে যথেষ্ট সামাজিক মর্যাদায় ভূষিত।

এর পর আসছি বাংলা সাহিত্যে বাউল প্রভাব প্রসঙ্গে। এই প্রভাব সম্পর্কে বলতে গেলে প্রথমেই কয়েকটি কথা আমাদের মাথায় রাখতে হবে, তা হল রবীন্দ্রনাথ কখনোই বাউল মত বা সঙ্গীতের গবেষক ছিলেন না, তিনি ছিলেন সেই মতের ও সংগীতের দর্শক। তিনি বাউল গানের মূল সুরটিকে সযত্নে সাজিয়েছেন নিজের চেতনার রথে। কখনোই তিনি কোন বাউল গান লেখেননি, বাউলের মূল গানকে ভেঙে তিনি তৈরি করেছেন নিজের মত। গানগুলির গঠন, গীতসুর, বাহ্যিক প্রকৃতি হয়তো বাউল গানের মত কিন্তু সেগুলি মূল বাউল গানের মতাদর্শ থেকে বহুযোজন দূরে মূলত বাউল গানে দুর্বোধ্য ভাবটিকে বর্জন করে তার শান্ত শীতল ধারাটি সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে সচেস্ট হয়েছেন তিনি। ফলে তার রসাস্বাদন সাধারণ আটপৌরে মানুষের কাছে হয়েছে অনেক সহজ। শুধু সুর নয়, বাউল গানের চলন ও ছন্দের প্রকৃতিও মুগ্ধ করেছিল রবীন্দ্রনাথকে। ছেউরিয়ায় লালনফকিরের আখড়া পড়ে রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহের জমিদারীতে। সেখানে বাউলদের সঙ্গে কালাতিপাত করলেও যতদূর জানা যায় লালনের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ লেখা হয়নি। কিন্তু লালনের গানের সর্বপ্রথম সংগ্রাহক সংকলক ও অনুবাদক তিনিই। এছাড়া গগন হরকরার মূল দু'টি গান ভেঁঙে তিনি নিজে গান বানিয়েছেন আবার লালনশাহী সুর থেকে প্রচলিত লোকসুর বা বৈষ্ণবপন্থী বাউলদের সুরেও তিনি আকৃস্ট হন। যেমন 'হরিনাম দিয়ে জগত মাতালে' গানটির সুরে তিনি রচনা করেন 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে', আবার লালনের গানের প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ করা যায় তাঁর গানে। লালন বলেন—

আমার ঘরের চাবি পরের হাতে
আমি ক্যামনে খুলি সে ধন দেখব চোখেতে।

রবীন্দ্রনাথ সেই গানের টানেই লিখলেন—"আমার ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে," এই ঘর আর কিছুই নয়। পার্থিব বন্ধনের প্রতীকী রূপ। এতো গেল রবীন্দ্র প্রভাবের কথা। কিন্তু রবীন্দ্রপরবর্তী কবিদের লেখায়ও আমরা বেশ কিছু বাউল প্রভাব লক্ষ করি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মত বাউলের মূল সুর বা ছন্দের প্রত্যক্ষ প্রভাব তাঁদের মধ্যে তেমন দেখা না গেলেও, নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতেই তাঁরা বাউলকে দেখতে স্বচ্ছন্দ বোধ করেছেন। কখনো তারা সম্পূর্ণ নিজেকেই সম্প্রসারিত করে দিয়েছেন বাউলের সঙ্গে, কখনো বাউলের তত্ত্ব ও তার নানা খুঁটিনাটি অনুষঙ্গ নিয়ে এসেছে কবিতায়। এমনও কিছু কবিতা পাই যেখানে বাউল প্রসঙ্গ এসেছে শুধুমাত্র নামকরণে, বিষয়বস্তুতে তাঁর ছোঁয়া নেই। আবার কেউ কেউ ঠাট্টার ছলেও বাউলকে এনেছেন তাঁর কাব্য শিল্পে। বাউলের সাধনা, দেহতত্ত্ব, বাউলের চিত্রকল্প এবং প্রতীকী শব্দ শুধু কবিতায় সৌন্দর্যই সৃষ্টি করেনি, এর মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে কবির মনের কথাটিও।

বাউলের মরমিয়াবাদকে একালের মেয়েদের বিচিত্রগামী ভালোবাসার ক্ষেত্রে বোঝাবার প্রয়াস ঘটিয়েছেন আধুনিক অনেক কবি। বুদ্ধদেব বসু তাঁর নায়িকার মৌন মাধুর্য রূপ-বর্ণনার প্রসঙ্গে এনেছেন বাউল ভাবনা—

মাঝ রাতে আজ বাতাস জেগেছে, শুনতে পাও কঙ্কাবতী
এলো এলোমেলো ব্যাকুল বাউল উত্তল বাও কঙ্কাবতী।

... হাহাকার করে বেহায়া হাওয়ার বেহালাখানি কঙ্কাবতী
জানালার কাছে হানা দেয় তার মনের বাণী কঙ্কাবতী
কোন কথা কয়? তুমি কি শুনবে? শুনাব নাকি?
আধো বিস্ময় আধো সংশয়ে মেলাব আঁখি,

(সেরিনাদ/ কঙ্কাবতী)

বাউলের প্রেম দেহকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলেও তা অবশেষে দেহাতীতে পৌঁছয়। তাঁর মরমিয়াবোধের বোঝের সার্থকতা দেহজ ভালোবাসায়। তবে বাউল ভাবনা এখানে তাৎক্ষণিক চেতনার প্রতিফলন।

বাউল ভাবনাকে জীবনের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন কবি অমিয় চক্রবর্তী। তাঁর মিস্টিক চেতনা কোথাও গিয়ে বাউলের লৌকিক অধ্যাত্মবাদ অনুসারী। তফাৎ শুধু পরিকাঠামোর—

পরাণ বাউল কয় গো
কখন হাসি কখন কাঁদি জানাজানি নয়গো
তুমিই জানো।

বাউল ভাবনার একটি খন্ডিত চিত্রকল্প পাই হুমায়ুন কবিরের কণ্ঠে। স্বদেশিকতার চেতনায় তিনি লেখেন—

একদিন জল ডাহুকের ডাকে শৈশবে তোমার ডাক
চিনেছিলাম। বিশ্বাস করিনি জলপ্রপাতের শব্দ
অন্ধকারের বেলাভূমি ঝিঁঝির শব্দের সাথে বেজে
উঠলে সরীর খালের শান্ত বাঁকে আমি অচিন সাধুর
নাম ধরে ব্যাকুল বাউল ডাক পাঠালে চারণ কথা
ভেসে আসে, নিসর্গ সুন্দরী।

(রক্তের প্রতিবেশী জন্মভূমি : কুসুমিত ইস্পাত)

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'ভূবন ডাঙার বাউল এক' কবিতাটি মূলত শান্তিদেব ঘোষের ভাই শুভময় ঘোষের মৃত্যু উপলক্ষ্যে লেখা। শুভময় ঘোষ সাংবাদিকতার সূত্রে দেশ ছেড়ে রাশিয়ায় যায়, সেখানে বসবাস শুরু করে, কিন্তু মর্মে ছিল তার কমিউনিজম, তারই মধ্যে দিয়ে তিনি আত্মনিয়োগ করেন বৃহত্তর দেশমাতৃকার খোঁজে এই দেশ অন্বেষণ কবির কাছে যেন সেই 'মনের মানুষের' অন্বেষণ। কবিতাটি মূলত একটি শোকগাথা বলা চলে। মনের মানুষ রূপ দেশের প্রতি আত্মনিয়োগের পরিনামী রূপ 'শিয়রে শুভ্রফুল'। এবং ঠিক তার পরেই ভেসে ওঠে শান্তির ঘুমের রূপ—

ভুলু হাসছিল
ভুলো না, মনে রেখো
দাসভিদানিয়া।

প্রকৃত দেশপ্রেমিক রূপ নিয়ে সেই চিরশান্তির কোলে ডুবে যাওয়া যুবক কবির চোখে আজ প্রকৃত বাউল। লাল মাটির ধুলো উড়িয়ে—

হাতে একতারা নিয়ে
ঘুঙুর পায়ে বাউল হাওয়া

আনন্দে নাচতে নাচতে
চলে গেল।

সে চলে গেল 'সহজ মানুষের' আরো গহন গভীর অন্বেষণে—

যেখানে জননী
যেখানে জন্মভূমি।

শামসুর রাহমান একটি কবিতায় যখন বলেন—

যখন তোমার বাহুর বাসরে
মগ্ন ছিলাম, চন্দ্রিত তন্দ্রায়
আলো আঁধারির চকিত সীমায়
লালনের গান দূর হতে এলো ভেসে।
সে গানের ধ্বনি স্তব্ধ সায়রে
কোটায় নিবিড় অজস্র শতদল।

(লালনের গান)

তখন বাউল ভাবনা আমাদের মনে এক অসামান্য চিত্রকল্পের জন্ম দেয়। আল মাহমুদের 'সোনালী কাবিনের' একটি কবিতায় মার্কসীয় দর্শন মূল বিষয়বস্তু। সেখানে লোক ঐতিহ্য এবং বাউল ভাবনা চেতনা প্রবাহে একটি অন্বয় প্রতিষ্ঠা করেছে—

এর চেয়ে ভাল নয় হয়ে যাওয়া দরিদ্র বাউল?
আরশিনগরে খোঁজা বাস করে পড়শি যে জন
আমার মাথায় আজ চুড়ো করে বেঁধে দাও চুল
তুমি হও একতারা, আমি এক তরুণ লালন
অবাঞ্ছিত ভক্তি রসে এ যাবৎ করেছি যে ভুল
সব শুদ্ধ করে নিয়ে তুলি নব্য কথার কূজন।

(সোনালী কাবিন)

কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের একটি কাব্যগ্রন্থ 'যৌবন বাউল'। নামকরণেই অসামান্য ব্যঞ্জনা। এর সঙ্গে এই কাব্যের 'অন্ধবাউল' নামক কবিতায় দেখা যায় এটি আধুনিক জীবন সমুখ ভাবের কবিতা হলেও বাক্য গঠনে, ভাবের নির্মাণে বাউলের নানা খুঁটিনাটি ব্যবহার করেছেন তিনি—

আয় তাকে মন করবি চুরি
সে আছে কোথায় কেউ জানেনা
অথবা
সে যেন অধরা সুবাস
হাওয়ায় ছড়ানো হাসনুহেনা।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের দু'টি কবিতা নিয়ে দেখানো যায় বাউল প্রসঙ্গের এক ভিন্ন রূপরীতি। সেখানে বাউল তত্ত্বের কোন গূঢ় তত্ত্বানুসন্ধান বা তত্ত্বের প্রয়োগের সঙ্গে কবি হাঁটেননি, বরং বাউল অনুষঙ্গকে কবিতায় প্রয়োগ করেছেন ঠাট্টার ছলে। 'দেহতত্ত্ব' কবিতাটির শুরুতেই কবি বলেন—

কী ঘর বানাইছে দ্যাখো সাহেব কোম্পানি

এক অঙ্গে লক্ষ মুখ শতেক বাখানি
আহা কী ঘর বানাইছে দ্যাখো সাহেব কোম্পানি।

আসলে সুনীল বাউল তত্ত্বের গভীরে কোনদিনই প্রবেশ করতে পারেননি। বাইরে থেকে শুধু পরিহাসের মধ্যে তিনি কবিতায় ঘটিয়েছে ব্যজস্তুতির সমাহার—

ঘরের মধ্যে অগ্নিকুন্ড ঘরেই পুষ্করিণী
তারই মধ্যে উথাল পাথাল ঘরের মানুষ যিনি
আহা কী ঘর বানাইছে দ্যাখো।

বাউল তত্ত্বে দেহই সাধনার আশ্রয়। কবি এই আশ্রয়েই সাধনা ও তার ব্যর্থতা দুই রূপকেই দেখিয়েছেন অগ্নিকুন্ড ও পুষ্করিণীর রূপকে। ফলে সেখানে উথাল পাতাল অবস্থা অন্তরাত্মার, ঘরেই রোশনাইতে "সুনীল ক্ষ্যাপা' কাম আস্বাদনকেই বড় করে দেখলেন, বাকি বাউল ধারণা যে তাঁর কাছে ভন্ড। সমস্ত সাধনপদ্ধতিকে হাসির ছলে উড়িয়ে তাই শেষে—

সুনীল ক্ষ্যাপা কয়রে আমি তাইরে নাইরে নাইরে
আমি তাইরে নাইরে নাইরে।

আবার জানা যায় হাসন রাজার গানের প্রেমে পড়েই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁকে নিয়ে একটি উপন্যাস লেখার পরিকল্পনার কথা বিভিন্ন সময় সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন। 'হাসান রাজার বাড়ি' শিরোনামে একটি কবিতাও তিনি লিখেছেন—

গাঁয়েতে এসেছে এক কেরামতি সাহেব কোম্পানি
কও তার ট্যাঁড়াক্যাড়া মানুষ না পিপীলিকা, যা রেছুটে যা যা রে
যা দ্যাখ গা খেলা হুরীর নাচন আর ভাড়ের কেরদানি
এখানে এমন শুধু মুখোমুখি বসে রবো আমি আর হাসনরাজা।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় হাসন রাজার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করেছেন—"কও তো হাসন রাজ, কি বৃত্তান্ত বানাইলে হে মনোহর বাড়ি?"। হয়তো নিজেই কবিতার ছলে হাসন রাজার মুখ দিয়ে উত্তর বের করে লিখেছেন যে—"বড় আমদে আছি রে ভাই, ছয়টি ঘরেতে ঐ যে ছয় দাসদাসী", কিন্তু কখনোই সুনীলের মনে প্রশ্ন আসেনি হাসান রাজা জমিদার হয়েও তার এত পরিবর্তন হয়েছিল কেন?

জয় গোস্বামীর কিছু কবিতায় বাউল প্রসঙ্গ এসেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'চন্দ্রোদয়' কবিতাটি যেখানে কবি যৌনতার নির্দিষ্ট অনুষঙ্গ এনে নিজেই হয়ে উঠেছেন হাসন রাজা। সাধন-সঙ্গিনীর প্রতি তার প্রশ্ন—

তোমার হাসনকে তুমি উঠিয়েছ বুকে
ওরচির হাসন রাজাকে
বাউল শরীর আর কী এমন ভারী?

বাউল তত্ত্বে যে দেহোত্তীর্ণ প্রেমের অন্বেষণ, তাতো কখনোই দেহকে অস্বীকার করে নয়, তাই দৈহিক মিলনের মধ্যে দিয়ে প্রেম রূপ ঈশ্বরের অনুসন্ধান কবির কাছে "পুনঃ পুনঃ চন্দ্রোদয়গুলি"। ঈশ্বরপ্রাপ্তির আনন্দ যেন এখানে ইন্দ্রিয়াতীত সুখ। সঙ্গিনীকে সেই সুখ পেতে দেখে কবির আত্মনিসঙ্গ সুখ "চারিদিক ঢেকে দেয় রাত জাগা জয়দেব কেঁদুলী"।

কবি জহর সেন মজুমদারের কবিতায় দেহতত্ত্বের অনুসঙ্গ পাই নানাভাবে। কবির মুখ থেকে

জানা যায় কৈশোরকালে এক স্থানীয় মেলায় তিনি বাউলদের সঙ্গে বেশ কিছু সময় কাটাতেন। সমগ্র শৃঙ্খলিত সংসার জগৎ থেকে একদম আলাদা হয়ে যাওয়া বাউল জগৎ কবির মনে এনে দেয় মুক্তির আনন্দ। কবি আকর্ষণ বোধ করে তাঁদের বাউন্ডুলেপনায়। তাঁর ভূমি ও ভূমার মাঝে' কবিতায় বাউলের 'মনের মানুষ' এসেছে 'সখা' সম্বোধনে। বাউল ও বৌদ্ধ সাধনা দু'য়ের প্রভাব পড়লেও মূলত তা একীভূত হয় ক্ষুধাতুর' ও 'মেঘাতুর' প্রেমে। খুঁজে পান অতীন্দ্রিয় সুখ। আবার 'বাউল যন্ত্রণা' কবিতায় দেহতত্ত্বের সহজানন্দের দিকটি তুলে না ধরে বাউলাঙ্গের হাত ধরে এসেছে তীব্র যন্ত্রণা। যেখানে "অন্ধত্ব বড়ো বেশি গ্রাস করে" "অন্ধকূপে মৃত্যু হয় লিঙ্গের', 'মৃত্যু হয় যোনির', যুগ যুগ ধরে সে পরম্পরাধর্মী সাধনা, যন্ত্রণা মাখা সেই সাধনায় শেষ পর্যন্ত "পূর্ণ হয় বাউলের ঝুলি"।

কবি বিজয় সিংহের 'অস্তি' কবিতায় পাই বাউলের উন্মত্ততার অনুষঙ্গ—

তুমিও দেখেছ উন্মত্ত পারা
তুমি ভাব ডাকে দেয় অনন্ত দূর
বস্তুত সাবধান করেছে কুকুর
হরি রহ মানস সুরধনীপুর।

অসামান্য চিত্রকল্পে কবি ডুবিয়ে রাখেন পাঠক সমাজকে। সব শেষে বলতে চাই শূন্য পরবর্তী যুগের কথা। সেখানেও বাউল ভাবনার প্রভাব। কবি বেবি সাউ 'গান লেখে লালন দুহিতা' কাব্যগ্রন্থটি কবিতা গুলিতে সৌন্দর্য চেতনার সঙ্গে বাউল ভাব মিলে মিশে একাকার। বাউল পার্থিব জগতের দুঃখ কষ্টের মধ্যেও নির্দিষ্ট লক্ষ্যে তার সাধনাকে অটুট রাখে মৌনতায় ডুবে। আর এযুগের লালন দুহিতাও বলেন—

এই জন্ম, এই শোক পেতেছে গভীর নীরবতা
মায়ামৃত্যু মায়াজন্ম গান লেখে লালনদুহিতা।

উৎসের সন্ধানে

১. ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী : 'বাংলার বাউল'
২. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : 'বাংলার বাউল ও বাউল গান'
৩. সুধীর চক্রবর্তী (সম্পা) : 'বাংলার বাউল ফকির'
৪. বুদ্ধদেব বসু : 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'
৫. সুভাষ মুখোপাধ্যায় : 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'
৬. অমিয় চক্রবর্তী : 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'
৭. জহর সেন মজুমদার : 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'
৮. বেবী সাউ : 'গান লেখে লাল দুহিতা'
৯. অলোক রঞ্জন দাসগুপ্ত : 'কবিতা সমগ্র'
১০. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় : 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'
১১. আবু সয়ীদ আইয়ুব : 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ'
১২. বিজয় সিংহ : 'অমৃত মায়াবী ধান্য'

বাউল গান ও ভবপ্রীতানন্দের ঝুমুর

বরুণ মণ্ডল

বাংলা লোকসাহিত্যের ধারায় বাউল গান এবং ঝুমুর গান দুটি উল্লেখযোগ্য শাখা হিসেবে পরিগণিত। সমগ্র বাংলাদেশ জুড়েই বাউলগানের ধারাটি বিস্তারলাভ করে থাকলেও ঝুমুর গান মূলত পশ্চিমবঙ্গের ঝাড়খণ্ড ও বিহার সংলগ্ন পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এবং বীরভূম জেলার কিছু অংশে এই গানের বিস্তার লক্ষ করা যায়। তবে বহুদিন ধরেই পুরুলিয়া জেলা ঝুমুর চর্চা ও সাধনার প্রধান কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠেছে। এই ধারায় অনেক খ্যাতনামা কবির আবির্ভাব ঘটলেও যিনি 'ঝুমুর সম্রাট' হিসেবে পরিচিত তিনি হলেন পঞ্চকোটরাজ সভাকবি ভবপ্রীতানন্দ ওঝা। ভবপ্রীতানন্দ ওঝার আত্মপরিচয় থেকে জানা যায় তিনি মিথিলার বিল্বপঞ্চক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম-ত্রিপুরানন্দ ওঝা। কবির পূর্বপুরুষগণ যথেষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন এবং বৈদ্যনাথ ধামের পূজারী ছিলেন। সেই ভক্তিপ্রাণতা ভবপ্রীতানন্দর হৃদয়ে 'ভক্তিরসধারা', হয়ে প্রবাহিত হয়েছিল, যার প্রকাশ ঘটেছিল তাঁর রচিত ঝুমুর গানগুলিতে। বাউলসাধকদের চিন্তাচেতনার সঙ্গে ভবপ্রীতানন্দ রচিত ঝুমুর গানগুলির অনেক ক্ষেত্রেই সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। বাউলগানের সঙ্গে ভবপ্রীতানন্দ রচিত ঝুমুর গানগুলির মূলগত সাদৃশ্য আলোচনা করাই আমাদের এই নিবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

বাউল গান হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বাউল সাধকদের দ্বারা রচিত হয়েছে এবং এখনও এই ধারা অব্যাহত আছে। এর বিষয়বস্তুও নানান বৈচিত্র্যে পূর্ণ। তবে রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা এর প্রধান অবলম্বন। বহু বাউলগানে রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলাকে সরাসরি তুলে ধরা হলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ব্যঞ্জনার মাধ্যমেই বাউল সাধকেরা এই কাজটি করেছেন। এই সাংকেতিকতাকে বাউলগানের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য বলে মনে করা হয়। অন্যদিকে ঝুমুর গানে নানান বিষয় স্থান পেলেও রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা এর প্রধান অবলম্বন। ভবপ্রীতানন্দ ওঝা তাঁর 'বৃহৎ ঝুমুর রসমঞ্জরী'র ভূমিকায় রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলাই ঝুমুরগানের প্রেরণাস্থল বলে জানিয়েছেন। এমনকি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ঝুমুরগানের মাধ্যমেই শ্রীরাধার প্রেমকথা প্রকাশ করতেন বলেও উল্লেখ করেছেন—

> বঙ্গের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা সাঁওতাল পরগণায় ঝুমুর সমধিক প্রচলিত। অত্রস্থ অধিবাসীদিগের ধারণা যে নন্দ-নন্দন-শ্রীমধুসূদন গোকুল নগরে বাসকালীন শ্রীমতীর প্রেমে বিভোর হইয়া, নীল সলিলা উর্ম্মিমালামণ্ডিতা যমুনার চারু শ্যামলতটে বংশীধ্বনি দ্বারা শ্রীরাধার প্রণয় গীতিকা ঝুমুরছন্দে প্রকাশ করিতেন এবং এই ঝুমুর গান করিয়া মণ্ডলাকারে রাসে নৃত্য করিতেন।[১]

এই লোকবিশ্বাস তাঁর রচিত ঝুমুরগানে প্রতিফলিত হয়েছিল। তাঁর গানে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা

অনেক স্থলেই ব্যঞ্জনার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। আর বিভিন্ন বাউলগানে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা ব্যঞ্জনার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। তেমনই একটি বহুল প্রচারিত বাউল গান—

সখি যমুনায় জল আনতে যাওয়া
হল বিষম দায় গো।
সে যে কদমতলায় কালো বাঘটা
দাদুরি বেড়ায় গো॥
বাঘটা কখনো গোঠে কখনো মাঠে
কখনো বংশীবটে রাই গো॥
আবার শ্রীমতীর ঐ নয়নশরে
বাঘ জর জর হয় গো।
যোগীন্দ্রকুমারে কয় যমুনার জল আনতে
তাই সাবধানে চাস গো।
আবার বাঘা ভেল্‌কি লাগিয়ে দেবে
বাঘ যদি বাগ পায় গো।
একি বাঘের গন্ধ মকরন্ধ মন্দা মন্দা
বয় গো॥
বাঘটা কখনো গোঠে কখনো মাঠে কখনো
বংশীবটে রাই গো।
আবার কুলবতী নারী দেখতে পেলে
চকমকায়ে চায় গো॥[২]

গানটি থেকে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় সখির প্রতি রাধার উক্তি। কৃষ্ণের কারণে যমুনায় জল আনতে যাওয়া অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে। কারণ কৃষ্ণ বৃন্দাবনের বিভিন্ন স্থানে যথা—গোঠে, মাঠে, বংশীবটে এমনকি যমুনার ঘাটে কদমতলাতেও অবস্থান করেন। এখানে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে 'কালো বাঘ' বলতে প্রেমিক শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণকেই বোঝানো হয়েছে। আবার 'শ্রীমতী' বলতে শ্রীরাধাকে বোঝানো হয়েছে। যমুনায় জল আনতে গিয়ে রাধা কৃষ্ণের দিকে প্রেমপূর্ণ নয়নে তাকালে রাধাপ্রেমে বিভোর কৃষ্ণ রাধার দৃষ্টিতে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। সাধক কবি যোগীন্দ্রকুমার তাই রাধাকে যমুনায় আনতে গিয়ে কৃষ্ণের দিকে সতর্কভাবে তাকাতে বলেছেন। এই 'বাঘ' অর্থাৎ কৃষ্ণ যদি রাধাকে 'বাগে' পান তাহলে 'বাঘা ভেল্‌কি' লাগিয়ে রাধার সঙ্গে প্রেমখেলা শুরু করে দিতে পারেন। তাত্ত্বিক দিক থেকে এর একটি অন্য অর্থও করা যেতে পারে। বাঘ যেমনভাবে একস্থানে স্থির থাকে না, সহজে তাকে ধরাও যায় না তেমনি ভগবান কৃষ্ণও ভক্তকে সহজে ধরা দেন না, ভক্তহৃদয় কৃষ্ণ বিচ্ছেদের আশঙ্কায় সদাই ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কৃষ্ণ চরণাশ্রিত ভক্ত হৃদয়ে কৃষ্ণলীলা সর্বদাই অনুষ্ঠিত হতে থাকে। রাধা আয়ান ঘোষের স্ত্রী তাই কুলকামিনী। যমুনায় জল আনতে গেলে তাঁকে দেখে কৃষ্ণ চকিতে চেয়ে ওঠেন। বৈষ্ণব ভাবাদর্শ প্রভাবিত এই বাউলগানটির সঙ্গে ভবপ্রীতানন্দ ওঝা রচিত একটি ঝুমুর গানের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়—

যাইতে যমুনা জলে শ্রীরাধা সখীরে বলে

তরুতলে কালীয়া দাঁড়ায় গো
একাকী সে যাব যমুনায়?
দেখিলে যুবতী-নারী শ্যাম বাজায় বাঁশরী
আঁখি ঠারি রমণী ভুলায় গো।।
সেই ভ্রমর কালীয়া নারীফুলে জড়াইয়া
অধর চুমিয়া মধু খায় গো।।
কহে রাধা প্রেমভীতা সঙ্গেতে চল ললিতা!
ভবপ্রীতা মাধবে ধেয়ায় গো।।[৩]

এখানেও শ্রীরাধার যমুনায় জল আনতে যাওয়ার প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। রাধা সখীর কাছে যমুনার ঘাটে গাছতলায় কৃষ্ণের দাঁড়িয়ে থাকার কথা বলেছেন। এখানে 'কালীয়া' বলে কৃষ্ণকে সম্বোধন করা হয়েছে। 'যুবতী নারী' দেখতে পেলে কৃষ্ণ বাঁশি বাজিয়ে চোখের ইশারায় নারীদেরকে মোহিত করেন। আবার ভ্রমররূপী কালিয়া বঁধু ফুলরূপী নারীকে জড়িয়ে ধরে তার অধর চুম্বন করে মধু পান করে। কৃষ্ণপ্রেমে ভয় পেয়ে রাধিকা সখীকে সঙ্গে যেতে বলেছেন। আর সাধক কবি ভবপ্রীতা মাধবকে ধেয়ান করেন।

এই দুটি গানের মধ্যে বিষয়গত সাদৃশ্য রয়েছে। এমনকি অনেক স্থলেই বর্ণনাভঙ্গী প্রায় একই রকম। বাউলগানে 'কদমতলায় কালো বাঘটা' ঝুমুরগানে 'তরুতলে কালীয়া' রূপে প্রকাশিত হয়েছে। বাউলগানের 'বাঘ' 'কুলবতী নারী দেখতে পেলে চকমকায়ে চায়' সেখানে ঝুমুরগানে 'কালীয়া, 'আঁখি ঠারি রমণী ভুলায়'। প্রকাশভঙ্গির এই সাদৃশ্যের পাশাপাশি আঙ্গিকগত দিক থেকেও সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। দুটি গানই রচিত হয়েছে রাধিকার জবানীতে। উপমা, রূপক প্রভৃতি অলঙ্কার ব্যবহারের ক্ষেত্রেও সাদৃশ্য আছে। কৃষ্ণকে বাঘ, ভ্রমর প্রভৃতির সঙ্গে তুলনা তারই নিদর্শন।

তাহলে আমরা বলতে পারি বাউল সাধক এবং 'ঝুমুর সম্রাট' ভবপ্রীতানন্দ একই দৃষ্টিভঙ্গিতে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে 'মর্মচক্ষে' প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং তা তাঁদের লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। এর থেকে বলা যায়, রাধাকৃষ্ণের প্রেমের স্বরূপ প্রকাশে বাউলসাধক এবং ঝুমুর কবির চিন্তাচেতনার কোনো পার্থক্য নেই।

বাউল সাধনার মূল অবলম্বন গুরু। গুরু নির্ধারিত পথে এগিয়েই তাঁরা সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে চান। এখানে গুরুকেই সমস্ত কিছুর 'মূল' বলে মনে করা হয়। বাউল সাধকদের মধ্যে গুরু-শিষ্যে কোনো কিছুই গোপন করা হয় না। এ ব্যাপারে অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে। বাউলদের গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক বিষয়ে বলতে গিয়ে তিনি বলেন—

> বাউলদের গুরুভক্তি সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে যাহা বুঝিয়াছি, তাহাতে মনে হয়, এই সম্প্রদায়ের মত গুরুবাদী সম্প্রদায় অন্য আর একটি আছে কিনা সন্দেহ, অন্তত বাংলায় যে নাই ইহা ঠিক। অনেক সময় ইহাদের গুরুভক্তি বা গুরুনিষ্ঠা বিন্দুমাত্র বিচার বিবর্জিত, অন্ধ, হাস্যকর ও চরম মূর্খতার পরিচায়ক বলিয়া মনে হইয়াছে, কিন্তু ইহাদের গুরু-শিষ্যের মধ্যে এমন একটা দৃঢ় বন্ধন দেখিয়াছি, যাহা অন্যত্র সুলভ নয়।[৪]

সমালোচকের এই বক্তব্য প্রমাণ করে বাউলসাধনায় গুরু সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে। গুরুর চরণে সমস্ত

কিছু সমর্পণ করে সাধক 'ভবনদী' পার হতে চান। 'গুরুধন'কে উপলব্ধি করে মানবাত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করা বাউল সাধনার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।[৫] বাউলদের গানে গুরুভাবনা বিভিন্নভাবে প্রকাশিত।

অন্যদিকে ঝুমুরগানে 'গুরুবাদ' তেমনভাবে লক্ষ করা যায় না। এখানে রসিক এবং নাচনীর সম্পর্কই ঝুমুরের চালিকা শক্তি বলে মনে করা হলেও ভবপ্রীতানন্দ ওঝার ঝুমুরগানে গুরুবাদের প্রভাব ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। এখানে বলে রাখা ভালো ভবপ্রীতানন্দ নিজে ছিলেন হরিভক্তিপরায়ণ এবং বৈদ্যনাথ ধামের মোহন্ত—তাই তিনি গুরু কৃপাকে জীবনের পাথেয় করেছিলেন বলেই আমাদের মনে হয়। কাশিপুর রাজবাড়িতে অবস্থানকালে ভবপ্রীতানন্দ ঝুমুরগান লিখতেন এবং নাচনী সিন্ধুবালা দেবী ভক্তিভরে সেই গান গাইতেন। ভবপ্রীতানন্দ "সিন্ধুবালাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। সম্বোধন করতেন 'বেটা' বলে।"[৬] এখানে সাধক কবি ভবপ্রীতানন্দ এবং সিন্ধুবালাদেবীর মধ্যে গুরু-শিষ্যার সম্পর্ক রক্ষিত হয়েছিল। ভবপ্রীতানন্দের বহু গানে গুরুর চরণধূলি না পাওয়ার বেদনা ধ্বনিত হয়েছে। তেমনি একটি ঝুমুর গান—

হরি ভবসিন্ধু ভয়ঙ্কর মোর পুণ্য নৌকা জীর্ণতর
ডুবে ডুবে এবার বুঝি আর বাঁচে না।
(ঐ যে) ভয়ঙ্কর ঢেউ উঠেছে এবার বুঝি প্রাণ বাঁচে না।
তরাও ভবসিন্ধু পহে দীনবন্ধু!
দেখ যেন পাথারে ভাসায়ো না॥
বহে পাপ প্রলয়-বাত ত্রাহি ত্রাহি বিশ্বতাত
ছয় গ্রহে করে গ্রাসের বাসনা।
হরি! নিষ্ঠুর নির্ম্মম তারা করুণতা জানে না॥
বাল্যেতে অবোধমতি না ভজিলাম জগৎপতি
যৌবনে যুবতী-ধনের কামনা।
(প্রভু!) কুরসে মজিল মন হৈল না হরি সাধনা॥
বার্দ্ধক্যে অশক্ত তনু হৃদে দীপ্ত ক্রোধভানু
গুরু-পদরেণু মাখা হৈল না
(হরি) ভাঙ্গিল বিষয়ের মোহ হৈল এখন চেতন॥
তুমি দীনবন্ধু হরি! অধমে রাখ উদ্ধারি।
ভবপ্রীতা সাঁতার দিতে জানে না।
(দেখো) ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু নামে কলঙ্ক রটায়ো না॥[৭]

গানটিতে দেখা যাচ্ছে জীবনের শেষপ্রান্তে এসে কবি বুঝতে পেরেছেন ঝড় তুফানের মধ্যে এই ভবনদী পার হবার মতো উপযুক্ত 'পুণ্যতরী' তিনি তৈরি করতে পারেননি এইজন্যেই তিনি বারবার 'হরি' অর্থাৎ ভগবানের কাছে আকুল প্রার্থনা জানিয়েছেন পরম দয়াময় যাতে তাঁকে অকূল দরিয়ায় না ভাসিয়ে দেন। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য—এই ছয় রিপুকে কবি ছয় গ্রহ বলে বর্ণনা করে বোঝাতে চেয়েছেন। এদের নির্মম, নিষ্ঠুর তাড়নায় অনবরত পাপের প্রলয় বাতাস সারা বিশ্বকে অস্থির করে তুলেছে। একথা যেমন কবি বলেছেন তেমনি

বাল্যকাল থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত 'জগৎপতি'-র সাধনা করতে না পারার বেদনা ধ্বনিত হয়েছে। বাল্যকালে বোধশক্তির অভাবে, যৌবনে রঙ্গারসের জন্য যুবতী ধনের কামনায় দিন অতিবাহিত করায় এবং বার্ধক্যে দেহের শক্তি হারানোর কারণে সর্বদা ক্রোধান্বিত হওয়ায় গুরু পদ স্মরণ নিতে পারেননি। জীবনের শেষ পর্যায়ে কবি বিষয়-বাসনা ত্যাগ করে 'দীনবন্ধু হরি'কেই এই 'ভবসিন্ধু' উদ্ধারের কাতর অনুনয় জানিয়েছেন। এখানে কবি ভবপ্রীতানন্দ ওঝা সমস্ত বিষয়-বাসনা ত্যাগ করে গুরুর চরণে নিজেকে সমর্পণ করতে চেয়েছেন। তিনি বুঝতে পেরেছেন গুরু চরণ বন্দনা না করার জন্যই তাঁকে এরকম পরিস্থিতিতে পড়তে হয়েছে। এখানে একান্ত ভাবেই গুরুপদে আস্থাশীল কবিকে খুঁজে পাওয়া যায়।

ভবপ্রীতানন্দ ওঝা রচিত ঝুমুরগানের মতোই বাউলগানেও গুরুবাদী চেতনার পরিচয় ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। লালন ফকিরের একটি গানে তারই প্রকাশ—

গুরু বিনে কি ধন আছে।
কি ধন খুঁজিস খ্যাপা অন্য কারুর কাছে॥
বিষয় ধনের ভরসা নাই।
ধন বলতে ধন গুরু-গোঁসাই,
সে ধনের দিয়ে দোহাই
ভব-তুফান যাবে বেঁচে।
পুত্র পরিবার বড় ধন
পেয়েছ এই ভবের ভূষণ,
মায়ার ভুলে পড়ে অবোধ মন
গুরুধনকে ভাবলি মিছে॥
কোন্ ধনের কি গুণপনা,
অন্তিমকালে যাবে জানা,
গুরুধন এখনও চিনলে না,
নিদানে পস্তাবি পাছে॥
গুরুধন অমূল্য ধন রে
বুঝালে বুঝিস নারে,
সিরাজ সাঁই কয়, লালন তোরে
নিতান্ত পেঁচোয় পেয়েছে॥[৮]

এখানেও দেখা যাচ্ছে গুরুকেই সর্বশ্রেষ্ঠ ধন হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। সংসারের মায়াবদ্ধ মানুষ বিষয় সম্পত্তিকে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন মনে করলেও বাউল সাধকেরা গুরুকেই 'শ্রেষ্ঠ ধন' বলে মনে করেন। লালন ফকিরের এই গানেও দেখা যাচ্ছে গুরুধনের দোহাই দিয়ে ঝড়-ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ ভবসংসার থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব। পুত্র পরিজন, বিষয় সম্পত্তির কী মূল্য তা জীবনের শেষ সময়ে টের পাওয়া যাবে বলে কবি মনে করেছেন। তাই তিনি সতর্ক হওয়ার পরামর্শ দিয়ে বারেবারেই গুরুধনকে অমূল্যধন মনে করার পরামর্শ দেন এবং গানটির শেষ

অংশে গুরু সিরাজ সাঁই বলেন, লালনকে 'পেঁচোয় পেয়েছে' বলেই বোঝালে বুঝতে চাইছে না। এভাবেই গানটির মধ্যে বাউল সাধকের গুরুবাদী ভাবনা ফুটে উঠেছে।

দুটি গানের মধ্যেই গুরুবাদী ভাবনার প্রাবল্য ধরা পড়েছে। বাউল সাধনায় 'গুরুবাদ' আসলে 'পুরুষতত্ত্ব' এবং 'প্রকৃতিতত্ত্ব'র মিলিত রূপের সাধনা "কৃষ্ণ পুরুষতত্ত্ব, রাধা প্রকৃতিতত্ত্ব এবং উভয়ের প্রেম মিলনই গুরুতত্ত্ব"।[৯] ভবপ্রীতানন্দ ওঝা রচিত গানটিতে সংসারের সমস্ত কিছুকে অস্বীকার করে গুরুর চরণেই নিজেকে সমর্পণ করে দিয়েছেন এবং জীবনের শেষ সময়ে শ্রীহরি অর্থাৎ গুরুর স্মরণ নিয়েই ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ ভবনদী পার হতে চান। এখানে একটা কথা বলা ভালো বাউল সাধনার গুরুবাদের মূল বক্তব্য এখানে রক্ষিত হয়েছে। অন্যদিকে লালন সাঁই রচিত গানটিতেও গুরুকেই সমস্ত কিছুর 'শ্রেষ্ঠ ধন' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এখানেও 'শেষের দিনে' গুরু কৃপাতেই এই সংসার সমুদ্র পার হতে পারা যাবে বলে আশা করেছেন। লোকসংগীতের দুটি শাখাতেই গুরুর চরণে নিজেকে সমর্পণ করার এই ঐকান্তিক প্রয়াসই এদের অন্তরধর্মের সাযুজ্যকে চিনিয়ে দেয় এবং ঝুমুরগান ও বাউল সংগীত উভয়ই যে গুরুবাদী চেতনায় সমৃদ্ধ তা প্রমাণ করে দেয়।

গুরুবাদী ভাবনায় বিশ্বাসী বাউল সাধকদের গানগুলির অন্তরঙ্গ বিশ্লেষণে জগৎ সংসারের শূন্যতার বিষয়টি অত্যন্ত জোরালো হয়ে ওঠে। এর সঙ্গে চর্যাগীতিকারদের 'শূন্যবাদের' একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। বাউলগানের মধ্যে বারেবারেই মানুষের শেষের দিনের কথা বলা হয়েছে। জীবনের সেই শেষ দিনে পুত্র-মিত্র কেউ সঙ্গে যাবে না, 'খালি হাতে একা পথে' এই মোহময় সংসার থেকে বিদায় নিতে হবে। সাধের ঘরবাড়ি, সোনার খাট-পালঙ্ক কোনো কিছুই সঙ্গে দেবে না বা সঙ্গে নিয়ে যাওয়া সম্ভবও হবে না। সমস্ত কর্মফলই পড়ে রবে এবং 'শেষের দিনের দিনে' সেই পরমপুরুষের কাছে তার হিসেব দিতে হবে। তাই বাউল সাধকের কলমে সংসারে সেই অনিত্যতার ছবি ধরা পড়েছে। আবার 'মোহন্ত কবি' 'ঝুমুর সম্রাট' ভবপ্রীতানন্দ ওঝার 'বৈরাগ্যাত্মক' ঝুমুরগানগুলিতেও এই একই ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। তিনিও তাঁর এই পর্বের গানগুলিতে জগৎ সংসারকে প্রকারান্তরে অনিত্যই বলেছেন। 'শেষের দিনের' কথা স্মরণ করে দিয়ে ভক্ত কবিও বলেছেন 'দ্বারাসুত' 'ধনজন' কিছুই পথের সাথী হবে না। এই ধরনের একটি গানে এই ভাবনার চূড়ান্ত প্রকাশ লক্ষ করা যায়—

হরি হরি বলরে মন। ভুলো না ধনে॥
দ্বারাসুত ধনজন-নিশার স্বপন।
কে যাবে তোর সঙ্গে যে দিন মুদিবি নয়ন॥
কোথা রবে সোনার মালা হীরার চেন ঘড়ি।
কোথা রবে ঘর ততলা শাল গাড়ী জুড়ি॥
শ্মশানে পুড়ে যে দিন হয়ে ভস্মজাল।
সেদিন কি আর চেনা যাবে রাজা কি কাঙ্গাল॥
সময় আছে বুঝে চল ভবপ্রীতা বলে।
মন ভ্রমরায় বসাও হরিচরণ কমলে॥[১০]

এখানে কবি অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষাতেই স্ত্রী-পুত্র সমস্ত কিছুকেই রাতের স্বপ্নের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কারণ রাত্রিবেলায় ঘুমঘোরে স্বপ্নে আনন্দ কিংবা দুঃখে হৃদয় বিগলিত হলেও যেমন ঘুম ভেঙে যাবার পর তার আর কোনো অস্তিত্ব থাকে না তেমনি যেদিন এই নশ্বর দেহের মৃত্যু ঘটবে সেদিন স্ত্রী-পুত্রদের নিশার স্বপ্নের মতোই মনে হবে। আর 'সোনার মালা', 'হীরার চেন ঘড়ি', 'তিনতলা বাড়ি জুড়ি গাড়ি' কোনো কিছুরই অস্তিত্ব থাকবে না। শ্মশানে পুড়ে ছাই হয়ে আত্মা পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে যাবার পর পার্থিব সংসারের রাজা আর কাঙ্গালের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকবে না কবির এই ভাবনা জগৎ সংসারের শূন্যতাকেই প্রকটিত করেছে। লালন ফকিরের বহু গানে এই ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। তেমনই একটি গান—

দেখ না রে মন ঝকমারি এই দুনিয়াদারি।
আচ্ছা কপনি-ধ্বজা উড়ালে করে ফকিরি॥
যা করো তা করো রে মন,
রেখো পিছের কথা আগে স্মরণ
বরাবরই।
(ও তোর) পিছে পিছে ঘুরছে শমন কখন দেবে হাতে দড়ি॥
দরদের ভাই বন্ধুজনা
সঙ্গে তারা কেউ যাবে না,
বড় সাধের বালাখানা
কোথায় রবে পড়ে তোমারি॥
সিরাজসাঁই কয়, লালন ভেড়ো,
তুই করিসনে কারও এনতাজারি॥[১১]

এই গানের মাধ্যমে লালন ফকির ভবিষ্যতের কথা মনে রেখে কর্মপথে চলার কথা বলেছেন। এই সাধক সাঁই অর্ন্তদৃষ্টিতে অনুভব করেছেন মৃত্যু যে কোনো সময় তার হিমশীতল স্পর্শে জীবকে ইহ সংসারের মায়া ত্যাগ করাতে পারে। তখন যাদের আপন আপন মনে করা হতো তারা কিন্তু কেউ সঙ্গে যাবে না আর সাধের আসবাবপত্র, ভোগের সামগ্রীগুলিও পড়েই থাকবে। তাহলে একটি নিভৃতে চিন্তা করলে সহজেই উপলব্ধ হবে লালন ফকিরও জগৎ সংসারকে শূন্য বলেই চিহ্নিত করেছেন। আবার উপরোক্ত ঝুমুরগানটির সঙ্গে পাগল বিজয় সরকার রচিত 'সুন্দর এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে' গানটির মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ভবপ্রীতানন্দ ওঝা রচিত আলোচ্য গানটির সঙ্গে বাউল সম্রাট পূর্ণদাস বাউলের কণ্ঠে বহুল প্রচারিত একটি বাউলগান 'শেষের দিনে সে জন বিনে' গানটির মূল বক্তব্যেরও সাদৃশ্য রয়েছে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই বোঝা গেল বাউল গানের সঙ্গে ভবপ্রীতানন্দ ওঝা রচিত ঝুমুরগানের নানাদিক থেকেই মিল খুঁজে পাওয়া যায়। রাধাকৃষ্ণের নিগূঢ় প্রেমলীলা বাউল এবং ঝুমুর উভয় প্রকার সংগীতেই পরিবেশিত হয়েছে। তেমনি বাউল সাধকের চেতনায় সমস্ত কিছুর মূলে রয়েছে গুরুর কৃপা। গুরু পদরেণু সম্বল করে ভবনদী পার হতে চাওয়া বাউলদের সঙ্গে ঝুমুরগানে সাধারণত গুরুতত্ত্বের মিল না থাকলেও ভবপ্রীতানন্দ রচিত ঝুমুরগানে এই গুরুবাদের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। লালন ফকিরের গানে দেখি গুরুকৃপা পেলে সে মায়ার

বাঁধন কাটিয়ে ভবসমুদ্র অনায়াসে পার হতে পারে—

মায়ার গেরাপি কাটো
ত্বরায় প্রেমতরীতে ওঠো,
সে যায় সমুদ্দুর পার
হয় গুরুকৃপা যার,[১২]

আবার ভবনদী পার হবার জন্য ভবপ্রীতাও ব্যাকুল কণ্ঠে গুরুর কৃপা প্রার্থনা করেন—

বার্দ্ধক্যে অশক্ত তনু হৃদে দীপ্ত ক্রোধভানু
গুরু পদরেণু মাখা হৈল না।
(হরি) ভাঙ্গিল বিষয়ের মোহ হৈল এখন চেতন॥
তুমি দীনবন্ধু হরি! অধমে রাখ উদ্ধারি
ভবপ্রীতা সাঁতার দিতে জানে না।[১৩]

এভাবেই বাউলগানের গুরু ভাবনার সঙ্গে ঝুমুরের গুরুতত্ত্ব মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় ভক্ত, সাধক কবিদের কলমে। এর পাশাপাশি ঝুমুরগান ও বাউলগানে জগৎ সংসারের মূল সত্য এই পৃথিবীতে আসার সময় যেমন কেউ সঙ্গে আসেনি তেমনি পৃথিবী ছেড়ে যাবার সময়ও কেউ সঙ্গে যাবে না। স্ত্রী-পুত্র সকলেই 'সংসার রঙ্গামঞ্চের সাথী মাত্র'—এই ভাবনার চরমতম প্রকাশ ঘটেছে। জগৎ সংসারে ভোগবাসনার মোহে আবদ্ধ হয়ে মানুষ কত না কুকর্ম করে থাকে-কারণ রূপ-রস-গন্ধপূর্ণ এই পৃথিবী ছেড়ে যাবার কথা কারোরই মনে থাকে না। বাউল সাধকেরা চোখে আঙুল দিয়ে সে কথা স্মরণ করিয়ে দেন—

(ও তোর) পিছে পিছে ঘুরছে শমন কখন দেবে হাতে দড়ি॥
দরদের ভাই বন্ধুজনা
সঙ্গে তারা কেউ যাবে না[১৪]

অন্যদিকে ভবপ্রীতানন্দ ওঝাও তাঁর ঝুমুরগানে এই ভাবনা তুলে ধরেছেন—

অন্তে পুত্র পরিবার সকলে ত্যজিবে।
ভবসিন্ধুর ঢেউ দেখে কেউ সঙ্গে কি যাইবে?[১৫]

অর্থাৎ উভয়ই সংসারের অনিত্যতা তাঁদের গানে তুলে ধরেছেন। বারেবারে কর্মফলের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বাউল সাধক ও ভবপ্রীতানন্দ যেভাবে লোকশিক্ষার দ্বার উন্মোচন করেছেন—তা তাঁদের সমাজ-মনস্কতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত। এখানেই বাউলগান ও ভবপ্রীতানন্দের ঝুমুরগানের ঐকান্তিক মিলনের সার্থকতা।

উৎসের সন্ধানে

১. শ্রী ভবপ্রীতানন্দ ওঝা : ঝুমুর নং-১৪৫, 'বৃহৎ ঝুমুর-রসমঞ্জরী', চতুর্থ সংস্করণ, ১৩৪০ বঙ্গাব্দ, ভূমিকা।
২. Purna Das bauler gaan youtube.in 20.05.2018, 2 p.m.
৩. শ্রী ভবপ্রীতানন্দ ওঝা : ঝুমুর নং-১৪৫, 'বৃহৎ ঝুমুর রসমঞ্জরী', পৃ. ১৪৫

৪. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : 'বাউলধর্মের উপাদান', 'বাংলার বাউল ও বাউল গান', তৃতীয় সংস্করণ, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা, ১৪০৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩০৪
৫. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : 'বাউলধর্মের উপাদান, বাংলার বাউল ও বাউল গান', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১২
৬. ড. ক্ষীরোদচন্দ্র মাহাতো : 'নাচনী শিল্পী সিন্ধুবালা', দি পুরুলিয়া সোসাইটি অফ অ্যানথ্রোপলজিক্যাল রিসার্চ, পুরুলিয়া, ২০০৪, পৃ. ১৫
৭. শ্রী ভবপ্রীতানন্দ ওঝা : ঝুমুর নং-১৯৫, 'বৃহৎ ঝুমুর-রসমঞ্জরী', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬
৮. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : ১৮৩ নং গান, 'বাউল ধর্মের উপাদান, বাংলার বাউল ও বাউল গান', প্রাগুক্ত, কলকাতা, ১৪০৮, বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬৫৬
৯. তদেব, পৃ. ৩১২
১০. শ্রী ভবপ্রীতানন্দ ওঝা : ঝুমুর নং-২০৫ 'বৃহৎ ঝুমুর-রসমঞ্জরী', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭
১১. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : ৩৩ নং গান, 'বাউল ধর্মের উপাদান বাংলার বাউল ও বাউল গান', প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৬
১২. তদেব, পৃ. ৬৫৬
১৩. শ্রী ভবপ্রীতানন্দ ওঝা : ঝুমুর নং-১৯৫, 'বৃহৎ ঝুমুর-রসমঞ্জরী', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬
১৪. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : ৩৩ নং গান, 'বাংলার বাউল ও বাউল গান', পৃ. ৫৬৬
১৫. শ্রী ভবপ্রীতানন্দ ওঝা : ঝুমুর নং-১৯১, 'বৃহৎ ঝুমুর-রসমঞ্জরী', পৃ. ১৮১

তথ্যের সন্ধানে

১. শ্রী ভবপ্রীতানন্দ ওঝা : 'বৃহৎ ঝুমুর রসমঞ্জরী', চতুর্থ সংস্করণ, ১৩৪০ বঙ্গাব্দ।
২. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : 'বাংলার বাউল ও বাউল গান', তৃতীয় সংস্করণ, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা, ১৪০৮, বঙ্গাব্দ।
৩. ড. ক্ষীরোদচন্দ্র মাহাতো : 'নাচনী শিল্পী সিন্ধুবালা', দি পুরুলিয়া সোসাইটি অফ অ্যানথ্রোপলজিক্যাল রিসার্চ, পুরুলিয়া, ২০০৪।
৪. ড. ক্ষীরোদচন্দ্র মাহাতো : 'মানভূম সংস্কৃতি', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১৬

সহজিয়া শব্দ গানের ফকির লালন সাঁই

দেবব্রত মণ্ডল

তোমাদের ধর্মের বিশেষত্বটি কী, আমাকে বলতে পার?
'বলা বড় কঠিন, ঠিক বলা যায় না।'

ফকির কথাটা শেষ করতেই রবিঠাকুর অন্য কী একটা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলেন। তার ফাঁকে ফকিরের এক সহচর বলল—

বলা যায় বৈকী। কথাটা সহজ। আমরা বলি এই যে, গুরুর উপদেশ গোড়ায় আপনাকে জানতে হবে। যখন আপনাকে জানি, তখন সেই আপনার মধ্যে তাঁকে পাওয়া যায়।

কবি জিজ্ঞেস করলেন— 'তোমাদের এই ধর্মের কথা পৃথিবীর লোককে শোনাও না কেন?' ফকির সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। কবির কাছে এসে বললেন— 'যার পিপাসা হবে, সে গঙ্গার কাছে আপনি আসবে।'

বাংলাদেশের একটি ছোটো নদীর ধারে এক সামান্য কুটিরের বাসিন্দা এই দুই ফকিরের মধ্যে লালন ছিলেন কি না তার উল্লেখ করেননি রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'আত্মবোধ' প্রবন্ধে। লালনের সঙ্গে কবির সাক্ষাৎ হয়েছিল কিনা সে নিয়েও তর্কের শেষ নেই। রবীন্দ্রনাথ জমিদারির দায়িত্ব নিয়ে যখন শিলাইদহে গেলেন, সেটা লালনের মৃত্যুর পরের বছর, ১৮৯১। তবে লালনের প্রিয় অনুচর গগন হরকরা, সর্বক্ষেপি, গোঁসাই গোপালের সঙ্গে কবির নিত্য লালনের গান ও দর্শন নিয়ে কথা হতো। এমনকি এস্টেটের এক কর্মচারীকে দিয়ে কবি লালনের গানের খাতা আনিয়ে নকল করিয়ে নেন। এর মধ্যে কিছু গানের শব্দ সংশোধন করে শুদ্ধ পাঠ লিখে লালনের কুড়িটি গান তৎকালীন জনপ্রিয় পত্রিকা 'প্রবাসী'তে প্রকাশ করেন। সেই সব গানের নিবিড় পাঠে কবি ভেসে যান ফকিরের ভাব নদীর গহনে।

যাই হোক লালন শাহ ফকিরকে নিয়ে অনুসন্ধানের শেষ নেই। বাউল সাধক কবি লালন ফকিরকে লালন শাহ ফকির বা লালন শাহও বলা হয়ে থাকে। লালনের বহু গানে এই ভণিতার ব্যবহার আছে। এই ফকির কবির জন্ম হয়েছিল ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে কুষ্টিয়ার কুমারখালি অঞ্চলের ভাঁড়রাগ্রামে। পূর্বের নদীয়া জেলার অন্তর্গত এক নির্জন গ্রাম্য কুলির অকুলীন দরিদ্র বংশের পল্লিসন্তান, পুঁথিগত ভাবে অশিক্ষিত, আখড়াধারী ফকিরি তন্ত্রের উপাসক ছিলেন বাউল কবি লালন শাহ ফকির। ছেলেবেলায় বাবা মারা যায়। বাবার নাম মাধব কর, মা পদ্মাবতী। অর্থকষ্টে তেমন শিক্ষা গ্রহণও হয়নি। চাপড়ার ভৌমিক পরিবার ছিল

তাঁর মামার বাড়ি। কিন্তু ক্রমে মামার বাড়ি দুঃসহ হয়ে ওঠে। দুঃখ ভুলতে সারাদিন একা একা সে টইটই ঘোরে মাঠে প্রান্তরে-গাঙের ধারে। কখনও উদাস হয়ে চেয়ে থাকে বন-প্রকৃতির দিকে। কখনও সুরেলা পাখির পিছনে ছুটতে ছুটতে তার দিন যায়। কোনও ফকির মেঠো পথে সুরের সারিন্দা নিয়ে হেঁটে গেলে, খেলা ছেড়ে লালন তার পিছু নেয়। একদিন ফকিরের হাত থেকে একতারা নিয়ে সত্যি সত্যিই সে শিখে নেয় সুর-সাধনা। আনমনে গায়, 'কার বা আমি কেবা আমার। আসল বস্তু ঠিক নাহি তার।' বাবার মৃত্যুর পর সংসারের সব দায় এসে পড়ে তার উপর। একদিন বিয়েও হল। দিন যত যায়, তার রকমসকম দেখে নানা কথা ওড়ে হাওয়ায়। পড়শিদের কানাকানিতে আর দারিদ্র্যের জ্বালা সঙ্গে নিয়ে লালন পথে নামে। সঙ্গে মা আর নতুন বৌ। হাঁটতে হাঁটতে এসে দাঁড়ায় দাস পাড়ায়। সেখানেই নতুন করে ঘর বাঁধে লালন। কিন্তু সংসারে মন কই তার।

সে বার গাঁ থেকে অনেকে গঙ্গাস্নানে চলল মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে। লালনও ঝোলা নিয়ে সঙ্গী হল দাসপাড়ার পড়শিদের। ক'দিন বেশ কাটলো তার। কত নতুন মানুষ, কত কথার ভিড়। স্নান তো হল, এ বার ফেরা। ফেরার পথেই লালনের গা গরম হল। ধূম জ্বর। কে একজন বলল 'বসন্ত হয়েছে লালুর। গুটিবসন্ত! গুটিবসন্ত!' জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকতে বকতে লালন একসময় জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। কে দেখবে তাকে এই বিদেশ-বিভুঁইয়ে। রাত্রিতে জ্বর বাড়ল প্রবল। কোনও সাড় নেই শরীরে। সঙ্গীরা রোগের সংক্রমণের ভয়ে দেহ ফেলে রেখেই চলল। কারা যেন মুখাগ্নি করে ভেলায় ভাসিয়ে দিল তার দেহ। গাঁ ঘরে রটলো লালনের মৃত্যু সংবাদ। পুত্রশোকে কান্নায় ভেঙে পড়লেন লালনের মা। কেঁদে কেঁদে চোখের জল শুকিয়ে গেল বৌয়ের।

কলার ভেলায় লালনের দেহ ভেসে চলল গাঙের ঢেউয়ে। কত গ্রাম, কত পথ। লালনকে নিয়ে এমন কাহিনির মিশেল আছে সুনীলের উপন্যাসেও। সে ঘটনা কাল্পনিক। তবু সে লালনের যাত্রাপথের কথায় সুনীল লিখছেন—

> কখনও আটকে যায় কচুরিপানায়। কখনও সাহেবদের কলের জাহাজ ভোঁ বাজিয়ে গেলে বড় বড় ঢেউয়ের ধাক্কায় সরে যায় পাড়ের দিকে। ...ভেলা এসে ঠেকল একটা মস্ত গাছের শিকড়ে। সেখানে নদীর পাড় ভাঙছে, গাছটির গুঁড়ির কাছেই সারাদিন পুরুষরা এলেও সন্ধ্যের সময় শুধু নারীরাই জল সইতে আসে। ...তিনজন রমণী সেই ঘাটে দেহ প্রক্ষালন করছে। গ্রামটি মুসলমান প্রধান। রমণীরা নিজেদের মধ্যে কলস্বরে কথা বলছিল, হঠাৎ যেন তারা কাছেই উঃ শব্দ শুনতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে কথা থামিয়ে তারা উতকর্ণ হল। ...খুব কাছেই, পুরুষের কণ্ঠ। দু'জন রমণী সঙ্গে সঙ্গে ভয় পেয়ে দৌড় দিল আলুথালুভাবে। একজন দাঁড়িয়ে রইল...।

হায় আল্লা! বেঁচে আছে তো! পিপাসায় ঠোঁট শুকিয়ে আসছে লালনের। শোনা গেল কেবল 'জল, জল।' জলের কথা শুনে রমণী আঁতকে উঠলেন। বললেন, 'আমরা মুসলমান।' আর যে পারছে না লালন। সে আবার বলল, 'মানুষের আবার জাত কি! জল দাও একটু। জল...।'

ঘাটের এই রমণীই লালনকে সেবায় ভরিয়ে সুস্থ করেন। নিয়ে যান ঘরে। কী নাম রমণীর? আর তার স্বামী? গবেষকদের কেউ বলছেন, ছেঁউড়িয়ার মলম কারিগর। আর তার স্ত্রীই লালনকে সুস্থ করে তোলেন। তাঁর ঘরে সে সময় সিরাজ সাঁই এসেছিলেন। রমণীর সেবায়

আর সিরাজের ঔষধে রোগমুক্তি ঘটল কয়েক দিনেই। বল ফিরল শরীরে। কিন্তু মুখে বসন্তের দাগ রয়ে গেল। চিরজন্মের মতো অন্ধ হয়ে গেল একটি চোখও। কোনও কোনও গবেষক বলেন, 'মলম নয়, লালনকে সিরাজই ঠাঁই দিয়েছিলেন।' লালন চেয়েছিল সিরাজের সঙ্গেই পথে হারিয়ে যেতে। কিন্তু তখনও লালনের গৃহের প্রতি টান থাকায় সিরাজ প্রথমে তাকে দলে নেননি, বরং তাকে বাড়ি পাঠান। গুরু সিরাজের নির্দেশ মতো তিনি বাড়ি ফিরে এলেন, কিন্তু গ্রাম তাকে মানল না। তাকে দেখে মা ও বৌ দু'জনেই বিস্ময়ে ও আনন্দে আত্মহারা হলেন। কিন্তু এই আনন্দ চিরস্থায়ী হল না। পরক্ষণেই তারা যখন জানতে পারল যে লালন বিধর্মীর হাতে অন্নজল গ্রহণ করেছে। সেই মুহূর্তেই তারা গ্রামবাসীর মতো লালনকে পরিত্যাগ করলো। লালনের আশা ছিল হয়তো তার স্ত্রী তার সহগামী হবে, কিন্তু শেষে যখন বৌ তার সঙ্গে এল না, তখন তীব্র অভিমানে-কান্নায় লালন মনে মনে বাঁধল গান—

সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে
লালন কয় জাতের কী রূপ দেখলাম না এ নজরে।

সূক্ষ্ম চেতনার তীব্র অধ্যাত্ম রসে ভরপুর সহজ কথার মর্মস্পর্শী লালনের গানগুলি আজও সমান জনপ্রিয়। বিভিন্ন ভাবনার, বিভিন্ন ভাবধারার গায়করা নিজস্ব উপলব্ধিতে দাঁড়িয়ে গেয়ে ফেরেন ফকিরের গানগুলি—

চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে
আমরা ভেবে করবো কি...

কিংবা

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি, কেমনে আসে যায়
তারে ধরতে পারলে মনবেড়ি, দিতেম পাখির পায়।...

চরম সত্যের দাবদাহে বিক্ষত লালনের মনে অধ্যাত্মপ্রেম জন্ম নেয় বাউলের মাত্রা ধরেই। লালনের সুস্থতা এবং জীবনের পরিপূর্ণতা ক্রমশ প্রেম ও ভক্তিরসের ভাবনায় এক পূর্ণ বৈরাগ্যের শরীরে দাঁড় করিয়ে দেয়। যার শরীরী ভাষায় ফুটে ওঠে বৈচিত্র্যের মাঝেও দেহতত্ত্বের সার্বিক রূপটির ছবি।

ঠাকুর পরিবারের জমিদারীভুক্ত ছেঁউড়িয়ার প্রজা হলেও লালন সাধনার শীর্ষে বিরাজ করতেন। সেই কুসংস্কার যুগেও বেশকিছু পুঁথিগত বিদ্যাধারীদের কাছে তিনি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। কুমারখালির হরিনাথ মজুমদার, জলধর সেন, অক্ষয়কুমার মিত্র, মীর মশারফ হোসেনের মতো শিক্ষিত লোকেরা তাঁর গানের ভক্ত ছিলেন। এছাড়াও সে সময় প্রায়ই শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে গিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ, জ্ঞানদানন্দিনী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে বাউল গান নিয়ে আলাপ আলোচনা করেছেন, তাঁদের বাউল গান শুনিয়ে মুগ্ধ করেছেন, তবুও তাঁদের কাছে রেখেছেন পরিচয়ের ব্যবধান। আত্মভোলা সমাজ সংসার পরিত্যক্ত এই সাধক মানুষটির গুণে মুগ্ধ হয়ে শিক্ষিত সমাজের প্রায় দশহাজার মানুষ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। লালন শিষ্যদের মধ্যে শীতল শাহ, ভোলাই শাহ, পাঁচু শাহ, মলম শাহ, মাণিক শাহ, মহিবুদ্দিন শাহরা শিলাইদহে ঠাকুর বাড়িতে যাতায়াত করতেন, সেইসূত্রে তাদের পরিচয় পাওয়া যায়।

লালন জাতপাতহীন বাউল ও ফকিরি ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর গানের কথায় যেমন হিন্দু মনোভাব দ্যোতক অনেক শব্দ ব্যবহার দেখা যায়—ঠিক তেমনই সুফি দেহতত্ত্বের ধর্মানুমোদিত পারিভাষিক শব্দের ব্যবহারও বিশেষভাবে লক্ষণীয়—

এ বড়ো আজব কুদরতি
আঠারো মুকামের মাঝে
জ্বলছে একটি রূপের বাতি
এ বড়ো আজব কুদরতি।...

কখনো কখনো শিষ্য সহযোগে গেয়ে ওঠেন—

বাড়ির কাছে আরশিনগর।
সেথায় এক পড়শি বসত করে

কখনও আবার গেয়ে ওঠেন—

দেহের মাঝে নদী আছে
সেই নদীতে নৌকা চলছে
ছয় জনাতে গুণ টানিছে
হাল ধরেছে একজনা।

ফকিরের গানে রূপকিভাব ও ভাষার গাঁথুনিতে কেবলই ফুটে উঠেছে না পাওয়াকে পাওয়া, না দেখাকে দেখার বাসনা। সাধারণ ধর্ম জীবনে না ধরা অধর চাঁদকে ধরার আকুতি, সহজ সরল জীবন পথের সাধন ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে একাঙ্গিকে জয় করার তাগিদ তাড়া করে ফিরেছে ফকির লালনের গানের শরীরে। রূপকি ভাষার তত্ত্ব কথা ফুটে উঠেছে এই গানে—

ধন্য ধন্য বলি তারে
বেঁধেছে এমন ঘর
শূন্যের উপর পোস্তা করে
সবে মাত্র একটি খুঁটি
খুঁটির গোড়ায় নাইকো মাটি
কিসে ঘর রবে খাঁটি
ঝড়ি তুফান এলে পরে।

এহেন ফকির লালন সাঁই দেখতে কেমন ছিলেন! স্মৃতি থেকে ডুব দিই 'মনের মানুষ'-এর পাতায়। যেখানে জ্যোতিরিন্দ্রের আহ্বানে লালন গিয়েছেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। জ্যোতিদাদার তখন পোট্রেট আঁকার পর্ব চলছে।

> দ্রুত হাতে কয়েকটা টান দিয়ে রেখাচিত্রটি সম্পূর্ণ করে জ্যোতিরিন্দ্র বলল, এই দিকে এসে দেখুন তো, আপনার মুখখানি ঠিক হয়েছে কি না। লালন উঠে এসে জ্যোতিরিন্দ্রের পাশে দাঁড়াল। ছবিটি দেখার পর হাসি ছড়িয়ে গেল তার সারা মুখে। সে বলল, বাবুমশাই আমার মুখখানি কেমন দেখতে, তা তো আমি জানি না। কখনও দেখি নাই। জ্যোতিরিন্দ্র বলল, সে কী? নিজের মুখ কখনও দেখেননি? এই যে গাইলেন আরশিনগরের কথা?

লালন বলল—'সে আরশিনগরে নিজেকেও দেখা যায় না, পড়শিকেও দেখা যায় না।'

লালনের কী এমন ছবি এঁকেছিলেন রবিঠাকুরের জ্যোতিদাদা, যা দেখে উপন্যাসের সাঁই হেসেছিলেন। রবীন্দ্রভারতীতে ১৮৮৯ সালের ৫ মে শিলাইদহে বোটের উপর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা লালনের যে পেনসিল স্কেচটি রয়েছে, তাতে লালন ন্যুব্জ। অসম্পূর্ণ হলেও, সেটিই একমাত্র লালনের পার্থিব অবয়ব। ছবির উপর লেখা লালন ফকির। শিলাইদহ বোটের উপর।

গবেষকদের অনুমান এ ছবি লালনের মৃত্যুর এক বছর আগে আঁকা। নন্দলালও এক সময় এই স্কেচটি দেখে লালনকে এঁকেছিলেন। তবে নন্দলালের লালন-এর খাড়া নাক। মাথার চুল বাঁধা। 'হিতকারী'র নিবন্ধকার স্বচক্ষে দেখেছিলেন লালন ফকিরকে। তাঁর লালন একটু অন্য। বাবরি চুল, একটি চক্ষু দৃষ্টিহীন, মুখে বসন্তের দাগ।

শেষের দিকে লালন সাঁই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। শিষ্যাদের নিয়ে নিরঞ্জন তত্ত্বালাপে মেতে থাকতেন। অন্তরের ব্যথার কথা কাউকে জানতে দিতেন না। শেষের সময় বুঝতে পেরে সাধনসঙ্গিনী, ধর্মকন্যা পিয়ারী, শিষ্যা-জামাতা শীতলকে ঘরবাড়ি, জোতজমা সমস্ত দানপত্র করে দিলেন। এমনকি নিজের সৎকারের জন্য দুই হাজার টাকা রেখে গেলেন। শিষ্যদের বললেন— 'ইন্তেকাল হলে হিন্দু মতে দাহ হবে না। আবার ইসলামি মতে জানাজা নামাজও পড়া যাবে না।' আর যেদিন চলে গেলেন, রাত থেকে শিষ্যরা গেয়ে চলেছে—

পার কর হে দয়াল চাঁদ আমার।
ক্ষম হে অপরাধ আমার ভবকারাগারে।

সাঁই নিজেও তার সপ্তকে গলা ছেড়ে গাইছেন—

পাখি কখন যেন উড়ে যায়
বদ হাওয়া লেগে খাঁচায়।

বসন্তকুমার লিখেছেন—

> স্বরলহরী থামিয়া গেল, সমস্ত গৃহতল নীরব নিস্তব্ধ, ইহার পর শিষ্যগণকে সম্বোধন করিয়া 'আমি চলিলাম' বলিয়া তাহার কণ্ঠ হইতে শেষ স্বর উচ্চারিত হইল, নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিলেন, সমাজ পরিত্যক্ত দীন ফকিরের জীবন নাট্যের যবনিকাপাত হইল।

একটু পরেই নাড়ি স্থির হয়ে এল। শিষ্যরা ডুকরে কেঁদে উঠলেন। সেদিন ছিল কার্তিকের পয়লা।

তথ্যের সন্ধানে

১. শক্তিনাথ ঝা : 'ফকির লালন সাঁই'
২. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় : 'মনের মানুষ'
৩. অন্নদাশঙ্কর রায় : 'লালন ফকির ও তার গান'

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশি সংগীতে বাউল ভাবনা : সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

সুশান্ত মণ্ডল

১৯০৫ সালে ২০ জুলাই ভারত সরকারের বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব ইংল্যাণ্ডে ভারত সচিব-এর অনুমোদন লাভ করে। ১লা আগস্ট 'সঞ্জীবনী' সাপ্তাহিকের সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র-এর প্রতিবাদে প্রকাশ্যে বয়কট বা বিলাতি বর্জন প্রস্তাব ঘোষণা করেন। এরপর ৭ আগস্ট কলকাতা টাউন হলে বিরাট জনসভায় এই প্রস্তাব গৃহীত হলে, এই আন্দোলন দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। যদিও রবীন্দ্রনাথ শুরু থেকেই বয়কট বা বর্জন নীতির বিরোধী ছিলেন। নঞর্থক রাজনীতির ত্রুটি ও বিপদ সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন। কিন্তু সে কথা তৎকালীন রাজনীতি প্রধানদের উত্তেজনার মুহূর্তে বোঝাতে গিয়েও ব্যর্থ হয়েছেন। অতঃপর ১৯০৫-এর ২৫ আগস্ট কলকাতা টাউন হলে শারীরিক অসুস্থতা কাটিয়ে 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' প্রবন্ধ পাঠ করে কবি তাঁর গঠনমূলক ভাবাত্মক পরিকল্পনা দেশবাসীর কাছে পেশ করলেন। এছাড়া 'সফলতার সদুপায়', 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে তৎকালীন বাস্তব সমস্যা সংকুল বাংলার বিবিধ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

বয়কট বা বর্জন নীতির বিরোধী হলেও রবীন্দ্রনাথ এই বিরাট আন্দোলনের মুখে স্থির থাকতে পারলেন না, তাঁর ভাবুক চিত্ত সাড়া দিয়ে উঠল। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি নানা কথা বললেও, অর্ন্তলোকে এক নতুনের সম্ভাবনা পুলকিত হয়ে উঠেছিল। সেই পুলকিত আবেগ ও উচ্ছ্বাসের প্রকাশ তাঁর স্বদেশি কবিতা ও সংগীতে প্রকাশ হচ্ছিল। বিভিন্ন পত্রিকা, বিশেষ করে 'বঙ্গদর্শন' ও 'ভাণ্ডার'-এ তাঁর স্বদেশি গানগুলি প্রকাশিত হত। ১৯০৫ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর বত্রিশ পৃষ্ঠার পুস্তিকা রূপে 'বাউল' প্রকাশিত হয়। এই পুস্তিকার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সদ্য রচিত গানগুলি সংকলিত হয়। পাণ্ডুলিপিতে এই স্বদেশি গানগুলির বেশিরভাগই বাউল গানের সুর নির্দেশ করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

> এইসব গানের ভিতর দিয়া কবি দেশকে কেবল দেশমাতৃকারূপে বন্দনা করিলেন না, দেশবাসীর অন্তরে ভাবের জোয়ার বহায়লেন ও শক্তির চেতনা উদ্বুদ্ধ করিলেন।[১]

রবীন্দ্রনাথ-এর আগেও স্বদেশি সংগীত রচনা করেছেন কিন্তু এই সময় রচনার প্রেরণা তিনি অন্তরের মধ্যেই পেয়েছেন। বাল্যকালেই 'সঞ্জীবনী সভা', 'হিন্দুমেলা'র উত্তেজনায় তিনি স্বদেশ ভাবোদ্দীপক কয়েকটি গান রচনা করে সকলকে বিস্মৃত করেছিলেন। সে সকল গানের অন্যতম

হল 'তোমারই তরে মা, সঁপিনু এ দেহ। তোমারই তরে মা, সঁপিনু এ প্রাণ।' আবার ১৮৮৬ সালে কলকাতায় প্রথম কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে'—রবীন্দ্রনাথ রচিত এই সংগীতের মধ্য দিয়ে অধিবেশন উদ্বোধন হয়। এই গানটি সম্পূর্ণ দেশিয় রামপ্রসাদী সুরে কবি স্বয়ং সভায় গেয়েছিলেন। বাংলাদেশে রামপ্রসাদী গান উচ্চাঙ্গ সংগীত হিসেবে পরিচিত নয়, তা লোকভাবনা প্রসূত গান রূপেই মানুষের কণ্ঠে গীত হয়। রবীন্দ্রনাথ নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে গানটিতে লোকসংগীতের সুর সংযোজন করে সেই সংগীতের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ প্রকাশ করেছেন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কংগ্রেস অধিবেশন উপলক্ষে রচিত গানে রামপ্রসাদী সুর সংযোজন প্রসঙ্গে বলেছেন—

> নিখিল ভারত রাষ্ট্র সংঘের নানা দেশীয় প্রতিনিধিদের নিকট বাংলার নিজস্ব সুর শোনানোই গায়কের উদ্দেশ্য ছিল কিনা জানি না। কবি বেশ জানতেন, যে গান সর্বসাধারণের জন্য রচিত হইবে, তাহার সুর সাধারণের সুর হওয়া প্রয়োজন।[২]।

পরবর্তীতে লোকসংগীত সংগ্রহ ও স্বরচিত গানে কবি লোকসংগীতের সুর আরোপের মধ্য দিয়ে দেশিয় সংগীতের প্রতি গভীর ভালোবাসা জ্ঞাপন করেছেন—তার সূত্রটি এখানে খুঁজে পাওয়া যায়। এই সূত্র ধরেই ১৯০৫-এর 'বঙ্গভঙ্গ' আন্দোলন-এর উন্মাদনার কালে তিনি যে স্বদেশি সংগীতগুলি রচনা করেছেন, তাতে অনায়াসেই বাংলার লোকসংগীত বাউল গানের সুর ও ভাবনা যোজনা করেছেন। স্বদেশের ভাবনা সকল মানুষের মনে সঞ্চারিত করার জন্য লোক-সংগীতের সুর সংযোজন ছাড়া কবি অন্য উচ্চাঙ্গ সংগীতের সুর কল্পনা করতে পারেননি।

বঙ্গভঙ্গের সময় কবির রচিত গানগুলি তীব্র আবেগের প্রেরণায় উৎসারিত। এইসব গানের মাধ্যমে কবি দেশকে কেবল দেশমাতৃকা রূপে বন্দনা করলেন না, দেশবাসীর অন্তরে দেশভক্তি ও ভাবের জোয়ার আনলেন ও নবশক্তির চেতনায় উদ্বুদ্ধ করলেন। এই সময় স্বদেশি গানগুলি বাউল সুরে বাঁধা। এ সুরের মাধ্যমে গানের কথাগুলি সহজেই সর্বসাধারণের মর্ম স্পর্শ করে। 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'—গানটি বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে ৭ আগস্ট কলকাতা টাউন হলে যে সভা হয়েছিল, সেই উপলক্ষ্যে লিখিত হয়। সত্যেন রায় লিখেছেন—"রবীন্দ্রনাথের নতুন সংগীত 'আমার সোনার বাংলা' বাউল সুরে গীত হয়েছিল।" ১৯০৫ সালের ৭ সেপ্টেম্বর তারিখে 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় এই গানটি রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষরে প্রথম প্রকাশিত হয়। তবে ৭ আগস্টের মহাসভায় গানটি গাওয়ার বিবরণ কোনো সংবাদপত্রে পাওয়া যায়নি। এ বিবরণ যদি সঠিক হয়ে থাকে, তবে এর আগে শান্তিনিকেতনে গানটি রচিত হয়েছিল বলা যায়। সরলা দেবী 'শতগান'-এ মূল গানটির স্বরলিপি প্রকাশ করেন। সেই স্বরলিপি থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায়, শিলাইদহের ডাক পিওন গগন হরকরার 'আমি কোথায় পাব তারে, আমার মনের মানুষ যে রে' গানটির সুরে রবীন্দ্রনাথ 'আমার সোনার বাংলা' গানটি রচনা করেন।[৩] গানটি বাউল সুর সংযোজনের পাশাপাশি রয়েছে লোক-ভাবনার বিষয় সম্ভার। 'অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে' মধুর হাসি দর্শনের মধ্যে নবান্নের স্মৃতি চিহ্ন জেগে ওঠে। ধেনুচরা মাঠ, পাড়ের খেয়াঘাট, পাখি ডাকা ছায়ায় ঢাকা পল্লীবাট আর ধানে ভরা আঙিনা সবই লোকজীবনের ছবি। লোক ভাবনার জারণ, বাউল সুরের মিশ্রণ—এই দুইয়ে মিলে স্বদেশি

গানের রেকর্ড বিক্রির জন্য যে বিজ্ঞাপন দেন, তাতে স্পষ্টতই উল্লেখ ছিল—

> H. Bose's records/songs composed & singing by Babu Rabindranath Tagore.

এই রেকর্ডে উক্ত গানটি ছিল। গানের কথায় বিশ্বমাতাকে দেশের পল্লিগাঁয়ের সাধারণ জননীরূপে গড়ে তুলেছেন। স্বাভাবিক ভাবেই সে মায়ের শরীর পল্লিমাটির গন্ধমাখা, শ্যামল বরণে ও কোমল মূর্তিতে তাঁর দেহটি গড়া। লোক-ভাবনাপ্রসূত এই মা যেন সকলের চেনা জগতের মা। বাউল সুরে রচিত অপর একটি গান—'মা কি তুই পরের দ্বারে পাঠাবি তোর ঘরের ছেলে'তেও পাই আঁচলপাতা পল্লিগাঁয়ের অতি চেনা মাকে।

'ভাণ্ডার' পত্রিকায় ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যায় স্বদেশি গান 'এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে, জয় মা বলে ভাসা তরী' মুদ্রিত হয়। গানটি বাউল সুরে রচিত বলে পত্রিকাটি দাবি করলেও পাণ্ডুলিপিতে সারি গানের সুর বলে উল্লেখ আছে। সরলা দেবীর 'শতগান'-এ উল্লিখিত এর মূল গান হল 'মন মাঝি সামাল সামাল ডুবল তরী'— রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে এটি সারি গানের সুরেই গীত হয়েছিল। ইন্দিরা দেবী গানটির স্বরলিপি করেন। বাউলগানের পাশাপাশি বাংলার লোকগীতি সারি গানের সুরও যে তাঁর উপেক্ষনীয় ছিল না, তা সহজেই অনুমান করা যায়। সারিগানে পূর্ব-বাংলার মাঝির দল সারিবদ্ধভাবে বৈঠার তালে তালে গান গেয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের এই গানটির কথার উপাদানের সঙ্গেও সারি গানের বৈশিষ্ট্যের সাযুজ্য লক্ষ করা যায়। 'ওরে মাঝি, কোথায় মাঝি, ...তোরা সবাই মিলে বৈঠা নে রে।' ঘাটে বাঁধার দিন ফুরিয়ে যাবে, তাই 'ওরে, দে খুলে দে, পাল তুলে দে, যা হয় হবে বাঁচি মরি'। লোকায়ত রবীন্দ্রনাথের স্বদেশি গানে এ যেন লোকগীতির প্রাণটুকুকে বাঁচিয়ে রাখার মরিয়া প্রচেষ্টা। এ প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল 'যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, আমি তোমায় ছাড়ব না মা!' গানটিতে। বিশ্বজনীন দরিদ্র ঘরে আশ্রয় নিয়েছে, ছেঁড়া কাঁথা পেতে তাঁর সন্তানকে আহ্বান জানাচ্ছে আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে। রচনার পাণ্ডুলিপিতে বাউলের সুর বলে উল্লেখ আছে। 'শতগান'-এ এর মূল গান হিসেবে দেখানো হয়েছে—'চিরদিন এমনিভাবে (ও মন) আশার মায়ায় ভুলে রবে'। রবীন্দ্রনাথ বাউল সুরেই গানটি গেয়েছিলেন হেমেন্দ্রমোহন বসুর রেকর্ডিং-এ।

বঙ্গভঙ্গের ঝোড়ো হাওয়ায় রবীন্দ্রনাথের বাউল সুর ও ভাবনায় যে সকল গান বাংলার একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে মানুষের কণ্ঠে উচ্চস্বরে ধ্বনি তুলে বয়ে চলেছিল, তাঁদের মধ্যে একটি গান সর্বাপেক্ষা বাঙালি হৃদয়কে বেশি পরিমাণে স্পন্দিত করতে সক্ষম হয়েছিল। আজও সেই গানটি বাঙালির কণ্ঠে কণ্ঠে মুক্তভাবে ধ্বনিত হয়—'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে'। 'ভাণ্ডার' পত্রিকায় ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যায় গানটি মুদ্রিত হয়। পাণ্ডু-লিপিতে এর মূল গান হিসাবে 'হরিনাম দিয়ে জগত মাতালে একলা নিমাই'। সহজ-সাধক বাউল মনের মানুষের তালাসে গ্রামের মেঠো পথে একতারা হাতে নিয়ে একলা বেরিয়ে পড়ে। শেষে মনের মানুষকে মনের মধ্যেই সন্ধান করে নিতে পারে ঐ সহজ সাধনার বলে। স্বদেশের তরে নিবেদিত মানুষকেও বাউলের মতো একলা বেরিয়ে যাওয়ার ডাক শোনাতে চান কবি এবং চরম চাওয়াকে সহজে কাছে এনে দিতে চান। তাই বলা যায়, শুধু বাউল সুর মাত্রই

নয়, তাঁর ভাবনাও গানের কথায় মিশিয়ে দিয়ে নতুন স্বদেশি বাউল গানের সন্ধান দিলেন কবি। যার স্বাদ গ্রহণে আমরাও মোহিত হয়ে যায়। বাউল সুরে অপর দু'টি গান— 'যে তোরে পাগল বলে, তারে তুই বলিস নে কিছু' এবং 'তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে/তা বলে ভাবনা করা চলবে না। স্বদেশি ভাবরসে পুষ্ট গান দু'টি দেশবাসীর আত্মোৎসর্গের প্রেরণাস্বরূপ। দ্বিতীয় গানটি রবীন্দ্রনাথ নিজেই ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। তাছাড়া উল্লেখ করার মতো বাউলধর্মী স্বদেশি সংগীতগুলি হল—'ওরে তোরা নাই বা কথা বললি', 'ছি ছি চোখের জলে ভেজাসনে আর মাটি', 'নিশিদিন ভরসা রাখিস হবেই হবে জয়' প্রভৃতি।

বাউল গান খাঁটি স্বদেশি সুরের বৈশিষ্ট্যান্বিত লোক উপাদান। মূলত এই গানের সুরগত বৈচিত্র্যই একে লোকসংগীতে কাছাকাছি নিয়ে গেছে। বাউলের মন ভুলানো ও প্রাণ মাতানো সুর বাঙালির নিজস্ব ঘরোয়া সম্পদ, অবশ্য এই গানের কোন নিজস্ব সুর নেই, বিভিন্ন অঞ্চলের লোকসংগীতের সুর, যেমন—সারি, জারি, ভাটিয়ালি, ঝুমুর প্রভৃতি গানের সুরানুকরণে বাউলদের গান বাঁধা হয়ে থাকে। এই সূত্রেই লোকসংগীতের সঙ্গে তার সম্পর্ক। অনেকে বাউলের ভাষা, ভাব ও সুরগত বৈশিষ্ট্যের সামগ্রিক পরিচয়ের সূত্রে এই সংগীতের লৌকিক দিকের আলোচনাকালে একে খাঁটি লোকসংগীতের পর্যায়ভুক্ত করতে চান না। কিন্তু বিভিন্ন লোক-সংগীতের সুরে বৈচিত্র্যপূর্ণ সমাবেশেই তা লোকসংগীত হয়েছে বলা যায়। এ সংগীতের ভাবেই তরুণ রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল। তিনি লিখেছেন—

> 'Universal Love' প্রভৃতি বড়ো বড়ো কথা বিদেশিদের মুখ হইতে বড়ই ভালো শুনায়, কিন্তু ভিখারিরা আমাদের দ্বারে দ্বারে সেই কথা গাহিয়া বেড়াইতেছে, আমাদের কানে পৌঁছাইয়া না কেন?[৫]

বিদেশি ভাষার 'Universal Love'-এর কথাই আমাদের দেশে বাউলের গানের ভাষায় খুব সহজে ব্যক্ত হয়। এ সকল তারাই রচনা করেন, যাদের ভাবধারার সঙ্গে নাড়ির গভীর সম্বন্ধ। রবীন্দ্রনাথ বলেন—

> বাংলা কেমন সহজ, ভাব কেমন সরল, ইহাকে দেখিলেই এমনই আত্মীয় বলিয়া মনে হয় যে, কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া ইহাকে প্রাণের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে দিই।[৬]

এই অনুভূতিই তাকে সারা জীবন সজীব রেখেছে। তাইতো বাউলের সুরে নানা রাগ-রাগিনী মিশিয়ে এই গানের গ্রাম্যতা দোষ থেকে মুক্তি দিয়ে তিনি অভিজাত সুরের ইন্দ্রজাল বুনে দিলেন, যাতে বাউল গানের কৌলিন্য রক্ষা পায়, সুরের আভিজাত্য বজায় থাকে, আবার ব্যক্তিসত্তা থাকে অক্ষুণ্ণ। এক সমালোচক রবীন্দ্রনাথের এই সংগীত সাধনার গুরুত্ব বিচার করতে গিয়ে বলেছেন—

> রবীন্দ্রনাথ এ দেশের সংগীতে...বিপ্লব এনেছিলেন...ড্রয়িং রুমে বসে এ বিপ্লব কখনো হয়নি। ড্রয়িং রুমের লোক দেখানো চাতুরি, ভুঁইফোড় হয়ে একদিন গজিয়ে উঠেছে, পরদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে গেছে। ...গ্রামে, পল্লীতে, ঘাটে-মাঠে-বাটে জনজীবনের নিবিড়যোগে যে সুরের আবির্ভাব, বিপ্লব আসে সেখান থেকেই বাংলার পল্লীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগ ছিল নিবিড়।[৭]

বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সরকারি কোন জন-সচেতনমূলক কার্যক্রম আঞ্চলিক

সংগীতের আশ্রয়ে প্রচার করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এই পন্থা অবলম্বনে দেশের নিম্নস্তরের মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন কর্মসূচির বিজ্ঞাপন-যান বার করা হয়। তার সঙ্গে বাউল সংগীত পরিবেশকদের কর্মসূচি অনুযায়ী গান রচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। বাউল গায়কেরা বিষয়ানুসারী গান রচনা করে গ্রাম-গঞ্জের প্রতিটি জায়গায় ঘুরে ঘুরে প্রচার কার্য সমাধা করেন। এতে সাধারণ মানুষের মধ্যে সেই বিষয়ের প্রতি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করানো যায় ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা যায়। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশি গানে বাউলের ভাব ও সুর সংযোজনের যে উদ্দেশ্য বর্তমানেও সেই কৌশল অবলম্বন করে তাকে এই সময়ও প্রাসঙ্গিকতার জায়গা করে দিয়েছে। এইজন্যই রবীন্দ্রনাথের স্বদেশি গানে বাউলের ভাবধারা আরও প্রাসঙ্গিক হয়েছে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের কথাতেই শেষ করা যায়—

> স্বদেশি আন্দোলনের আবেগ জোয়ারে যে বিরাট সাহিত্য ও সংগীত সৃষ্টি হইল, তাহার প্রভাব আমাদের জীবনে ব্যর্থ হয় নাই।[৮]

উৎসের সন্ধানে

১. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : 'রবীন্দ্র জীবনী', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৬৫, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪১৭
২. তদেব, পৃ. ১৬৪
৩. প্রশান্তকুমার পাল : 'রবি জীবনী', পঞ্চম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স কলকাতা, ১৪১৮, পৃ. ২৫৮
৪. তদেব, ব্রজেন্দ্র কুমার দেবশর্মাকে লিখিত পত্র, পৃ. ২৬২
৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৪ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমী, কলকাতা, ২১৬, পৃ. ২৪৫-২৪৬
৬. তদেব, ২৪৪
৭. সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'রবীন্দ্রনাথের গান', করুণা প্রকাশনী, কলকাতা ১৯৬১, পৃ. ৭
৮. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : 'রবীন্দ্র জীবনী', পূর্বোক্ত : পৃ. ১৭০

গানটি অনেকাংশে লোকগানের স্বগোত্র হয়েছে।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবে সমস্ত বঙ্গবাসী একযোগে আন্দোলনে সামিল হয়েছিল। রাজনীতি, শিক্ষা, সমাজ সকল দিকের বিশিষ্টজনই বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে একই উদ্দেশ্য সাধনে বিভিন্ন পথে ইংরেজ বিরুদ্ধ কাজ চালনা করেছেন। স্বভাবতই এই আন্দোলন কেন্দ্রিক রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য প্রকাশিত হতে লাগল পত্র-পত্রিকায়। 'অবস্থা ও ব্যবস্থা', 'বঙ্গবিভাগ' প্রবন্ধে তিনি বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের প্রস্তাবকে ক্ষতির দিক থেকে না দেখে লাভের দিক থেকে দেখার পরামর্শ দিয়েছেন। বয়কট আন্দোলনকেও একই দৃষ্টিতে দেখতে চাইলেন। এ অবস্থায় ১ সেপ্টেম্বর সিমলা থেকে ঘোষিত হয় ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ কার্যকরী হবে। রবীন্দ্রনাথ এইসময় স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার ও সন্তানদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে গিরিডিতে ছিলেন। সেখানে 'খেয়া'র অধ্যাত্মমুখী কবিতাধারা রচনা করলেও সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির

ছায়াপাত কয়েকটি কবিতায় ঘটেছিল। স্বদেশের প্রতি গভীর অনুরাগবশতই উত্তাল রাজনৈতিক অবস্থা তাঁর ভাবনাকে নাড়া দিয়েছিল। তাই কলকাতার বাইরে গিরিডিতেও বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়া তাঁকে স্পর্শ করেছিল।

এই গিরিডি বাস রবীন্দ্রনাথের জীবনে এক স্মরণীয় অধ্যায়। কারণ এখানে বাসকালেই তিনি অনেকগুলি স্বদেশি গান রচনা করেছিলেন। বাউল দর্শন ও সুরের প্রতি মোহমুগ্ধ রবীন্দ্রনাথ বাংলার মানুষকে স্বদেশি ভাবনায় উজ্জীবিত করার জন্য যে স্বদেশি গান লিখলেন, তাতে বাউল ভাবনা ও সুরের সংযোজন ঘটালেন। তিনি হয়তো ভেবেছিলেন বাউলের সহজ, সরল সুরের দ্বারা স্বদেশ ভাবনার কথাগুলি মানুষের মর্মমূলে দ্রুত পৌঁছে দেওয়া যাবে। বাউল সুরের সম্মোহিনী ক্ষমতা আছে। একতারা হাতে বাউল গায়ক যখন রাঙা মাটির পথ ধরে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরের লক্ষ্যে পাড়ি দেয়, তখন তার সুর মানুষের হৃদয়তলে অনুরণন তোলে। তাই বাংলার উত্তপ্ত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বদেশ-ভাবনা চাড়িয়ে দেবার সহজ উপায় হিসেবে বাউল সুর ও ভাবনাকে কাজে লাগাতে প্রয়াসী হন। বাংলার মানুষকে স্বদেশ ভাবনায় আকৃষ্ট করার জন্য গানের কথাতে লোক-ভাবনার বিস্তার ঘটান।

ধর্মশাস্ত্রের অনেক গভীর তত্ত্ব যেমন সহজকথায় ও সুরে বাউল সম্প্রদায় কর্তৃক পরিবেশিত হয়, তেমনি সহজ কথা ও সুরে স্বদেশ প্রেমের গান বেঁধে তাঁকে সহজেই সাধারণ মানুষের কাছে পোঁছে দিয়েছেন কবি। শুধু বাউলের সুর নয়, সারি গানের সুরও সেগুলিতে সংযোগ করেছেন। এতে দেশের মানুষের মনে উদ্দীপনা সঞ্চারিত হয়েছে। লোকায়ত চেনা সুরের আকর্ষণে গানের কথা স্বদেশবাসীর কানের ভিতর দিয়ে সহজেই অন্তরে পৌঁছে গেছে। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা এইভাবে লোকায়ত চেতনার গভীরে অন্তর্নিহিত ছিল। তাই তিনি বলতে পারেন—

> কেবল দেশি জিনিস ব্যবহার করা নহে, যতটা সম্ভব, দেশি ভাব দেশি আচার পালন করা চাই। সময় বিশেষ লোকের কাছে উপহাস্যস্পদ হইবার গৌরব আছে—একথা মনে রাখিয়ো।[৪]

তিনি স্বদেশি গানের মধ্যে বাউলের সুর ও ভাব সংযোজনের ক্ষেত্রে এতটুকু সংকোচ করেননি, উপহাসের ভয় ছিল না তাঁর বরং এই মাটির গন্ধ মাখা বাউল সুর ও ভাব গ্রহণের গৌরব অনুভব করেছেন তিনি।

'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয় 'ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকায় মাথা'। গিরিডিতে বাসকালে গানটি রচনার পরেই পাণ্ডুলিপিতে পরিচিত বাউল গানের সুর নির্দেশ করে দেন। কলকাতার গায়করা সেই সুরেই তাদের কণ্ঠ দেন। সরলা দেবীর 'শতগান'-এর মূল গান হিসেবে উল্লেখ আছে 'আমার (সোনার) গৌর ক্যানে কেঁদে এলো ও নরহরি'। বাউল সুরের এই গানটির স্বরলিপি করেন ইন্দিরা দেবী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বাউল সুরেই নিজ কণ্ঠে গানটি গেয়েছিলেন। হেমেন্দ্র মোহন বসু 'দ্য টকিং মেশিন হল' নামে প্রতিষ্ঠান থেকে গানের রেকর্ড বিক্রির জন্য যে বিজ্ঞাপন দেন, তাতে স্পষ্টতই উল্লেখ ছিল—

H. Bose's records/songs composed & singing by Babu Rabindranath

Tagore.

এই রেকর্ডে উক্ত গানটি ছিল। গানের কথায় বিশ্বমাতাকে দেশের পল্লিগাঁয়ের সাধারণ জননীরূপে গড়ে তুলেছেন। স্বাভাবিক ভাবেই সে মায়ের শরীর পল্লিমাটির গন্ধমাখা, শ্যামল বরণে ও কোমল মূর্তিতে তাঁর দেহটি গড়া। লোক-ভাবনাপ্রসূত এই মা যেন সকলের চেনা জগতের মা। বাউল সুরে রচিত অপর একটি গান—'মা কি তুই পরের দ্বারে পাঠাবি তোর ঘরের ছেলে'তেও পাই আঁচলপাতা পল্লিগাঁয়ের অতি চেনা মাকে।

'ভাণ্ডার' পত্রিকায় ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যায় স্বদেশি গান 'এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে, জয় মা বলে ভাসা তরী' মুদ্রিত হয়। গানটি বাউল সুরে রচিত বলে পত্রিকাটি দাবি করলেও পাণ্ডুলিপিতে সারি গানের সুর বলে উল্লেখ আছে। সরলা দেবীর 'শতগান'-এ উল্লিখিত এর মূল গান হল 'মন মাঝি সামাল সামাল ডুবল তরী'— রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে এটি সারি গানের সুরেই গীত হয়েছিল। ইন্দিরা দেবী গানটির স্বরলিপি করেন। বাউলগানের পাশাপাশি বাংলার লোকগীতি সারি গানের সুরও যে তাঁর উপেক্ষনীয় ছিল না, তা সহজেই অনুমান করা যায়। সারিগানে পূর্ব-বাংলার মাঝির দল সারিবদ্ধভাবে বৈঠার তালে তালে গান গেয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের এই গানটির কথার উপাদানের সঙ্গেও সারি গানের বৈশিষ্ট্যের সাযুজ্য লক্ষ করা যায়। 'ওরে মাঝি, কোথায় মাঝি, ...তোরা সবাই মিলে বৈঠা নে রে।' ঘাটে বাঁধার দিন ফুরিয়ে যাবে, তাই 'ওরে, দে খুলে দে, পাল তুলে দে, যা হয় হবে বাঁচি মরি'। লোকায়ত রবীন্দ্রনাথের স্বদেশি গানে এ যেন লোকগীতির প্রাণটুকুকে বাঁচিয়ে রাখার মরিয়া প্রচেষ্টা। এ প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল 'যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, আমি তোমায় ছাড়ব না মা!' গানটিতে। বিশ্বজনীন দরিদ্র ঘরে আশ্রয় নিয়েছে, ছেঁড়া কাঁথা পেতে তাঁর সন্তানকে আহ্বান জানাচ্ছে আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে। রচনার পাণ্ডুলিপিতে বাউলের সুর বলে উল্লেখ আছে। 'শতগান'-এ এর মূল গান হিসেবে দেখানো হয়েছে—'চিরদিন এমনিভাবে (ও মন) আশার মায়ায় ভুলে রবে'। রবীন্দ্রনাথ বাউল সুরেই গানটি গেয়েছিলেন হেমেন্দ্রমোহন বসুর রেকর্ডিং-এ।

বঙ্গভঙ্গের ঝোড়ো হাওয়ায় রবীন্দ্রনাথের বাউল সুর ও ভাবনায় যে সকল গান বাংলার একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে মানুষের কণ্ঠে উচ্চস্বরে ধ্বনি তুলে বয়ে চলেছিল, তাঁদের মধ্যে একটি গান সর্বাপেক্ষা বাঙালি হৃদয়কে বেশি পরিমাণে স্পন্দিত করতে সক্ষম হয়েছিল। আজও সেই গানটি বাঙালির কণ্ঠে কণ্ঠে মুক্তভাবে ধ্বনিত হয়—'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে'। 'ভাণ্ডার' পত্রিকায় ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যায় গানটি মুদ্রিত হয়। পাণ্ডু-লিপিতে এর মূল গান হিসাবে 'হরিনাম দিয়ে জগত মাতালে একলা নিমাই'। সহজ-সাধক বাউল মনের মানুষের তালাসে গ্রামের মেঠো পথে একতারা হাতে নিয়ে একলা বেরিয়ে পড়ে। শেষে মনের মানুষকে মনের মধ্যেই সন্ধান করে নিতে পারে ঐ সহজ সাধনার বলে। স্বদেশের তরে নিবেদিত মানুষকেও বাউলের মতো একলা বেরিয়ে যাওয়ার ডাক শোনাতে চান কবি এবং চরম চাওয়াকে সহজে কাছে এনে দিতে চান। তাই বলা যায়, শুধু বাউল সুর মাত্রই নয়, তাঁর ভাবনাও গানের কথায় মিশিয়ে দিয়ে নতুন স্বদেশি বাউল গানের সন্ধান দিলেন কবি। যার স্বাদ গ্রহণে আমরাও মোহিত হয়ে যায়। বাউল সুরে অপর দু'টি গান— 'যে তোরে পাগল বলে, তারে তুই বলিস নে কিছু' এবং 'তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে/তা বলে

ভাবনা করা চলবে না। স্বদেশি ভাবরসে পুষ্ট গান দু'টি দেশবাসীর আত্মোৎসর্গের প্রেরণাস্বরূপ। দ্বিতীয় গানটি রবীন্দ্রনাথ নিজেই ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। তাছাড়া উল্লেখ করার মতো বাউলধর্মী স্বদেশি সংগীতগুলি হল—'ওরে তোরা নাই বা কথা বললি', 'ছি ছি চোখের জলে ভেজাসনে আর মাটি', 'নিশিদিন ভরসা রাখিস হবেই হবে জয়' প্রভৃতি।

বাউল গান খাঁটি স্বদেশি সুরের বৈশিষ্ট্যান্বিত লোক উপাদান। মূলত এই গানের সুরগত বৈচিত্র্যই একে লোকসংগীতে কাছাকাছি নিয়ে গেছে। বাউলের মন ভুলানো ও প্রাণ মাতানো সুর বাঙালির নিজস্ব ঘরোয়া সম্পদ, অবশ্য এই গানের কোন নিজস্ব সুর নেই, বিভিন্ন অঞ্চলের লোকসংগীতের সুর, যেমন—সারি, জারি, ভাটিয়ালি, ঝুমুর প্রভৃতি গানের সুরানুকরণে বাউলদের গান বাঁধা হয়ে থাকে। এই সূত্রেই লোকসংগীতের সঙ্গে তার সম্পর্ক। অনেকে বাউলের ভাষা, ভাব ও সুরগত বৈশিষ্ট্যের সামগ্রিক পরিচয়ের সূত্রে এই সংগীতের লৌকিক দিকের আলোচনাকালে একে খাঁটি লোকসংগীতের পর্যায়ভুক্ত করতে চান না। কিন্তু বিভিন্ন লোক-সংগীতের সুরে বৈচিত্র্যপূর্ণ সমাবেশেই তা লোকসংগীত হয়েছে বলা যায়। এ সংগীতের ভাবেই তরুণ রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল। তিনি লিখেছেন—

> 'Universal Love' প্রভৃতি বড়ো বড়ো কথা বিদেশিদের মুখ হইতে বড়ই ভালো শুনায়, কিন্তু ভিখারিরা আমাদের দ্বারে দ্বারে সেই কথা গাহিয়া বেড়াইতেছে, আমাদের কানে পৌঁছাইয়া না কেন?[৫]

বিদেশি ভাষার 'Universal Love'-এর কথাই আমাদের দেশে বাউলের গানের ভাষায় খুব সহজে ব্যক্ত হয়। এ সকল তারাই রচনা করেন, যাদের ভাবধারার সঙ্গে নাড়ির গভীর সম্বন্ধ। রবীন্দ্রনাথ বলেন—

> বাংলা কেমন সহজ, ভাব কেমন সরল, ইহাকে দেখিলেই এমনই আত্মীয় বলিয়া মনে হয় যে, কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া ইহাকে প্রাণের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে দিই।[৬]

এই অনুভূতিই তাকে সারা জীবন সজীব রেখেছে। তাইতো বাউলের সুরে নানা রাগ-রাগিনী মিশিয়ে এই গানের গ্রাম্যতা দোষ থেকে মুক্তি দিয়ে তিনি অভিজাত সুরের ইন্দ্রজাল বুনে দিলেন, যাতে বাউল গানের কৌলিন্য রক্ষা পায়, সুরের আভিজাত্য বজায় থাকে, আবার ব্যক্তিসত্তা থাকে অক্ষুণ্ণ। এক সমালোচক রবীন্দ্রনাথের এই সংগীত সাধনার গুরুত্ব বিচার করতে গিয়ে বলেছেন—

> রবীন্দ্রনাথ এ দেশের সংগীতে...বিপ্লব এনেছিলেন...ড্রয়িং রুমে বসে এ বিপ্লব কখনো হয়নি। ড্রয়িং রুমের লোক দেখানো চাতুরি, ভুঁইফোড় হয়ে একদিন গজিয়ে উঠেছে, পরদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে গেছে। ...গ্রামে, পল্লীতে, ঘাটে-মাঠে-বাটে জনজীবনের নিবিড়যোগে যে সুরের আবির্ভাব, বিপ্লব আসে সেখান থেকেই বাংলার পল্লীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগ ছিল নিবিড়।[৭]

বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সরকারি কোন জন-সচেতনমূলক কার্যক্রম আঞ্চলিক সংগীতের আশ্রয়ে প্রচার করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এই পন্থা অবলম্বনে দেশের নিম্নস্তরের মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন কর্মসূচির বিজ্ঞাপন-যান বার করা হয়। তার সঙ্গে বাউল সংগীত পরিবেশকদের কর্মসূচি

অনুযায়ী গান রচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। বাউল গায়কেরা বিষয়ানুসারী গান রচনা করে গ্রাম-গঞ্জের প্রতিটি জায়গায় ঘুরে ঘুরে প্রচার কার্য সমাধা করেন। এতে সাধারণ মানুষের মধ্যে সেই বিষয়ের প্রতি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করানো যায় ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা যায়। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশি গানে বাউলের ভাব ও সুর সংযোজনের যে উদ্দেশ্য বর্তমানেও সেই কৌশল অবলম্বন করে তাকে এই সময়ও প্রাসঙ্গিকতার জায়গা করে দিয়েছে। এইজন্যই রবীন্দ্রনাথের স্বদেশি গানে বাউলের ভাবধারা আরও প্রাসঙ্গিক হয়েছে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের কথাতেই শেষ করা যায়—

> স্বদেশি আন্দোলনের আবেগ জোয়ারে যে বিরাট সাহিত্য ও সংগীত সৃষ্টি হইল, তাহার প্রভাব আমাদের জীবনে ব্যর্থ হয় নাই।[৮]

উৎসের সন্ধানে

১. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : 'রবীন্দ্র জীবনী', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৬৫, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪১৭
২. তদেব, পৃ. ১৬৪
৩. প্রশান্তকুমার পাল : 'রবি জীবনী', পঞ্চম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স কলকাতা, ১৪১৮, পৃ. ২৫৮
৪. তদেব, ব্রজেন্দ্র কুমার দেবশর্মাকে লিখিত পত্র, পৃ. ২৬২
৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৪ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমী, কলকাতা, ২১৬, পৃ. ২৪৫-২৪৬
৬. তদেব, ২৪৪
৭. সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'রবীন্দ্রনাথের গান', করুণা প্রকাশনী, কলকাতা ১৯৬১, পৃ. ৭
৮. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : 'রবীন্দ্র জীবনী', পূর্বোক্ত : পৃ. ১৭০

বাউলকথা : বিশ্বমানবতার চৈতন্যকথা

অমিত দে

'বাউল' শব্দটির প্রকৃত অর্থ কী এ নিয়ে মত পার্থক্য রয়েছে। মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' গ্রন্থে এই শব্দটির প্রথম ব্যবহার দেখি। কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য-চরিতামৃত' গ্রন্থে 'বাউল' শব্দটির বহু ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। এ নিয়ে নানান মতভেদ রয়েছে। কারো মতে, বায়ু মানে শ্বাস-প্রশ্বাসকে নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ দিন বেঁচে থাকার জন্য যাঁরা সাধনা করেন তারা বাউল। আবার কারো মতে, সংস্কৃত 'বাতুল' থেকেই 'বাউল' শব্দের উৎপত্তি ঘটেছে। এক ধরনের উন্মাদগ্রস্ত লোক যারা সাধারণের মতো আচরণ করেন না তাদের 'বাতুল' বা পাগল বলা হয়ে থাকে, সেখান থেকে 'বাউল' শব্দটি এসেছে। তর্ক যাই থাক তবে এক ধরনের ঈশ্বরপ্রেমে উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তিদেরকে 'বাউল' বলা হয়। অনেকে মনে করেন 'বাউল' শব্দটি আরবি শব্দ 'আউল' বা হিন্দি শব্দ 'বাউর' থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। আরবি 'আউল' শব্দের অর্থ হল— যারা ঈশ্বরের সেবক। সুতরাং বিভিন্ন সোর্স থেকে আসা তথ্যানুযায়ী এদের দুটি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। সেটি হল— সেবা ও প্রেম। অবশ্য দুটিই একে অপরের পরিপূরক।

বাউল একমাত্র নিজের মধ্যে লালিত এবং গভীরতায় প্রোথিত একজন আত্মস্থ দার্শনিক নয়; বাউল হল একটি জীবনচর্যা যা অতীব তুচ্ছ এক নগণ্য মানবিকসত্তার মোড়কে এক মহান দার্শনিক মহাকাব্যের আধার যাতে রসিকসত্তা হিসেবে অবগাহন করা যায় কিন্তু যার তল পাওয়া যায় না। আসলে কোথায় শুরু ও কোথায় শেষ স্বয়ং খ্যাপা বাউলও বোধহয় তা যথাযথ প্রকাশ করতে পারবে না। কারণ এ অনুভবের অণু-পরমাণুতে বিস্তারিত, আবর্তিত এবং অদৃশ্য হয়। 'দশ দিক সবকিছু বাদ দিয়ে ঐ প্রথমটায় ঠিক'—বাউলের কথার এই হেঁয়ালির মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষ দুর্জ্ঞেয় অথচ অনাবিল আত্মতৃপ্তির দিকে ধাবিত হয়। দু'হাত বাড়িয়ে একতারা হাতে নিয়ে সেই মানুষের মনটিও কখন বলে ওঠে—

আমার অন্তরে বৈরাগের লাউ বাজে রে সজনী
হৃদয়ে বৈরাগের লাউ বাজে
আমার মনোমাঝে কে বিরাজে?

এই জিজ্ঞাসায় মানবপ্রেম। এই অন্তহীনতাই বোধহয় বাউল ধারার মূল আধার। অনুভবই একে একমাত্র স্পর্শ করতে পারে। আর এই 'ক্ষ্যপাদের' পথ দেখায় আরো বড়ো 'ক্ষ্যাপা'-বিশ্বচরাচরের

হদিশ জানা কোন এক 'মুরশিদ'।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—

জীবে প্রেম করে যেইজন
সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।

জীব ও শিবের কোন পার্থক্য নেই। জগৎ ঈশ্বরময়, ঈশ্বর জগৎময়। এটাই আসলে বিশ্বাত্মবাদ, ইংরেজি ভাষায় Pantheism-এর মূলে আছে মানবধর্ম বা মানবতাবাদ। ইসলাম সুফিধর্মের মূল কথাই হল মানবতাবাদ। তাদের মতে, সৃষ্টির চরমোৎকর্ষ মানব এবং মানবের চরমোৎকর্ষ পূর্ণমানব। এই পূর্ণমানব মানবদেহেই ঈশ্বরের অবস্থান। সুফিধর্মের সাদৃশ্য বাউল ধর্মে বিদ্যমান। এইজন্যই বাউলরা তাদের দেহ এবং দেহকে অতিক্রম করে সাধনার সারবস্তুকে তুলে ধরেছেন। মক্কাতে ঈশ্বরের বাস কিন্তু লালন তাঁর গানে 'মানবদেহ-রূপ মক্কা' নির্মাণ করেছেন। এই মানব জীবন ও মানব দেহকে বাউলরা পরম সম্পদ বলে মনে করেছে। দেবদেবীর পূজা-উপাসনার মধ্য দিয়ে ভগবানকে পাওয়া যায়—এই ধারণা তাদের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয়েছে। দেহের মধ্যেই ঈশ্বরের বাস এবং দেহ সাধনার মধ্য দিয়েই ঈশ্বরকে পাওয়া সম্ভব বলে তারা মনে করে। একারণেই তাদের তত্ত্ব 'যাহা আছে দেহভাণ্ডে, তাহা আছে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে।' এ কারণেই তো লালন বলেছেন—

দেব-দেবতাগণ
করে আরাধন
জন্ম নিতে মানবে।
কতো ভাগ্যের ফলে না জানি
মন রে পেয়েছো এই মানব-তরণী।
বেয়ে যাও ত্বরায় সুধারায়
যেন ভরা না ডোবে।
এই মানুষে হবে মাধুর্য-ভজন
তাইতো মানুষরূপ গড়লে নিরঞ্জন।

মানবতার এমন উচ্চ প্রকাশ খুব কমই দেখা গেছে। বাউল রাধাশ্যাম সাধন-ভজনের অন্যতম উপায় হিসাবে দেহতত্ত্বের কথা বলেছেন। দেহের মধ্যেই বিরাজমান সপ্তলোক, সপ্তপাতাল, সপ্তসাগর, সপ্তদ্বীপ। তাঁর গানে উঠে এসেছে সে কথা—

আগে দেহের খবর জান গে রে মন,
তত্ত্ব না জেনে কি হয় সাধন।
দেহে সপ্ত সর্গ, সপ্ত পাতাল
চৌদ্দ ভুবন কর ভ্রমণ।
দেখ না খুঁজে, কোথায় বিরাজে
তোর পরমগুরু আত্মারাম॥

দেহের মধ্যেই আত্মার বাস। দেহকে অবলম্বন করেই স্থূল হতে সূক্ষ্মে অগ্রসর হয়ে অবশেষে আত্মার স্বরূপত্ব লাভের প্রচেষ্টা করা হয়ে থাকে। তবে এই স্থূল হতে সূক্ষ্মে অগ্রসর হওয়ার অর্থ হচ্ছে সৃষ্টি ধারার বিপরীত গতিতে বা প্রতিলোম গতিতে অগ্রসর হওয়া—

এই উল্টা সাধন দ্বারা মানবের 'স্বভাব' বা অন্তর্নিহিত 'সহজ ও স্বাভাবিক' অবস্থা লাভ করা যায়। এই অবস্থাতেই মানুষ ব্রহ্ম-স্বরূপত্ব লাভ করে। তাই তন্ত্রের চক্র-ভেদ, পাতঞ্জল মতের অষ্টাঙ্গ যোগাভ্যাস, বেদান্তের পঞ্চকোষ বিবেক, তান্ত্রিক বৌদ্ধগণের 'কায়'-বাদ, সহজিয়া বৈষ্ণব ও বাউলের 'রূপ-স্বরূপত্ব', 'বাউলের উজানে বাওয়া' বা 'উল্টা কল' প্রয়োগ করা প্রভৃতি মূলত একই পথের প্রকারভেদ মাত্র।

ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে সাধক বাউল তার সুপ্তখনি থেকে এক একটি আকর তুলে এনে ভক্তদের (শ্রোতাদের) সামনে উপস্থিত করে। কখনো 'চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে'—এই গভীর ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে দেহতত্ত্বের নিভন্ত সল্‌তেকে উস্কে দেয় আবার উত্তর জিজ্ঞাসা করলে হেঁয়ালি করে আর এক হেঁয়ালির তত্ত্ব উপস্থিত করে বলে—

কথা কয় রে দেখা দেয় না
নড়ে চড়ে হাতের কাছে
খুঁজলে জনমভর মেলে না।

এর সঙ্গে অতিরিক্ত সংযুক্তি করে একগুচ্ছ অনাবিল হাসি যা কখনো দ্বন্দ্ব তৈরি করে আবার ধন্দও তৈরি করে। আবার কখনো কখনো বলে ওঠে—

জানিস ক্ষাপা, ঘর আছে তার দুয়ার নাই
লোক আছে তার বাস্তু নাই
কে তাহারে আহার যোগায়?

শ্রোতার বিস্ময় ভাঙতে না ভাঙতে আর এক প্রস্থ হেসে বলে—'ছেলে মরে মাকে ছুঁলে গো।' শ্রোতার বিস্ময় কাটতে না কাটতেই বাউল আবার বলে ওঠে—

কথা শুনতে চমৎকার
সাধন বিনে বুঝতে পারে এমন সাধ্য কার?

বলেই হো হো করে হেসে ওঠে বাউল। সঠিক গুরুই একমাত্র সাধনকার্যের দিশা দেখাতে পারে। তাই ক্ষ্যাপা বাউল বলে ওঠে 'এসব কথা শিখতি হলে গুরুর কাছে থাকতি হবে, জানতি হবে'। 'মনের ময়লা' দূর করে বাউল সত্যিকারের মানুষ হবার ডাক দেয়।

মানবদেহের অন্তর্গত বীর্য ও রজ নিয়ে তাদের সাধনা, সেটা অলীক অনুমান নির্ভর নয়, নরনারীর বাস্তব শরীর নির্ভর। তারা বলে— 'যে বস্তু জীবনে কারণ তাই বাউল করে সাধন।' অর্থাৎ—

তাদের সাধনা রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ পূজা নয়, নিজের শরীরের অন্তঃস্থিত পদার্থকে সংরক্ষণ। সেই বিশ্বাস এত প্রবল যে গয়া কাশী বৃন্দাবন নবদ্বীপ সবই তাদের কাছে অসার।

তারা মনে করে—

জীবনই তীর্থ ধর্ম পথ
এই কথা বাউলের মত।

'মনের মানুষ' বা 'আলেখ মানুষ' নিজের মধ্যেই রয়েছে তাঁকে আলাদা করে চেনা যায় না, চিনে নিতে হয়। মনে নিষ্ঠা থাকলেই তাঁর ঠিকানা পাওয়া যায়। কেবলমাত্র যার জ্ঞান-নয়ন উন্মীলিত হয়েছে সেই তাঁকে দেখতে পায়, অনুভব করতে পায়। তাঁর স্বরূপ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বাউল রাধাশ্যাম তাঁর গানে বলেছেন—

মানুষে মানুষ রয়েছে মিশে।
তোর নাই জ্ঞান-নয়ন,
ওরে অবোধ মন,
সে মানুষ-রতন
তুই চিনবি কিসে?
আলেকের মানুষ থাকে আলোকেতে,
মোহ-অন্ধ জনে না পারে চিনিতে,
করে স্থান-স্থিতি এই মানুষেতে,
পলকেতে যায়, পলকেতে আসে।।

সুতরাং মানুষ বা তার দেহকে বাদ দিয়ে এই সাধনার অস্তিত্ব নেই। এদের কায়াসাধন পদ্ধতি রক্ত-মাংসের দেহের আশ্রয়ে গঠিত। যেদিক থেকেই দেখা হোক না কেন মানবদেহ, মানবমন, মানবপ্রেম বাউল গানে এসেই যায়। তবে দেহভোগের সুখটি কখনোই প্রধান লক্ষ্য নয়, দেহের মধ্য দিয়ে পরমার্থ লাভ করাই বাউলের লক্ষ্য।

বাউল গান আগাগোড়াই অসাম্প্রদায়িক। যে গানের সাধনা মানুষের দেহ ও মনকে নিয়ে সে গানে সাম্প্রদায়িকতা থাকবে না এটা স্বাভাবিক। জাতবিচারের উর্ধ্বে উঠে মানবপ্রেমের প্রচার করাই তাঁদের উদ্দেশ্য। তার অন্যতম প্রমাণ লালন ফকির। হিন্দুর ছেলে দৈব বিপাকে পড়ে মুসলমান হয়ে ফকিরের কাছে বাউল ধর্মে দীক্ষা নিলেন। লালন সাঁই কু-সংস্কার ও জাতপাতের বিরুদ্ধে গিয়ে এক ছত্রের জল আনার প্রয়াস করেছেন। তিনি বলেছেন—

ভক্তির দ্বারে বাঁধা আছেন সাঁই।
হিন্দু কি যবন বলে
তাঁর কাছে জাতির বিচার নাই।

কিংবা

সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে।
লালন কয় জাতের কি রূপ, দেখলাম না এ নজরে।

অর্থাৎ 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'—লালন ফকির এই শিক্ষাই সেদিন গ্রাম-বাংলাকে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথও পরবর্তীকালে মানবধর্মকেই শ্রেষ্ঠধর্ম বলে উল্লেখ করেছেন। একতারা বাজিয়ে চালচুলোহীন ফকিরি বাউলটি প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার প্রতি কুঠারাঘাত হেনেছেন এবং দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেছেন—

এমন মানবজন্ম আর কি হবে।
মন যা করো ত্বরায় করো এই ভবে।।
অনন্ত রূপ সৃষ্টি করলেন সাঁই।
শুনি মানবের উত্তম কিছুই নাই।।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন—

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ।

বাউল সাধনা এই মুক্তির কথা বলেছে। জাতপাত, বর্ণ-বৈষম্য ভারতবর্ষের বহু প্রাচীন সমস্যা।

আমরা নিজেরা নিজেরাই জর্জরিত। এগুলিও তো বন্ধন-মানব সৌভ্রাতৃত্বের পক্ষে অশুভ। রবীন্দ্রনাথের বহু আগেই পঞ্জু শাহ বাউল জাতিভেদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন—

জাতের বড়াই কি
ইহকাল পরকালে জাতে করে কি
আমার মনে বলে অগ্নি জ্বেলে দিই জাতের মুখি।

বাউলরা দেহের মধ্যে অসীম প্রেমরস উপলব্ধি করে পরম সত্তার সঙ্গে মিলিত হতে চায়। দেহের মধ্যে 'মনের মানুষ', 'অচিন পাখি', 'অধরা' মানুষকে ধরতে চায়। তারা দেহের ক্ষুদ্র আমিকে অসীম অখণ্ড 'আমি'র সঙ্গে যুক্ত করতে চায়। যুগে যুগে বাউলের কথাতে তাই-ই উঠে এসেছে। তবে তাকে সহজে পাওয়া যায় না— এর জন্য চাই সরল ভক্তি ও প্রেম। লালন তাঁর গানে বলেছেন—

আমার বাড়ির কাছে আরশি নগর
সেথায় কে পড়শি বসত করে
আমি একদিনও না দেখিলাম তারে।

কিংবা

আমার মনের মানুষের সনে
মিলন হবে কত দিনে।...
মেঘের বিদ্যুৎ মেঘে যেমন।
লুকালে না পায় অন্বেষণ।...
যখন ও রূপ স্মরণ হয়,
থাকে না লোকলজ্জার ভয়।
অধীর লালন বলে সদাই
ও যে প্রেম করে সেই জানে।

প্রেমের এমন সুন্দর উদাহরণ সর্বকালেই বিরল। এই সমস্ত তথাকথিত অল্পশিক্ষিত, দরিদ্র, ফকিরি, ভবঘুরে বাউলদের গানের অসাধারণ মূর্চ্ছনা স্পর্শ করেছিল উনিশ শতকের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মানুষদেরকেও। সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য ছিলেন কাঙাল হরিনাথ। প্রকৃত নাম হরিনাথ মজুমদার। তাঁর গানগুলি বাঙালির হৃদয় স্পর্শ করেছিল। তাঁর বিখ্যাত একটি পঙ্‌ক্তি—'হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হল পার কর আমারে।' তাঁকে কেন্দ্র করেই শহরের শিক্ষিত সমাজে বাউল গানের একটা কৃত্রিম চাহিদা তৈরি হয়েছিল। বটতলার প্রকাশকেরা এই ধরনের বাউল গীতির বই প্রকাশ করেছিলেন। এদের মধ্যে হৃদয়লাল দত্ত সংগৃহীত 'বাউল সংগীত' (১৮৮২), তিনকড়ি স্মৃতিরত্ন সংকলিত 'বাউল সংগীত' (১৮৮২), দয়ালচাঁদ ঘোষের 'বাউল সংগীত' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বাউল গানের চর্চা কলকাতার শিক্ষিত মহলে অনেকেই করতে থাকেন। ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, সুধীর চক্রবর্তী প্রমুখরা উল্লেখযোগ্য। তবে বাউল গানকে বা লালনের গানকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বের দরবারে নিয়ে গেলেন। বাউলের মানবপ্রেমকে বিশ্বের দরবারে ছড়িয়ে দিলেন। ড. সুকুমার সেন বলেছেন—

বাউল গান রবীন্দ্রনাথের আবিষ্কার বলিলে বেশি বলা হয় না। রবীন্দ্রনাথ সূক্ষ্ম রস সন্ধানী চিত্তে

> অবজ্ঞাত ও তুচ্ছ জ্ঞানে প্রত্যাখ্যাত অনেক রচনায় নব নব সৌন্দর্য আবিষ্কারের ফলে ভারতীয় সাহিত্যের রসসম্পদ বহু গুণিত হইয়াছে। তাঁহার অনুভব দিয়াই আমরা বাউল গানের মর্মের পরিচয় পাইয়াছি। রবীন্দ্রনাথের মনের গঠনে বাউল গানের প্রভাব সামান্য নয়। বাউল গানের সংগ্রহে তাঁর প্রচেস্টা প্রথম ও শ্রেষ্ঠতম।

রবীন্দ্রনাথ 'হিবার্ট' বক্তৃতাতে লালন ফকির, গগন হরকরার বাউলগানের বিরাট প্রশংসা করেছেন। গানগুলির গীতিমূর্চ্ছনা ও মানবপ্রেম এমনই অভূতপূর্ব যা রবীন্দ্রনাথের মানসিক জগতকে অনেকখানি প্রভাবিত করেছিল। আসলে রবি কবি ছিলেন বাউলময়। সেকারণেই তো বাউল রবি বললেন—

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

এই বোধ ও মানবচেতনা একমাত্র বাউল গানেই লক্ষ করা যায়। যখন গগন হরকরা উদাত্ত কণ্ঠে গেয়ে উঠে বলেন—

আমি কোথায় পাবো তারে
আমার মনের মানুষ যেরে।

তখন বাঙালির মন মনের মানুষ অন্বেষণে মেতে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অবলীলায় বলতে পেরেছেন—'Deliverance is not for me in renunciation' মানবের মাঝে আসল সৌন্দর্যের সন্ধান পেয়েছেন। গগন বাউল 'মনের মানুষ'-এর সন্ধানের জন্য দেশে বিদেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন। এই খোঁজা এবং খুঁজতে খুঁজতে আকুল হওয়া ও শেষ পর্যন্ত পাওয়া এবং সবার মধ্যে বিলীন করে দেওয়া বাউল-চর্চা, মনন ও দর্শনের বোধহয় মূলকথা। 'সোনার তরী'র রবি বললেন 'ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোট সে তরী', ভবের তরীতে ঠাঁই পেতে কবিও তো নানান দেশে ঘুরলেন, মানবপ্রেমের জয়গান গাইলেন।

বাঙালির সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয় অনুসন্ধানে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বাউল-ফকির সমাজ ও তার গভীর মানবতাবাদী জীবনদর্শন মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। আমরা এমন একটি জাতি যার অন্তরে রয়েছে বিরাট সাংগীতিক ঐতিহ্য, যার ভেতরে প্রচ্ছন্ন রয়েছে লোকায়ত ও ক্ষিতিমোহন সেন তাঁর 'বাংলার সাধনা' গ্রন্থের লোকোত্তর চেতনার সুদীর্ঘ পরম্পরা। এক বাউল সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একবার আড্ডায় বলেছিলেন—

> মানবপন্থী বাংলাদেশ প্রাচীনকালেও ভারতের শাস্ত্রপন্থী সমাজ-নেতাদের কাছে নিন্দনীয় ছিল। তার মানে বাংলাদেশ চিরদিনই শাস্ত্রগত-সংস্কারমুক্ত। বৈষ্ণব ও বাউলদের মধ্যেও দেখা যায় সেই স্বাধীনতা। তাদের সাহিত্যে ও গানে অলঙ্কার বা শাস্ত্রের গুরুভার তারা কখনও সইতে পারেনি। শাস্ত্রের বিপুল ভার নেই অথচ কি গভীর কি উদার তার ব্যঞ্জনা। এদেশের কীর্তন-বাউল-ভাটিয়ালি প্রভৃতি গানে খুব সাদা কথায় এমন অপূর্ব মানবীয় ভাব ও রস সাধকেরা ফুটিয়ে তুলে গেছেন যে কোথাও তার তল মেলে না, কূল মেলে না। অপার মানবীয় ভাবের কোথায় সীমা কোথায় শেষ? প্রাণের মতোই তা সর্বভারমুক্ত ও সহজ তার অতল অপারতার রহস্য।

'হারামণি' গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আরো বলেছিলেন—

> আমাদের দেশে যাঁরা নিজেদের শিক্ষিত বলেন তাঁরা প্রয়োজনের তাড়নায় হিন্দু-মুসলমানের মিলনের নানা কৌশল খুঁজে বেড়াচ্ছেন। অন্য দেশের ঐতিহাসিক স্কুলে তাঁদের শিক্ষা। কিন্তু আমাদের দেশের ইতিহাস আজ পর্যন্ত প্রয়োজনের মধ্যে নয়, পরন্তু মানুষের অন্তরতর গভীর সত্যের মধ্যে মিলনের সাধনাকে বহন করে এসেছে। বাউল সাহিত্যে বাউল সম্প্রদায়ের সেই সাধনা দেখি এ জিনিস হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই, একত্র হয়েছে অথচ কেউ কাউকে আঘাত করেনি। এই মিলনে সভাসমিতির প্রতিষ্ঠা হয়নি; এই মিলনে গান জেগেছে, সেই গানের ভাষা ও সুর অশিক্ষিত মাধুর্যে সরস। এই গানের ভাষায় ও সুরে হিন্দু-মুসলমানের কণ্ঠ মিলেছে, কোরানে-পুরাণে ঝগড়া বাধেনি। এই মিলনেই ভারতের সত্য পরিচয়, বিবাদে বিরোধে বর্বরতা। বাংলাদেশের গ্রামের গভীর চিত্তে উচ্চ সভ্যতার প্রেরণা ইস্কুল-কলেজের অগোচরে আপনা-আপনি কিরকম কাজ করে এসেছে, হিন্দু-মুসলমানের জন্য এক আসন রচনার চেষ্টা করেছে, এই বাউল গানে তারই পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রেম তো শাস্ত্র মেনে, বিধি মেনে হয় না। প্রেম হয় গভীর অনুরাগে। বেদ-বেদান্ত, কোরান সেখানে তুচ্ছ হয়ে যায়। মানবপ্রেম ও ঈশ্বরপ্রেম দু'টি ক্ষেত্রেই সত্য। একারণেই পঞ্জু শাহ্ বাউল বলেছেন—

অনুরাগের জোরে বিধির কলম নাহি সে মানে,
বেদ বেদান্ত দূরে রেখে করে প্রেমালাপ।

চৈতন্য প্রবর্তিত রাগানুগা ভক্তিটিই এখানে পরিস্ফুট হয়েছে। বিনম্রতা, ভক্তি ও প্রেমের অপূর্ব মেলবন্ধন আমরা বাউল গানগুলিতে লক্ষ করতে পারি। যেমন—

এক অচিন পাখি উড়ে উড়ে এল বুকের ভাঙা খাঁচাতে
তারে যতন করে রাখবো ধরে এ প্রাণ বাঁচাতে

কিংবা

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি ক্যামনে আসে যায়
ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতাম পাখির পায়।

এই গানগুলি শুধুমাত্র সাধনার গান না, এদের মধ্যে বৈষ্ণবীয় বিনম্রতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কোন কোন বাউলগানে এত অসাধারণ সমষ্টি চেতনা লক্ষ করা গেছে তা অভাবনীয়। বাউল ক্ষ্যাপা সনাতনের একটি গান—

ক্ষ্যাপা মন আমার পরের জন্য কাঙাল চিরকাল।
জয় গুরু জয় গুরু বলে তোমার ঝরে না দুই চোখের জল।।

বাউলের গানে ও সুরে উঠে এসেছে ঔপনিষদিক বাণী বা উপদেশ। ক্ষ্যাপা সনাতন যখন বলে 'সঙ্গে কেউ দেবে না ছেঁড়া কম্বল' তখন মনে পড়ে গীতার সেই বাণী 'কা তব কান্তা কস্তে পুত্র' (কে তোমার স্ত্রী, কে তোমার পুত্র)। মধ্যযুগের সন্ত চৈতন্যদেবের মধ্যেও বাউল প্রবৃত্তি ছিল। রায় রামানন্দের কাছে তিনি বাউলতত্ত্বকথার পাঠ নিয়েছেন। আসলে উদারতা, বিনম্রতা, মানবপ্রেম এ সমস্ত ধর্মই বাউলের বৈশিষ্ট্য। চৈতন্যদেবের মধ্যে সেটা ছিল বলেই সমকালীন জাতিভেদকে অগ্রাহ্য করে যবন হরিদাসকে বুকে টেনে নিয়েছিলেন। বাউলের

মানুষতত্ত্বে ব্যক্তিমানুষ আর পরম-মানুষ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। লালনের উক্তি—

১. 'এই মানুষে সেই মানুষ আছে কত মুনি ঋষি চার যুগ ধরে বেড়াচ্ছে খুঁজে।'

২. আমার আপন খবর আপনার হয় না
একবার আপনারে চিনলে পরে অচেনারে যায় চেনা।

রাধাশ্যামের উক্তি—' মানুষে মানুষ রয়েছে মিশে তোর নাই জ্ঞান নয়ন।'
গোপীনাথের উক্তি—'আগেতে মনে বুঝে দেখ না খুঁজে মানুষ আছে এই মানুষে।'

বাউলরা মানুষের মাঝে 'মানুষ রতন'কে খুঁজে পেতে চায়। এই তো তাদের সাধনা, এই তো তাদের মানবতা। বাউল গানে ইহমুখী মানবতার কথা যেমন আছে তেমনি ইহবিমুখ বৈরাগ্যের কথাও আছে। বাউলদের নৈরাশ্যবাদ এক অর্থে মানবতাবাদের পরিপোষক। জাগতিক মোহ ভগবৎ প্রেমের পথে বাধাস্বরূপ। সংসার বন্ধন ছিন্ন করে ভগবৎসত্তার কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ বাউল সাধনার মূল লক্ষ্য। এদের ঘর নেই কিন্তু পথ আছে, রয়েছে একতারা। তারা নিজেরা মুক্ত থেকে অন্যকে মুক্তির পথ দেখায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়—

সীমার মাঝে অসীম তুমি
বাজাও আপন সুর।

ভূতপূর্ব লালন সাঁই যেন তার গানে এ কথাটিকেই তুলে ধরেছিলেন—

আপন খবর জানলে পরে রে
ও যাবে অচেনারে চেনা।

বাউল সাধকের কথায় এই বিশ্বচরাচর 'তেনার'ই সৃষ্টি। বাউলের গানে রয়েছে—

ও মন দেহ ভরি সন্ধান করি
কোন্ মিস্ত্রি এ বানাইছে।

আমরা অহং বোধে 'এটা আমার, এটা তোমার' বলে উঠি, আসলে কোনটাই আমাদের নিজস্ব নয়—'ঐ মিস্ত্রি তালি দিলেই সব ফক্কা'। একথা ভাববার বোঝা হয় প্রকৃতিপ্রেম, মানবপ্রেম ও ঈশ্বরপ্রেম—ত্রিধারা এখানে এক হয়ে গিয়ে 'একে চন্দ্র ঐটি চরণাবৃন্দ (ব্রহ্ম) সত্তাতে একাকার হয়ে গেছে। এই বিস্ময়ের ধারা বাউল-চর্চার মাধ্যমে যুগের পর যুগ চর্চিত হয়ে শুধু সংকীর্ণ মানবিকতায় নয়, বিশ্বমানবিকতায় একাকার হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথের কথায় বলা যায়, 'ভুবনেশ্বর হে মোচন কর বন্ধন তব মোচন হে।' বাউল ব্যক্তির মুক্তিতে বিশ্বাস করে না, বাউল সাধকেরা বিশ্বমানবতার মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করে—

অজ্ঞানং তিমিরান্ হে গুরু নাশ কর
জ্ঞান অঞ্জন নয়নে দাও।

বিশ্বমানবতার মুক্তি না হলে ব্যক্তি ও ব্যক্তিসত্তা পূর্ণতা পায় না। তাই বাউল সাধনা ব্যক্তির ঊর্ধ্বে উঠে বিশ্বমানবতার ধ্বজাকে তুলে ধরেছে।

তথ্যের সন্ধানে

১. উপেনাথ ভট্টাচার্য : 'বাংলার বাউল ও বাউল গান', ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা,

তৃতীয় সংস্করণ, নববর্ষ ১৪০৮
২. সুধীর চক্রবর্তী : 'বাউল ফকির কথা', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০১০
৩. সুকুমার সেন : 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস', দ্বিতীয় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১২
৪. ভূদেব চৌধুরী : 'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা'।
৫. শক্তিনাথ ঝা : 'বস্তুবাদী বাউল', লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী কেন্দ্র, কলকাতা,
৬. শক্তিনাথ ঝা : 'বাউল ফকির পদাবলী' প্রথম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১১

জাতি ধর্মের ঊর্ধ্বে লালন ও তার বাউল গান

অনামিকা মুখার্জি

সমগ্র বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে লালন সবচেয়ে বেশি গান রচনা করেছেন, বা যে কোন কারণেই হোক তাঁর রচিত গানগুলি ভালোভাবে রক্ষিত হয়ে সবচেয়ে বেশি প্রচার সৌভাগ্য লাভ করেছে। বিগত প্রায় একশ বছর ধরে তাঁর সঙ্গে ক্রমাগত ভাবাবেগ যুক্ত হয়ে তাঁকে প্রায় মহাকবির স্তরে তুলে আনা হয়েছে।

মহম্মদ আবুতালিবের গবেষণা লব্ধ ফল— 'তিনি জন্মগতভাবে মুসলিম সন্তান এবং সুফি সম্প্রদায় ভুক্ত ফকির ছিলেন।'[১] এখন প্রশ্ন এই যে, মুসলিম সুফি সম্প্রদায় আর বাংলার বাউলদের মধ্যে পার্থক্যই বা কি? তাঁরা কি ধর্ম-সাধনা ক্ষেত্রে সমগোত্রীয়? ড. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মনে করেন বাংলার বাউলেরা 'মিথুনাত্মক যোগসাধক' (কামাচারী বা বামাচারী)। তাঁদের সাধনা-দেহবাদী জড়-সাধনা মাত্র। প্রকৃত ঈশ্বর-বিশ্বাস বা ঈশ্বরোপসনা তাঁদের সাধনার অঙ্গীভূত নয়। পক্ষান্তরে, সুফিরা অধ্যাত্মবাদী প্রেমোপাসক। ইসলামের সুনির্দিষ্ট সাধন পথের মাধ্যমে খোদা-প্রেমে আত্মবিলয় (ফানা) লাভ ও অনন্ত জীবনে উত্তরণই (বাকা) তাঁদের সাধনার চরম ও পরম কথা। এমতাবস্থায় সুফি সাধনার মধ্য থেকে বাউল সাধনা ও বাউল ধর্মের জন্ম যে কি করে হতে পারে, তা বুঝে ওঠা সত্যিই মুশকিল। কিন্তু আরো মুশকিলের ব্যাপার এই যে, ড. ভট্টাচার্য তাঁর 'বাউল গানে' এমন সব কবি ও সাধকের বাণী ও জীবনী উদ্ধৃত করেছেন, যাঁরা, তাঁরই দেওয়া সংজ্ঞা অনুযায়ী, আদৌ বাউল নন অথবা কেবল মাত্র 'সখের বাউল'। তাই তাঁর বাউল মত ও বাউল গানের মধ্যে বিরোধ ঘটেছে স্বাভাবিকভাবেই।

ড. ভট্টাচার্য বাংলার বাউল গীতিকারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং পথিকৃৎ হিসেবে লালন শাহকে চিহ্নিত করেছেন বিশেষভাবে। কিন্তু এমন মতও পাওয়া যায়, লালন শাহ একজন সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। তিনি 'বাউল' বা 'সাধু সেবা' দলের মধ্যে কেউ নন।[২] এরকম বহু মত লালন সম্পর্কে প্রচলিত। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তথাকথিত বাউলতত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামাননি। তাঁর সহজ রসবোধ লালনের গানের প্রতি তাঁকে আকৃষ্ট করে। প্রধানত রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে অনুপ্রাণিত হয়ে অধ্যাপক মনসুর উদ্দীন, শ্রীবসন্তকুমার পাল প্রমুখ উৎসাহী তরুণগণ তখন থেকেই 'হারামণি' সংগ্রহে অগ্রসহ হন।

যাই হোক, আপাতত মহম্মদ আবু তালিবের গবেষণা লব্ধ ফলকেই সঠিক বলে ধরে

নেওয়া যাক। ১১৭৯ সালের ১ কার্তিক যশোর জেলার হরিশপুর গ্রামের সম্ভ্রান্ত দেওয়ান। পরিবারে লালনের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম দরীবুল্লাহ দেওয়ান। খুব সম্ভবত, লালনের পূর্ব পুরুষ কেউ বিচারক ছিলেন। স্নেহাস্পদ লুৎফর রহমান একটি প্রাচীন টুকরো কাগজে লালনের পিতার নাম দেয়নেত কাজী শব্দটি পেয়েছেন। এই 'দেয়নেত' 'দেওয়ান' শব্দের অপভ্রংশ বলে মনে হয়। দাদার নাম গোলাম কাদির (দেওয়ান) ও মাতার নাম আমিনা খাতুন। দুদ্দু শাহের ভাষায়—

এগারোশো ঊনআশি কার্তিকের পহেলা।
হরিশপুর গ্রামে সাইর আগমন হৈলা॥
গোলাপ কাদের হন দাদাজী তাহার।
বংশ পরম্পরায় বাস হরিষপুর মাঝার॥
দরীবুল্লাহ দেওয়ান তার আব্বাজীর নাম।
আমিনা খাতুন মাতা এবে প্রকাশিলাম॥

তাই একথা নিশ্চিত হয়ে, হরিশপুর গ্রামে তাঁদের আদি বাসভূমি। (বংশ পরম্পরা বাস) ছিল এবং তিনি এক বিশেষ খানদানি পরিবারের হতভাগা সন্তান ছিলেন। কেননা অতি অল্প বয়সেই তিনি মাতা-পিতা হারা হন।

শিশুকালে সাইজীরে তাঁরা ছাড়ি গেলা।
অনাথ হইল চাঁদ বিধাতার খেলা॥
এমনি নিদান কালে বৈশাখ মাসে।
শিরাজ সা দরবেশে দেখে নিল ঘরে॥

বাল্য ও কৈশোরের নানা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে শিশু লালন দরবেশ সিরাজ শাহের আশ্রয় লাভ করেন। সিরাজ শাহ গরীব হলেও একেবারে নিঃস্ব ছিলেন না। তিনি আবার আমানত উল্লাহ শাহ নামে এক সুফি সাধকের মুরীদ ছিলেন। এই সিরাজ শাহের কাছেই লালন যথা সময়ে এবং যথা-রীতি সুফি মতে দীক্ষিত হন। বলা বাহুল্য, দীক্ষাকালে সিরাজ তাঁর পীর প্রদত্ত খিরকা খানিও তাঁর শিষ্যকে উত্তরাধিকার হিসেবে দান করেন। সিরাজ শাহের পীর আমানত উল্লাহ শাহ চট্টগ্রাম নিবাসী ছিলেন। অদ্যাবধি তাঁর বিখ্যাত দরগাহ চট্টগ্রাম বখশী বাজারে অবস্থিত রয়েছে। দূরদূরান্তর থেকে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা তাঁর মাজার যিয়ারত করতে আসেন। এর অল্প দিন পরে সিরাজ শাহ ও তাঁর স্ত্রী মারা যান। তখন লালনের বয়স ২৬ বছর। এই ঘটনাটি ঘটে ১২০৫ সালে। এরপর লালন নবদ্বীপে বৈষ্ণব তীর্থ দর্শন করতে যান। এই নবদ্বীপে থাকাকালে পদ্মাবতী নামে এক বিধবা ক্ষত্রিয় রমণীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। বিধবা লালনের চেহারায় মৃত পুত্রের আদল দেখে তাঁকে পুত্র সম্বোধন করে নিজে গৃহেই স্থান দান করেন। লালনও বিধবার ব্যবহারে হারানো মাতৃত্বের আস্বাদ পেয়ে মুগ্ধ হন। ফলে এই বিধবার পুত্র পরিচয়ে নবদ্বীপে কিছুদিন তিনি দিন অতিবাহিত করেন।

পদ্মাবতী নামে এক বিধবা রমণী।
নিজাবাসে লয়ে গেল সেই ক্ষত্রধনী॥

হরিশপুর গ্রামবাসীদের মুখেই এ-কাহিনি শোনা গেছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, বসন্তবাবুর মতে, পদ্মাবতীই লালনের আসল মা এবং তাঁর মাতামহ ভস্মদাস। লালন জীবনীর সংগ্রাহক বসন্তবাবুর লালন সম্পর্কিত প্রথম প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ১৩৩২ সালের 'প্রবাসী' পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায় (মহাত্মা লালন ফকির : বসন্ত কুমার পাল, প্রবাসী, কলিকাতা, ১৩৩২)। বসন্তবাবু এই প্রবন্ধে লালনকে জন্মগতভাবে কায়স্থ সন্তান বলে উল্লেখ করেন; এবং তাঁর জন্মস্থান হিসেবে নদিয়া (বর্তমান কুষ্টিয়া) জেলার ভাঁড়ারা গ্রামকে চিহ্নিত করেন। পরে এই জীবনকাহিনি প্রামাণ্য বলে গৃহীত হয়; এবং অধ্যাপক মনসুর উদ্দীন প্রমুখ ব্যক্তি দ্বারা পুনর্গঠিত ও প্রচলিত হয়। ফলে মুসলিম সমাজে, বিশেষ করে স্পর্শকাতর বাহ্য শরীয়তপন্থী মহলে, লালন শুধু বে-শরা ফকির বা বাউল বলেই গণ্য হলেন না, সমকালে রংপুর থেকে প্রকাশিত 'বাউল ধ্বংস ফতওয়া' নামক পুস্তিকা থেকে জানা যায় যে, ফতওয়ায় তাঁকে মুসলমান জাতির এক নম্বর দুশমন, হিন্দু আর্য-সমাজীদের গুপ্তচর এবং ৬০/৭০ লাখ নিরীহ মুসলমানকে বিভ্রান্তকারী বলেও ঘোষণা করা হয়েছে।

নবদ্বীপ থেকে ফিরে এসে তিনি রাজশাহীর বিখ্যাত খেতুরের এক মেলাতেও গিয়েছিলেন (১২২২ সালের কোনো এক সময়ে)। খেতুরীর মেলায় তিনি 'নৌকাযোগে' গমন করেন এবং ফেরার পথে দারুণ বসন্ত ব্যধিতে আক্রান্ত হন। এই সময়ে তাঁর ভক্তদের মধ্যে কেউ সঙ্গে ছিল না। তাঁর পরিচয়ও হয়তো অজ্ঞাত ছিল, তাই নির্দয় নৌকাযাত্রীরা তাঁকে নদীর তীরে ফেলে রেখে গন্তব্য স্থানে চলে যায়। সৌভাগ্যক্রমে মলম নামে এক বক্তি তাঁকে নদীতীরে দেখে দয়াপরবশ হয়ে নিজ বাড়িতে নিয়ে যায়। এভাবে লালন নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পান।

এক মাস পরে তিনি ভগবানের কৃপায় ব্যধিমুক্ত হন। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, লালনের এই বসন্ত রোগে আক্রান্ত হওয়ার ব্যাপার নিয়ে বহুতর লোককাহিনি রচিত হয়েছে। তাতে লালনকে জন্মগতভাবে কায়স্থ সন্তানও বলা হয়েছে। মলম শাহ ছিলেন কালীগঙ্গা নদীতীরের ছেঁউড়িয়ার গ্রামবাসী। এইখানেই বর্তমানে লালনের দরগাহ বিদ্যমান। এখন থেকে লালন মলমের বাড়িতে (অর্থাৎ কুষ্টিয়া জেলার ছেঁউড়েতে) বাস করতে থাকেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই তিনি বিখ্যাত হয়ে উঠেন। তাঁর মৃত্যু হয় ১২৯৭ সালের ১ কার্তিক শুক্রবার। দুদ্দু শাহের ভাষায়—

> বরশত সাতানব্বই বাঙ্গালা সনেতে।
> ১ লা কার্তিক শুক্রবার দিবা অন্তে॥
> সবারে কাঁদায় মোর প্রাণের দয়াল।
> ওফাত পাইল মোদের করিয়া পাগল॥

মূল পুঁথিতে পঁচানব্বই আছে, কিন্তু পঁচানব্বই সালের ১ কার্তিক শুক্রবার নয়। পত্রিকায় 'হিতকারী' প্রাপ্ত বিবরণীতেও ১৭ অক্টোবর শুক্রবার বলা হয়েছে। এই শুক্রবার সাতানব্বই সাল হলেই ঠিক হয়।

দুদ্দু শাহ ব্যতীত লালন শাহ এবং লালন শাহ ব্যতীত দুদ্দু শাহ কল্পনাই করা যায় না। দুদ্দু শাহ লিখিত বিবরণী থেকে জানা যায়, যশোরের চরচড়িয়া গ্রাম নিবাসী লালনের অন্যতম

প্রিয় শিষ্য শুকুর শাহের আশ্রমে বসে একদিন লালন তাঁর আত্মজীবনী তাঁর প্রিয়তম শিষ্যকে শোনান। পরে সেই কাহিনিই দুদ্দু লিপিবদ্ধ করেন। তবে দুঃখের বিষয়, তিনি তা ছেপে প্রকাশ করেননি। দুদ্দু শাহের বিবরণিটি যশোরের আব্দুল লতীফ আফি আনহু সংগৃহীত।

কুষ্টিয়ার ছেঁউড়ে গ্রামে স্থায়ীভাবে আস্তানা করবার পূর্বে লালন যশোর জেলাস্থ তাঁর চড়িয়ার আখড়া-সংক্রান্ত যাবতীয় সম্পত্তি তাঁর শিষ্য শুকুর শাহকে দানপত্র করে দিয়ে যান। এই উত্তরাধিকারিত্বের নিদর্শনস্বরূপ লালন শাহ কৃত জমিনের একটি পাট্টা ও রেজিস্ট্রিকৃত দলিল ও তাঁরা অদ্যাবধি রক্ষা করেছেন। এই দলিলটি বাংলা ১২৮৮ সনে রেজিস্ট্রিকৃত হয়। তাতে লালনের পরিচয় লিখিত আছে—

পাট্টা গ্রহিতা
শ্রীলালন শাহ
পিতার নাম মৃত সেরাজ শাহ
জাতিয় মুসলমান
পেশা ভিক্ষা ইত্যাদি
সাং ছেওড়া
পুং ভ্রাহিমপুর
ভালুকাপুর রেজিস্টারী
কুমার খালী।

এখানে লালন নিজেকে মুসলমান বলেছেন এবং পিতার নাম 'সিরাজ শাহ' লিখেছেন। কিন্তু আসলে সিরাজ তাঁর পীর এবং পালক পিতার পেশা ভিক্ষাকে আধ্যাত্মিক অর্থে ধরতে হবে।

লালনের গানের বিষয়বস্তু আধ্যাত্মিক জীবনাশ্রিত। সাধারণভাবে একে সাধন-সংগীত বলে। অর্থাৎ জীবনের অভীষ্ট বস্তুর অনুভূতি ও আস্বাদন এবং সেই পথেই সাধনার সিদ্ধি ও পরমানন্দ লাভ। শ্রীচৈতন্যের জীবন ও ধর্ম-আন্দোলন লালন ফকিরকে আকৃষ্ট করেছিল। গৌরাঙ্গ যেমন জাতের বিচার মানেনি লালনও তাই—

সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে,
লালন বলে জাতের কি রূপ দেখলাম না এই নজরে।
কেউ মালা কেউ তজবি গলায়
তাইতে তো জাত ভিন্ন বলায়
যাওয়া কিংবা আসার বেলায়
জাতের চিহ্ন রয় কারে রে।
যদি সুন্নত দিলে হয় মুসলমান
নারীর তবে কি হয় বিধান।
বামন চিনি পৈতে প্রমাণ বামনী চিনি কিসেরে।

লালন ফকিরের জীবনে ও আচার-ব্যবহারে যে একটা উদার ধর্মভাবের কথা উল্লেখ আছে, তার গানে সেই ভাবটি এমন সুস্পষ্ট প্রকাশ পেয়েছে যে তাঁর দু'একটা গান উদ্ধৃত করলেই বোঝা যায়। তিনি মুসলমানদের গোঁড়ামি এবং হিন্দুর গোঁড়ামি উভয়ই সমান ঘৃণা করতেন

অথচ হিন্দুরা তাঁকে বৈষ্ণব গোঁসাই এবং মুসলমানেরা তাঁকে ফকির বলে পূজা করতো। তিনি জাতিবিচার করতেন না। লালন ফকির যদিও নিরক্ষর ছিলেন কিন্তু এই অশিক্ষিত ফকিরের গানে তাঁর ধর্মভাব ও কবি সুলভ সরস হৃদয়ের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে বিস্মিত হতে হয়। মনের মানুষের জন্য তাঁর যে এক গভীর প্রেমের পরিচায়ক—

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়
ধরতে পারলে মনবেড়ি দিতেম পাখির পায়।

কত সহজ সরল ভাষায় তিনি তাঁর সাধনার ধনের জন্য মনের আবেগ প্রকাশ করেছেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জমিদারি বিরাহিমপুর পরগণার অন্তর্গত ছেউড়িয়া গ্রামে কালীগঙ্গা নদীর ধারে লালন ফকিরের আখড়া ছিল। সে আখড়া এখনও আছে—তাঁর শিষ্যদের ১০/২৫ জন এখন সেখানে থাকে। শোনা যায় চট্টগ্রাম, রঙ্গপুর, যশোহর, নদীয়া প্রভৃতি জেলায় প্রায় দশ হাজার শিষ্য তাঁর ছিল। ছেউড়িয়ার আখড়ায় লালন ফকির সস্ত্রীক বাস করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর কুষ্টিয়ায় 'হিতকারী' নামক সংবাদ পত্রে তাঁর সম্বন্ধে যা প্রকাশিত হয়েছিল তা হল—

ফকির লালনের ধর্মজীবন বিলক্ষণ উন্নত ছিল। মিথ্যা জুয়াচুরিকে লালন ফকির বড়োই ঘৃণা করতেন। নিজে লেখাপড়া জানতেন না কিন্তু তাঁর রচিত অসংখ্য গান শুনলে তাঁকে পরম পণ্ডিত বলে বোধ হয়। তিনি কোনো শাস্ত্রই পড়েন নাই। কিন্তু বিলক্ষণ শাস্ত্রবিদ্ বলে বোধ হত। বাস্তবিক ধর্মসাধনে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি খুলে যাওয়ায় ধর্মের সারতত্ত্ব তাঁর জানবার অবশিষ্ট ছিল না। লালন ফকির নিজে কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মাবলম্বী ছিলেন না অথচ সকল ধর্মের লোকেই তাঁকে আপন বলে জানত। মুসলমানদের সঙ্গে আচার ব্যবহারে মিল থাকায় অনেকে তাঁকে মুসলমান বলে মনে করত। বৈষ্ণব ধর্মের মতো পোষণ করতে দেখে হিন্দুরা তাঁকে বৈষ্ণব বলে মনে করত। ইনি জাতিভেদ মানতেন না। নিরাকার পরমেশ্বরে বিশ্বাস দেখে ব্রাহ্ম বলে অনেকে ভুল করত। ইনি নামাজ পড়তেন না। তাই তাঁকে মুসলমান বলা যায় না, তবে জাতিভেদ বিহীন অভিনব বৈষ্ণব বলা যেতে পারে। যাইহোক তিনি একজন পরম ধার্মিক ও সাধু ছিলেন এ বিষয়ে কারও সন্দেহ নাই। ইনি বিষয়হীন ফকির ছিলেন না। ইনি সংসারী ছিলেন। সামান্য জোত জমি ছিল, বাড়ি ঘর ও ছিল। জিনিসপত্র ও মধ্যবর্তী গৃহস্থের মতো, নগদ টাকা প্রায় দু'হাজার রেখে মারা যান। তাঁর সম্পত্তির কিছু অংশ তাঁর স্ত্রীকে, কিছু অংশ ধর্ম কন্যা, কিছু অংশ শীতলাকে কিছু অংশ সৎকাজে প্রয়োগের জন্য ইনি উইল করে দেন। জীবনের শেষে তিনি উপার্জন করতে পারেন না। শিষ্যরাই তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করতো। বছরের শেষে শীতকালে একটি ভাণ্ডারা (মহোৎসব) দিতেন। তাতে সহস্রাধিক শিষ্যগণ একত্রিত হয়ে সংগীত ও আলোচনা হত। তাতে তাঁর ৫/৬ শত টাকা ব্যয় হতো। ১১৬ বছর বয়সেও তিনি অশ্বারোহণে স্থানে স্থানে যেতেন। মৃত্যুর প্রায় একমাস পূর্ব থেকে তাঁর পেটের রোগ হয় ও হাত পায়ের গ্রন্থি জলস্ফীত হয়। দুধ ভিন্ন অন্য কিছু খেতেন না। ধর্মের আলাপ পেলে নব বলে বলীয়ান হয়ে রোগের যাতনা ভুলে যেতেন। অনেক সম্প্রদায়ের লোক তাঁর সঙ্গে ধর্মালাপ করে রাত্রি পাঁচটার সময় শিষ্যগণকে বলেন 'আমি চলিলাম।' এর কিছুক্ষণ পরেই তিনি মারা যান। মৃত্যুকালে কোন সাম্প্রদায়িক মতানুসারে তাঁর অন্তিম কার্য সম্পন্ন হওয়া তাঁর অভিপ্রায় ও উপদেশ ছিল না। তাঁর জন্য মোল্লা বা পুরোহিত কিছুই লাগে নাই। হরিনাম কীর্তন হয়েছিল। তাঁরই উপদেশ অনুসারে আখড়ার মধ্যে একটি ঘরের ভিতর তাঁর

সমাধি হয়েছে।

> ১৮৯০ সালে লালন শাহ-র প্রয়াণের পর তাঁকে নিয়ে বাউল পক্ষীয় ও বাউল বিরোধী দু'টি দলই সক্রিয় হয়ে ওঠে। কলকাতার উচ্চমহলে ও বাংলায় শিক্ষিত সমাজে বিশেষত ঠাকুর বাড়ির প্রয়াসে এবং রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত উদ্যমে ছাপার অক্ষরে লালনের গান ও তাঁর মর্মরস প্রচারিত হয়। শুরু হয়ে যায় বাউল গান। সংগ্রহ ও সংকলনের নানামুখি উদ্যম। গড়ে ওঠে কয়েকটি সখের বাউলের দল। ক্রমে ক্রমে নানা গৌণ ধর্ম ও সম্প্রদায় একই সঙ্গে 'বাউল' এই সাধারণ (generic) বা বিশেষ (specific) সংজ্ঞায় আবদ্ধ হয়ে যায়। বাউল সুর বলে একটা অলীক অনির্ণীত ধরণ বাংলা গানে চেপে বসে।[৩]

বাউল-সাধনা, যেন মেথরের যাওয়া-আসার পথ ধরে ঠাকুর ঘরে আসা, এই যখন ছিল ভদ্রলোকদের ধারণা (এবং শ্রীরামকৃষ্ণেরও ধারণা)[৪] তখন হঠাৎ খবর এলো, লালন 'ফকির' নামে বাউলদের মধ্যে একজন বড়ো 'মহাত্মা' ছিলেন; তিনি আর ইহলোকে নেই। ১৮৯০-এর ৩১ অক্টোবর এই খবর 'হিতকারী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এর রচয়িতা ছিলেন সম্ভবত রাইচরণ দাস। তিনি লিখেছিলেন, তিনি অর্থাৎ লালন—

> ধর্ম্মজীবনে বিলক্ষণ উন্নত ছিলেন-নিজে লেখাপড়া জানিতেন না; কিন্তু তাঁহার রচিত অসংখ্য গান শুনিলে তাঁহাকে পরম পণ্ডিত বলিয়া মনে হয়। ...তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া যাওয়ায় ধর্ম্মের সারতত্ত্ব তাঁহার জানিবার অবশিষ্ট ছিল না... সকল ধর্ম্মের লোকই তাঁহাকে আপন বলিয়া জানিত।[৫]

লক্ষণীয়, শ্রীরামকৃষ্ণের যে সকল গুণ শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের একটি প্রভাবশালী অংশকে আকর্ষণ করেছিল, সে সমস্ত গুণই লালনের মধ্যেও যে ছিল, তা উদ্ধৃত সংবাদে বেশ জোড় দিয়ে বলা হল।

> এই বিবরণে প্রথমত লালনের 'ভদ্র'-লোকায়ত নীতিবোধ, দ্বিতীয়ত চূড়ান্ত নিরক্ষতা সত্ত্বেও চূড়ান্ত পাণ্ডিত্য এবং তৃতীয়ত তাঁর অন্তর্দৃষ্টি খুলে যাওয়া খুবই গুরুত্ব পেয়েছে। এই ধরনের কথা তো পরমহংস রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে আগে থেকে প্রচলিত ছিল। মধ্য 'ভিক্টোরিয়' 'ভদ্র'-লোকায়ত নীতিবোধের সঙ্গে নৈতিক ব্যবহারের সঙ্গে অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার সহাবস্থান প্রমাণিত এবং প্রচারিত না হলে তো ভদ্র-অভদ্র কোনও গুরুর পক্ষেই ভদ্রসমাজে কস্কে পাওয়া আদৌ সম্ভব ছিল না। 'হিতকারী' লালনের জন্য এই কাজটি করলেন।[৬]

ভৌগোলিক বিচারে যাকে 'মধ্যবঙ্গ' বলা যায় সেখানকার কয়েকজন বুদ্ধিজীবী লালনের ও তাঁর বাউল-সম্প্রদায়ের খোঁজ খবর রাখতেন। তাঁরা হলেন হরিনাথ মজুমদার, মীর মশারফ হোসেন ('হিতকরী' পত্রিকার সম্পাদক), জলধর সেন, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এবং রাইচরণ দাস। লালনের মতো এক গেঁয়ো, অথচ প্রকৃত 'মহাত্মা'র আবিষ্কারে একটা শোরগোল পড়ে গেল। এমনকি দক্ষিণেশ্বরের পুরোহিত রামকৃষ্ণের আবিষ্কারের পরেও দেখা গিয়েছিল।

উভয়ক্ষেত্রে ব্রহ্মজ্ঞানীদের ভূমিকা লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। শ্রীরামকৃষ্ণকে পরিচিত করালেন প্রধানত কেশবচন্দ্র সেন। লালনকে বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন জোড়াসাঁকোর ব্রহ্মজ্ঞানী ঠাকুর পরিবার। জোড়াসাঁকোঠাকুরবাড়ি থেকে উৎসারিত জোরালো প্রচার বাউল গানকে এবং লালনকে অমরত্ব দান করেছে।

কিছু ধর্মবেত্তা এবং শিক্ষিত সুধীজনের কাছে লালনের ধর্ম ও সাধনা নিন্দিত হয়েছে, তাঁর সাংগীতিক প্রতিভাও অস্বীকৃত হয়েছে। ত্রিপুরা জেলা মুসলিম ছাত্র সম্মেলনের চতুর্থ অধিবেশনে শিক্ষাবিদ ড. মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন মন্তব্য করেন যে—

> লালনসহ অন্যান্য লোককবি যে সব গান রচনা করে গেছেন 'তাহাতে যথেষ্ট রসবোধের পরিচয় নাই' এবং 'এগুলি গ্রাম্যতাদোষে দুষ্ট বলিয়া ভদ্র সমাজে স্থান করিয়া লইতে পারেন নাই।[৭]

তবে বাউলদের বিরুদ্ধে পরিচালিত আন্দোলন সম্পর্কে মুক্তমন বুদ্ধিজীবীদের কেউ কেউ প্রতিবাদ জানিয়েছেন। ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের নামে তাঁরা বাউলদের উপর অত্যাচার নিগ্রহকে সমর্থন করেননি। এঁদের মধ্যে কাজী আব্দুল ওদুদ, ক্ষিতিমোহন সেন প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। একটি গানে লালন বলেছেন 'এ দেশেতে এই সুখ হল, আবার কোথা যাই না জানি'-এই পঙ্‌ক্তিতে তত্ত্ব ছাপিয়ে তাঁর নিপীড়িত জীবনের মর্মবাণীই যেন ফুটে উঠেছে।

> লালন ফকির হিন্দু ছিলেন, নাকি মুসলমান ছিলেন, সেই বিতর্কের কোন সর্বগ্রাহ্য মীমাংসা এখনও হয়নি। কিন্তু, তিনি যে একজন প্রতিভাশালী কবি এবং উচ্চস্তরের সাধক ছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু যেহেতু সামাজিক বিচারে তাঁর কোন 'জাত' ছিল না তাই তিনি রামপ্রসাদ সেন অথবা কমলাকান্ত ভট্টাচার্যের মতো সম্মান এবং স্বীকৃতি পাননি। অথচ যে প্রতিভা তাঁর গীতাবলীতে দেখা যায়, তা যদি তিনি নিজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য ব্যবহার করতেন, কিংবা নিজের ঢাক নিজে পেটাতেন, তবে তিনি অমন অখ্যাত এবং অবজ্ঞাত হয়ে থাকতেন না। অন্তত এ বিষয়ে তাঁর কোন strategy ছিল না। এ ধরনের কোন Strategy of Survival সাহেবধনী সম্প্রদায় এবং বলরাম হাড়ি সম্প্রদায় অবলম্বন করেনি। লালনের সম্প্রদায়ে অবশ্যই কোন তথাকথিত 'ভদ্রলোক'-এর অস্তিত্ব ছিল কিনা, সন্দেহ।[৮]

বাউল-বিরোধী আন্দোলনের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস নেই, থাকলে জানা যেত কী অমানসিক অত্যাচার ও নির্মম নিগ্রহ এই মরমি সাধক বাউলদের সহ্য করতে হয়েছে। একতারার বিরুদ্ধে চলেছে লাঠির সংগ্রাম। বাংলার সামাজিক ও ধর্মীয় ইতিহাসে এ এক বেদনাদায়ক অধ্যায়।

> লালনের জীবৎকালেই তাঁর বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিক্রিয়ার সূচনা হয়। বাউল বা লালন-বিরোধী আন্দোলনের তথ্য খতিয়ান সংগ্রহ করলে এই প্রতিক্রিয়ার যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করা যাবে।[৯]

বাংলার বাউলের প্রাণপুরুষ ও কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব হওয়ার দরুণ প্রায় সব আঘাতই লালন অথবা তার শিষ্য-প্রশিষ্যের উপরে এসেছে। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেছেন—

> শরীয়তবাদী মুসলমানগণ লালনকে ভালো চোখে কোনদিনই দেখেন নাই। এক সংখ্যা গরিষ্ঠ দল লালনের খ্যাতি-প্রতিপত্তির দিনেও তাঁকে নিন্দা করেছে। এই বাউলপন্থী নেড়ার ফকিরেরা চিরকাল অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়েছে।[১০]

উৎসের সন্ধানে

১. মহম্মদ আবু তালিব : 'লালন শাহ ও লালন গীতিকা', ভূমিকা অংশ, বাংলা একাদেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৮

২. বসন্তকুমার পাল : 'মহাত্মা লালন ফকির' : 'হিতকারী' পত্রিকার বিবরণী, ১২৯৭, পৃ. ২৭
৩. সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত : 'বাংলার বাউল ফকির' : আত্মপক্ষ, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পৃ. ১৬
৪. শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, কলকাতা, Sobharani Basu, Some Mystics of Modern India (Varanasi, ১৯৭৯) ১৩৮৭, ৪, পৃ. ১৩৪, দ্রষ্টব্য
৫. আবুল আহসান চৌধুরী : 'লালন শাহ', ঢাকা, ১৩৯৯, পৃ. ১১৬-১১৯
৬. রমাকান্ত চক্রবর্তী : 'পশ্চিমবঙ্গে বাউল-ধর্ম বিষয়ক অধ্যয়নের বিভিন্ন ধারা', সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত, 'বাংলার বাউল ফকির' ১ম প্রকাশ ১৯৯৯, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পৃ. ৬৩-৬৪
৭. মহম্মদ মনসুরউদ্দিন : 'হারামণি' দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৭৮, পৃ. ২০৪
৮. সনৎ মিত্র সম্পাদিত : 'বাউল লালন রবীন্দ্রনাথ', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৫, পৃ. ১৩৮
৯. আবুল হাসান চৌধুরী : 'সামাজিক প্রতিক্রিয়া লালন-বিরোধী আন্দোলন', সনৎ মিত্র সম্পাদিত, 'বাউল লালন রবীন্দ্রনাথ', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৫, পৃ. ১৬৩
১০. ড. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : 'বাংলার বাউল ও বাউল গান', ১৩৭৮, পৃ. ৫৪৫

সোমালি চক্রবর্ত্তী

বিদ্যাপতি শুনি চণ্ডীদাস-গুণ দরশনে ভেল অনুরাগ! শ্রী শচীন্দ্রনাথ অধিকারী তাঁর 'শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের ১৬৫ পৃষ্ঠায় "লালন ফকিরের সঙ্গে মোলাকাৎ" প্রবন্ধে উদ্ধৃতিটি এভাবে ব্যবহার করলেও পদকর্তা বৈষ্ণবদাস সংকলিত এবং সতীশচন্দ্র রায় পরিবর্ধিত ও সম্পাদিত "শ্রী শ্রী পদকল্পতরু" গ্রন্থের সঠিক সংস্করণ ১৯১৮, ৪র্থ শাখার ২৬শ পল্লব, পদসংখ্যা ২৩৮৯-তে উদ্ধৃতিটি এভাবে পাওয়া যায়—"চণ্ডীদাস শুনি বিদ্যাপতি/দরশনে ভেল অনুরাগ।" সেকালের এই দু'জন কবির আলাপ পরিচয় হয়েছিল কিনা তা নিয়ে আজও গবেষণা চলছে। ঠিক একইভাবে আধুনিক বাংলার অপর দুই মরমি কবি যে পল্লির নিভৃতকুঞ্জে মিলিত হয়েছিলেন ও কাব্যলক্ষ্মীর তপোবনে বসে পরস্পর রসালাপে মগ্ন হয়েছিলেন, তারও সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। শচীন্দ্রনাথ অধিকারীর মতানুযায়ী যুবক রবীন্দ্রনাথ যখন সপরিবারে শিলাইদহ কুঠিবাড়িতে জমিদারি-সংক্রান্ত কাজের জন্য অবস্থান করছেন তখন বিখ্যাত সন্ত পল্লীকবি লালন সাঁই ফকিরের সঙ্গে তাঁর দেখা হল। তাঁদের এই প্রথম মিলনের কাহিনি গল্প-উপন্যাসের মতো।

জমিদারির দরবার চলাকালীন প্রজাদের পিছনে একজন বৃদ্ধকে লক্ষ করলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর কোনো কাজ ছিল না, বক্তব্যও ছিল না। তবু সে নীরবে তিন-চার ঘণ্টা দু'চোখ ভরে দেখেছিল রবীন্দ্রনাথকে। ফর্সা গায়ের রং, গায়ে, মুখে বসন্তের দাগ, মাথার লম্বা চুল ঝুঁটি করে বাঁধা, মুখে পাকা লম্বা দাড়ি, নারদ ঋষির মতো। চেহারাটা বেশ দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো। রবীন্দ্রনাথ বেশ কয়েকবার সেই সৌম্য বিহ্বল মুখটির দিকে তাকালেন, তার সঙ্গে কথা বলতে উৎসাহিতও হলেন কিন্তু প্রজাদের দরবারের গোলমালে পরিচয়ের সুযোগ পেলেন না। স্নানাহার সেরে আসার পর ছেলেমেয়েদের হাস্যকলরব শুনে তার কারণ জানতে চাইলে বড় মেয়ে তার হাতে ধরিয়ে দেয় এক অদ্ভুত লাঠি। গ্রাম্য ঐ লাঠিটা তেলে জলে পেকে ঘোর কালো কুচকুচে হয়ে গেছে, লাঠিটার হাতল সাপের মুখের মতো বাঁকা, নানারকম কারুকাজ করে সেটাকে হুবহু সাপের আকৃতি দেওয়া হয়েছে। অদ্ভুত সেই লাঠি ঘিরেই ছেলেমেয়েদের কৌতূহল। চাকরদের ডেকে রবীন্দ্রনাথ ওই লাঠির মালিকের খোঁজ করতে লাগলেন। রহস্যের আবরণে কোথা থেকে এই অদ্ভুত দর্শন সুন্দরকারুকার্যখচিত লাঠিটি এসে পড়ল শিলাইদহ কুঠিবাড়িতে! এ কার অভিজ্ঞান? এ কোন্ অচেনা-অজানার স্মরণচিহ্ন?

হয়ধর মিঞা নামে ছেঁউড়িয়ার একজন বরকন্দাজ বললেন এ লাঠি তাদের গ্রামের লালন সাঁই ফকিরের। সকালে ছেঁউড়ের প্রজারা দরবার করতে এসেছিল, তাদের মধ্যে লালন ফকিরও ছিল। রবীন্দ্রনাথ আগে সেই বিখ্যাত ফকিরের নাম শুনেছিলেন, কিন্তু কোনোদিন চোখে

দেখেননি। লালন ফকির তাঁর দরবারে এসেছিলেন অথচ তার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেলেন না এই ভেবে রবীন্দ্রনাথের মনে খুব আফশোস হল। সকালবেলাকার সেই সৌম্যমূর্তি বৃদ্ধের চেহারাটি রবীন্দ্রনাথের মনে পড়ে গেল। তিনি ফকিরের ঐ সুন্দর অপরূপ লাঠিখানা ভালো করে নেড়েচেড়ে দেখলেন, সাঁইজির এই অভিজ্ঞান যত্ন করে নিজের কাজে রাখলেন তিনি। হুকুম দিলেন একজন আম্‌লা গিয়ে যেন ছেঁউড়ে থেকে সসম্মানে লালন- সাঁইকে সঙ্গে নিয়ে আসে। হুকুম তামিল হল। পরদিন বিকালে ঐ সাপমুখো লাঠির মালিক বৃদ্ধ লালনসাঁই ফকির এলেন রবিবাবুর সঙ্গে দেখা করতে। সৌম্যমূর্তি বৃদ্ধ মরমি কবি, মুখে পাকা লম্বা দাড়ি, হাতে সুন্দর একটি একতারা, যেন দেবর্ষি নারদ এলেন বীণা যন্ত্রটি হাতে করে রাজার সভায় নিমন্ত্রিত হয়ে। লালনের সঙ্গে এলেন তাঁর এক প্রিয় শিষ্য। পল্লীকবি লালন সাঁইজির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আলাপ পরিচয় জমে উঠল। জমিদার রবীন্দ্রনাথ নিমেষে কবি রবীন্দ্রনাথে পরিবর্তিত হয়ে গেলেন। অনেকক্ষণ আলাপ-আলোচনার পর সাঁইজি একতারা বাজিয়ে গাইলেন—

আমি একদিনও না দেখিলাম তারে—
আমার বাড়ির কাছে আরশিনগর,
তাতে এক পড়শি বসত করে।...
সে আর তার লালন একখানেই রয়
তবু লক্ষ যোজন ফাঁক রে!
আমি একদিনও না দেখিলাম তারে।

রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়ে গেলেন ঐ অখ্যাত অজ্ঞাত অশিক্ষিত পল্লীকবির মরমি গান শুনে। আরও গান চলল, সুরের পর সুর, ভাবের পর ভাব। অমৃতের ঢেউ বয়ে গেল সেদিন দুই কবির নিবিড় পরিচয়ের মধ্যে। জমিদারির সব কাজ রইল বন্ধ। কবি রবীন্দ্রনাথ সেই অজ্ঞাত মরমি পল্লীকবির প্রাণরসের নির্ঝরে ডুবে গেলেন। তাঁর বিশ্বজনীন ধর্ম, প্রতি মনুষ্যে ব্রহ্মদর্শনের স্বরূপ, ভগবানের বিচিত্র লীলারসের আস্বাদান নিয়ে তাঁর স্বরচিত গানের মাধ্যমে আলাপ চলল। লালনের কোন্ জাত জিজ্ঞেস করায় তিনি গাইলেন—

সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে।
লালন ভাবে জেতের কি রূপ, দেখলাম না এ নজরে
যদি সুন্নৎ দিলে হয় মুসলমান,
নারীর তবে কি বিধান,
বামুন চিনি পৈতে প্রমাণ, বাম্‌নি চিনি কিসে রে?
জগৎ বেড়ে জাতের কথা
লোকে গৌরব করেন যথা তথা,
লালন সে জেতের ফাতায়
বিকিয়েছে সাথ বাজারে।

লালন সাঁই জাতিভেদের সংকীর্ণ গণ্ডির বাইরে। তার পরিচয় 'অমৃতস্য পুত্র'। তিনি সর্বভূতে বিরাজমান ভগবানের সন্ধানী। তিনি হিন্দুও নন, মুসলমানও নন, তিনি মানুষ। পরম সমাদরে পল্লীকবির সেই অপরূপ স্মরণচিহ্ন সাপমুখো লাঠিগাছটি তাঁর হাতে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ সাঁইজিকে

আলিঙ্গান করলেন। সবাই বুঝলো সেই সাপমুখো অপরূপ লাঠিগাছই কবি-মিলনের দূত।

এই তো গেল প্রথম দর্শন ও আলাপের কাহিনি। এরপরেও বেশ কয়েকবার লালন সাঁইজির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাত হয় বলেই মনে করেন শচীন্দ্রনাথ অধিকারী। রবীন্দ্রনাথ বাউল, ফকির, কীর্তনীয়া, কবিয়ালদের গান শুনতে বড়ই ভালোবাসতেন। কত জ্যোৎস্নালোকিত শারদ রাত্রে পদ্মাবক্ষে তাঁর বজরার ছাদে বসে তিনি নিভৃতে সাঁইজির মরমি তত্ত্বসংগীত বিভোর হয়ে শুনতেন—'আমার এ ঘরখানায় কে বিরাজ করে!' শিলাইদহ কাছারি পুণ্যাহে, মেলায় এবং অন্যান্য অনেক উৎসবে রবীন্দ্রনাথ সদলবলে ডেকে এনেছেন লালন সাঁইকে। আবার কখনো কখনো ঘোড়ায় চড়ে লালন ফকির একাও এসেছেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে। একবার গুরুদেব নিজেই গিয়েছিলেন ছেঁউরিয়া গ্রামে সাঁইজির আশ্রম দেখতে।

সাঁইজি বহুদিন বেঁচে ছিলেন। তিনি ১১৬ বছর বয়সে দেহরক্ষা করেন। তিনি হিন্দুর ছেলে হলেও মুসলমানের হাতে মানুষ। রবীন্দ্রনাথ সাঁইজির মৃত্যুর পর তাঁর সমাধির উপরে একটি পাকা স্মৃতিমন্দির তৈরি করে দিয়েছিলেন সম্ভবত ১৩১১ বঙ্গাব্দে। সাঁইজি নিঃসন্তান হলেও তাঁর বহু শিষ্য ছিল, তাঁরা কেউই জাতিভেদ মানতেন না। হিন্দু-মুসলিম সকলেই তাঁর শিষ্য হতে পারতো। একারণেই হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজেই তাঁরা একঘরে ছিল। ভিক্ষাই ছিল তাঁদের একমাত্র উপজীবিকা। রবীন্দ্রনাথ সাঁইজিকে কিছু জমি দান করেন বিনা নজরে এবং আশ্রমের জমির খাজনাও মাফ করে দেন। প্রথম জীবনে সাঁইজির সঙ্গে এই অন্তরঙ্গ আলাপ পরিচয়ের ফলেই রবীন্দ্রনাথ বাউলসংগীত ও সহজ-সাধনের উপর আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাই তাঁর রচিত বাউল সংগীতের সুধাস্রোত বাংলার কানের ভিতর দিয়ে মরমে গভীর আকুলতা এনেছে—

তোমায় নতুন করেই পাবো ব'লে হারাই ক্ষণে ক্ষণ
ও মোর ভালোবাসার ধন।
দেখা দেবে ব'লে তুমি হও যে অদর্শন,
ও মোর ভালোবাসার ধন॥

শচীন্দ্রনাথ অধিকারী এভাবেই লালন ফকিরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাৎ ও তার পরবর্তীকালে উভয়ের গভীর সম্পর্কের সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর গ্রন্থে। 'পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ' এবং 'রবীন্দ্রনাথ ও শিলাইদহ'—এই দু'টি গ্রন্থেই ঠাকুর এস্টেটের কর্মচারী শ্রী শচীন্দ্রনাথ অধিকারী রবীন্দ্র-লালন সাক্ষাতের পরিচয় দান করেছেন গল্পের ছলে। শ্রী শচীন্দ্রনাথ অধিকারী ছিলেন ঠাকুর এস্টেটের বহুদিনের কর্মচারী, তিনি এই কাহিনি শোনেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এস্টেটের বরকন্দাজ হায়দার মিঞার কাছ থেকে। শ্রী শচীন্দ্রনাথ তাঁর কাহিনির সত্যতা কখনোই অস্বীকার করেননি। তবুও উভয় গ্রন্থেই কাহিনির বিস্তারিত বর্ণনা শেষে প্রকাশক মহাশয় কেন ফুটনোটে লিখেছেন, অনুসন্ধানের দ্বারা জানা গেছে সত্য কাহিনির নায়ক রবীন্দ্রনাথ নন, তাঁর দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ—তা এখনও বোঝা যায়নি।

বস্তুত, রবীন্দ্রচিন্তার বিশ্বমুখী অভিযানে মরমি কবি লালন শাহ সকলের অগোচরে নিভৃতে নাবিকের কাজ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন স্থানে, ফকিরের গান নিয়ে আলোচনা করেছেন, অথচ তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে কিনা এ সম্পর্কে কোথাও কিছু লিখে যাননি। তা আজও আমাদের কৌতূহলের বিষয়।

রবীন্দ্রনাথ সর্বমোট ২৯৮টি লালনগীতি সংগ্রহ করেছিলেন এবং সেগুলি বর্তমানে

বিশ্বভারতীর 'রবীন্দ্রভবনে' সংরক্ষিত আছে।[১] শান্তিদেব ঘোষ বলেছেন—গুরুদেব লালনের শিষ্যদের কাছ থেকে হাতে লেখা ২৯৮টি গানের দুটি খাতা সংগ্রহ করেছিলেন। ড. সনৎকুমার মিত্র সেই খাতা দুটি থেকে গানগুলি সংগ্রহ করে, 'লালন ফকির : কবিও কাব্য' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন।[২] শচীন্দ্রনাথ অধিকারী ছিলেন ঠাকুর এস্টেটের বহুদিনের কর্মচারী, তিনি এই কাহিনি শোনেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এস্টেটের বরকন্দাজ হায়দার মিঞার কাছ থেকে। এ বিষয়ে অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মতে ছেউড়িয়া লালনের আখড়া থেকে গানের খাতা আনিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর এস্টেটের একজন পুরাতন কর্মচারী বামাচরণ ভট্টাচার্যকে দিয়ে নকল করিয়ে নেন। অধ্যাপক ভট্টাচার্য 'পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ'-এর লেখক শচীন্দ্রনাথ অধিকারীর মতানুসারে বামাচরণ ভট্টাচার্যের নাম উল্লেখ করেছেন। শচীন্দ্রনাথ নিজেও ঠাকুর এস্টেটের কর্মচারী ছিলেন। তাঁর কথার ভিত্তিতেই অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ওই মন্তব্য করেছেন।[২]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে লালন ফকিরের দেখা সাক্ষাৎ হয়েছিল কিনা এ সম্পর্কে অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দিন 'বাউল কবি লালন শাহ' গ্রন্থের ২য় সংস্করণে আলোচনা করেছেন।[৩]

> গোঁসাই গোপাল শিলাইদহের একজন বাউল ছিলেন, তাঁর বাবা রামলালও একজন বাউল ছিলেন। গোঁসাই গোপালের পুত্র কুষ্টিয়ায় একজন ব্যবসায়ীর সাহায্যে গোঁসাই গোপালের প্রায় একশত গান পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেন। এতে উল্লেখ রয়েছে যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে লালনের দেখা-সাক্ষাৎ হয়।

অধ্যাপক মুহম্মদ মুনসরউদ্দিন লালনের ছেউড়িয়া আখড়ার কয়েকজন শিষ্যের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে জানতে পারেন যে রবীন্দ্রনাথ লালনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য অধ্যাপক মনসুরউদ্দিন নিজেও এ সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন না এবং তিনি জীবিতকালে এ সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হননি। রবীন্দ্রনাথ নিজেও বলেছেন, 'শিলাইদহে যখন ছিলাম বাউলদের সঙ্গে আমার সর্বদা সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা হতো।" এই প্রসঙ্গে নন্দলাল সেনগুপ্তের কাছে রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠির কিছু অংশ থেকে জানা যায়—

> বাউলের গান শিলাইদহে খাঁটি বাউলের মুখে শুনেছি ও তাদের পুরাতন খাতা দেখেছি। নিঃসংশয়ে জানি বাউল গানে একটা অকৃত্রিম বিশিষ্টতা আছে, যা চিরকেলে আধুনিক। হাল আমলের কলেজ পাস করা সেটা জাল করতে পারে না, সে তাদের ক্ষমতার অতীত। ইংরাজি পড়া বাউলের গান আছে, দেখেছি তা, তা অস্পৃশ্য। আমার অনেক গান বাউল ছাঁচের, কিন্তু জাল করতে চেষ্টা করিনি, সেগুলো স্পষ্টত রবীন্দ্র বাউলের রচনা। কিন্তু কাব্য পরিচয়ে যে বাউল গানগুলো আছে সে আমার মাথায় কিংবা কলমে আসত না, লোক ঠকাতে গেলে নিশ্চয় ধরা পড়তুম।"

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই খাঁটি বাউলের নাম কোথায় প্রকাশ করেননি। এমনকি বাউলের পুরাতন খাতার আসল মালিককে সে সম্পর্কেও কোনো মন্তব্য রেখে যাননি। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সাহিত্যে ও সংগীতকর্মে বাউলের প্রভাব অত্যন্ত গভীর এবং আবেগ আশ্রিত। বাউল ধর্ম এবং দর্শনকে তিনি তাঁর জীবনদর্শন বলে গণ্য করেছেন। অবশ্য তাঁর এই বিশ্বাস একজন সাহিত্যিকের মন ও ভাবনাপ্রসূত, বাউলদের গুপ্ত সাধনা কিংবা রীতিনীতির সঙ্গে তা সম্পৃক্ত

নয়। বাউলদের বহিরঙ্গে যে জীবনবোধ উদ্ভাসিত হয়েছিল তাকেই রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছিলেন। তাদের অসাম্প্রদায়িক চেতনা, মানবিক মূল্যবোধ, জাতিভেদ প্রথাকে অস্বীকার করে সর্বধর্মকে সমন্বিত করার যে প্রচেষ্টা এবং সর্বোপরি তাদের গান রবীন্দ্রনাথকে আশৈশব প্রাণিত করেছিল। যাতায়াতের সুবিধা এবং কলকাতা শহর নদীয়া-কুষ্টিয়ার নিকটবর্তী হওয়ায় অনেক বাউল কলকাতার রাজপথে একতারা হতে ঘুরে ফিরেছে গান গেয়ে। রবীন্দ্রনাথ সে সব গান শুনেছেন এবং বাউলদের দেখেছেন। ছেলেবেলা থেকেই শহর কলকাতার বাইরের জীবন তাঁকে বারবার আকর্ষণ করেছে। এমনি সময়ে দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের হাত ধরে শিলাইদহ অঞ্চলে এসেছিলেন। তখন কুষ্টিয়া ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে লালন খ্যাতি তুঙ্গে। বাউলদের প্রতি গানে তার রচয়িতার নাম থাকে। লালন তখন অত্যন্ত জনপ্রিয় থাকায় বাউল ফকিরেরাও তার গান প্রায়ই গাইত। এমনিভাবেই লালন ফকিরের নাম ছড়িয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথও তাঁর গান শুনেছিলেন। কলকাতা থেকে বেরিয়ে আসার পর খুব স্বাভাবিক ভাবেই এই বাউল সাধককে দেখার বাসনা ছিল তাঁর। শিলাইদহে দীর্ঘকালের যাতায়াত ও অবস্থানের দরুণ বাউলদের প্রতি তাঁর গভীর মমত্ববোধ তাঁর বিভিন্ন রচনায় প্রতিফলিত হয়। এই প্রসঙ্গে একটি কবিতার উল্লেখ করা চলে—

কতদিন দেখেছি ওদের সাধককে
একলা প্রভাতের রৌদ্র সেই পদ্মানদীর ধারে
যে নদীর নেই কোন দ্বিধা।
পাকা দেউলের পুরাতন ভিত ভেঙ্গে ফেলতে।
দেখেছি একতারা হাতে চলেছে গানের ধারা বেয়ে
মনের মানুষকে সন্ধান করবার
গভীর নির্জন পথে।[৭] **—পত্রপুট, ১৫**

প্রশ্ন ওঠে সেসময় রবীন্দ্রনাথ কোন বাউলকে দেখেছিলেন। গগন হরকরা নামে শিলাইদহ পোস্ট অফিসে তখন একজন ডাক হরকরা ছিলেন। তাঁকে রবীন্দ্রনাথ প্রতিদিনই দেখতেন। তাঁর গানও শুনেছেন। তবে যাঁর গান সংগ্রহে উদ্বুদ্ধ হন রবীন্দ্রনাথ, তিনি ছিলেন লালন ফকির। ইংরাজি ১৮৮৯ সালের মে মাসে গুরুদেবের অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর লালন সাঁই-এর একটি রেখাচিত্র আঁকেন। এটি তিনি এঁকেছিলেন পদ্মার নদীবক্ষে, বোটের উপর সাঁই-এর। এটিই লালনের একমাত্র প্রামাণ্য প্রতিকৃতি। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে উচ্চদরের একজন বাউল সাধক বলে জেনেছিলেন। প্রতিকৃতিটি আঁকার সময় গুরুদেব শিলাইদহে ছিলেন কিনা বা তখন তাঁর সঙ্গে সাঁইজির যোগাযোগ হয়েছিল কিনা তা জানা যায় না। সাঁইজি যে ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন তাঁর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অঙ্কিত ঐ স্কেচ। কিন্তু আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরই বা কেন এ বিষয়ে কোনো বিবরণ লিপিবদ্ধ করে যাননি? শচীন্দ্রনাথ অধিকারী লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ ১৩১১ বঙ্গাব্দে লালন ফকিরের সমাধি বাঁধিয়ে দেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথও সে বিবরণের কোনো ইতিহাস লিখে যাননি। লালন ফকিরের একটি গানে রবীন্দ্রনাথের উল্লেখ আছে।

মন তুমি গুরুর চরণ ভুল না
গুরু বিনে এ ভুবনে পারে যাওয়া ঘটবে না
পারে যদি যাবি রবি ঠিক রাখ মন ষোল আনা
সে পারের সম্বল না থাকিলে পাটনী তোরে পার করবে না।
হক্কের উপর থাকরে মন লাহুত তুমি চিন না
এই সত্য জেনে মানুষ ধরলে লালন কয়
পারের সম্বল লাগবে না।
তুমি গুরুর চরণ ভুলো না।[৮] **—হারামণি : সপ্তম খণ্ড**

"হারামণি" নামকরণ সম্পর্কে একটি ইতিহাস আছে। কলকাতা থেকে প্রকাশিত "প্রবাসী" পত্রিকায় গ্রামাঞ্চল থেকে সংগৃহীত লুপ্তপ্রায় লোকগীতি প্রকাশের জন্য একটি বিভাগ রাখা হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বিভাগের নামকরণ করেন "হারামণি"। মনসুরউদ্দিন তাঁর সংগৃহীত লোকগীতি প্রকাশের জন্য সংকলন গ্রন্থের নাম "হারামণি" এখান থেকেই গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথের দেওয়া "হারামণি" সপ্তম খণ্ডে ৬৮৬টি ফকির লালন সাঁই-এর গান, পাঞ্জু সাঁই ও বিভিন্ন পদকর্তাদের গান বর্তমান। এতে বাউল সাধনার সুদীর্ঘ তত্ত্ব ও তথ্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এই 'রবি' নামে লালন সাঁইয়ের অন্য কোন শিষ্যের খোঁজ পাওয়া যায়নি। লালন শিষ্যদের মত এই যে, 'এই রবি ছিলেন, শিলেদার রবিবাবু মশাই।'

রবীন্দ্রনাথ শুধু লালন ফকিরের গানের ভাব, দর্শন, বুঝে-শুনে তৃপ্ত ছিলেন না। তিনি তাঁর ভাষা ও ছন্দ সম্পর্কেও বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। সত্য কথা বলতে, রবীন্দ্রনাথই লালন ফকিরকে পরিপূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ লালন ফকিরের অনেক গান সংগ্রহ করেন এবং প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। তবে তিনি যে ২৯৮ টি গান সংগ্রহ করেছিলেন তার মাত্র ২০টি গান তিনি 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশ করেন। বাকি গান তিনি তাঁর নিজের সংগ্রহে রাখেন। রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপির ১০৪ ও ১০৬ সংখ্যক গানের ক্ষেত্রে কয়েকটি বানান ও শব্দের সংশোধন করেন রবীন্দ্রনাথ। অন্য সব গান অবিকৃত রাখেন। 'প্রবাসী' পত্রিকার আশ্বিন ১৩২২ 'হারামণি' বিভাগে লালন ফকিরের গান প্রথম কিস্তিতে ৬টি, অগ্রহায়ণ সংখ্যায় ৩টি, পৌষে ৫টি এবং মাঘ সংখ্যায় আরো ৬টি অর্থাৎ মোট ২০টি গান প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ 'ছন্দ' গ্রন্থে ছন্দের প্রকৃতি বিশ্লেষণের জন্যও লালন ফকিরের গান ব্যবহার করেছেন। 'ছন্দ' গ্রন্থের সম্পাদক প্রবোধচন্দ্র সেন এই সম্পর্কে 'ছন্দ' গ্রন্থের পাঠ পরিচয়ে ব্যাখ্যা দান করেছেন।

> রবীন্দ্রনাথের সংগৃহীত লালন ফকিরের কতকগুলি গান প্রকাশিত হয় ১৩২২ সনে 'প্রবাসী' পত্রিকার 'হারামণি' বিভাগে। 'ছন্দের প্রকৃতি' প্রবন্ধে উদ্ধৃত দু'টি গানও 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত উক্তগানগুলির মধ্যে স্থান পেয়েছিল। কিন্তু এই প্রবন্ধের পাঠে এবং প্রবাসীর পাঠে কিছু পার্থক্য দেখা যায়।[৯]

উদ্ধৃতিটি উল্লিখিত ২টি গান প্রবাসী ১৩২২ সালের আশ্বিন ও পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত। এই গান দুটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত "লালন গীতিকা" (১৯৫৮) গ্রন্থের ৭ ও ৪১৪ সংখ্যক গান। "লালনগীতিকা" গ্রন্থেও এই গান দুটির পাঠ 'প্রবাসী' তথা "ছন্দ" পুস্তকের পাঠ থেকে কতকাংশে পৃথক। দুই পাঠের ভাষাতে পার্থক্য থাকলেও প্রাকৃত বাংলা ছন্দের বিশেষ

বৈশিষ্ট্যের জন্য উভয় ক্ষেত্রেই লালনের গান ব্যবহৃত হয়েছে। লালন ফকিরের সাথে রবীন্দ্রনাথের যে বিশেষ সম্পর্ক ছিল তা বোঝা যাবে আরও কয়েকটি ঘটনার উল্লেখে।

১৩৩২ সালের শ্রাবণ মাসে বসন্তকুমার পাল 'মহাত্মা লালন ফকির' নামে এক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধ পাঠ করে প্রশংসিত মন্তব্য করেন। ১৩৬১ বঙ্গাব্দে তথা ইংরাজি ১৯৫৪ সালে বসন্তকুমার পাল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশেষ অর্থানুকূল্যে 'মহাত্মা লালন ফকির' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। প্রকাশকের নিবেদনে শ্রী অজিতকুমার স্মৃতিরত্ন বলেন—

> নিরক্ষর পল্লীবাসী হইতে আরম্ভ করিয়া আমরা শুনিয়াছি জ্ঞানবৃদ্ধ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত ফকিরের সহিত ধর্মালাপ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছেন। শিলাইদহে মহাকবি রবীন্দ্রনাথের সহিত প্রথম যেদিন তাঁহার ভাবের বিনিময় হয় তাহা জাহ্নবী-যমুনা মহামিলনের ন্যায় রসোচ্ছাসের সংগমতীর্থ রচনা করে।[১০]

রবীন্দ্র-লালন সাক্ষাৎকারের আর একটি বিবরণ দিয়েছেন রায় বাহাদুর জলধর সেন।

> সেদিন প্রাতঃকালে লালন ফকির নামক একজন ফকির কাঙালের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। লালন ফকির কুমারখালীর অদূরবর্তী কালীগঙ্গার তীরে বাস করিতেন। তিনি কোন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন বলা কঠিন, কারণ তিনি সকল সম্প্রদায়ের অতীত রাজ্যে পৌঁছিয়াছিলেন। তিনি বক্তৃতা করিতেন না, ধর্মকথাও বলিতেন না তাঁহার এক অমোঘ অস্ত্র ছিল—তাহা বাউলের গান। তিনি সেই সকল গান করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিতেন। শুনিয়াছি কবিবর শ্রীযুক্ত ঠাকুরের শিলাইদহের কুঠিতে লালন ফকির একবার গান করিয়া সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া অপরাহ্ণ তিনটা পর্যন্ত গান চলিয়াছিল, ইহার মধ্যে কেহই স্থানত্যাগ করিতে পারেন নাই।[১১]

শিলাইদহের সাধক কবি গোঁসাই গোপালের সংগীত পদাবলীর সংকলক ও প্রকাশক রাসবিহারী জোয়ারদারও এ বিষয়ে মন্তব্য করেছেন—

> নদিয়া জেলার কুষ্টিয়া মহকুমার অন্তর্গত শিলাইদহ একটি গ্রাম। ঠাকুর বংশের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের পাদস্পর্শে পূত হইয়া গ্রামটির নাম চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। পূত গ্রামটি পবিত্র গঙ্গা-সলিলা গঙ্গানদীর তীরে অবস্থিত। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই পদ্মার উপর বজরায় থাকিতেন এবং এখানেই তাঁহার কবিত্বশক্তির বিকাশ পায়। ...সাধক লালন সাঁই প্রভৃতি বহু সাধু ও দরবেশ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে আসিতেন। কবি রবীন্দ্রনাথ সাধক লালন সাঁইকে ভালোবাসিতেন ও তাঁহার সুললিত গান একাগ্রমনে শ্রবণ করিতেন।[১২]

'হিতকারী' পত্রিকার তথ্য অনুযায়ী লালন শাহ ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের ১৭ অক্টোবর শুক্রবার পরলোক গমন করেন।[১৩] রবীন্দ্রনাথ যে তার পূর্বে শিলাইদহে আসা-যাওয়া করেছেন তার প্রমাণ 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে আছে। দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের কল্যাণে বাল্যকাল থেকেই শিলাইদহের সঙ্গে তাঁর এক নাড়ীর যোগ গড়ে ওঠে। এই শিলাইদহেই হয়তো দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে বেড়াতে এসে লালন সাহেবের দেখা পান গুরুদেব। শ্রী বিনয় ঘোষ বলেছেন—

> ১৮৮৪-৮৫ খ্রিস্টাব্দে বাউল গানের সংগ্রহটি তাঁর হাতে পড়ার পর যখন বাংলা লোকসাহিত্যের গোপন রত্নভাণ্ডারের দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষিত হল, তার দু'তিন বছরের মধ্যেই মনে হয়

> শিলাইদহে বিখ্যাত বাউল লালন ফকিরের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল।... ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময় থেকে শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের অবস্থিতির কথা জানা যায় এবং তারও আগে বাল্যকাল থেকেই যে মধ্যে মধ্যে শিলাইদহে তিনি অগ্রজদের সঙ্গে যাতায়াত করতেন 'জীবনস্মৃতি'তে তার আভাস পাওয়া যায়। সুতরাং লালনের মৃত্যুর আগে তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হওয়া অসম্ভব নয়। অবশ্য সাক্ষাৎ হয়ে থাকলে তার প্রায় পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর পরে 'প্রবাসী' পত্রিকায় 'হারামণি' বিভাগে তিনি লালন ফকিরের গান প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন।[১৪]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বয়স যখন ২২ বছর, তখন 'সঙ্গীত-সংগ্রহ ও বাউল-গাথা' নামে একটি কাব্যসংকলন তাঁর হাতে আসে। এতে ছিল বাউল গান সহ কয়েক প্রকার লোকসংগীত। ১২৯০ সালে বৈশাখ সংখ্যায় 'ভারতী' পত্রিকায় গ্রন্থটির সমালোচনাকালে, বাউল গানের ভাব ও ভাষার প্রশংসা করলেও তাঁদের ধর্মমত বা তাঁদের জীবন সম্পর্কে কোনো কথা বলেননি গুরুদেব। তবে ঐ প্রবন্ধে লোকগীতি সংগ্রহের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। এই প্রবন্ধ থেকে সহজেই অনুমান করা যেতে পারে যে তখনো পর্যন্ত বাউলদের জীবনও ধর্মের সঙ্গে প্রকৃত পরিচয় লাভের সুযোগ তিনি পাননি। এর প্রায় ৬ বছর পর অর্থাৎ ১৮৮৯ সালের ৫ মে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এঁকেছিলেন লালনের রেখাচিত্র। লালন সাঁই যদি কোনো সাধারণ বাউল হতেন তাহলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর হয়তো এই স্কেচ্‌টি অঙ্কন করতেন। দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যেরূপ শ্রদ্ধাপূর্বক সখ্যতা ছিল তাতে রবীন্দ্রনাথ তখন শিলাইদহে উপস্থিত না থাকলেও চিত্রটি পরে দেখেছিলেন তা সহজেই অনুমান করা যায়। দাদার হাত ধরে রবীন্দ্রনাথ ১৮৭৬ সালে ১৫ বছর বয়সে প্রথম শিলাইদহে আসেন। ছেলেবেলা থেকেই তিনি বাউলদের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জমিদারির দায়িত্বগ্রহণ করেছিলেন ১৮৯১ সালে। এর আগেই ১৮৮৯ সালে নভেম্বর মাসে তিনি সপরিবারে শিলাইদহে নৌকাবাস করেছেন। 'রবীন্দ্র বর্ষপঞ্জি'[১৫] অনুসারে ১৮৯০ সালের জুন মাসেও রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে থেকেছেন। এই বছর অক্টোবর ১৭ তারিখে লালন ফকির পরলোক গমন করেন।

রবীন্দ্রনাথ ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে সপরিবারে যখন শিলাইদহে যান তখন তাঁর সঙ্গী ছিলেন বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বলেন্দ্রনাথ এ সময়ে সুনা উল্লাহ্ নামের এক গায়কের ১২টি গান সংগ্রহ করেন। এ সম্পর্কে তিনি তাদের 'পারিবারিক স্মৃতিলিপি'[১৬] পুস্তকে পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কলিকাতা বির্জিতলাস্থিত বাসভবনে রক্ষিত একটি বড়ো মাপের কাতায় তাঁদের পরিবারস্থ অনেকে বিচিত্রবিষয়ক রচনা স্বহস্তে লিখে রাখতেন। ইন্দিরা দেবীর "রবীন্দ্রস্মৃতি" (১৩৬৭) গ্রন্থে এই পুস্তকের বিবরণ পাওয়া যায়। ২টি খাতার একটি রবীন্দ্রনাথ তাঁর জন্মদিনে উপহারস্বরূপ পান এবং অন্যটি হারিয়ে যায়। রথীন্দ্রনাথের পঞ্চাশতম জন্মদিনে পাওয়া ঐ পুস্তক রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত। শিলাইদহ সুনাউল্লাহ্ শীর্ষক একটি বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। তিনি বলেছেন—

> আমরা যখন শিলাইদহ ছিলুম তখন রোজ আমাদের বোটে সেখানকার গ্রাম্য গাইয়েদের আমদানি হতো।

সুতরাং হয়তো এমন ভাবেই কখনো রবীন্দ্রনাথ লালন ফকিরের গানও শুনেছিলেন ও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল। বস্তুত লালন ফকিরের প্রতি তাঁর যে বিশেষ আকর্ষণ ছিল এ সম্পর্কে তাঁর অসংখ্য লেখায় লালনের উদ্ধৃতি ও তাঁর উল্লেখ তা সপ্রমাণ করে। এই প্রসঙ্গে লালন

ফকির সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> আর একটি বিষয় যেটা আমার বিশেষ ঔৎসুক্যের বিষয়। সেটা ছোট ছোট নতুন ধর্মপ্রচারকদের জীবনী ও বক্তব্য সংগ্রহ করা। মফস্বলে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতে পাই যে হয়তো পল্লীর নিভৃত ছায়ায় কোন ব্যক্তি এক নতুন সম্প্রদায় সংগঠন করিতেছেন। তাঁহারা ভদ্রসমাজে বিশেষ পরিজ্ঞাত নহেন, কিন্তু সমাজের মধ্যে তাহারা কি বলিতে আসিয়াছেন, কি বলিতেছেন এটা জানা উচিত। এইগুলি সংগ্রহ করিয়ে সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্মমত প্রচলিত হইতেছে, অজ্ঞাতে ও অলক্ষিতে যে সকল শক্তি সমাজের মধ্যে কার্য করিতেছে, তাহা অনেকটা বুঝা যাইবে। আমি এইরূপ একজন ধর্মপ্রচারকের বিষয়ে কিছু জানি—তাহার নাম লালন ফকির। লালন ফকির কুষ্ঠিয়ার নিকটে হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এরূপ শুনা যায় যে তাঁহার বাবা-মা তীর্থযাত্রাকালে পথিমধ্যে তাহার বসন্ত রোগ হওয়াতে তাঁহাকে রাস্তায় ফেলিয়া চলিয়া যান। সেই সময় এক মুসলমান ফকির দ্বারা তিনি পালিত ও দীক্ষিত হন। এই লালন ফকিরের মতে মুসলমান হিন্দু জৈন সকল একত্র করিয়া এমন একটি জিনিস তৈয়ার হইয়াছে তাহাতে চিন্তা করিবার অনেক বিষয় আছে।[১৭]

লালনের মৃত্যু হয় ১৮৯০ সালে, আর গুরুদেব ১৮৯১ সালে সপরিবারে শিলাইদহে কুঠিবাড়িতে ওঠেন পিতার নির্দেশে জমিদারি তদারকির দায়িত্ব নিয়ে। একটানা তাঁকে সেখানে থাকতে হয়েছিল প্রায় ১৮৯১ সাল পর্যন্ত। বাংলা ১২৯৯ সালে 'গানের বহি' নামে গুরুদেবের গানের একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তাতে আমরা পাই 'তোমরা সবাই ভালো' এবং 'ক্ষ্যাপা তুই আছিল আপন খেয়াল ধরে'—বাউল সুরে রচিত দু'টি গান। কিন্তু সুরের দিক থেকে কুষ্ঠিয়ার বাউলদের গানের সুরের সঙ্গে তার কোনো মিল নেই। তবে দ্বিতীয় গানটির কথাতে বাউল জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। রবি ঠাকুর ১৩০১ সালে 'সাধনা' পত্রিকায় বাংলার লোকসাহিত্য-সংগ্রহের কাজে দেশবাসীকে উৎসাহিত করবার আগ্রহে পুনরায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এরপরেই ১৩০২ সালে গুরুদেবের দিদি স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা সরলা দেবী 'লালন ফকির ও গগন' নামে 'ভারতী' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। প্রবন্ধে তিনি এক জায়গায় লিখেছেন—

> কুষ্ঠিয়ার সন্নিহিত প্রদেশে সামান্য বৈরাগীর মুখে তাঁহার (লালন) ও তাঁহার কোনো শিষ্যের রচিত কতিপয় গান শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া তাহাদের কতকগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলাম।[১৮]

সেখানে তিনি যে ৮টি বাউল গান ছাপিয়েছিলেন, তার ছয়টি ছিল লালন ফকিরের গান, আর বাকি দু'টি ছিল গগন হরকরার। গগন হরকরা ছিলেন লালনেরই এক ভক্ত শিষ্য। ১৩০৫ সালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উদ্যোগে প্রকাশিত 'বীণাবাদিনী' নামে, তাঁদেরই বাড়ি থেকে, সংগীতের একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল, তার মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যায় লালনের 'ক্ষম অপরাধ ওহে দীননাথ' এবং 'কথা কয় কাছে দেখা যায় না।' গান দু'টির স্বরলিপি পরপর প্রথম প্রকাশিত হয়। ইন্দিরাদেবী এই গান দু'টির স্বরলিপি লিখেছিলেন। ১৩০৭ সালের বৈশাখ মাসে সরলাদেবী, 'শতগান' নামে, গুরুদেবের গানসহ, হিন্দি, উর্দু ও বাংলা ভাষার নানা প্রকৃতির ১০০ গানের একটি স্বরলিপি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাতে 'বাউল সংগীত' নামে ১০টি গানের যে স্বরলিপি ছিল, তাতে গগন হরকরার দু'টি গানের মধ্যে 'আমি কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যে রে' গানটিও আমরা পাই। এই ক'টি বিচ্ছিন্ন ঘটনা থেকে পরিষ্কার ধারণা

করতে পারি যে, গুরুদেব ও তাঁর পরিবারের সকলে শিলাইদহ অঞ্চলের লালন ফকির ও তাঁর সম্প্রদায়ের ধর্মমত ও তাঁদের গানের প্রতি খুবই আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে লালনজীবনীগ্রন্থ প্রণেতা বসন্তকুমার পাল লালন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কাছে জানতে চেয়ে একটি পত্র দেন ১৩৩৯ সালে। রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ থাকায় তার নির্দেশে সুধীর চন্দ্র কর কবির পক্ষে বসন্তকুমার পালকে জানান—

> আপনার এই মহৎকাজে সাহায্য করতে পারলে তিনি আরও সুখী হতেন সন্দেহ নেই। ফকির সাহেবকে তিনি জানতেন বটে, কিন্তু সে তো বহুদিন আগে। বুঝতেই পারেন এখন সে সব সুদূর স্মৃতির বিষয়—তাঁর মনে তেমন উজ্জ্বল নয়। তবে তিনি বললেন, কলকাতায় 'লালবাংলা' ২০ নং মে ফেয়ার, বালিগঞ্জ এই ঠিকানায় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় থাকেন, তিনিও ফকির সাহেবকে জানতেন, তাঁর কাছে খোঁজ করলে অনেক বিষয় আপনার জানবার সুবিধা হতে পারে।

বস্তুত, ঠাকুর পরিবারের অনেকেই 'ফকির সাহেব' তথা লালন ফকিরকে জানতেন। ১৩০২ সালে সরলা দেবীর উদ্যোগে ঠাকুর বাড়ির পত্রিকা 'ভারতী'তে অক্ষয় কুমার মৈত্র কর্তৃক সংকলিত লালন ফকিরের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ পায়। এই বিবরণ থেকে আমরা অনেকটাই নিশ্চিন্ত হই যে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে লালন ফকিরের সাক্ষাৎকার বিষয়টি আদৌ অসম্ভব ছিল না। কিন্তু কেন রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করেননি—তা শুধু বিস্ময়কর নয়, রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এটি অকল্পনীয়ও বটে।

রবীন্দ্রনাথের নির্দেশক্রমে বসন্তকুমার পালকে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হলেও তিনি তা করেছিলেন কিনা এবং সে আলোচনা থেকে তিনি কি জানতে পেরেছিলেন—এসব তথ্য আজও অজানা। রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে থাকাকালীন গগন হরকরা ও সর্বক্ষেপী নামের সাধিকার সঙ্গে প্রায়শই আলাপ আলোচনা করেছেন। গগণ হরকরা ও সর্বক্ষেপী লালনকে তাদের গুরু বলে জানতেন। বাউল গান ও তার রচয়িতাদের প্রতি গুরুদেব ও তাঁর পরিবারের সকলের যে গভীর ভালোবাসা ছিল, তা থেকে এ বিশ্বাস জন্মে যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে লালন ফকিরের দেখা হয়েছিল এবং বিভিন্ন সময়ে গুরুদেবের বিভিন্ন উক্তিতেও এমন ধারণা করতে আমাদের কষ্ট হয় না।

শ্রীকুমার সেন রবীন্দ্র-লালন সাক্ষাৎকার বিষয়ে 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড 'রবীন্দ্রনাথ'-এ উল্লেখ করেছেন—

> সাধনা...চালাইবার কালে রবীন্দ্রনাথ উত্তর-মধ্যবঙ্গে লালন ফকিরের ও আন্দি বোষ্টমীর মতো অনেক বাউল-বৈষ্ণব-দরবেশের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের গীতনিষ্ঠ ধর্ম অনুশীলনের পরিচয় পাইয়াছিলেন।[২০]

রবীন্দ্রনাথের সমকালে লালন ফকির বিদগ্ধ সমাজের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। কাঙাল হরিনাথ মজুমদার, মীর মোশারফ হোসেন লালন ফকিরের সমসাময়িক ছিলেন। হরিনাথ সম্পাদিত সাপ্তাহিত পত্রিকা 'গ্রামবার্তা প্রবেশিকা'[২১]য় "জাতি" শীর্ষক এক নিবন্ধে লালন ফকিরের নাম ও তার ধর্ম বিষয়ে নানা তথ্য পাওয়া যায়। মীর মোশারফ হোসেন রচিত 'সংগীত লহরী' গ্রন্থেও লালনের উল্লেখ আছে। সুতরাং এসব থেকেও অনুমিত হয় যে লালন ফকির রবীন্দ্রনাথের কুষ্ঠিয়ায় আসা-যাওয়া এবং থাকাকালীন কেবল সাধারণের

মধ্যেই নয়, সুধী মহলেও দৃষ্টি-আকর্ষণ করেন। তাই রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষের কাছ থেকে এ হেন একজন বিখ্যাত মানুষের সঙ্গে আলাপ করাটাই বাঞ্ছনীয়। বিশেষত যখন তারা একই অঞ্চলে বাস করেছিলেন সাময়িকভাবে। যাইহোক, আমাদের এই আলোচনায় নানা ঐতিহাসিক তথ্য বিশ্লেষণ করে রবীন্দ্র-লালন সাক্ষাৎকারের একটি সম্ভাব্য বিবরণ তুলে ধরার প্রয়াস করা হয়েছে। লালন ফকিরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দেখা হয়েছে কিনা এ সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত কোনো সদুত্তর না মিললেও রবীন্দ্রনাথ যে লালন ফকির তথা বাউলদের দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত ছিলেন এ সম্বন্ধে সকলেই ঐক্যমত পোষণ করেন। রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে পূর্ব বাংলায় যে সকল বাউলগান এবং বাউল সাধকের সংস্পর্শে এসেছিলেন, পরবর্তী জীবনে শান্তিনিকেতন আশ্রমে বাস করার সময় তাদের সঙ্গে আর কোনো সংযোগ রাখতে পারেননি। বীরভূমের যে বাউল গান তখন তাঁর শোনার ও সেখানে যে বাউলদের আচার-আচরণ তাঁর প্রত্যক্ষ করার সুযোগ হয়েছিল, তা পূর্ব বাংলার বাউল গান কিংবা বাউলের আচারের চেয়ে কিছুটা স্বতন্ত্র। পশ্চিম বাংলার বাউল সাধনা চৈতন্যধর্ম দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছে। একদিন যে বাউলকে তিনি তার মনের মানুষ সন্ধান করার মধ্যে আত্মহারা হতে দেখেছেন, সে দিন আর সে বাউলকে তিনি খুঁজে পেলেন না, তার আচার জীবনে কিংবা সংগীতের ভাবে তিনি নতুন রূপে দেখতে পেলেন। তা তাঁর অন্তরকে স্পর্শ করতে পারল না। সেই জন্য পরবর্তী জীবনে যখন তিনি বাউলের গানের উল্লেখ করেছেন, তখনও তিনি সেই যে প্রথম যৌবনের একদিন পদ্মাতীরে যে বাউলের সন্ধান পেয়েছিলেন তার কথা এবং তার বাণীই তিনি উদ্ধৃত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের একটি গানে ইঙ্গিত আছে যে তাঁর সঙ্গে কোন এক বাউলের ঘনিষ্ঠতা জন্মেছিল, যার সুবাদে সেই বাউল তাঁকে নাম ধরে ডেকেছে। লালনের একটি গানে 'পারে যদি যাবি রবি ঠিক রাখ মন যোল আনা'—আমরা উল্লেখ করেছি। রবীন্দ্রনাথ ১৮৯০ সালের জানুয়ারি মাসে 'আমাকে কে নিবি ভাই, সঁপিতে চাই আপনারে'—এই গানটি রচনা করেন এবং এই গানটিতে বাউলদের কথা যেমন রয়েছে, তেমনি গানের মধ্যে তাঁর প্রিয় সেই বাউলের কথাও আছে—

আমারে কে নিবি ভাই, সঁপিতে চাই আপনারে।
আমার এই মন গলিয়ে কাজ ভুলিয়ে সঙ্গে তোদের নিয়ে যারে।
তোরা কোন রূপের হাটে চলেছিস ভবের বাটে
পিছিয়ে আছি আমি আপন ভারে...
তোদের ওই হাসি খুশি দিবানিশি দেখে মন কেমন করে।।
আমার এই বাঁধা টুটে নিয়ে যা লুটে পুটে
পড়ে থাক মনের বোঝা ঘরের দ্বারে
যেমন ওই এক নিমেষে বন্যা এসে
ভাসিয়ে নে যায় পারাপারে॥
এত যে আনাগোনা কে আছে জানা শোনা
কে আছে নাম ধরে মোর ডাকতে পারে?
যদি সে বারেক্ এসে দাঁড়ায় হেসে

চিনতে পারি দেখে তারে।[২২]

লালন ফকির ব্যতীত 'রবি' নামে রবীন্দ্রনাথকে সম্বোধন করতে পারে সে সময়ে এমন কোনো বাউল ছিল বলে বিশ্বাস হয় না। রবীন্দ্রনাথ সেই 'ডাক' দেবার কথা উল্লেখ করেছেন তাঁর গানে নিবিড় মমতায়। এই গান রচনার ৮ মাস পরেই ১৮৯০ সালে ১৭ অক্টোবর লালন লোকান্তরিত হন। আমাদের দুর্ভাগ্য যে রবীন্দ্রনাথ এই বাউলের কোনো পরিচয় সেভাবে রেখে যাননি। প্রথম যৌবনে যখন শিলাইদহে বার কয়েক আসা-যাওয়া করেছেন সেই সময় লালন ফকিরের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হওয়া একেবারে অস্বাভাবিক ছিল না এবং রবীন্দ্রনাথ লালন ফকিরের গানের যে মূল্য ও গুরুত্ব প্রদান করেছেন তা থেকে এটা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, তিনি তাঁর প্রতি বিশেষ আকৃষ্টও ছিলেন। পরিশেষে তাই আমাদের মনে ধারণা জন্মে, বাউল ফকির, যাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দেখা হয়েছিল এবং যিনি তাঁর নাম ধরে ডেকেছিলেন তবে কি তিনিই বাউলরাজ লালন? কবিগুরু ও বাউলরাজের সাক্ষাৎ-এর নিশ্চিত প্রমাণ আজও পাওয়া যায়নি। এখনও আমরা তার জন্য অপেক্ষারত।

উৎসের সন্ধানে

১. বাংলার বাউল ও বাউল গান
২. উজ্জ্বল কুমার মজুমদার : 'রাতের তারা দিনের রবি', পৃ. ২০৩
৩. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : বাংলার বাউল ও বাউল গান, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫
৪. মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন : বাউল কবি লালন শাহ প্রসঙ্গে
৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বাউল গান প্রবন্ধ
৬. নন্দগোপাল সেনগুপ্ত : কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ, পৃ. ১০০-১০৯
৭. রবীন্দ্ররচনাবলী, দশম খণ্ড, বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ, পৃ. ১২৬
৮. মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন : হারামণি, সপ্তম খণ্ড
৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ছন্দ, পৃ. ৪২১
১০. বসন্তকুমার পাল : মহাত্মা লালন ফকির
১১. জলধর সেন : কাঙাল হরিনাথ, পৃ. ২৩
১২. রাসবিহারী জোয়ারদার সংকলিত : গোপাল গীতাবলী
১৩. পাক্ষিক হিতকারী, ১৫ কার্তিক ১২৯৭
১৪. পুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত : রবীন্দ্রনাথ ও লোকসংস্কৃতি
১৫. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্র বর্ষপঞ্জি, পৃ. ২৭-২৮
১৬. পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক
১৭. বঙ্গদর্শন, পৌষ, ১৩১৬
১৮. সরলাদেবী : লালন ফকির ও গগন
১৯. সলিল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : রবীন্দ্রনাথ ও লোকসংস্কৃতি
২০. সরলাদেবী : লালন ফকির ও গগন
২১. গ্রাম্যবার্তা প্রবেশিকা, ভাদ্র ১২৭৯, পৃ. ৩
২২. গীতবিতান, বিশ্বভারতী, ৫৫৮ সংখ্যক গান

জীবনমুখী লালনগীতি

সুকন্যা রায়চৌধুরী

পারে লয়ে যাও আমায়।
আমি অপার হয়ে বসে আছি ওহে দয়াময়।।

দুই শতক পেরিয়েও যে গান, গানের কথা আজও মানুষের মুখে মুখে ফেরে, সে গানে যে মানবতার মাদকতা আর মানুষ-রতন হওয়ার রহস্য রয়েছে তা বলাই বাহুল্য! আর সে গান হল লালন গীতি। সেই সময়ের মানুষের মধ্যে তো বটেই এমনকি এখনকার নবীন প্রজন্ম থেকে প্রবীণ প্রজন্ম সবার মুখেই লালন লালিত হয়ে চলেছে। শুধু তাই নয়, জাতি ও শ্রেণি বৈষম্যের ভেদাভেদ মুছে সবার মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে এই গান দিক থেকে দিগন্তে। মানবতাই যে আসল ধর্ম— তা ক্রমশই সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে। সৃষ্টিতত্ত্ব থেকে মুক্তিতত্ত্ব সবই উঠে এসেছে লালনের বাঁধা গানে, মানবজীবনের নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ হয়েছে লালন গীতির চরণে চরণে। মানব মনের বহু জিজ্ঞাসার উত্তর আছে এই গানগুলিতে। লালন গীতির মূল খাতার সবগুলি এখনও পাওয়া না গেলেও, যে কয়টি গানের হদিস পাওয়া গেছে, তার সংখ্যা নেহাত কম নয়। মনিরুদ্দিন শাহ ছিলেন লালনের নিজের হাতে দীক্ষিত শিষ্য। খোদা বক্সের হিসাব অনুযায়ী, তিনি লালনের ৫০০ গান জানতেন। আবুল আহসান চৌধুরী লিখেছেন—

> বর্তমান লেখক সংকলিত 'লালন সমগ্র' বইয়ে লালনের গানের খাতা, 'হারমণি' ও অন্যান্য সূত্র থেকে মোটের ওপর লালনের ৬৪২ টি পদ প্রামাণ্য পদ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

ছেউড়িয়ার আখড়া থেকে রবি ঠাকুর সংকলিত যে দুটি খাতা রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র ভবনে সংরক্ষিত আছে তাতে গানের সংখ্যা ২৯৮। এছাড়াও যে সমস্ত গানের খাতা পাওয়া যায়নি তাতে গানের সংখ্যাও যে নেহাতই কম নয়, তা বেশ সুস্পষ্ট ভাবেই অনুমান করা যায়। লালন গীতির আলোচনা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বেশ কিছু মূল্যবান নিদর্শন সৃষ্টি করেছে। কিন্তু আজকে একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে কেন এই গানগুলি বিভিন্ন প্রজন্মের মানুষের মুখে মুখে ফেরে? আজকের দিনেও কি করে গানগুলি এত প্রাসঙ্গিক? এই প্রশ্নগুলি থেকে যায়। বর্তমানে 'ঈশ্বর/জগতস্রষ্টা কে?' এই বিষয়টি বেশ চর্চিত হয়ে উঠেছে। এর পাশাপাশি আর কিছু প্রশ্ন শহর-গ্রামের গলিতে; আনাচে-কানাচে ঘোরা ফেরা করতে দেখা যায়; যেমন—

'মনের মানুষ কে? তাকে চিনবই বা কিভাবে?'; আমরা এত যে বলি 'জাত যাবে', এই জাত কোথায় যায়?', " 'আমি' কাকে বলে?", 'মানুষের জীবনে আর পাঁচটা মানুষের গুরুত্ব কোথায়?' এই প্রশ্নগুলির উত্তর অন্বেষণ করেছিলেন বাউল সম্রাট লালন, আর তাই এই প্রশ্নগুলির উত্তর লালনগীতির স্তরে স্তরে সাজানো আছে। এই প্রশ্নগুলির উত্তরান্বেষণের প্রেক্ষিতে লালনগীতিকে বেশ কিছু পর্যায়ে সাজানো যেতে পারে— (১) আমি (২) মানুষ রতন (৩) জাত ভোলানো গান (৪) মনের মানুষ (৫) ঈশ্বর। এই স্তরগুলির প্রত্যেকটিই প্রত্যেকটির সঙ্গে সম্পর্কিত ও মানবজীবন-মানবধর্মের সারকথা সম্বলিত। লালনের গানগুলি সাধারণ মানুষের প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে কতখানি সক্ষম, সেটিই আমাদের আলোচনার বিষয়।

॥ ১ ॥

আমি কথার অর্থ ভারি

জন্ম থেকে আমৃত্যু যাকে নিয়ে আমাদের ভাবনা সে হল 'আমি'। প্রতিনিয়ত আমরা যাকে আমি বলে চলেছি সেই 'আমি' কে? তার উত্তর আমরা কজনই বা খুঁজতে যাই! কয়জনই বা আমরা এ বিষয়ে ভাবি! সবাই বলবেন, আজকালকার ব্যস্তময়তার দিনে এসব নিয়ে ভাবার সময় হয়ে ওঠে না। কিন্তু এই যে উদয়াস্ত ব্যস্ত থাকা, তা কিন্তু ওই 'আমি'টার জন্যই। অনেকেই বলতে পারেন, পরিবার-পরিজনকে ভালো রাখতেই কিংবা সমাজের স্বার্থে এত পরিশ্রম করতে হয় তাই এত ব্যস্ত থাকি, নিজের জন্য ভাবার সময় কোথায়? একটু ভেবে দেখলে বোঝা যায় ঐ পরিজনকে ভালো রাখাটাই আসলে 'আমি'কে ভালো রাখা। যাদের কথা ভাবতে গিয়ে নিজের কথা ভাবার সময় নেই বলে জাহির করছি তারা ভালো না থাকলে 'আমি' কি ভালো থাকে? স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে এই 'আমি' কে? তা আমরা জানি না, জানলে 'নিজের কথা ভাবার সময় নেই' এ কথা আমরা বলতাম না। বাউল সম্রাট লালন একথা বুঝেছিলেন। আর তাই এই আমি-র আমিত্ব সন্ধানে ব্রতী হয়েছিলেন লালন সাঁই। তিনি বুঝেছিলেন যাকে 'আমি' বলে পরিচয় দিই তাকে আমরা চিনি না। আমাদের এই 'আমি'-র অহং-এর কাছে বাকি সব কিছু অনেক সময়ই তুচ্ছ হয়ে যায়, মুখে ফুটে ওঠে বিষাক্ত কিছু ভাষার ব্যবহার, অথচ ঐ ভাষা যে ঐ 'আমি'-রই পরিচায়ক তা আমরা ভুলে যাই, কারণ ঐ প্রকৃত 'আমি'টাকে আমরা চিনতে পারি না। অপরের দুটো কটু কথা, কটু ব্যবহার মানুষের মানকে অপমানে পরিণত করতে পারে না, কারণ সেই একটিই। এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে কখনোই ততটা চিনতে পারে না, যতটা সে নিজে নিজেকে চিনতে পারে। তাই যে যা চেনে না তা নিয়ে ভালো-মন্দ যাই বলুক না কেন সে সবই অন্ধের হাতি দর্শনের মতো ব্যাপার। মানুষ জন্ম নেয় মান আর হুঁশ নিয়ে। ছুরির যেমন ধার কমলে পুনরায় শাণিত করে নিতে হয়, তেমনই নিজেকে বোঝার মধ্যে দিয়ে মানুষের 'হুঁশ'কে অক্ষুণ্ণ রাখতে হয়, আর তখন সে বুঝতে পারে জন্মসূত্রে পাওয়া তার মান এতটাও ঠুনকো নয়, যে অপরের কথায় তা বিকিয়ে যাবে বা অপমানিত বোধ করবে। বিভিন্ন ধর্মকথায় এই প্রকৃত 'আমি'-কে চেনার কথাই বলা হয়েছে বিভিন্নভাবে। আমরা সে সব ধর্মকথা শুনি, পড়ি কিন্তু সে পথ ধরে 'আমি'-কে চিনে উঠতে পারি না। লালন বলেন—

অনন্ত শহর বাজার
আমি আমি শব্দ করে
আমার আমি চিনতে নারে
বেদ পড়ি পাগলের প্রায়।।

অথচ এই আমিত্বকে উপলব্ধি করলে, চিনতে পারলে সহজেই বোঝা যায় এই আমি-র বেঁচে থাকার কারণ কি? তার জীবনের লক্ষ্য কি? আর এভাবে সহজেই তার জীবনের চলার পথ হয়ে ওঠে সুগম। লালনের কথায়—'আমি কী তাই জানলে সাধন সিদ্ধ হয়।' এই আমি-কে জানাই হল জীবন চক্রের মূল রহস্য। সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার এই 'আমি'-কে জানলে তার সাথে সাথে জানা যায় এই জগৎকে; অন্যের 'আমি'-কে চিনতেও সাহায্য হয়। দিব্যজ্ঞান, দিব্যচক্ষু ইত্যাদির কথা আমরা কম বেশি সকলেই শুনেছি এবং এসব শুনলে আমাদের মনে হয়, এ সব যেন এক অতিন্দ্রিয়, অলৌকিক ব্যাপার। কিন্তু এসবই আমাদের সামনের বাস্তব বিষয়, শুধু আমরা এদের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করতে পারি না তাই আমাদের কাছে তা অলৌকিক বলে প্রতিভাত হয়। আসলে নিজেকে চেনার মধ্যে দিয়েই লাভ করা যেতে পারে দিব্যজ্ঞান। নিজের ভিতরে নিজের অন্বেষণ, তার উপলব্ধি ও তাকে জানাই হল প্রকৃত দিব্যজ্ঞান লাভ করা। 'আপ্ততত্ত্ব যে জেনেছে/দিব্যজ্ঞানী সে-ই হয়েছে' অর্থাৎ নিজেকে যিনি জানতে পেরেছেন সেই দিব্যজ্ঞানী হয়ে উঠতে পেরেছেন। আমাদের আশেপাশে এখন সাধু সন্তের সংখ্যা কম নয়, অবশ্য তারই পাশাপাশি 'ভণ্ড সাধু' কথাটিরও প্রচলন আছে। কিন্তু প্রকৃত সাধু ব্যক্তি যে নেই তাও কিন্তু নয়। প্রকৃত সাধু ব্যক্তি যারা তাঁরা নিজেকে চিনে তবেই হতে পারেন প্রকৃত সাধু—

লালন বলে সাধুমহন্ত
সিদ্ধ হয় আপনারে চিনে।।

লালন উপলব্ধি করেছিলেন যে নিজেকে না চেনার অর্থই হল নিজেকেই ফাঁকি দেওয়া, কারণ নিজেকেই যদি কেউ চিনে উঠতে না পারে; তবে, সে কিছুই স্পষ্টভাবে চিনে উঠতে পারে না, সে পারে না যথার্থ জ্ঞান লাভ করতে। আর তাই তার কাছে এ জগত সংসার, এই জগৎ স্রষ্টা সবই থেকে যায় মায়ার অন্তঃপুরে। নিজেকে জানার সাথে সাথে সব স্পষ্ট হয়ে ওঠে ব্যক্তির কাছে। মায়ার অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে এসে বিশ্ব, স্রষ্টা ও সৃষ্টি যে এক— তা উপলব্ধ হয়। আমরা এই 'আমি'-র কথা ভেবে অনেক সময় মিথ্যে বলে থাকি, কিন্তু নিজেকে মিথ্যে বলা যায় না। কারণ 'আমি' নিজের বাইরে নয়, সে থাকে নিজের ভেতরে। স্বচ্ছ আয়নায় নিজের প্রতিফলন দেখে কিংবা দিনের আলোয় নিজের ছায়া দেখে তাকে যদি 'আমি' বলে ভাবি তবে বিষয়টি হবে শিশুর চাঁদ ধরার মতো ব্যাপার। এ কথা যদি সারা জীবনেও উপলব্ধি না করা যায়, তবে মৃত্যু লগ্নে দেখা যায় যে, যাকে 'আমি' বলে ভাবতাম সেই দেহ পড়ে থাকল আর 'প্রকৃত আমি' তাকে ছেড়ে চলে গেল ঐ দেহকে চেতন শূন্য করে তখন, তা বেশ স্পষ্ট ভাবেই উপলব্ধি করা যায়। লালনের কথায়—

খ্যাপা না জেনে তোর আপন খবর যাবি কোথায়।
আপন ঘর না খুঁজিয়ে বাইরে খুঁজলে পড়বি ধোঁকায়।।...

আপনার আপনি না চিনে
ঘুরবি কত এ ভুবনে
লালন বলে অন্তিমকালে
নাহি রে উপায়॥

লালনের ভাবনায় যাকে 'আমি' বলি সেই 'আমি'-র কাছে প্রকৃত 'আমি' অপরিচিত, অথচ এই দুই 'আমি'-র বাস, একই জায়গায়। এই এক 'আমি' যেন অন্য 'আমি'-র কাছে "আরশি নগরের পড়শি।" এক মায়ার চশমা চোখে আমরা এই জগতের সব কিছুই বুঝতে চেষ্টা করি। আমরা আমাদের যে চোখে দেখতে পারি সেই চোখে নিজেকে খুঁজতে যাই, যে চোখে দেখতে পারি না অর্থাৎ মনের চোখে নিজেকে খুঁজি না, আর তাই 'আসল আমি' আর 'নকল আমি'-র মধ্যে রয়ে যায় এক সমান্তরাল দূরত্ব। লালন বলেন—

সাধ্য কিরে আমার সেরূপ চিনিতে।
অহর্নিশি মায়ার ঠুসি জ্ঞান-চক্ষেতে।।...
সে আমি অচিন একজন
এক জাগাতে থাকি দুজন
ফাঁকে থাকি লক্ষ যোজন
না পাই দেখিতে।।

যখন এ জগৎ সৃষ্টি হয়নি তখন যে সর্বব্যাপী সত্তা বিরাজিত ছিলেন তিনিই হলেন প্রকৃত 'আমি'-র স্বরূপ। কারণ এই জগৎ, এই 'আমি' সবই তাঁর থেকে সৃষ্ট এবং সৃষ্ট সব কিছুই আধারিত থাকে স্রষ্টায়। এই অখণ্ডসত্তাই আত্মা অর্থাৎ 'আমি' রূপে বিভিন্ন দেহে বিরাজমান। তাই নিজেকে চিনলে চেনা যায় সেই স্রষ্টাকে, তাঁর স্বরূপকে। কিন্তু আমরা নিজেকে চিনে উঠতে পারি না, আর যাকে চিনি সেই আমি কি সত্যিই 'আমি'? এর উত্তর খুঁজতে থাকলেই চেনা যাবে নিজেকে। আমাদের বাইরে এই যে জগৎ তার বাইরেও এক জগৎ রয়েছে আমাদের ভিতরে, সেই হল প্রকৃত জগৎ। কিন্তু আমরা সাধারণ মানুষরা সেই জগতের কথা ভাবতে পারি না, অথচ বিশ্বের এক অংশের মানুষ ঐ জগতকে জানতে ছেড়েছেন ঘর, হয়েছেন বিশ্বসংসারের রহস্যের সত্যান্বেষী। আর আমরা পেয়েছি বাউল গান, লালন গান, ভাব সংগীত ইত্যাদি। ঐ প্রকৃত 'আমি'-কে জানা মানুষগুলোর কাছ থেকে আমরা পেয়েছি জীবন দর্শন, জীবন জিজ্ঞাসা, অগণিত প্রশ্নের হাজার উত্তর। আমরা প্রতিটি মানুষ সকলের কাছে সমান নই, কেউ আমাদের কাছে ভালো তো অন্যের কাছে মন্দ, আর আমাদের সব থেকে ভয় থাকে খারাপ হওয়ার। সকলের কাছে নিজেকে ভালো হিসেবে উপস্থাপন করার চাহিদা আমাদের এক প্রকার সহজাত। কিন্তু এই ভালো-মন্দের মাপকাঠি এক-একজনের কাছে এক এক রকম, তাই চাইলেও কেউ সকলের কাছে না হতে পারে মন্দ, না হতে পারে ভালো। তা সত্ত্বেও, আমরা দুর্নামের ভয়ে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে অনেক কিছুই করে থাকি কিংবা নিজেকে গুঁটিয়ে রাখি, এই ভেবে যে, আমাদের ইচ্ছানুরূপ কাজ যদি অন্যের ভালোত্বের সংজ্ঞার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হতে না পারে, তবে দুর্নাম হতে পারে। কিন্তু যে কোনো আবিষ্কারমূলক কাজ করার আগে যদি প্রতিটি মানুষই, অন্যে কি ভাববে ভাবতো তবে, আবিষ্কারের জগৎ চিরদিনের জন্য অবরুদ্ধ হয়ে যেত। যাঁরা আবিষ্কারমূলক কাজ করেন, তাঁরা আসলে জানেন যে তাঁরা কি চান অর্থাৎ কি আবিষ্কার

করতে চান আর তা এটাই প্রমাণ করে যে, তিনি নিজেকে চিনেছেন, নিজেকে জেনেছেন, আর তাই তাঁদের লক্ষ্য তাদের কাছে খুবই সুস্পষ্ট এবং দুর্নামের ভয়ও তাঁরা করেন না। লালনের কথায়—

আপনার আপনি চেনা যদি যায়।
তবে তারে চিনতে পারি সেই পরিচয়।...
সেই আমি কি আমিই আমি
তাই জানিলে যায় দুর্নামি
লালন কয় তার কি ভ্রমি
এ ভব কৃপায়।।

আসলে এই আত্মতত্ত্বের মূল কথাই হল, আত্মানুসন্ধান। সবার কাছে নিজে যে যা নয় তা হওয়ার চেষ্টা করতে পারলেও নিজেকে এ বিষয়ে ফাঁকি দেওয়ার কোনো ফাঁকই থাকে না। তাই একজন মানুষের প্রধান কাজই হবে, সে নিজে কি তা জানা। দিনের শেষে প্রতিটি মানুষকেই নিজের মুখোমুখি হতে হয় আপন অন্তঃপুরে।

লালন ফকির কয়,
যাবি মন কোথায়
আপনার আপনি ভুলে।।

॥ ২ ॥

ও তার ঠিকের ঘরে ভুল পড়েছে মন। কী সে চিনবি রে মানুষরতন

মানুষ আর পাঁচটা প্রাণীর মতোই শুধু অতিরিক্ত বুদ্ধিবৃত্তি বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন প্রাণী নয়, মানুষ হল এই বিশ্বের বহু মূল্যবান সম্পদ, যাকে লালন 'মানুষরতন' বলেছেন। আবার কখনো বলেছেন 'সোনার মানুষ'। কিন্তু এই 'রতন'কে সে অর্থাৎ মানুষ মূল্য দিতে পারে না তার স্বরূপ না বুঝে, তাই সে এই 'মানুষরতন'কে চিনে উঠতেও পারে না, তাই নিজেকে খুঁজতে পেতে তার দেরী হয়ে যায়।

এই মানুষে আছে রে মন
যারে বলে মানুষরতন।
লালন বলে পেয়ে সে ধন
না পাই চিনিতে।।

আমাদের আশেপাশের ছোটো বড়ো সব মানুষের মধ্যেই লুকিয়ে আছে এই 'সোনার মানুষ'। মানুষে মানুষে এই যে ভেদাভেদ তা সবই আমাদের সৃষ্টি, জাত বা কাজের প্রেক্ষিতে এই যে মানুষকে ছোটো-বড়ো হিসেবে দেখা তা একেবারেই মূল্যহীন, কারণ তার মধ্যে যেই পরমাত্মা রয়েছেন, সেই পরমাত্মাই সকলের মধ্যে বিরাজমান। লালনগীতিতে মানবতাবাদের দিকটি বারবার লক্ষ করা যায়। এই গানগুলিতে বার বারই ধরা পরেছে মানুষকে চেনার কথা, সে মানুষ সে নিজেই হোক বা অন্য মানুষ। লালনের কথায় মানুষ হয়ে মানুষের কদর করতে জানলে তবে 'সোনার মানুষ' হয়ে ওঠা যায়, পার্থিব জড় বস্তু যে সোনা, তা কেবলই এক খনিজ পদার্থ মাত্র, তার মালিক হলেই সোনার মানুষ হওয়া যায় না। প্রকৃত সোনার মানুষ সে, যিনি কোনো রকম ভেদাভেদ ভুলে অন্য মানুষের কদর করতে জানেন। রবি ঠাকুরের 'গুপ্তধন' গল্পে আমরা দেখেছি মৃত্যুঞ্জয়কে, সে

তার জীবনের প্রায় সবটুকুই কঠোর পরিশ্রম করে কাটিয়ে দিয়েছিল ঐ গুপ্তধন পাওয়ার লালসায়। শেষ অবধি যখন সে তা পায় এবং ঐ সোনা, রত্ন সম্ভারের মধ্যে আটকে পড়ে, তখনই সে উপলব্ধি করতে পারে যে প্রকৃত 'রতন' বা 'সোনা' এসব কিছুই নয়। তার মনে পরে উন্মুক্ত আকাশতলে তার আপন পরিজন, পড়শিদের কথা, তার ভিটের কথা। এমনকি সেই ভোলা কুকুর আর সেই অসময়ের আশ্রয়দাতা সেই মুদির কথাও তার মনে পড়তে থাকে। সে বোঝে যে তার জীবনের প্রকৃত সম্পদ সেই মানুষগুলোই, যারা আছে সেই উন্মুক্ত পৃথিবীর প্রাঞ্জল অঙ্গানে, এসব সোনা, রত্নভাণ্ডার সবই তুচ্ছ ও মূল্যহীন এক 'সোনার গারদ' মাত্র। এই সোনার গারদেই সে প্রথম উপলব্ধি করে মানব ও মানবজীবনের মূল্য এবং সে প্রথম নিজেকে চিনতে পারে অর্থাৎ সে নিজে কি এবং সে আসলে ঠিক কি চায় তা বুঝতে পারে। আসলে মানুষ হয়ে অন্য মানুষের কদর করতে পারলে তবেই প্রকৃত অর্থে মানুষ হয়ে ওঠা যায়, হওয়া যায় 'সোনার মানুষ'। লালনের কথায়—

মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি।
মানুষ ছাড়া ক্ষ্যাপা রে তুই মূল হারাবি।।

এই সত্য উপলব্ধি হলে আর কোনো তত্ত্বের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয় না; কারণ সব ধর্মের সার আছে এই মানবধর্মে। এই মানবধর্ম আমাদের তৈরি সকল ভেদাভেদ ভুলিয়ে দেয়। এই মানবতত্ত্ব যে বোঝে, সে আর অন্য কোনো তত্ত্বই অনুসরণ করে না। মানবতত্ত্ব আমাদের জাতিগত ভেদাভেদ ভুলিয়ে দিতে পারে, পারে নিজেকে চেনাতে, খোঁজ দিতে পারে মনের মানুষের আবার স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে পারে ঈশ্বরে অভেদত্ব। লক্ষ্য স্থির রাখতে ও সঠিক পথে এগিয়ে যেতে 'মানুষ-রতন' তত্ত্বের জুড়ি মেলা ভার। লালন বলেন—

নরই সরই নূলা ঝুলা
পেচ পেচী আলাভোলা
তাতে নয় সে ভোলনেওয়ালা
যেজন মানুষ রতন চেনে।।

॥ ৩ ॥

জাত ভোলানো গান

সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে।
লালন কয় জাতির কী রূপ দেখলাম না এই নজরে।।

লালন গানে যে বিষয়টি বার বার সুস্পষ্টভাবে উঠে এসেছে সেটি হল জাত ভোলানো গান। লালন গীতিতে তথা লালন তত্ত্বে সবার আগে স্থান পেয়েছে মানুষ তথা মানবতা। আর মানবতা ধর্মের মূলেই রয়েছে ভেদভেদহীনতা। আর তা থেকেই লালনের গানে বারবারই এসেছে জাত ভোলানো গান। এই যে সেই আদিকাল থেকে আমরা জাত চলে যাওয়ার বিষয়ে এত ওয়াকিবহাল, কিন্তু এই জাত যে কোথায় যায় তা আজ অবধি জানা যায়নি। আমাদের সমাজে বেশ কিছু নিয়ম প্রচলিত আছে জাত প্রসঙ্গে। যেমন—এক জাতের মানুষ অন্য জাতের মানুষকে ছুঁলে জাত চলে যায়। আবার এক উচ্চ জাতের মানুষ নিম্ন জাতের মানুষের কাছ থেকে জল পান করলে উচ্চ জাতের মানুষের জাত যায় ইত্যাদি নানা ধরনের নিয়ম মানতে দেখা যায়। কিন্তু এসব নিয়মের আদৌ

কোনো ভিত বা ভিত্তি আছে কিনা তা কেউ ভেবে দেখে না। শহরের দিকগুলিতে তবু বর্তমানে এই ভেদাভেদ কিছুটা প্রশমিত হয়েছে তবে নির্মূল হয়নি। কিন্তু প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে এখনো এই ধরনের ভেদাভেদ-এর বাহুল্য নজরে আসে। সমাজের এই ভেদাভেদকে লালন 'আজব কারখানা' বলে আখ্যায়িত করেছেন—"জাত গেল জাত গেল বলে একি আজব কারখানা।"

যে জাত বা বংশে মানুষ জন্মগ্রহণ করে, সে সেই জাত বা বংশ কোনোটিই নিজে নির্ধারণ করতে পারে না। কিন্তু জন্ম পরবর্তীকালে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় তার ধর্ম বদলে নিতে পারে এবং তার ধর্ম বদলের সাথে বদলায় তার জাত। আবার কোনো অনাথ শিশুকে দত্তক নেওয়া হলে সেই শিশু জন্মসূত্রে যে জাতের, সেই জাত কোন্ জাত? তা সে জানতেও পারে না। সুতরাং একজন মানুষ কোন্ জাতে জন্মাবে, কোন্ জাতে বড়ো হবে আর কোন্ জাতের মানুষ হয়েই বা তার শেষ দিন কাটবে, তা সে নিজেও জানে না। একজন মানুষের মূল জাত হল মানব জাত। তাই লালন বলেছেন—

আসবার কালে কি জাত ছিলে
এসে তুমি কি জাত নিলে।
কি জাত হবা যাবার কালে
সেই কথা ভেবে বলো না।।

এই জাত বিষয়টি বড়োই অদ্ভুত, একই কাজ বা বৈশিষ্ট্য ভিন্ন জাতে ভিন্ন অর্থধারক। স্বামীর মৃত্যু হলে তার বিধবা স্ত্রীকে বৈধব্য পালনের জন্য সাদা বস্ত্র পড়তে দেখি হিন্দু জাতে, আবার সাদা বস্ত্রেই খ্রিস্ট জাতের বিবাহ সম্পন্ন হয়ে থাকে, আবার এই জাতের কেউ মারা গেলে কালো পোশাকে মৃতের আত্মার শান্তি কামনার চল রয়েছে। অন্যদিকে মুসলিম জাতের মেয়েরা তাদের সাধারণ জীবনযাপনেই কালো বোরখা পরে থাকে রীতি হিসেবে, যা তাদের সুখ বা দুঃখ কোনো কিছুরই ইঙ্গিত নয়। অথচ এই সকল জাতের নারীই কিন্তু মূলত মানুষ এই একই পৃথিবীর বাসিন্দা, এদের সকলের কাছেই সাদার অর্থ সাদা এবং কালোর অর্থ কালো কিন্তু তবু জাতিভেদে তাদের আচরণের এত তারতম্য।

সুন্নত দিলে হয় মুসলমান
নারীলোকের কী হয় বিধান
বামুন চিনি পৈতে প্রমাণ
　　বামনী চিনি কীসে রে।।

কেউ মালা কেউ তসবি গলে
তাই তে কি জাত ভিন্ন বলে
আসা কিংবা যাওয়ার কালে
　　জাতের চিহ্ন রয় কারে রে॥

তাই লালনের কাছে জাত একটাই আর সেটি হল মানুষের জাত। তিনি এই জাত নিয়ে ভেদাভেদ-অস্পৃশ্যতা দেখেছিলেন এই সমাজে। আর তা যে শুধুই হানাহানি, বিদ্বেষ আর ঘৃণার সৃষ্টি করে তাও তিনি বুঝেছিলেন। আর উপলব্ধি করেছিলেন যে, আপাত দৃষ্টিতে দেখে এই জগতের যা কিছু আমরা বিচার করতে চাই তা সবই মায়া, আসল সত্য হল জগতস্রষ্টা। জগতস্রষ্টাকে উপলব্ধি করতে পারলেই জানা যায় নিজেকে তথা এই জগতকে। মানুষে মানুষে এই যে বর্ণ, ধর্ম, উচ্চ-নীচ, সবকিছুই জাতিগত ভেদ লালনের কাছে অর্থহীন বলে মনে হয়েছে। লালন তাই জাতের এই

ভেদাভেদকে 'বিকিয়েছে সাধবাজারে'। তাহলে লালনের জাত কি? এই প্রশ্নের উত্তর তাঁর গানে পাওয়া যায়—

সবে বলে লালন ফকির কোন্ জাতের ছেলে।
কারে বা কী বলি আমি দিশে না মেলে।....

জাত বলিতে কী হয় বিধান
হিন্দু যবন বৌদ্ধ খ্রিস্টান
জাতের আছে কিবা প্রমাণ
শাস্ত্র খুঁজিলে।
মানুষের নাই জাতের বিচার
এক এক দেশে এক এক আচার
লালন বলে জাতের ব্যবহার
গিয়াছি ভুলে।।

॥ ৪ ॥

মনের মানুষ

লালন গীতিগুলির মধ্যে 'মনের মানুষ' নিয়ে গানগুলি খুব বেশিভাবে মানুষকে ছুঁয়ে যায়। জাতিগত ভেদাভেদ ভুলে, নিজেকে উপলব্ধি করে, মানুষকে যখন মানুষ মানুষরতন হিসেবে চিনতে শেখে তখন সে মনের মানুষের অন্বেষণ করতে থাকে। এই মনের মানুষ কে? বিভিন্ন দিক থেকে এই মনের মানুষের ব্যাখ্যা করা যায়। আমরা সাধারণ মানুষ যখন এই 'মনের মানুষ' কথাটি শুনি, তখন আমরা এমন একজনকে কল্পনা করি, যে ভিন্ন দেহে আমারই মনের প্রতিরূপ। সহজভাবে বলতে গেলে, মন থেকে ভালোলাগার যে মানুষ সেই হল মনের মানুষ। যাকে প্রেমিক বা প্রেমিকা নামে আমরা সংজ্ঞায়িত করে থাকি। কিন্তু ভিন্ন অর্থে মনের মানুষ হল সেই মানুষ, যে মানুষটা এই 'আমি' নামের দেহের ভিতরে বাস করে অর্থাৎ আত্মা, এখানেও ফিরে আসে লালন গানের আত্মতত্ত্বের কথা। আবার অনেকের কাছে এই 'মনের মানুষ' হল জগতস্রষ্টা অর্থাৎ ঈশ্বর। লালন গান যিনিই শুনেছেন তিনিই তাঁর নিজের মতন করে তাঁর ব্যাখ্যা করে নিয়েছেন এই গানগুলির কথাকে। তাই এক একজনের কাছে এই 'মনের মানুষ'-এর অর্থ ভিন্ন ভিন্ন। তবে 'মনের মানুষ'-কে ঈশ্বর, প্রেমিক, আত্মা বা অন্য যেভাবেই দেখা হোক না কেন, সকলেই তাকে নিজের সাথে অভিন্ন বলে মনে করেন। "এই মানুষে সেই মানুষ আছে।" এই মানুষ অর্থাৎ আমার মধেই আছে সেই মানুষ অর্থাৎ মনের মানুষ। আর ঠিক এই কারণেই 'মনের মানুষ' অর্থে ঈশ্বরকে কল্পনা করলে তাঁকে নিজের থেকে অভিন্ন মনে হয় না আর তাই এই মানুষ, তার মনের মানুষকে নিয়ে বাহ্যিক দিক থেকে থাকে একেবারেই আড়ম্বরশূন্য। লালন বলেছেন—"আছে যার মনের মানুষ মনে তোলা, সে কী জপে মালা।" আবার মানুষ নিজেকে যেভাবে এবং যতটা চিনতে পারে, অন্যকে সে সেভাবে চিনতে পারে না, আবার অপর কেউ তাকে তাঁর মতো করে চিনতে পারে না। তাই সেই অর্থে ব্যক্তি নিজেই নিজের 'মনের মানুষ'। আবার যদি কেউ এই মনের মানুষ অর্থে জীবনসঙ্গী তথা প্রেমিক বা

প্রেমিকা কল্পনা করেন, সেক্ষেত্রেও যদি সে নিজেকেই না চেনে তবে সে কখনোই বুঝতে পারবে না যে তার আকাঙ্ক্ষিত মনের মানুষটি ঠিক কেমন—

আপনার আপনি চিনি নে।
দিন-দোনের পর যার নাম অধর
তারে চিনব কেমনে।।

অর্থাৎ মনের মানুষের হদিশ তখনি পাওয়া সম্ভব যখন নিজেকে চেনা যাবে। আর নিজেকে না চিনতে পারলে, আক্ষেপের সুরে গাইতে হবে—

মনের মানুষ চিনলাম না রে।
পেতাম যদি মনের মানুষ
সাধিতাম তার চরণ ধরে।।

লালনের কাছে এই মনের মানুষ-এর পরিচয় ঠিক কি? এ বিষয়ে মতপার্থক্য থাকতে পারে। তবে তাঁর গানের কথাগাঁথায় 'মনের মানুষ' কথাটি যেভাবে উঠে এসেছে তাতে মনে হয় যে তাঁর কাছে এই 'মনের মানুষ' হল তাঁর আত্মা। 'এই মানুষে', 'সেই মানুষ' খুঁজতে তিনি ব্রতী হয়েছিলেন। তাই তাঁর গানে এসেছেন জগতস্রষ্টা, তেমনি আবার এসেছে সমাজের বৈচিত্র্যময় দিক ও সমস্যা, আর এসেছে মানবতা ধর্ম সাধনের সাধনকথা। 'মনের মানুষ মনের মাঝে কর অন্বেষণ'— এই তাঁর মন্ত্র। মনের মানুষকে শুধু জানা নয়, তাকে উজাড় করে ভালোবাসা দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে তাঁর কথায়। অর্থাৎ নিজেকে চেনা, নিজেকে সঠিক পথ নির্দেশ করা, সর্বোপরি নিজেকে ভালোবাসার মধ্যে দিয়েই থাকা যাবে আমাদের আশেপাশের মানুষগুলোর প্রতি দায়িত্ববান। মনের মানুষ যদি ঈশ্বর হন, তবে তাঁকে খোঁজার মধ্যে দিয়েই খুঁজে পাওয়া যায় নিজেকে কারণ সেই ঈশ্বর আর আমি অভিন্ন, অর্থাৎ "সো অহম্"। আবার যদি প্রেমিক অর্থে 'মনের মানুষ'-কে বুঝি, তবে তাঁকে খুঁজে পাওয়ার জন্য আগে নিজেকে, নিজের মনকে বুঝতে হবে। কিন্তু সবশেষে মানুষ উপলব্ধি করতে পারে যে, জগতস্রষ্টা কিংবা সে নিজে, এই দুই হল প্রকৃত অর্থে "মনের মানুষ"। কারণ স্রষ্টা ও সৃষ্টি অভিন্ন এবং তাদের প্রকৃত যে সম্পর্ক তা একেবারেই আড়ম্বরহীন, সাদামাটা, সহজসরল। এদের একজন মেঘ তো অপরজন বৃষ্টি। এই আত্মপাঠ বোঝার জন্যই তাঁর জীবনব্যাপী আকুতি—

মিলন হবে কতদিনে।
আমার মনের মানুষের সনে।।

॥ ৫ ॥

নাম বদলে ঈশ্বর এক

মনের মানুষ সেই জগত স্রষ্টা তথা ঈশ্বর বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন ধর্মে, বিভিন্ন নামে পরিচিত। তবে লালনের ধর্মে তথা মানব ধর্মে কোনো জাতি ভেদ নেই, ভেদাভেদ নেই ধর্মের, তাই লালনের কাছে ঈশ্বর এক। লালনের কাছে যে রাম সেই রসুল সেই নবী আবার সেই গোপাল।

রাম-রহিম বলছে যে জন

ক্ষিতি-জল কি বায়-হুতাশন
শুধালে তার অন্বেষণ
মূর্খ দেখে কেউ বলে না।

জগতস্রষ্টা সৃষ্ট এই বিশ্বে আমরাই তাঁকে নানারূপে কল্পনা করে থাকি আপন স্বার্থে। আসলে জগৎস্রষ্টাই হলেন আমাদের প্রকৃত মনের মানুষ, তাঁকে আমরা ঠিক যে রূপে দেখতে চাই সেরূপেই কল্পনা করে নিতে পারি। আমাদের পার্থিব মন তাঁর এই সুবৃহৎ রূপকে এক নিরাকার জ্যোতি রূপে কল্পনা করতে অক্ষম। আর এভাবেই সৃষ্টি হয় নিত্য নূতন দেবদেবীর। আর ঐ সৃষ্ট দেবদেবী বা ঈশ্বর যেহেতু মানবমন কল্পিত তাই ঈশ্বর ও স্রষ্টা অভিন্ন আর এভাবেই বিভিন্ন ধর্ম লালনের কাছে এক হয়ে গেছে। লালন গীতিতে যখন নারীর কথা পাই তখন মনে হয় যেন লালন ছিলেন পরম নবী ভক্ত—

"শুনি নবির অঙ্গে জগৎ পয়দা হয়।
সেই যে আকার কী হল তার কে করে নির্ণয়।"

তাঁর গানে আল্লার কথা আমাদের মনে প্রশ্ন তোলে, লালনের ভক্তি কি তবে শুধুই আল্লার প্রতি?—

আল্লা কে বোঝে তোমার অপার নীলে।
আপনি আল্লা ডাক আল্লা বলে॥

যখন তাঁর গানে রাধা কৃষ্ণের কথা দেখি তখন মনে হয় যেন শ্রীরাধিকা, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর মনের কথা ব্যক্ত করছেন।—

পরলাম কলঙ্কের হার
তবু তো ও কালার
মন তো পেলাম না;
যেমন রূপ কালা
অমনি উহার মন কালা॥

আবার কোনো গানে মনে হয় ছোট্ট গোপাল সজল নয়নে তাঁর যশোদা মায়ের প্রতি অনুযোগ জানাচ্ছেন।

আর আমারে মারিস নে মা।
বলি মা তোর চরণ ধরে ননী চুরি আর করব না।।
ননীর জন্যে আজ আমারে
মারলি গো মা বেঁধে ধরে
দয়া নাই মা তোর অন্তরে
স্বল্পেতে গেল জানা। ...
ছেড়ে দে মা হতের বাঁধন
যায় যেদিকে যায় দুই নয়ন
পরের মাকে ডাকব এখন

তোর গৃহে আর থাকব না।

আসলে বাউল সম্রাট লালনের কাছে নাম বদলে ঈশ্বর এক, তাই তাঁর যখন যে নামে ইচ্ছে হয়েছে সেই নামে ডেকেছেন তাঁকে। এই সকল নামে সেই পরম শক্তি তাঁর কাছে এক। আর তাই তাঁর কথায় নেই কোনো ভেদাভেদ, নেই কোনো দ্বন্দ্ব শুধুই আছে মিলন; মনের সাথে মনের; মানুষের সাথে মানুষের আর পরমাত্মার। তাই তাঁকে জাতপাতের কাঁটাতার কখনোই বাঁধতে পারেনি—

সবে বলে লালন ফকির হিন্দু কি যবন।
লালন বলে আমার আমি না জানি সন্ধান।..
বেদ-পুরাণে করেছে জারি
যবনের সাই হিন্দুর হরি
তাও তো আমি বুঝতে নারি
দুইরূপ সৃষ্টি কী তাই প্রমাণ।।

এই ঈশ্বরই লালনের কাছে তাঁর মনের মানুষ, সেই ঈশ্বর আর সে যে অভিন্ন তা উপলব্ধিতেই তাঁর জীবনব্যাপী সাধনা। বিশ্বের সব কিছুই তাঁর থেকে সৃষ্টি, আবার তাঁতেই বিলীন। এই 'আমি', আমার 'মনের মানুষ', 'মানুষ-রতন' সব কিছুই তাঁর থেকেই সৃষ্ট। এই 'আমি' থেকে 'ঈশ্বর'-এর মধ্যে এক জীবন চক্র চক্রাকারে আবর্তিত হয়ে চলেছে। 'আমি'-কে জানলে সহজেই চেনা যায় 'মানুষ-রতন'-কে। 'মানুষ-রতন'-কে জানলে বোঝা যায় যে 'জাত'-এর ভেদাভেদ বলে কিছু হয় না, একটাই জাতের অস্তিত্ব আছে আর সেটি হল মানব জাত। এই 'আমি', 'মানুষ-রতন'কে চিনলে এবং 'জাতি'গত ভেদাভেদ যে কেবলই এক অহেতুক সামাজিক কাঁটা তার তা উপলব্ধি হলে, সে সব ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে মানুষ তার 'মনের মানুষ'-এর অন্বেষণে কখনো ঘর ছাড়ে কখনো বা ঘর বাঁধে। আর এই সবের মধ্যেই চলতে থাকে তার ঈশ্বর অন্বেষণ। আমরা যে 'জাতি'-গত ভেদাভেদ সৃষ্টি করি, তাও ঈশ্বরকে ঘিরেই। এভাবেই হয় ঈশ্বর উপলব্ধি আর তারপর আবার তাঁর হাতের সুনিপুণ শিল্পে তৈরি হয় নতুন এক 'আমি'; চলতে থাকে জীবন চক্র।

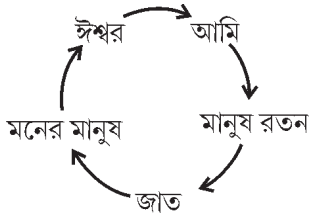

দেখাই যাচ্ছে যে, লালনগীতির মধ্যেই আছে সেই সহজ প্রশ্নগুলির নিগূঢ় উত্তর। আর তাই স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও ছিলেন বাউল গানের পৃষ্ঠপোষক। তাঁর গানেও লালনগীতির ছোঁয়া ধরা পরে। লালনের কথায় 'ঘরের চাবি পরের হাতে।' অন্যদিকে কবিগুরু লিখেছেন 'ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে'। আবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে যে,তাঁর মনের মানুষই হলেন জগতস্রষ্টা, তা স্পষ্টই বোঝা যায়, যখন তাঁর প্রেম ও পূজা পর্যায়ের গানগুলি শুনেও আমরা

কোন্‌টি কোন্ পর্যায়ের গান তা বুঝতে ভুল করি। লালনের সাথে কবিগুরুর সাক্ষাৎ আদৌ হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে গবেষকদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও, লালনের শিষ্য বা অনুসারীদের সাথে যে তাঁর সাক্ষাৎ হতো তা তাঁর একটি চিঠিতে স্পষ্ট বোঝা যায়—

> তুমি তো দেখেছ শিলাইদহতে লালন শাহ ফকিরের শিষ্যদের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমার কিরূপ আলাপ জমত। তারা গরিব। পোশাক-পরিচ্ছদ নাই। দেখলে বোঝার জো নাই তারা কত মহৎ। কিন্তু কত গভীর বিষয় সহজভাবে তারা বলতে পারত।

ভক্তিগীতির মধ্যে দিয়ে সহজ সরল কথা ধরে তারা তাদের মতো করে উপলব্ধি করতো জীবন রহস্য। লালন গীতির বেশ কিছু গানই এই ভক্তিগীতিগুলির মতনই। লালন বলেছেন—

আল্লা বল মন রে পাখি।
ভবে কেউ কারো নয় দুঃখের দুখী।।
ভুলো না রে ভব ভ্রান্ত কাজে
আখেরে এসব কাণ্ড মিছে
মন রে আসতে একা যেতে একা
এ ভব পিরিতের ফল আছে কি।..
গোরের কিনারে যখন লয়ে যায়
কাঁদিয়ে সবায় প্রাণ ত্যজতে চায়
লালন কয় কারো গোরে কেউ না যায়
থাকতে হয় একাকি।।

এরই পাশাপাশি যে শ্যামা-সঙ্গীত তথা ভক্তিগীতিটির কথা মনে আসে সেটি হল—

ভেবে দেখ মন, কেউ কার নয়,
মিছে ভ্রম ভূ-মণ্ডলে।
যার জন্য মর ভেবে, সে কি তোমার সঙ্গে যাবে

সাধারণ মানুষের বোঝার মতোই লালন গান বাঁধতেন, আর ঠিক এই কারণে গানগুলি যেমন ছুঁয়েছিল পুঁথিগত বিদ্যাহীন মানুষগুলির মন আবার পৌঁছেছিল উচ্চশিক্ষিত মানুষগুলির কাছেও। প্রতিটি মানুষের যেমন স্ব স্ব অস্তিত্ব রয়েছে তেমনি রয়েছে তাদের নিজ নিজ দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি আর সেই দৃষ্টিভঙ্গিতেই তাঁরা দেখেন উপনিষদের—'আত্মানং বিদ্ধি' বা গ্রিক দার্শনিক প্লেটোর চিন্তার প্রতিফলন 'know thyself' মিলে গেছে লালনের আত্মতত্ত্বের সাথে। লালন বলেছেন—

এমন মানবজনম আর কি হবে।
মন যা করো ত্বরায় করো এই ভবে।।

আসলে আমাদের ধর্ম একটাই সেটি হল মানবধর্ম। তাই বিভিন্ন দার্শনিকদের চিন্তাপথ কোথাও এসে মিলে যায়। কবিগুরুর গানের রেশ ধরে বলা যায় যে, যখন তিনি বলেন— 'আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে তাই হেরি তায় সকলখানে' তখন লালন-রবি-দেকার্ত— প্লেটো-সুফি-সন্ত- রামপ্রসাদ সকলেই এক হয়ে যায়। ঠিক এইভাবেই 'মনের মানুষ' এর মতো গানগুলির মধ্যে দিয়ে লালন, লালনপ্রেমীদের মনের খুব কাছের মানুষ তথা মনের মানুষ হয়ে উঠেছেন। লালনগীতি তাই অমর। কিন্তু লালনের গান ও তাঁর আখড়ার কথা শুনলেই সেই সমস্ত প্রশান্তময় মুহূর্তগুলির রেশ পেতে

অনেকেরই বোধ হয় সাধ হয় আমার মতই, তাই শেষে বলা যায়—

হয়না কেন তোমার আমার;
এই যে ছোট্ট জীবনখানা,
বাউল গানের ছন্দে বাঁধা!
ছোটো বড়ো জাতকে ভুলে,
সবার সাথে সবাই মিলে,
মনের মানুষ অন্বেষণে,
কাটত যে দিন হেঁসে খেলে।
তোমার আমার ক্ষ্যাপা মনে,
মিলন হত লালন গানে॥

তথ্যের সন্ধানে

১. আবুল কাশেম মুরাদ সংকলিত : 'ফকির লালন সাঁইয়ের নির্বাচিত একশত সঙ্গীত', সদর প্রকাশনী, ঢাকা, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১০।
২. আবুল আহসান চৌধুরী সংকলিত-সম্পাদিত : 'লালনের গান', গাঙচিল, কলকাতা, গাঙচিল, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০১৭।
৩. ড. মোঃ আব্দুল করিম মিঞা : 'বাউল-লালন পরিভাষা', নবযুগ প্রকাশনী, কলকাতা, ২য় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ২০১৪।
৪. ড. অম্লান কুমার গুহঠাকুরতা : 'অচীনপুরের সন্ধানে', শ্রদ্ধা প্রকাশন, জানুয়ারি ২০১৯
৫. লিপি চক্রবর্তী ও চন্দন চক্রবর্তী সংকলিত : 'বাংলা কবিতা চর্যাগান থেকে বিনয়-সন্ধান', গ্রন্থি প্রকাশন, মে ২০১৭।
৬. সুব্রত রায়চৌধুরী সম্পাদিত : তথ্যসূত্র 'বাঙালি গীতিকার', ২১ বর্ষ,।
৭. 'সাহিত্য-পরিষৎ' ত্রৈমাসিক পত্রিকা, একাশিতম বর্ষ, দ্বিতীয়-চতুর্থ সংখ্যা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, শ্রাবণ-চৈত্র ১৩৮১।

আন্তর্জালিক উৎস

- http://www.lalongeeti.com/lalon-kangal-harinath/
- https://lalonsain.wordpress.com
- http://www.prothomalo.com/specialsupplement/article/503128//
- http://sahityosudha.wordpress.com/2015/07/31/138//

রবীন্দ্রনাথের বাউলাঙ্গের গান

অস্মিতা মিত্র

ভাষার উৎপত্তি মনের ভাবকে ব্যক্ত করার উদ্দেশ্যেই— একথা সবারই জানা। আমাদের দৈনন্দিন কথাবার্তার মধ্যে বেশিরভাগ কথাই হয় কাজের কথা। কিন্তু এই কাজের বা প্রয়োজনীয় কথার মধ্যেও আমরা এমন কিছু কথা বলি যার ধরণ ভিন্ন। অনেক সময় কোনো বিশেষ উপলব্ধি বা বিশেষ অনুভবও প্রকাশ পায় ভাষার আকারে। আবার এমন কিছু মনের ভাবও আছে যা কথার মাধ্যমে সম্পূর্ণ প্রকাশ করা সম্ভব হয় না, তখন সাহায্য নিতে হয় সংগীতের। সংগীতের ভাবই প্রাণ, ছন্দ, সুর, তাল বিকাশের প্রধান উপকরণ। আর রবীন্দ্রনাথের গানে ভাব যে এক বিশেষ জায়গা জুড়ে আছে একথা কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর রানী চন্দকে বলেছিলেন—রবীন্দ্রনাথের জীবনী পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথেরই গানে। এ প্রসঙ্গে বলা যায় অবন ঠাকুর নিশ্চয়ই ভেবেছিলেন রবীন্দ্রনাথের মর্মের জীবনীর কথা বিশেষ একজনের। মানুষের মনোজীবনে থাকে তার বাস্তবজীবনের অবলম্বন, তা না হলে রবীন্দ্রনাথের সীমার থেকে অসীমের যাত্রাও হয়ে যায় ব্যর্থ।

'বাউল' নামটি শুনলেই যেকোনো রবীন্দ্রপ্রেমীর মনে ভেসে ওঠে ১৯১৬ সালে অবন ঠাকুরের আঁকা সেই ছবি যেখানে বাউল রূপে একতারা হাতে নাচছেন আমাদের রবি বাউল।

শিলাইদহ পর্বে (১৮৯১-৯৫)-র পর থেকে বাউলদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের যে টান ব্যাপ্ত হয়েছে তা প্রায় তাঁর সমগ্র জীবন ধরেই ছিল। এই পর্ব পার হয়ে অনেক দূরে চলে এসেও নানান উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ঐ পর্বের অভিজ্ঞতার কথা, লোকসাধনার ধারার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারে লোকসাধনার ঐতিহাসিক মূল্যের কথা বলেছেন।

সকল সাহিত্যের মতো লোকসাহিত্যেও আছে ভালোমন্দের ভেদ। আধুনিক বাউল গানের বেশিরভাগটাই পথে পথে বিকোচ্ছে চলতি হাটের সস্তা দামের জিনিস হয়ে। লোকসংস্কৃতি বা লোকসাধনার ধারার মধ্যে আমাদের স্বদেশের চিত্তের ঐতিহাসিক পরিচয়ও দেখতে পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।

বাউল সাধনার সার কথা হল প্রেমের মাধ্যমে মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করা। এই প্রেম হল মানবপ্রেম। প্রেমের জন্যই তার ঘর বাঁধা আবার ঘর ছাড়াও তার প্রেমেরই জন্য। তাদের জীবন মুক্ত জীবন আর ধর্ম হল জীবনবোধ। বাউলের 'মনের মানুষ' মানুষের অন্তর সত্তা। রবীন্দ্রনাথের নিজের মধ্যেও গড়ে উঠেছিল এক স্বতন্ত্র বাউল সত্তা। বাউলদের দেহতত্ত্বের ধারণা নয় বরং অচিন

পাখি ও মনের মানুষের ধারণাই গুরুদেবকে করে তুলেছিল পাগল, প্রেমিক ও সাধক। বলা যায় গুরুদেবের বাউল তাঁর নিজস্ব বাউল যে অবিরত খুঁজে যায় তাঁর মনের মানুষকে। সেই মানুষকেই তিনি বাউল গানের সুরে ধরেছেন কিন্তু কথা ও ভাব অবশ্যই তাঁর নিজের। তবে বাউলের নির্দিষ্ট কোনো সুরের সীমাবদ্ধতা নেই বরং বলা যায় গুরুদেবের 'মনের মানুষ' হয়েছে তাঁর বাউলাঙ্গের বিষয়। রবি বাউলকে আমরা মূলত খুঁজে পাই তাঁর গানে। মনের মানুষকে সন্ধান করার আশায় গভীর ও নির্জন পথে তিনি ব্রাত্য এবং বন্ধনহীন।

রবীন্দ্রনাথের বাউল সাধনা

লালনগীতির দার্শনিক ও নান্দনিক প্রভাব গুরুদেবকে আলোড়িত করার সাথে সাথে তাঁর চেতনার জগতেও এক অভূতপূর্ব পরিবর্তনের সাধন ঘটে। রবীন্দ্রনাথ বাউল গানের দ্বারা এতটাই প্রভাবিত হয়েছিলেন যে তিনি নিজেকে 'রবীন্দ্র-বাউল' বলেও পরিচয় দিয়েছেন। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের শেষ ভাগে রবীন্দ্রনাথ জমিদারি দেখাশোনার দায়িত্ব নিয়ে আসেন শিলাইদহে। সেখানে তিনি বাংলার সাধারণ মানুষদেরকে আরও কাছ থেকে দেখার সুযোগ পান। এ সময় তিনি কুষ্টিয়া অঞ্চলের বাউল-ফকিরদের সাধন সংগীত শুনে চমকিত হন। তাদের গানের সুর ও বাণী তাকে আপ্লুত করে তোলে। তাদের দর্শন তিনি আত্মস্থ করেন। তাঁর সাথে বাউলদের এক অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই সম্পর্কের কারণেই বাউল গানের প্রতি এক অসীম মোহের টানে তিনি অনেক বাউল গান সংগ্রহ এবং বিভিন্ন পত্রিকায় তা ছাপার ব্যবস্থা করেন। ১৩১৪ সালের ভাদ্র সংখ্যাতে 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশ করেন লালনের গান। 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে গান সম্পর্কিত প্রবন্ধেও তিনি লালনের গানের উল্লেখ করেছেন। ১৩৪১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত 'ছন্দের প্রকৃতি' শিরোনামের প্রবন্ধেও তিনি লালনের গানের প্রসঙ্গ তোলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অক্সফোর্ডে দেওয়া বক্তৃতায় লালনের 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি' গানের ইংরেজি অনুবাদ করে শুনিয়েছেন বিদেশি শ্রোতাদের। এই বক্তৃতায় তিনি লালনকে উপনিষদের ঋষিদের সাথে তুলনা করেন। এই গানটি তিনি 'গোরা' উপন্যাসেও উদ্ধৃত করেছেন। ১২৯০ সালে 'ভারতী'-র বৈশাখ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ 'সঙ্গীতসংগ্রহ' নামক একটি গীত সংগ্রহের প্রথম খণ্ডে সংগৃহীত বাউল-জাতীয় গানগুলির উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম তাঁর কবিচিত্তের কৌতূহল ও সহমর্মিতা প্রকাশ করেন।

বাউলাঙ্গের রবীন্দ্রসংগীত

রবীন্দ্রনাথের গানে বাউলের প্রভাব অনস্বীকার্য। বাউলাঙ্গের প্রভাবে প্রভাবিত রবীন্দ্র সংগীতের বিস্তারিত তালিকার মধ্যে কিছু গানের তথ্যসহ আলোচনায় অগ্রসর হয়েছি। ভাওয়াইয়া গানের আদলে নির্মিত গগন হরকরার একটি গানে পাওয়া যায় মনের মানুষকে ধরতে পারার সাধনা—'দেখেছি রূপসাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা'। গীতাঞ্জলির যুগে এই 'রূপ-সাগরে' অবগাহন করেই রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন অরূপরতন প্রত্যাশী হতে। এই গানের অনুরূপ আকুলতাই প্রকাশ পায় রবি ঠাকুরের একটি গানেও—

ভেঙে মোর ঘরের চাবি
নিয়ে যাবি কে আমারে

ও বন্ধু আমার![১]

গানটির রচনাকাল ২০ শে পৌষ, ১৩২৪ বঙ্গাব্দ। গানটি পূজা পর্যায়ের। এখানে ঈশ্বর হলেন সেই মনের মানুষ যাকে লক্ষ করে প্রকাশ পায় কবির আকুলতা। প্রকাশিত হয় সেই প্রেমের কথা যাকে আশ্রয় করে বাউলরা ডুব দিয়ে থাকেন প্রেমের রূপসাগরে।

বাউলরা গুরুদেবকে বলেছিলেন—'আপনাকে জানতে হবে, যখন আপনাকে জানি তখন সেই আপনার মধ্যেই পাওয়া যায় তাকে।' রবীন্দ্রনাথও প্রায় একই প্রশ্ন রেখে গেছেন তাঁর অন্যান্য নানা গানে। তার প্রতিফলন ঘটেছে কখনো পূজা পর্যায়ে বা কখনো দেশাত্মবোধক গানে। এমনই এক দেশাত্মবোধক গানে মিশে গেল বাউলাঙ্গের ভাবনা। কথা বলে ওঠেন আমাদের প্রাণের রবি-বাউল—

এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে
জয় মা বলে ভাসা তরী।[২]

গানটির রচনাকাল ১৩১২ বঙ্গাব্দ (১৯০৫ খ্রি.) এই গানেরই অনুরূপ সুর বেজে ওঠে—

মন মাঝি সামাল সামাল
ডুবল তরী ভবনদীর তুফান ভারি...

লালন বলেছেন—

কী কবি ভেবে মরি, মন মাঝি ঠাহর দেখিনে
ব্রহ্ম আজি খাইছে খাবি, সেই নদী পাড় যাই-কেমনে।

মানবদেহে পঞ্চ ইন্দ্রিয়, ষড় রিপু ছাড়াও আছে আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন, সাধ-আহ্লাদ, আবেগ উৎকণ্ঠা যা ভবনদীর জলে ভেসে চলা কামনা-বাসনার বোঝায় ডুবুডুবু। তাঁর মতে এখনো সময় আছে জাগতিক কামনা-বাসনার ঊর্ধ্বে উঠে আত্মোপলব্ধির।

লালনের গানে আমরা পেয়ে যাই মনের মানুষের সন্ধান। যার মনের মানুষ আছে তার পূজা প্রার্থনার প্রয়োজন নেই। ১২১৭ সালের পৌষে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের একটি গানেও পাওয়া যায় প্রাণের মানুষকে খুঁজে চলার জন্য তাঁর নিরন্তর ব্যাকুলতা। অন্তরের অচিনপাখির মতোই নিজের ভেতরেই রয়েছে তার উপস্থিতি—

আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে,
তাই হেরি তায় সকল খানে।[৩]

গানটি পূজা পর্যায় ও বাউল উপ-পর্যায়ভুক্ত। এটি 'রাজা' নাটকের অন্তর্গত। বাউল দলের কণ্ঠে এটি শ্রুত। এখানে গুরুদেবের প্রাণের মানুষকে খুঁজে পাওয়ার ব্যাকুলতার সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে লালনের বাউলাঙ্গের চরম প্রভাব। শান্তিদেব ঘোষের মতে, শিলাইদহে বাউলদের গানের বাণী প্রতিফলিত হয়েছে গুরুদেবের বিভিন্ন গানে। মনের মানুষ যখন মনের দ্বারে আসে তখন মন থাকে সুপ্ত। আর সে যখন চলে যায় তখনই ঘুম ভাঙে এবং সেই সঙ্গে জেগে ওঠে কবির অন্তরের বাউল সত্তা। ১৯১৪ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনাথ লেখেন আরও এক বাউল সত্তার প্রতিধ্বনি—

আমার মন যখন জাগলি না রে
ও তোর মনের মানুষ এল দ্বারে।[৪]

এটিও 'পূজা' পর্যায় ও 'বাউল' উপপর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। এখানেও যেন কবির গানের সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে গেছে বাউলের প্রভাব। কবি লিখছেন-বাউলের সুর ও বাণী কোনো এক সময়ে তাঁর মনের মধ্যে মিশে গেছে সহজ হয়ে। বাংলার গ্রামে এর শান্ত দৃশ্যপটের সঙ্গে মিলে মিশে গেছে। কবির বাউল সত্তা—

গ্রামছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ
আমার মন ভুলায় রে।[৬]

এই গানটির প্রকাশকাল ১৩১৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে। এটি রবীন্দ্রনাথের 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের অন্তর্গত। এখানে রাঙা মাটির পথ যেন কবিকে ভুলিয়ে নিয়ে যেতে চায় অন্য জগতে, ফলে এখানেও ধরা পড়ে কবির বাউলসুলভ ক্ষ্যাপা মনোভাব। ১৩১২ সালের ভাদ্র মাসে প্রকাশিত স্বদেশ পর্যায়ের গান—

যে তোরে পাগল বলে
তারে তুই বলিস নে কিছু।[৭]

এই গানে যে আত্মশক্তির খোঁজ আমরা পাই সেখানে আছে লোকায়ত গানের সাধনমার্গের কথা। রবীন্দ্রনাথের গানে আমরা পাই একলা চলার সুর। আত্মশক্তির যে বীজ নিহিত ছিল বাউল গানে তা রবীন্দ্রনাথ আত্মস্থ করে রচনা করেন স্বদেশ পর্যায়ের গান। ১৩১২ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে রচিত স্বদেশ পর্যায়ের একটি গানে রবীন্দ্রনাথ লোকায়ত সুর ও বাউল পর্যায়ের সাধনার গভীর নির্জন পথের কথা—

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চলো রে।[৮]

এ গানেও বাউলাঙ্গের প্রভাব অত্যন্ত গভীর। একই সুরের মূল গানটি এইরূপ—

হরিনাম দিয়ে জগৎ মাতালে
একলা নিতাই।

'শতগানে' এটি 'বাউল' বলে উল্লেখিত হলেও সুরটি আসলে ঢপকীর্তন। আমাদের রবি বাউলের মনের ভেতর বেজে ওঠে হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া এক অসামান্য লোকায়ত গান। আর তাই বাংলার প্রাণের গান রচনার সময় বাউল গানের সুর তথা বাউলাঙ্গের ভাষা খুঁজে পায় নতুনভাবে বেজে ওঠার পথ। কিন্তু বাউলের মনের মানুষের খোঁজে গুরুদেব নিজেও দিশেহারা। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গে মুখরিত বাংলার আকাশ, বাতাস। সেই সময় কবি কণ্ঠে গর্জে উঠল বাংলার প্রতি ভালোবাসা এবং তার স্মারক হিসেবে রচিত হল এমন এক গান যা পরবর্তীকালে ঘুরেছে মানুষের মুখে মুখে। সৃষ্টি হয়েছে এক প্রাণের সঙ্গীতের। আর আমাদের প্রাণের রবি বাউলও এভাবেই কথা বলে উঠলেন সকলের কণ্ঠে— 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।'[৯]

বাউলাঙ্গের বিশেষ প্রভাব যায় রবীন্দ্রনাথের আরেকটি গানেও—

বাদল-বাউল বাজায় রে
বাজায় রে একতারা।[১০]

১৩২৯ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে রচিত এই গানে আমরা আরো একবার প্রত্যক্ষ করলাম

রবীন্দ্রনাথের বাউলসত্তাকে। 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি'। গানটি বর্তমানে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত। তবে এই গানটি ফকির বর্তমানে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত। তবে এই গানটি ফকির লালন শাহের ভাবশিষ্য কুষ্টিয়ার গগন হরকরা তথা গগনচন্দ্র দাস রচিত—

আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে।

এই বাউল গানটির সুর অবলম্বনে রচিত। সুরটি ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে তাঁর 'আমার সোনার বাংলা' গানটিতে ব্যবহার করা হয়।

সংগীতের উৎসমুখে বাউলাঙ্গের উপস্থিতি

সরলা দেবীর 'জীবনের ঝরাপাতা' থেকে আমরা জানতে পারি, মহর্ষিদেব যখন চুঁচুড়ায় থাকতেন তখন তাঁর বোটের মাঝিদের কাছ থেকে সরলা দেবী নানাপ্রকার বাউল, ভাটিয়ালি গান শিখেছিলেন এবং বলেছেন যে—তিনি যা কিছু শিখতেন তাই-ই রবীন্দ্রনাথকে শোনাবার জন্য তার প্রাণ ব্যস্ত থাকত। ছিন্নপত্রাবলীতেও গ্রাম্য গীত শ্রবণের একাধিক অভিজ্ঞতার কথা আছে। 'যৌবনী ক্যান বা কর মন ভারি' গানের সকৌতুক উল্লেখ শুধু ছিন্নপত্রে (৯৩ সংখ্যক) নয়, লোকসাহিত্য গ্রন্থের 'গ্রাম্যসাহিত্য' (১৩০৫) প্রবন্ধেও পাওয়া যায় এর আভাস।

১৯০৫ সালের পর থেকেই রবীন্দ্রনাথ ক্রমশ বাউল সুরের সোপান বেয়ে সন্তর্পণে এসে পৌঁছেছেন বাউল সাধনার বেদীপীঠে। কাব্যে "খেয়া"-র 'কৃপণ' কবিতায় বাউলের মাধুকরী বৃত্তির উল্লেখ যেমন আছে তেমনি আছে 'আমার নাই বা হল পরে যাওয়া' গানে বাউলের আত্মসন্তুষ্টি অভিমানের। দেশতান্ত্রিক আন্দোলন থেকে সরে এলেও সদ্যপরিচিত বাউল সংগীতকে তিনি ছাড়তে পারেননি। ধনঞ্জয় বৈরাগী নামে তাকে চিহ্নিত করে নতুন এক স্বপোলব্ধ রাজনৈতিক চেতনার ইচ্ছা-মন্ত্রে দীক্ষিত করে 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৩১৬) নাটকের গণমঞ্চে পাঠিয়ে দিলেন তাকে। তারপর থেকেই মূলত গীতাঞ্জলির যুগ বেষ্টন করে 'শারদোৎসব' (১৩১৫), 'রাজা' (১৩১৭) ও 'অচলায়তনে' (১৩১৮) ঢাল নামল বাউলাঙ্গ ও কীর্তনাঙ্গ গানের। ধনঞ্জয়ের একতারায় ঘনঘন ঝংকার উঠল, বাজল গান—

বাঁচাও বাঁচি মারেন মরি।
রইল বলে রাখল কারে।[১০]

১৩২১ সালে রবীন্দ্রনাথ লেখেন 'ফাল্গুনী' নাটক। সেখানে কবি নিজে পরলেন অন্ধ বাউলের সাজ, আঁকা হল অবনীন্দ্রনাথের সেই অবিস্মরণীয় রবি-বাউলের ছবি।

১৩২২ সাল থেকে রবীন্দ্রনাথের বাউলাঙ্গ সুর সৃষ্টির ধারা কিছুটা স্তিমিত হলেও একেবারে রুদ্ধ হয়নি। এ বছরই প্রবাসীতে 'হারামণি' বিভাগের প্রবর্তন কৃতিত্ব তাঁরই এবং তাঁর সংগৃহীত লোকগীতিই প্রকাশিত হতে থাকে সর্বাগ্রে। ইতিমধ্যেই বাউলতাত্ত্বিক ক্ষিতিমোহন সেনের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে কবির ঘনিষ্ঠতর সম্পর্কের মধ্যবর্তিতায় লোকায়ত সাধনার রাজধানীতে কবি নিত্য নিমন্ত্রণ রক্ষা করে চলেছেন এবং এ বছরই আমরা পাই তিনটি স্মরণীয় গান—'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে', 'তুমি কোন পথে যে এলে পথিক' এবং 'এই তো ভালো

লেগেছিল'—এগুলি রবীন্দ্রসংগীতের স্বকীয়তায় চিহ্নিত হলেও বাউল-কীর্তনের সেই প্রচ্ছন্ন ভঙ্গিকে চিনে নিতে আমাদের বিশেষ অসুবিধা হয় না।

১৩২৯ সালের এক বর্ষণব্যথিত আষাঢ়ে আত্রাই নদীর বুকে কবি লিখলেন আরেক স্মরণীয় বাউলাঙ্গের গান—'আমি কান পেতে রই'। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে এর রচনার তারিখ ২রা শ্রাবণ, ১৩২৯। প্রমথনাথ বিশী 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন' গ্রন্থে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জানিয়েছেন গানটি শান্তিনিকেতনে রচিত।

বাউলদের নিজেদের কথায় তাদের সাধনা গুপ্ত সাধনা। তাই তাদের এই সাধনার ভাষা সরাসরি উদ্ধৃত করার অধিকার কারও নেই। বলাবাহুল্য রবীন্দ্রনাথ যথার্থই জেনেছিলেন এই সাধনার রাস্তা। তবে এই রাস্তাকে তিনি সরাসরি গ্রহণ করেননি বরং গ্রহণ করেছেন—

বাউলের মানবিক দর্শন, সুর, ঈশ্বর বলে মানুষকে পূজা করার রীতিকে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাউল সুর ও কীর্তন সমার্থক হয়ে উঠেছিল বহুক্ষেত্রে। গীতরূপের সুর সৃষ্টিগত কাঠামোতে একদিকে মোহনচাঁদ ঢপকীর্তন, মধুকানের সুর ও মনোহর শাহি কীর্তনের গভীর উপাদানগত প্রভাব ছিল অন্যদিকে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল লালনশাহি সুরও। বেশ কিছু শিক্ষিত কবি গড়ে তুলেছিলেন তথাকথিত পপুলার বাউলগানের কাঠামো। কিন্তু এর সারল্য সৌন্দর্য গভীরতার আবেদন স্পর্শ করেছিল শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকলকেই। বেশ কিছু তথাকথিত বাউল গান জনপ্রিয়তায় হয়ে উঠেছিল খাঁটি গ্রাম্য-সংগীত। যেমন—শিক্ষিত শহুরে বাউলের 'দিন তো গেল সন্ধ্যা হল' গানটি গ্রামের অশিক্ষিত বৈরাগী ভিখারির কণ্ঠেও সম্প্রচারিত হয়েছিল। সিলেটের শেখ ভানু রচিত 'নিশীথে যাইও ফুলবনে রে ভোমরা' শচীনদেব বর্মনের রেকর্ডের মাধ্যমে শহরের শিক্ষিত মনকেও উদভ্রান্ত করে তুলেছিল।

রবীন্দ্রনাথের গানে বাউলের সুর প্রয়োগের পূর্বে স্বয়ং বিহারীলাল, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও স্বর্ণকুমারী দেবী বেশ কিছু বাউল সুরের গান রচনা করেছিলেন। বিহারীলালের 'বাউল বিংশতি' (১৯২৪) গ্রন্থ প্রমাণ করেন যে তিনি রীতিমতো ছিলেন বাউলগানের প্রেমিক। বিহারীলালের 'পাগল মানুষ চেনা যায়' এই বাউল গানের সুর অবলম্বনেই রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন প্রায়শ্চিত্তের 'আমরা বসব তোমার সনে' গানটির।

ব্রহ্মসংগীতে প্রবেশ করেছিল বাউলের সুর। এছাড়াও গুরুদেব তাঁর জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউল গানের সুর বা ভাষাকে আবার কখনো দর্শন চিন্তাকে অনুসরণ করেছেন তাঁর সংগীত রচনার ক্ষেত্রে। আবার বাউল সুরের যে প্রাথমিকভাব, তা রবীন্দ্রনাথের সুরসজ্জায় লাভ করেছে নাগরিক পরিশীলন। সুর ও তালবৈচিত্র্যের কারণে গুরুদেবের বাউল প্রভাবিত গানগুলি তাঁকে পরিণত করেছে 'রবি-বাউলে' এবং একই সাথে আমাদের প্রাণের ঠাকুরের মধ্যে প্রকাশ পায় যথার্থ বাউলসত্তার নিদর্শন।

উৎসের সন্ধানে

১. গীতবিতান (বিশ্বভারতী গ্রন্থ বিভাগ, কলিকাতা) পৃ. ২৯
২. তদেব, পৃ. ২৪৫
৩. তদেব, পৃ. ২১৬

৪. তদেব, পৃ. ২১৬
৫. তদেব, পৃ. ৫৪৯
৬. তদেব, পৃ. ২৫৮
৭. তদেব, পৃ. ২৪৪
৮. তদেব, পৃ. ২৪৩
৯. তদেব, পৃ. ৪৫৬
১০. তদেব, পৃ. ১৮০
১১. তদেব, পৃ. ২৬২
১২. তদেব, পৃ. ৫৪৮
১৩. তদেব, পৃ. ৫২৮
১৪. তদেব, পৃ. ৫৪৯
১৫. তদেব, পৃ. ২১৫
১৬. তদেব, পৃ. ৭৯৮

তথ্যের সন্ধানে

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'গীতবিতান', বিশ্বভারতী গ্রন্থ বিভাগ, কলিকাতা
২. 'অনুষ্টুপ' : "অন্য রবীন্দ্রনাথ" বিশেষ সংখ্যা
২. 'রবীন্দ্র প্রসঙ্গ', পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি পত্রিকা

আন্তর্জালিক উৎস

http://www.bdshow.biz
http://hewengland.eidesh.com

জনপদাবলী

দীপঙ্কর মল্লিক

❐ বাউল ধর্ম : তত্ত্ব, ভাবনা ও দর্শন

রবীন্দ্রনাথ বাউলদের কথা বলতে গিয়ে লিখেছিলেন—

দেখেছি একতারা-হাতে চলেছে গানের ধারা বেয়ে
মনের মানুষের সন্ধান করবার
গভীর নির্জন পথে।

বাউল মূলত লোকায়ত ধর্ম সাধনার নাম। এই ধর্মই জীবনমুখী। বাউলরা নির্বাণ চায় না, মুক্তি চায় না, এঁদের মূল কথাই হল সমস্ত কুসংস্কারের বাইরে দাঁড়িয়ে মনের মানুষকে অনুসন্ধান করা। বস্তুত, একটি বিশেষ ধর্ম-সম্প্রদায় হল বাউল। 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত এঁদেরকে বলেছেন 'উপাসক সম্প্রদায়'। 'মনের মানুষ' সন্ধান করা হলো এঁদের মূল উদ্দেশ্য। 'হৃদয় মাঝে'ই সেই মনের মানুষকে এঁরা উপলব্ধি করেছেন। এঁরা ভাবে 'পাগল', প্রেমে আত্মহারা; প্রেমই এঁদের কাছে সব। বাউলরা অন্তর্মুখী সাধক। তাঁরা আত্মভোলা। কেতাব-কোরান অপেক্ষা দেহতত্ত্বকেই এঁরা গুরুত্ব দিয়েছেন। আচার-বিচার-নিয়মনিষ্ঠা-শীল-শরিয়তের বিরুদ্ধে এঁদের প্রতিবাদও করতে দেখা যায়। কেননা, সংস্কারকে এঁরা গুরুত্ব দেননি, উদারতা ও মানবতার মহিমায় এঁরা উদ্দীপ্ত। 'মানবধর্ম' (Religion on Man) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এজন্যে লিখেছেন—'এই গানের ভাষায় ও সুরে হিন্দু-মুসলমানের কণ্ঠ মিলেছে, কুরান-পুরাণে ঝগড়া বাধেনি।' 'বাতুল' শব্দ থেকে 'বাউল' শব্দটি এসেছে। বাউলেরা ভাবের উন্মাদ। তাই তাঁরা 'ক্ষ্যাপা' বা 'পাগলা'। 'বাউল' শব্দটি কোথা থেকে এসেছে এবং তার অর্থ ঠিক কী, তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতান্তর-মনান্তর রয়েছে। যেমন—

১. 'বায়ু' শব্দের সঙ্গে ল-প্রত্যয় যোগ করে 'বায়ুল' শব্দ হয়েছে। তা থেকে 'বাউল' শব্দ এসেছে।
২. 'ব্রজকুল' থেকে 'বাজুল' এবং তা থেকে 'বাউল' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে।
৩. 'বাউল' শব্দের অর্থ 'বাহ্যজ্ঞানশূন্য'।

বাউল মূলত লৌকিক ধর্মমত। এই গান বাংলার নিজস্ব সম্পদ। বাউলের ঈশ্বর হলেন 'মনের মানুষ', 'অচিন পাখি'। লালন বলেছেন, 'মনের মধ্যে মনের মানুষ কর অন্বেষণ'। বাউল গানগুলি তত্ত্বভিত্তিক। নানা তত্ত্ব এসব গানের মধ্যে রয়েছে। যেমন— আত্মতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, সাধনতত্ত্ব, পরমতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব। এই সৃষ্টিতত্ত্বের মধ্যে পড়ে নবিতত্ত্ব ও গৌরতত্ত্ব। খণ্ড খণ্ড তত্ত্বের উপরে নির্ভর করে গড়ে উঠেছে বাউলতত্ত্ব। প্রতিটি গান রচিত হয়েছে কোনও বিশেষ তত্ত্বের উপর নির্ভর করে। যেমন লালন মনে করেন, দেহ হল খাঁচা। সেই খাঁচার মধ্যে 'অচিন পাখি' নিত্য যাতায়াত করে। 'মন-বেড়ি' দিয়ে তবে সেই 'অচিন পাখি'কে ধরা যায়। এখানে আত্মতত্ত্বের কথা ধরা পড়েছে। 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে বিভিন্ন প্রসঙ্গে নয় বার 'বাউল' শব্দটি উচ্চারিত হয়েছে। সেখানে আমরা পেয়েছি এমন বক্তব্য—

বাউলকে কহিও লোক হইল আউল।

বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল॥
বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল॥

বাউলরা উদারপন্থী। তাঁরা সহজিয়া মতাবলম্বী। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে আরম্ভ করে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত বাউল গানের সৃষ্টি ও ব্যাপ্তির কাল। সেই গানের ধারা আজও সমানভাবে অক্ষুণ্ণ রয়েছে। বাউল ধর্মে হিন্দু তান্ত্রিক, নাথ, যোগী, সুফি, বৈষ্ণব ও সহজিয়া সাধন পদ্ধতির প্রভাব রয়েছে। শাস্ত্রাচার থেকে মুক্ত হয়ে এই বাউলরা প্রথম সমাজের নীচুতলার মানুষের কথা শুনিয়েছে। এঁরা মুক্ত মনের অধিকারী। কোনো কল্পিত স্বর্গে বিশ্বাস করেন না। মানুষের মধ্যে এঁরা 'পরম রতন'-এর অন্বেষণ করেন। লালন সাঁই তাঁর একটি গানে লিখেছেন—

এমন মানব জনম আর কি হবে।
মন যা কর ত্বরায় কর এই ভবে।
অনন্তরূপ সৃষ্টি করলেন সাঁই
শুনি মানবের উত্তম কিছুই নাই
দেব-দেবতাগণ করে আরাধন
জন্ম নিতে মানবে।

বাউলরা গুরুবাদী সম্প্রদায়। বাউল ধর্মে গুরুতত্ত্ব আছে। গুরু তাঁদের কাছে সিদ্ধ পুরুষ। গুরু ধরেই বাউলরা অধ্যাত্মসাধনা করেন। গুরুর নির্দেশ মেনে পরমাত্মার সন্ধান করেন।

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ৫১৭টি বাউল গান সংকলন করেন। তিনি বাউল গানের মধ্যে নানা বৈচিত্র্য অন্বেষণ করেছেন। বাউলরা মানব জন্মকে অসীম গুরুত্ব দেন। তাঁদের বিশ্বাস, "কত ভাগ্যের ফলে না জানি মনরে পেয়েছ এই মানব তরণী।" বাউলের আরাধ্য মানুষ মনের মধ্যেই থাকেন, তাঁকে চেনা যায় না, তাঁকে পেতে হলে মনকে শিশুর মতো সহজ-সরল করতে হয়। আর তার জন্য প্রয়োজন সৎগুরুকে আশ্রয় করা। লালন তাঁর গানে বলেছেন, "মুরশিদ বিনে কি ধন আর আছে রে এ জগতে।" লালন অন্য একটি গানে গেয়েছেন—

গুরু শিষ্য এক আত্মা যদি হওয়া যায়।
ও তারে ধরতে বড় দেরি নয়, চিনতে বড় দেরি নয়॥

বাউলরা বিশ্বাস করেন মানবাত্মা হল নদী। আর পরমাত্মা হল সমুদ্র। সুতরাং নদী যদি একবার সমুদ্রে মিলে যায়, তাহলে আত্মা ও পরমাত্মার মিলন সম্ভব হয়। তাই তাঁরা পরম দয়ালের কাছে আত্মনিবেদন করেছেন। লালন তাঁর গানে বলেছেন—"চাতক স্বভাব না হলে, /অমৃত মেঘের বারি শুধু কথায় কি মেলে?"

বাউলরা অজ্ঞাত মর্মের অনুসন্ধান করেছেন। তাঁরা যে বক্তব্য প্রকাশ করেছেন তার সঙ্গে কোরান, পুরাণ, বেদ, বাইবেল তুলনীয় নয়। অর্থাৎ তাঁরা ধর্মের নতুন পথ দেখিয়েছেন। সেই ধর্মের নাম হল মানবধর্ম। তাই বাউলরা হলেন মানবতাবাদী।

বাউলের আরাধ্য হল 'অধর মানুষ'। এই বাউলরা মনে করেন গুরু হলেন মুক্তিদাতা। তাই লালন বলেন, "মুরশিদ বিনে কি ধন আর আছে রে এ জগতে।" গুরু-শিষ্যের সাধনায় সেই পরমাত্মা ধরা দেন। লালন তাই বলেন, "গুরু শিষ্য এক আত্মা যদি হওয়া যায়।/ও তারে

ধরতে বড়ো দেরি নয়, চিনতে বড়ো দেরি নয়।" বাউলরা সাধনপন্থী। তাঁরা শুদ্ধপ্রেমে বিশ্বাসী। লালন একটি গানে বলেছেন ঈশ্বরকে চিনতে হলে নিজেকে চিনতে হয়—"আমার আপন খবর আপনার হয় না।" আমরা আগেই বলেছি প্রেম হল বাউলদের আরাধ্য। কিন্তু এই প্রেম হল শুদ্ধ প্রেম—"শুদ্ধ প্রেম সাধলো যারা, কাম-রতি রাখিল কোথা।" বাউলরা তাই পরম দয়ালের কাছে আত্মনিবেদন করেন। তাঁরা উপলব্ধি করেন, "চাতক স্বভাব না হলে,/অমৃত মেঘের বারি শুধু কথায় কি মেলে?"

লালন ফকির

লালন ফকির (১৭৭২-১৮৯০) ছিলেন বাউল সাধনার প্রধান গুরু। তিনি অসংখ্য বাউল গান লিখেছেন। ১১৭৯ বঙ্গাব্দের ১ কার্তিক (১৭৭২) তাঁর জন্ম। তবে জন্মসাল, জন্মভিটা, জাতিসূত্র, গানের সংখ্যা নিয়ে বহু বিতর্ক আছে। জন্মভিটা সম্পর্কে অন্তত চারটি মতান্তর এমন—

১. আব্দুল ওয়ালীর মতে, লালনের জন্মস্থান যশোহরের ঝিনাইদহ মহাকুমার হরিশপুর গ্রামে।
২. বসন্তকুমার পালের মতে, কুষ্টিয়ার কুমারখালির অন্তর্গত ভাঁড়ারা গ্রামে।
৩. কাঙাল হরিনাথের মতে, কুষ্টিয়ার অন্তর্গত ঘোড়াই গ্রামে।
৪. এ. কে. এস নূরের মতে, যশোহর জেলায় ফুলবাড়ি গ্রামে।

লালন নিয়ে মানুষের আগ্রহের শেষ নেই। সুতরাং তাঁকে নিয়ে বহু জনশ্রুতি, অসংখ্য সত্য-মিথ্যা গল্প প্রচলিত আছে। শোনা যায়, তিনি তীর্থভ্রমণে বেরিয়ে পথের মধ্যে দুরারোগ্য বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গীরা অসহায় লালনকে ত্যাগ করে চলে গেলে সিরাজ সাঁই তাঁকে নিজের গৃহে আনেন। অসুস্থ লালনকে সেবা-শুশ্রূষা দ্বারা সুস্থ করে তোলেন।

সিরাজের মানবপ্রেমে অভিভূত লালন তাঁর কাছেই বাউল ধর্মে দীক্ষিত হন। ছেউরিয়াতে তিনি আশ্রম করলে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বহু মানুষ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কুষ্টিয়ার কাঙাল হরিনাথ (১৮৩৩-৯৬) তাঁর অন্তরঙ্গ শিষ্য ছিলেন। ১৯২৭ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসের প্রথম দিনে (১৮৯০ খ্রি. অক্টোবর ১৭) ছেউরিয়ায় লালন দেহান্তরিত হন।

➲ লালন সম্পর্কে প্রাজ্ঞজনের অভিমত

১. লালন নিজে লেখাপড়া জানিতেন না; কিন্তু তাঁর রচিত অসংখ্য গান শুনিলে তাঁকে পরম পণ্ডিত বলিয়া বোধ হয়। তিনি কোনো শাস্ত্রই পড়েন নাই; ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন না; অথচ সকল ধর্মের লোকই তাঁহাকে আপন বলিয়া জানিত।
২. লালনের ধর্মমত অতি সরল ও উদার ছিল। তিনি জাতিভেদ মানিতেন না, হিন্দু-মুসলমানকে সমভাবে দেখিতেন ও শিষ্যদিগের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান সকল জাতিকেই গ্রহণ করিতেন।

➲ লালনের গানের বৈশিষ্ট্য

লালন ফকির বাউল সাধনার শ্রেষ্ঠ পথনির্দেশক। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বিপরীতে তিনি মানবধর্মের প্রচারক ছিলেন। তিনি মরমি সাধক। সমাজমনস্ক মানুষ হিসেবেই তিনি জাত-পাত, সম্প্রদায়বিদ্বেষ, প্রথা-সংস্কারকে গুরুত্ব দেননি।

১. লালনের কবিত্বশক্তি বিস্ময়কর। ভাবের সঙ্গে ভাষার যথার্থ মিলনে তাঁর গান অসামান্য শিল্পসমৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি প্রমাণ করেছেন, খাঁটি বাউলের সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার কোনো যোগ নেই। কেননা, জাত-পাত শুধু দূরত্ব বাড়ায়, মনুষ্যত্বকে লাঞ্ছিত করে। 'জাতের নামে বজ্জাতি'র বিরুদ্ধে নজরুলের অনেক আগে লালনের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল এই গান—

> সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে।/লালন বলে জেতের কি রূপ/দেখলাম
> না এ নজরে।।/কেউ মালা কেউ তসবি গলায়/তাইতে কি জাত ভিন্ন বলায়?/যাওয়া
> কিংবা আসার বেলায়/জেতের চিহ্ন রয় কার রে?

২. লালনের গানে মানব মহিমা অনবদ্য ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। লালন লিখেছেন—

> এই মানুষে আছে রে মন,
> যারে বলে মানুষ রতন
> লালন বলে, পেয়ে সে ধন
> পারলাম না রে চিনিতে।।

৩. লালন সহজ সাধনা করেছেন। তিনি কোনোরকম সংস্কারকে গুরুত্ব দেননি। তিনি এই সত্য উপলব্ধি করেছেন, মানুষ ছাড়া মানুষের কোনো মুক্তি নেই। এই মানুষই একমাত্র পরিত্রাতা। লালন তাই মানুষ খুঁজেছেন—

> যথা যাই মানুষ দেখি
> মানুষ দেখে জুড়াই আঁখি।

৪. সমাজে সমস্ত স্তরের মানুষরা লালনের ধর্মকে মন থেকে গ্রহণ করেছেন। আসলে লালন কখনো ভেদ-বৈষম্যকে গ্রহণ করেননি। তিনি সেই মানুষের সন্ধান করেছেন, যে মানুষ অধরা।

৫. লালন মরমি সাধক ছিলেন বলেই মনের মানুষের সঙ্গে মিলিত হতে চেয়েছেন। লালনের দর্শনে বলা হয়েছে, ঈশ্বর-আল্লাহ বলে যদি কেউ থাকেন তবে তিনি মানুষের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হন। লালন বলেছেন—

> ১. মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি
> নইলে পরে ক্ষ্যাপারে তুই মূল হারাবি।
>
> ২. মানুষ ছাড়া মনরে আমার
> দেখবি সব অন্ধকার
> লালন বলে মানুষ আকার
> ভজলে পাবি।

৬. লালন বুঝেছেন, ধর্মে ধর্মে কোনো ভেদ নেই। সুতরাং মানুষ নেহাত নিজের সুবিধার জন্যে ধর্মের বিভাজন করেছেন। লালন সেই বিভাজনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। তাই তিনি গেয়েছেন—

> লালন বলে হাতে পেলে

জাত পোড়াতাম আগুন দিয়ে।

ঠিক অনুরূপ কথা বলেছেন পাঞ্জু শাহ—

জাতের বড়াই কি
ইহকাল পরকালে জাতে করে কি—
আমার মন বলে অগ্নি জ্বেলে দি
জাতের মুখি॥

৭. বাউল মতের প্রসার ও সাধনার পথ কখনোই কুসুমবিস্তীর্ণ ছিল না। শাস্ত্রাচারী হিন্দু ও শরীয়তপন্থী মুসলমানরা এদের কখনো শ্রদ্ধার চোখে দেখেনি। বাউলরা তাই ব্রাত্য হিসেবেই চিহ্নিত হয়েছিল। কিন্তু সময়ের চলমানতার সূত্র ধরে আজ প্রমাণিত হয়েছে বাউল ধর্ম পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানবপন্থী ধর্ম। কারণ তাঁদের গান প্রথম ভেদ-বৈষম্যের জঞ্জালে ভালোবাসার ফুল ফুটিয়েছে। তাই লালনের গান আজও মানুষের মুখে মুখে ফেরে। লালনের গান শিক্ষিত-অশিক্ষিত, গ্রাম-শহরের যেকোনো মানুষের মন ছুঁয়ে যায়। যেমন এই গানটি—

চাতকেরি এমনি ধারা
অন্য বারি খায় না তারা
তৃষ্ণায় জীবন যায়গো মারা
মেঘের জল না হলে॥

৮. লালনের গানের মধ্যে ভাবের গভীরতা ও শিল্পের নৈপুণ্য প্রমাণ করে—তিনি ছিলেন স্বশিক্ষিত। অন্নদাশঙ্কর রায় ঠিকই বলেছিলেন—'দীর্ঘ শতবর্ষ ধরে ইনি জীবনের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেছেন।' ভাব-ভাষা-ছন্দ-অলংকারে লালন অতুলনীয়। নিরক্ষর হলেও তাঁর স্বাতন্ত্র্য তর্কাতীত। তিনি শব্দকুশলী ও শব্দ সচেতন শিল্পী। তাঁর গান যেন একই সঙ্গে চণ্ডীদাসের সারল্য ও ভারতচন্দ্রের শব্দমন্ত্রের যোগফল। এখানেই তাঁর অভিনবত্ব। লালনের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গান হল—

১. আমার এ ঘরখানায় কে
২. আমি একদিনও না দেখিলাম তারে
৩. এমন মানবজনম আর কী হ'বে
৪. কোন্ দেশে যাবি মন
৫. গৌর কী আইন আনিলে
৬. জাত গেল জাত গেল বলে
৭. ভক্তের দ্বারে বাঁধা আছেন সাঁই
৮. মানুষ অবিশ্বাসে পাইনে রে
৯. মনুষতত্ত্ব যার সত্য হয় মনে
১০. সব লোকে কয় লালন কী জাত

আলোচনা

১. আমি একদিনও না দেখিলাম তারে

আমি একদিনও না দেখিলাম তারে

আমার বাড়ির কাছে আরশিনগর
ও এক পড়শি বসত করে।
গ্রাম বেড়িয়ে অগাধ পানি
ও তার নাই কিনারা নাই তরণী পারে—
আমি বাঞ্ছা করি দেখব তারি
আমি কেমনে সে গাঁয় যাই রে।
বলব কি সেই পড়শির কথা
ও তার হস্ত-পদ-স্কন্ধ-মাথা-নাই রে।
ও সে ক্ষণেক থাকে শূন্যের উপর
আবার ক্ষণেক ভাসে নীরে।
পড়শি যদি আমায় ছুঁত
আমার যম-যাতনা যেত দূরে।
আবার সে আর লালন একখানে রয়
তবু লক্ষ যোজন ফাঁক রে।

মরমি সাধক লালনের গান তাঁর সুগভীর অধ্যাত্মপ্রেমের বাণীবাহক। এক অদ্ভুত শিল্পবোধ তাঁর এই গানকে আচ্ছাদিত করে আছে। একটি ঐশ্বরিক শিল্পীমন ও কালজয়ী সত্তার অস্তিত্ব তাঁর মধ্যে ছিল।

১৮০৯-১৯০০ : এই কালপর্বে যখন নবজাগরণের জোয়ারে ভেসে গিয়েছিল মধ্যযুগের মায়া, তখন লালন যেন দ্বিতীয় রামপ্রসাদ হয়ে উঠলেন—অর্থাৎ রামপ্রসাদের মতো সুরের সাধনায় তিনি নিমগ্ন হলেন। তিনি মানুষের কথা বলেছেন, মানব-মহিমার কথা শুনিয়েছেন। আকুল আহ্বানে জানতে চেয়েছেন, 'মিলন হবে কত দিনে'।

'বাড়ির কাছে আরশিনগর' কবিতাটি অসাধারণ রহস্যময় চিত্রকল্পে অভিনব। আমরা আমাদের কাছের মানুষকে হৃদয়ের একেবারে কাছে দেখতে পেয়েও তাঁকে উপলব্ধি করতে পারি না। বাড়ির কাছের 'পড়শি'কে আমরা সব সময়ই তো দেখি; কিন্তু তাঁর কাছের জন হয়ে নিবিড় সখ্যতার সম্পর্ক করতে পারি কোথায়? এখানে 'আরশিনগর' ও 'পড়শি'—দুটি শব্দই পারিভাষিক। চর্যার ভাষার মতো দ্ব্যর্থবোধক। 'আরশি' শব্দের অর্থ আয়না। **'আরশিনগর' বলতে বোঝায় খোদা বা ঈশ্বরের অবস্থান যেখানে।** 'পড়শি' শব্দের অর্থ প্রতিবেশী। কিন্তু লালনের গানে এই শব্দটির অর্থ হলো যিনি অপার্থিব, পরম শক্তির আধার। এই পরম শক্তিই হলেন রবীন্দ্রনাথের কাছে 'জীবনদেবতা', 'অন্তরতম', 'অন্তর্যামী'। লালন একটি গানে বলেছেন, 'কি সাধনে পাব তারে/যে আমার জীবনদাতা'। কিন্তু আত্মজ্ঞান না হলে তাঁকে জানা যায় না। মায়ার ঘোরে থাকলে সাঁই বা মুর্শিদের প্রকৃত রূপ জানা যায় না। ফলে সেই পড়শিকে চিনেও আমরা তাঁর কাছের মানুষ হতে পারি না। অথচ তিনি হলেন আমাদের 'মনের মানুষ'। লালন বলেছেন, তিনি এবং 'সাঁই' এক জায়গাতেই থাকেন। তবু তাঁদের মধ্যে 'লক্ষ যোজন' দূরত্ব। অথচ এই 'সাঁই'-এর কৃপা না থাকলে পরমেশ্বরের সন্ধান সম্ভব নয়। 'পড়শি' ও 'পরমেশ্বর' হলেন এক। লালন বলেছেন, 'আগমে নিগমে এই কয়/গুরু রূপে দিন দয়াময়'।

অথচ সেই দয়াময়ের স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় না। তিনি কাছে থাকেন বলেই কাকে বলা হয়েছে 'পড়শি'। কিন্তু তাঁর সঙ্গে সাধকের 'অগাধ পানি'র দূরত্ব। জলের যেমন তল কিংবা কিনারা কিছুই পাওয়া যায় না; তেমন তিনি অধরা। তাঁর কাছে যাওয়ার জন্যে পারে 'নাই তরণী'।

লালন মনে মনে সংকল্প করেছেন, সেই 'পড়শি'কে তিনি দেখবেন। তিনি 'আরশিনগরে' যাবেন 'পড়শি'র সন্ধানে। তবে 'তার নাই কিনারা।' তিনি কখনও নিরাকার সত্তায় শূন্যে থাকেন; কখনও সাকারে 'ক্ষণেক ভাসে নীরে'। লালন আক্ষেপ করে বলেছেন, সেই 'পড়শি' যদি একবার তাঁকে স্পর্শ করতেন তবে 'যম যাতনা সকল যেত দূরে'। আকুল কণ্ঠে লালন বলেছেন, 'পড়শি' আর তিনি একস্থানে থাকলেও উভয়ের সাক্ষাৎ হয় না। উভয়ের মধ্যে 'তবু লক্ষ যোজন ফাঁক রে'।

লালন অমৃত সন্ধানী। তাঁর 'পড়শি' হল তাঁর 'মনের মানুষ'। লালন লোকায়ত তত্ত্ব-দর্শনে বিশ্বাসী। ভাববাদী তত্ত্বের চাদর জড়িয়ে আমরা আপন সত্তাকে চিনতে পারি না। সবার মধ্যে যে সেই পড়শি বসত করেন কিন্তু কামনা-বাসনা-অহংকারের প্রাবল্যে তাঁকে উপলব্ধি করতে পারি না। ভাববাদী জ্ঞানতত্ত্ব আচ্ছন্ন করে রাখে আমাদের মনকে; তাই সত্যিকারের 'মনের মানুষ' অধরা থেকে যান।

এই আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা পুনশ্চ স্মরণ করিয়ে দেব, সংস্কৃত 'আদর্শিকা' থেকে গৃহীত 'আরশি' শব্দের অর্থ আয়না, দর্পণ, মুকুর; আরবি 'আর্শ্' শব্দ থেকে এসেছে আরশ। এর অর্থ খোদার আসন, সিংহাসন; রাজাসন; বেহেশ্‌তের উচ্চতম অবস্থান; 'আরশ' শব্দের সঙ্গে ই/ঈ/ঈন প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'আরশি' শব্দ হয়েছে; নজরুল লিখেছেন, 'আরশে থাকিয়া হাসিলেন খোদা'; আরশিনগরের কথা আমরা অন্য একটি গানেও পাই—'ফকির লালন কইয়া গেলা না/কার বা বাড়ি কে পড়শি/আরশিনগরের ঠিকানা/কইয়া গেলা না।'

'পড়শি'-র 'স্ব'-রূপ

বাউল সাধকরা তাঁদের বহু গানে পড়শির কথা বলেছেন। এই 'পড়শি' অলৌকিক কোনও সত্তা নন। কেননা, লালন ছিলেন অলৌকিকতা-বিরোধী লৌকিক সাধক। 'পড়শি' হলেন 'আত্মরাম' বা 'মনের মানুষ'। তিনি অন্তরঙ্গ। তাঁকে উপলব্ধি করতে হয় অন্তর দিয়ে।

আমরা মনে রাখবো যে, বাউল সাধক লালন সাঁই তাঁর বিভিন্ন গানে মনের মানুষের সন্ধান করেছেন। সেই মনের মানুষ বা পড়শি তাঁর কাছেই থাকেন। অথচ তাঁর অজ্ঞতার কারণে পড়শিকে চিনতে পারেন না। তাই লালন বলেছেন, 'আমি একদিন না দেখিলাম তারে'। লালন ও পড়শির মধ্যে রয়েছে 'অগাধ পানি'র দূরত্ব। তাই তাঁকে তিনি কাছে পান না। পড়শি যেখানে থাকেন, সেখানে যাওয়াও সম্ভব হয় না। কেননা, সাধক ইচ্ছা করলেই সেই পরমকে, তাঁর সাধনার ধনকে কাছে পান না। এ জন্যে লালন আক্ষেপ করে বলেছেন—'কেমনে সে গাঁয় যাই রে'।

পড়শি আমাদের মনের মধ্যেই অবস্থান করেন। আমরা তাঁকে উপলব্ধি করতে পারি না। এজন্যে তাঁর আর আমাদের মাঝখানে 'লক্ষ যোজন ফাঁকে রে'। এভাবে পড়শির সঙ্গে তাঁর

দূরত্ব তৈরি হওয়ার লালন গভীর আক্ষেপ করেছেন। তাঁরা যেন বহমান ধারার দু'পাড়ের দু'জন বাসিন্দা। আর মাঝখানে রয়েছে 'অগাধ পানি'। সেই পানি বা জল ক্রমাগত বাড়তে থাকে। ফলে লালন তাঁর 'পড়শি'র কাছে পৌঁছতে পারেন না। তবু তাঁর সন্ধানেই লালনের সমস্ত সাধনা। এই 'মনের মানুষ'কে দূরের কেউ নন, লালনের ভাষায় তিনি হলেন 'কাছের মানুষ', তিনি 'সাঁই' বা 'গোসাঁই'। তিনি অন্তরতম। তাঁর সঙ্গে লালনের গভীর সম্পর্ক।

গানটিতে বাউল-সাধনার গুহ্যতত্ত্ব : লালন ছিলেন অসাম্প্রদায়িক। তিনি মানবতার পূজারি। মরমি লোকায়ত বাউল সাধকদের মধ্যে তিনি ছিলেন অগ্রগণ্য। তাঁর অসংখ্য গানের মধ্যে বাউল সাধনতত্ত্বের গুহ্যাতিগুহ্য অর্থ মুদ্রিত হয়ে আছে। লালন পুথিনির্ভর সাধক নন। তিনি যে 'মনের মানুষ' অন্বেষণ করেছেন, সেই মনের মানুষ দেহাতীত বা অতিলৌকিক নন। তিনি বাউল সাধকের 'কাছের জন'। 'বাড়ির কাছে আরশিনগর' আসলে তত্ত্বধর্মী একটি গান। আমাদের পাঠে কবিতা রূপেই গানটি পঠিত। সুধীর চক্রবর্তী **'জনপদাবলি'** নামাঙ্কিত গ্রন্থে লিখেছেন—

> 'আরশি নগর' বলতে বোঝায় সাধকের ভ্রূমধ্যে অবস্থিত আজ্ঞাচক্র। সেখানেই বাস করে পড়শি বা উপাস্য। দেহতত্ত্বের বিচারে এই উপাস্য হলেন আদি শক্তি; যে শক্তিতে একজন মানুষ বীর্যবন্তা হয়ে ওঠেন।

সৃষ্টির আদি বীজ এই 'পড়শি'র হস্ত-পদ-স্কন্ধ-মাথা নেই। অথচ সেই শক্তি হলো ভ্রমণরত— তিনি সদা সঞ্চারমান। তাঁর কাছে যাওয়া সহজ নয়। কেননা, লালন দেখেছেন—

গিরাম বেড়ে অগাধ পানি
ও তার নাই কিনারা নাই তরণী পারে।

ফলে পড়শির সঙ্গে লালনের অদৃশ্য এক দূরত্ব থেকেই যায়। সেই 'পড়শি'র এমন স্থানে বাস করেন যে তিনি—

ক্ষণেক থাকে শূন্যের উপর
ক্ষণেক ভাসে নীরে।।

সাধক কবি রামপ্রসাদের মতো লালন আক্ষেপ করে বলেছেন, তিনি একটিবার যদি পড়শির স্পর্শ লাভ করতেন; তবে তাঁর 'যম যাতনা সকল যেত'। কিন্তু উভয়ের মধ্যে রয়েছে 'লক্ষযোজন ব্যবধান'। এভাবে লালন ফকিরের গানটি হয়ে উঠেছে মরমি কবির লোকায়ত সাধনার গভীর তত্ত্বকথা।

মরমি সাধক লালন : লালন কোনো সাম্প্রদায়িক ধর্মাবলম্বী ছিলেন না। মুসলমানদের সঙ্গে তাঁর যেমন সুগভীর সখ্যতা ছিল তেমন হিন্দুদের সঙ্গেও তাঁর সুগভীর হৃদ্যতা ছিল। তিনি নিরাকার পরমেশ্বরে বিশ্বাস করতেন। যদিও তিনি গুরুবাদের সমর্থক ছিলেন। ভেদ বৈষম্যহীন এই সাধক সারাজীবন ধরে সমন্বয় পন্থায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বারবার বলেছেন জাতের কোনো ভেদ থাকা উচিৎ নয়। তাঁর একাধিক গানে এই কথাই বারবার উচ্চারিত হয়েছে। তিনি গেয়েছেন—

১. কেউ মালায় কেউ তছবি গলায়,

তাইতে যে জাত ভিন্ন বলায়,
যাওয়া কিম্বা আসার বেলায়
জাতের চিহ্ন রয় কার রে॥

২. যদি ছুন্নত দিলে হয় মুসলমান,
নারীর তবে কি হয় বিধান,
বামন চিনি পৈতা প্রমাণ,
বামনি চিনি কিসে রে॥

৩. জগৎ বেড়ে জেতের কথা,
লোকে গৌরব করে যথাতথা,
লালন সে জেতের ফাতা
ঘুচিয়াছে সাধ বাজারে॥

'শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত'-এ রয়েছে—যে ব্যক্তি মাছ ধরতে বসে, তার দৃষ্টি ফাতনার উপরে নিবদ্ধ থাকে; কিন্তু প্রয়োজন মতো সঙ্গীর সঙ্গেও সে কথা বলে। অর্থাৎ সংসারে থেকেও ভজন-সাধন-আরাধনা করা যায়। এর ফলে আসক্তি মুক্ত থাকা যায়। সুতরাং লালন বারবার বলেছেন, সংসারের মধ্যে থেকেও মানব-রতন ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা যায়। লালন যে কতবড়ো অসম্প্রদায়িক ছিলেন তার প্রমাণ হলো তাঁর গানে শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাচার্যের কথা রয়েছে। লালন কী গেয়েছেন শোনা যাক—

তোরা, কেউ যাস্‌নে ও পাগলের কাছে,
তিন পাগলের হল মেলা নদে এসে।

দেখ্‌তে যে যাবি পাগল
সেই ত হবি পাগল
বুঝ্‌বি শেষে।
ছেড়ে তার ঘর দুয়ার ফিরবি নে যে।

লালন ছিলেন সর্বজনীন ভাবের ভাবুক। তিনি কোনো আড়ম্বর করতেন না। কারণ ফকিরদের কোনো আড়ম্বর থাকে না। তাঁর গানে আত্মনিবেদনের সুর প্রবল। আমরা আগেই বলে নিয়েছি লালনের সবথেকে বড়ো গুণ হল—তিনি যখন দীন-দয়াময়ের কথা উচ্চারণ করেছেন তখন কোনো ভেদ-বৈষম্যের কথা বলেননি। তিনি জাতিতে ও ধর্মে ধর্মে কোনো পার্থক্য দেখেননি। ফলে তার ধর্মে কোনো ভেদ ছিল না। তিনি আল্লা ও হরিকে একই আসন নিয়ে বসতে দিয়েছেন। এর ফলে শরীয়তবাদী মুসলমানগণ লালনকে ভালোচোখে কখনও দেখেননি। তারা লালনের খ্যাতি-প্রতিপত্তির নিন্দা করেছেন। আসলে লালনের সময়কার মানুষ লালনকে বুঝতে পারেননি। তাঁর আত্মতত্ত্বের মধ্যে কেউ প্রবেশ করতে পারেনি। লালন বারবার বলেছেন—মুরশিদ হলেন গুরু। গুরুই হলেন মুক্তিপথের অগ্রদূত। আমরা মনে রাখব যে, লালন সাঁই ফকির হবার আগে হিন্দু ছিলেন। পরে সিরাজ সাঁই দরবেশের কাছে দীক্ষিত হন। কাজেই তাঁর লেখায় হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মের সাধন-ভজনের প্রক্রিয়া ও পন্থার উল্লেখ দেখা যায়। তার সাধনায় কোনো সংস্কার যোগ হয়নি। তিনি মনুষ্যত্বের কথা বলেছেন। তিনি যে

মুক্তির কথা শুনিয়েছেন সেই মুক্তি তখনই সম্ভব যখন শুদ্ধ প্রেমের প্রেমিক হওয়া যায়। তাই লালন গেয়েছেন—

শুদ্ধ প্রেমের প্রেমী মানুষ যে জন হয়,
মুখে কথা ক'ক না ক'ক, নয়ন দেখলে চেনা যায়।
মণিহারা ফণী যেমন, প্রেম-রসিকের দুটি নয়ন
কি দেখে কি করে সে জন কে তাহার অন্ত পায়?

মানুষই লালনের কাছে সব। তাঁর সাধনার মূল লক্ষ্য হল মানুষ-তত্ত্বের সাধনা। তাই তিনি বলেছেন—"মানুষ-তত্ত্ব যার, সত্য হয় মনে/সে কি অন্য তত্ত্ব মানে?" তিনি পূজার্চনা যাগ-যজ্ঞ নিরর্থক বলে মনে করেছেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন—"এই মানুষ সেই মানুষ আছে, /কত মুনি-ঋষি চার যুগ ধরে বেড়াচ্ছে খুঁজে।" সুতরাং মূর্তির মধ্যে, সংস্কারের মধ্যে, সেই সাধনার ধনকে খুঁজে পাওয়া যায় না। মনকে শুদ্ধ করতে না পারলে তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। আর তখন সাধক ও সাধ্য কাছাকাছি থাকলেও মিলন হয় না। তখন মনে প্রশ্ন জাগে—মিলন হবে কত দিনে?

আলোচনা

২. সব লোকে কয় লালন কী জাত

সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে—
লালন বলে জেতের কীরূপ দেখলাম না এ নজরে।
যদি ছুন্নৎ দিলে হয় মুসলমান
নারীলোকের কী হয় বিধান
বামন চিনি পইতের প্রমাণ
বাম্‌নি চিনি কীসে রে।
কেউ মালা কেউ তসবি গলায়
চাইতে কী জাত ভিন্ন বলায়
যাওয়া কিংবা আসার বেলায়
জেতের চিহ্ন রয় কার রে।
গর্তে গেলে কুপজল হয়
গঙ্গায় গেলে গঙ্গাজল কয়
মূলে একজন সে যে ভিন্ন নয়
ভিন্ন জানায় পাত্র অনুসারে।
জগৎ বেড়ে জেতের কথা
লোকে গৌরব করে যথাতথা
লালন সেই জেতের ফাতা
বিকিয়েছে সাধবাজারে।

জাতের নামে বজ্জাতি কত ভয়ংকর হতে পারে তা বিভিন্ন কবিতায় ও প্রবন্ধে উল্লেখ

করেছেন কবি নজরুল ইসলাম। ভেদ-বৈষম্য উচ্চবর্ণের মানুষ নিজেদের সুবিধা অনুসারে করে থাকেন। এই বিভেদ সবটাই নিজেদের সুবিধার জন্য করা হয়ে থাকে। ছুন্নৎ দিলে মুসলমান হওয়া যায়; কিন্তু মুসলমান নারীর কোন্ চিহ্ন দেখে বোঝা যাবে তিনি মুসলিম ধর্মের মানুষ? ব্রাহ্মণকে চেনা যায় পৈতা দেখে, কিন্তু কোন্ চিহ্ন দেখে বলা সম্ভব—তিনি ব্রাহ্মণী। মানুষ যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন কোন্ বৈশিষ্ট্য দেখে বলা সম্ভব এই শিশুটি হিন্দু না মুসলমান, জৈন না খ্রিস্টান? আসলে মানুষ নিজের ইচ্ছানুসারে ভেদাভেদের প্রাচীর তুলেছে এবং জাত-পাত, বর্ণ-বর্গ-বিত্ত ভেদ করে একে অন্যের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করেছে। কোনো জল কুয়োয় পড়ে, কোনো জল আবার গঙ্গায় পড়ে। জলের কোনো ধর্ম নেই। সে যেখানেই পড়বে তার স্বভাব বহন করবে—এটাই স্বাভাবিক। সুতরাং সমস্ত ধর্মের মূলে রয়েছে এক অদ্বিতীয় স্রষ্টা। আমরাই শুধু ভেদাভেদ করে কূপমণ্ডুকের জীবন-যাপন করছি। সুতরাং জাত ও বংশের গৌরব ঘোষণা না করাই ভালো। অসাম্প্রদায়িক ও ভেদ-বুদ্ধি বিরোধী লালন তাই বলেন তিনি জাতের ফাতা বা চিহ্ন বেচে দিয়েছেন। অর্থাৎ লালনের অসাম্প্রদায়িক মনোভাব এই গানে সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে। বলাবাহুল্য তান্ত্রিক এবং সহজিয়া সাধকরা বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেও সে প্রতিবাদের মধ্যে সেই অর্থে প্রতিরোধের কোনো জোরালো কণ্ঠস্বর ছিল না। কিন্তু বাউলরাই প্রথম বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করেছেন। লালন একটি গানে বলেছেন—

ভক্তির ডোরে বাঁধা আছেন সাঁই
হিন্দু কি যবন বলে
তাঁর কাছে জাতের বিচার নাই॥
ভক্ত কবীর জাতে জোলা
প্রেম ভক্তিতে মাতোয়ারা
ধরেছে সেই ব্রজের কালা
দিয়ে সর্বস্ব ধন তাই।

আমরা লালন প্রসঙ্গে পূর্বেই বলে নিয়েছি, লালন জাত-ধর্ম-বর্ণের কোনো গণ্ডিবদ্ধ সংকীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন না। তাঁর ভাষা সহজ-সরল এবং দেশজ গ্রাম বাংলার উপমা অবলম্বিত। তিনি কোনো পৌত্তলিকতায় বিশ্বাস করতেন না। জাতের নামে যারা স্বাজত্যবোধকেই উগ্র দেশাত্মবোধের সঙ্গে মিশিয়ে দিতেন লালন তাঁদের সঙ্গে সহমত পোষণ করতেন না। কারণ লালন জানতেন, প্রকৃত ধার্মিক কখনও জাত-পাত, বর্ণ-বিদ্বেষ মানেন না। সুতরাং লালন পরিষ্কার বলেছেন, সবধর্মের মূলে রয়েছেন একজনই। তিনি হলেন পরশমণি। তিনি কারোর মধ্যে ভেদাভেদ করেন না। ভেদ করেন সাধারণ মানুষ। সুতরাং লালন সেই জাতধর্ম ও ভেদাভেদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সহজ সাধনপন্থী হতে চেয়েছেন। বাহ্যিক ধর্মাচারে, অন্ধ ভক্তিতে, পারস্পরিক বিদ্বেষে লালনের কোনো আস্থা ছিল না। বরং তিনি ভেদের বাইরে দাঁড়িয়ে অভেদের কথা শুনিয়েছেন। মানুষের মধ্যেই তিনি দেবতার সন্ধান করেছেন। আমরা মনে রাখবো যে, যে ধর্মকে লালন গ্রহণ করেছেন সেই ধর্ম হল লোকায়ত ধর্ম। ফলে সেখানে সংস্কারের কোনো মূল্য নেই। বরং তিনি চেয়েছেন, নিম্নবর্গের মানুষ যেন সমস্ত ভেদ-বৈষম্য

ভাসিয়ে দিয়ে প্রকৃত ধর্মকে উপলব্ধি করতে পারেন। আসলে ব্রাহ্মণ্য সমাজ প্রভাবিত জীবনচর্যা-সমাজ-সংস্কৃতি-ধর্মাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন লালন।

রূপকের অন্তরালে লালন জীবনের গভীর কথা শুনিয়েছেন। তিনি খণ্ডিত কোনো ধর্ম-দর্শনের কথা বলেননি। তাঁর গানের বৈচিত্র্য চোখে পরার মতো। মানুষের প্রতি সুগভীর বিশ্বাস তাঁর একাধিক গানের মধ্যে পাওয়া যায়। তাঁর মরমি সংগীতের মধ্যে প্রেম অনেকখানি জায়গা করে নিয়েছে। তাঁর সাধনতত্ত্বের প্রাণ-প্রবাহী শক্তি হল প্রেম। এই প্রেম শুদ্ধ প্রেম। লালন লিখেছেন—

কামে থেকে নিষ্কামী যে হয়;
কামরূপে প্রেম শক্তির আশ্রয়,
লালন ফকির ফাঁকে ফেরে,
কঠিন দেখে শুনে।

লালন বিকৃত যৌনাচারের কথা বলেননি। বরং তিনি উপলব্ধি করেছেন পরিশুদ্ধ প্রেম না থাকলে সেই সাঁইকে খুঁজে পাওয়া যায় না। লালন লিখেছেন—

ডুবে দেখ প্রেম-নদীর জলে
মীনরূপে সাঁই খেলে।
প্রেম-ডুবাক না হইলে
বাঁধবে না রে জালে।

তিনি ধর্মের কোনো গণ্ডি স্বীকার করেননি বলে তিনি কোনো ভেদাভেদ মানেননি। তাই গৌরাঙ্গাকে নিয়ে তিনি অসামান্য গান লেখেন। লালনের এই গানটি আমাদের মন জুড়িয়ে দেয়—

আজ আমার গৌর পদে মন মজিল,
আর কিছু লাগে না ভালো
সদায় মনে চিন্তা এই।
আমার সর্বস্ব ধন, ও চাঁদ গৌরাঙ্গ ধন
সে ধন কিসে পাই গো তাই শুধায়।

লালন সকল মানবের মধ্যে অভেদ কল্পনা করেছেন। তিনি জাতের বিচার ভুলে গিয়েছেন। তাঁর গানে আচারসর্বস্ব ধর্মীয় অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করা হয়েছে। তিনি ছুঁৎমার্গের প্রতি ঘৃণা দেখিয়েছেন। চিরাচরিত শাস্ত্রাচারের বিরুদ্ধে মানবধর্মের প্রচার করেছেন। ফলে তাঁর ধর্ম বিশ্বজনীন ধর্ম।

লালনের গানে আবহমান বাংলার চিরায়ত জীবন-সংস্কৃতির কথা পাওয়া যায়। মানব দেহকে তিনি তরু বা নৌকার সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, "কত ভাগ্যের ফলে না জানি/মনরে পেয়েছ এ মানব তরণী।" পাপ-পুণ্য, শাস্ত্র-আচারের ঊর্ধ্বে তিনি মানবদেহকে রেখেছেন। এই মানবদেহ তাঁর মতে ভজন-সাধনের মহাতীর্থ। তাই তিনি লিখেছেন—

উপাসনা নাই গো তার
দেহের সাধন সর্বসার

তীর্থব্রত যার জন্য
এদেহে তার সব মিলে।

লালন মরমি সাধক। তবে তিনি গুহাবাসী সাধকের মতো শুধু নিজের শান্তি চাননি। তিনি মানুষের মধ্যে দেবোপম সত্তাকে অনুভব করেছেন। মানুষের মধ্যেই তিনি “মানুষ রতন” পেয়েছেন। তাই লালন বলেছেন, “এই মানুষে আছেরে মন/যারে বলে মানুষ রতন।”

❖ **অন্যান্য বাউল গায়ক :** বাউল গানে লালন ফকিরের পাশাপাশি যাঁদের কথা বলতে হয়, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—

১. কুবির গোঁসাই	:	১. চাষা নইলে মানীর মান
		২. মানুষ হয়ে মানুষের করণ
		৩. মানুষে নিষ্ঠারতি কর মন
২. খোদা বক্শ শাহ্	:	১. জাতির নামে বজ্জাতি সব
		২. মানুষ ভজন করব বলে
		৩. মানুষ ভজন করবা যদি
৩. গগন হরকরা	:	১. আমি কোথায় পাব তারে
৪. গোবিন্দ দাস	:	১. ফকির সেজে ফিকির কর
		২. বাউল প্রেমে মজলে সবাই
		৩. ভিক্ষা নয় রে কর্ম করে
৫. জালালউদ্দিন	:	১. আমি না থাকিলে খোদা
		২. আমি বিনে কেবা তুমি
		৩. ধর্ম কি জাত বিচারে
		৪. মানুষ থুইয়া খোদা ভজ
		৫. বিচার করলে নাইরে বিভেদ
৬. দয়াময় হালদার	:	১. আল্লা সালাম ভগবান নাও গো প্রণাম
৭. দুদ্দু শাহ	:	১. আগে মানুষ পরে ধর্ম
		২. কাজ নেই পিরের দরগায়
		৩. কে তাহারে চিনিতে পারে
		৪. জাতি ধর্মের বড়াই কোরো না
		৫. মানুষ রতন চিনলে না
৮. দুবিন শাহ্	:	১. নামাজ আমার হইল না আদায়
৯. পাঞ্জু শাহ্	:	১. জেতের বড়াই কী
		২. শুধু কি আল্লা বলে ডাকলে তারে
১০. ফুলবাসউদ্দিন	:	১. আমি ভাবি বসে দিবানিশি
		২. তোর যায় না জাতির অহংকার
		৩. হিন্দু যখন খ্রিস্টান

১১. ভবা পাগলা : ১. ভবা কী জাত সবাই বলে
২. মানুষ তোমার কোথায় অবস্থান
১২. মহিন শাহ্ : ১. জাতের ঠাকুর বিরাজ করে
২. বসো মানুষের কাছে
১৩. সচ্চিদানন্দ : ১. মিছে জাত জাত করে
২. যদি বিশ্বস্রষ্টা একজন
১৪. হাসন রাজা : ১. আমি নামাজ রোজা পড়তাম
২. বিচার কর চাইয়া দেখি

১৭৮৭ সালে কুবির গোঁসাই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মস্থান বর্তমান বাংলাদেশের মধুপুর গ্রামে। তাঁর প্রকৃত নাম কুবের সরকার। তিনি জাতিতে ছিলেন যোগী-তাঁতি। তিনি ১২০০-র বেশি বাউলগান লিখেছেন। তাঁর গানে হিন্দু-মুসলমান ধর্ম-সংস্কৃতির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তিনি মানুষকেই বড়ো করে দেখেছেন। তাঁর গানের মধ্যে বার বার ভেদ বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কথা বলা হয়েছে। মানুষ সব সময় ভেদ বৈষম্য নিয়ে ব্যস্ত থাকে। অথচ তারা জানে না—'আল্লা মহম্মদ রাধাকৃষ্ণ একাঙ্গ একাত্মা সার।' সুতরাং মানুষ শুধুমাত্র নিজেদের মধ্যে আকাশ-জমিন পার্থক্য তৈরি করে। এই দেহের মধ্যে হিদু কিম্বা যবন খুঁজে পাওয়া যায় না। বস্তুত এই দেহের মধ্যে কোথায় গয়া-কাশি-বারাণসী; কোথায় বা খোদার বসত, কোথায় বা ভগবানের স্বর্গ কেউ তা জানে না। সুতরাং লালনের মতো কুবির গোঁসাই বার বার বলেছেন মানুষে মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ করার কোনো প্রয়োজন নেই। কী চমৎকার তিনি বলেছেন—

জানি আল্লা আর রসুল বিভিন্ন নয়।
যুগলরূপ রাধাকৃষ্ণ বলি স্পষ্ট সর্ব ঘটে পটে রয়॥
হিন্দু মুসলমানে সবাই মানে।
বোঝে না ভাবের নির্ণয়॥

তিনি অন্য একটি গানে বলেছেন, 'মানুষ হয়ে মানুষের করণ কর দেখিরে মন।' একথা বলেছেন একারণেই মানুষকে বিশ্বাস করলে পাওয়া যাবে মানুষের দর্শন। কুবির গোঁসাই এই গানটিতে বলেছেন মানুষ হল পরম রতন—

মানুষ হয়ে মানুষ মানো।
মানুষ হয়ে মানুষ জানো॥
মানুষ হয়ে মানুষ চেনো।
মানুষ রতনধন॥

আর একটি গানে কুবির গোঁসাই বলেছেন, 'মানুষে নিষ্ঠারতি কর মন'। কেননা, এই মানুষের মধ্যেই আছে পরমাত্মা, পরমেশ্বর। ফলে মানুষ বিনা কখনো সাধনা পরিপূর্ণতা পাবে না। খোদা **বক্শ্ শাহ্** অনুরূপে ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, চামার-মুচি, মক্কা-মদিনা, মন্দির-গির্জা—এ সবের মধ্যে কোনো ভেদ করলেন না। কী অপূর্ব তিনি লিখলেন—

জাতির নামে বজ্জাতি সব জাতি কি নিবা সঙ্গে করে।
সাদা কিবা কালো বরন জাত দেখছ কি এক নজরে॥

তিনি মানুষের ভজনা করতে বলেছেন। কেননা, মানুষ ভজন করলে পরম ঈশ্বরকে ভজনা করা হয়। সুতরাং মনকে পবিত্র গঙ্গা জলের মতো করতে পারলে তবেই মন-বনে ফুল ফুটবে। **গগন হরকরা** ছিলেন 'খ্যাপা প্রকৃতির মানুষ'। অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তী তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন—

> গগনের লেখা ও গাওয়া 'আমি কোথায় পাব তারে' শুনে রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হন এবং নানা লেখায় ও ভাষণে গানটি উদ্ধৃত করেন।... 'অনেক দিন সন্ধ্যার পরে নির্জনে বোটের ছাদে বসে রবীন্দ্রনাথ এঁর গীতসুধা পান করতেন।' দুটি রবীন্দ্রসংগীতের সৃষ্টি হয়েছে গগনের গানের সুরে। 'অসার মায়ায় ভুলে রবে' অবলম্বনে 'যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক' এবং 'আমি কোথায় পাব তারে'-র ছাঁচে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি'। দুটিই রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ পর্যায়ের গান, ১৯০৫ সালের রচনা। দুটি গানেরই স্বরলিপি প্রকাশ করেন সরলা দেবী তাঁর 'শতগান' বইতে। ১৯১৭ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের মর্যাদা পায় 'আমার সোনার বাংলা' গানটি।[১]

গগন হরকরার গানে মুগ্ধ রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন সহজ ভাষায় গভীর ভাবের কথা। আসলে গগন হরকরার গানের মধ্যে এমন জাদু আছে যে, তা সহজেই আমাদের মনকে মুগ্ধ করে। 'আমি কোথায় পাব তারে' গানটিতে যে দরদ, যে আকুলতা, যে অন্বেষণ ইচ্ছা নিরন্তর মনের মধ্যে করুণ রাগিনীর সুর তোলে, তারই অপূর্ব ভাষ্য ধরা পড়েছে

আলোচনা

৩. আমি কোথায় পাব তারে

আমি কেথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যে রে—
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে।
লাগি সেই হৃদয়শশী সদা প্রাণ হয় উদাসী
পেলে মন হত খুশি দেখতাম নয়ন ভরে।
আমি প্রেমানলে মরছি জ্বলে নিভাই কেমন করে
মরি হায় হায় রে
ও তার বিচ্ছেদে প্রাণ কেমন করে
ওরে দেখ না তোরা হৃদয় চিরে।
দিব তার তুলনা কি যার প্রেমে জগৎ সুখী
হেরিলে জুড়ায় আঁখি সামান্যে কি দেখিতে পারে
তারে যে দেখেছে সেই মজেছে ছাই দিয়ে সংসারে।
মরি হায় হায় রে—
ও সে না জানি কি কুহক জানে
অলক্ষে মন চুরি করে।
কুল মান সব গেল রে তবু না পেলাম তারে
প্রেমের লেশ নাই অন্তরে—
তাইতে মোরে দেয় না দেখা সে রে।

ও তার বসত কোথায় না জেনে তায় গগন ভেবে মরে
মরি হায় হায় রে—
ও সে মানুষের উদ্দিশ যদি জানিস কৃপা করে
আমার সুহৃদ হয়ে ব্যথার ব্যথিত হয়ে
আমায় বলে দে রে।

গগন হরকরা সম্পর্কে যে তথ্য পাওয়া যায় তা হল এমন—

১. ১৮৪০-১৯১০ হল গগন হরকরার জীবৎকাল।
২. গগন হরকরার পুরো নাম গগনচন্দ্র দাস।
৩. তাঁর জন্ম শিলাইদহের কাছে আড়পাড়া গ্রামে।
৪. তাঁর জীবিকা ছিল শিলাইদহ পোস্ট অফিসের ডাক বিলি করা।
৫. গগন হরকরার গানে মুগ্ধ হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি দুটি গানও লিখেছিলেন এই বাউল সংগীত সাধকের সুরে।

যে মনের মানুষকে বাউল সাধক খুঁজে বেড়ান সেই মনের মানুষ মনের মধ্যেই থাকেন। কিন্তু আমরা তাকে খুঁজে পাইনা। সুতরাং যে সব থেকে কাছের তাকে আমরা পাশে পেয়েও ‘দেশ-বিদেশে বেড়াই ঘুরে’। তাঁর বিচ্ছেদে প্রাণ কাঁদে। অথচ তাঁর প্রেম পেলে জগতের সবথেকে সুখি মানুষ হওয়া যায়। তাকে দেখলে আনন্দের শেষ থাকে না। কিন্তু তাঁকে দেখা যায় না। তাঁকে কাছে পাওয়া যায় না। এই মনের মানুষ সবসময় কাছেই থাকেন, কিন্তু আমরা তার প্রেমের মহিমা উপলব্ধিই করতে পারি না। গগন হরকরার মনে হয়েছে, আমাদের মধ্যে যে প্রেম সেই প্রেমে খাদ মেশানো। তাই আমরা তাঁকে কখনোই কাছে পাই না। ফলে আমাদের মনের বাসনা পূরণ হয় না। সেই মনের মানুষ ঠিক কোথায় বাস করেন আমরা তার খোঁজ পাই না। গগন বলেছেন, কেউ যদি তাঁর খোঁজ পায়, তিনি যেন কৃপা করে তার ঠিকানা বলে দেন। কেননা, বাউল সাধক তাঁরই খোঁজে নিরন্তর মনে মনে জপ করে থাকেন। গগন হরকরা বলেছেন, তিনি কুল-মান সব জলাঞ্জলি দিয়েও তাঁর প্রাণের মানুষকে খুঁজে পান না। তাই তাঁকে দিবানিশি খুঁজে চলেন। তাঁর মনে হয়েছে, মনের মধ্যে প্রেমের লেশমাত্র নেই বলে তিনি সেই পরম রত্নকে খুঁজে পান না। **গোবিন্দ দাস** তাঁর গানের মধ্যে অনুরূপে ‘মানুষ রতন’ খুঁজেছেন। তিনি জয়দেবের কেন্দুলি গ্রামের কথা উল্লেখ করেছেন। এভাবে—

বাউল প্রেমে মজলে সবাই বাউল বাউল রসনা।
হিমেল রাতে কেঁদুলিতে শুনতে বাউল মন্দ না॥

এত জায়গা থাকতে গোবিন্দ দাস কেন কেন্দুলি গ্রামের কথা উল্লেখ করলেন, তার একটি কারণ সম্ভবত এখানেই ছিলেন কবি-সাধক জয়দেব গোস্বামী। এই বাউল সাধক ভিক্ষান্নে জীবিকা অর্জন করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন—

ভিক্ষা নয় রে কর্ম করে ক্ষুধার অন্ন ঘরে আন।
পরের ধনে প্রাণ ধারণে বিরূপ যে হন ভগবান॥

আলোচনা

৪. বিচার করলে নাইরে বিভেদ কে হিন্দু কে মুসলমান

বিচার করলে নাইরে বিভেদ কে হিন্দু কে মুসলমান
রক্ত মাংস একই বটে সবার ঘটে একই প্রাণ।
জীব যাহারে বলা হয় সে তো সুন্দর দেহ নয়
প্রাণ সম্বন্ধে জগতময় সবাতে তার এক সন্ধান।
মাথাতে মস্তিষ্ক থাকে মলমূত্র পেটেতে রাখে
পায়ে হাঁটে চোখে দেখে একই বায়ু করে পান।
বাতাস খেয়ে জীবন বাঁচে বায়ুতে পরাণ আছে
পরমায়ু তারি কাছে একজনে করেছে দান
একই যদি সবার গোড়া আছে যখন স্বীকার করা।
ভিন্ন করে ভবে কারা—দিয়ে গেল বিভেদের জ্ঞান।
খাওয়া পরা চাল চলনে ভিন্ন হইয়া ভিন্ন মনে
যার-তার ভাবে নিচ্ছি টেনে হরি-আল্লাহ-ভগবান।
একের বিচার কোথায় গেল পরম কীসে চিনা হল
জালালউদ্দীন ঠেকে রইল শুধু ভাবের গান।

পূর্ববঙ্গের সাধক-গীতিকার রসিদউদ্দিনের শিষ্য হলেন **জালালউদ্দিন**। তাঁর সম্পর্কে যে তথ্য পাওয়া যায় তা হল এমন—

১. ১৮৯৪ সালে এপ্রিল মাসে জালালউদ্দিন জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে তাঁর দেহান্তর হয়।
২. বাংলাদেশের কেন্দুরা থানার তেঁতুলিয়ার কাছে আসদহাটি গ্রামে জালালউদ্দিনের জন্ম হয়। তিনি মামার বাড়িতেই জন্মগ্রহণ করেন।
৩. তাঁর পিতার নাম ছদরুদ্দীন খাঁ। তিনি ছিলেন শিক্ষিত মানুষ।
৪. তিনি দশম শ্রেণি পর্যন্ত বিদ্যাচর্চা করেন।
৫. পত্নীর মৃত্যুর পর তাঁর মধ্যে বৈরাগ্য আসে।
৬. তিনি সুফি ধর্মে আকৃষ্ট হন।
৭. প্রায় এক হাজার গান তিনি লেখেন। 'জালাল গীতিকা' নামে সেই গানগুলি চার খণ্ডে প্রকাশিত হয়।

অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তী তাঁর 'জনপদাবলি' নামাঙ্কিত গ্রন্থে এই বাউল সাধক সম্পর্কে লিখেছেন—"গুরুসদয় দত্ত জালালকে খুব পছন্দ করতেন। গায়ক আব্বাসউদ্দিন তাঁকে পিরের মতো ভক্তি করতেন। জালাল অত্যন্ত জনপ্রিয় গীতিকার এবং বলিষ্ঠ মতবাদের মানুষ। তাঁর যুক্তিবাদী আধুনিক মনস্কতা বিশেষভাবে তাঁর গানকে আকর্ষণীয় করেছে।"[৫] তাঁর গানের মধ্যে আমরা স্বদেশের একটি প্রাণবন্ত চালচিত্র খুঁজে পাই। তিনি জানিয়েছেন মানুষ না থাকলে ঈশ্বরকে চিনত কে? সুতরাং মানুষের মধ্যে দিয়ে নিজের প্রেমকথা বোঝাতে গিয়ে ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর এই অসাধারণ কথাগুলি ধরা পড়েছে নিচের এই গানটিতে— "আমি না থাকিলে খোদা তোমার জায়গা ভবে নাই।/স্থান না পেয়ে অন্য কোথাও আমাতে

লয়েছ ঠাঁই॥/দুনিয়া তোর স্বরূপ-ছায়া আমাতে তোমারই মায়া।/ছেড়ে দিলে এসব কায়া তুমি বলতে কিছু নাই॥" এই বাউল সাধক রাধা-রহিম-কৃষ্ণ—এঁদের মধ্যে ভেদ দেখেননি। কেননা, মানুষ নিজের স্বার্থে ভেদাভেদ করে; প্রকৃত কোনো ভেদ নেই। কী সুন্দর তিনি বোঝালেন—

তুমি সে অনন্ত অসীম আমাতে হয়েছ সসীম।
কালীকৃষ্ণ করিম রহিম কত নামে ডাকছি তাই॥

রামপ্রসাদ বলেছিলেন, মা হলেন তার জীবনের একমাত্র সার, মাকে পেলে গয়া-গঙ্গা-কাশি-বারাণসীর প্রয়োজন হয় না। আর এখানে জালালউদ্দিন বলেছেন, খোদা কখনও মক্কায় বন্দি থাকতে পারেন না। তিনি আমাদের কাছেই আছেন, তাকে ডাকলেই তিনি দেখা দেন। কিন্তু আমরা তাকে ডাকতে পারি না—

খোদার ঘর হয় মক্কা শরিফ এই কথা পাগলে বলে।
এমন প্রত্যয় কেমনে হবে বিচারবোধ জাগ্রত হলে॥
প্রতি ঘটেই খোদা আছে এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডময়।
সে তো পাখির মতো খাঁচায় পুরে এক স্থানেতে রাখার নয়॥

"বিচার করলে নাইরে বিভেদ" গানটির বৈশিষ্ট্য হল—

১. এই গানে জালালউদ্দীন হিন্দু-মুসলমানের ভেদ করেননি। অর্থাৎ তিনি ছিলেন অসাম্প্রদায়িক সাধক।
২. তিনি মানবদেহের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, সব মানুষ একই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এবং সবাই এই বাতাস গ্রহণ করেই প্রাণ ধারণ করে। বাতাসের মধ্যে যদি ভেদ না থাকে, তাহলে মানুষে মানুষে ভেদ কেন?
৩. একটি গাছে যেমন একটিই প্রধান মূল হয় এবং তার সঙ্গে অসংখ্য শাখামূল যুক্ত হয়; তেমন একটি ধর্মে থাকে তার অসংখ্য আচার-বিচার-সংস্কার। সুতরাং এক হরি-আল্লাহ-ভগবানকে আলাদা আলাদা করার কোনো অর্থই হয় না।

আলোচনা

৫. জাতাজাতির সৃষ্টি করে ভারতকে শ্মশানে দিলে

জাতাজাতি সৃষ্টি করে ভারতকে শ্মশানে দিলে
যতসব কায়েত বামুন অবশেষে এই বুঝিলে।
শূদ্র বৌদ্ধ ইতর মুসলমান
সবি তো এক মায়ের সন্তান
ভারতের মাটিতে সবারই প্রাণ
কেউ না দেখিলে।
রচিয়া জাতির বেড়া
দেবতায় করলে দেশছাড়া
মানুষ ছাড়িয়া নোড়া
সবাই পূজিলে।

এ দুঃখ আর বলি কারে
যে দুঃখে মোর প্রাণ বিদরে
দুদ্দু কয় তাই বিনয় করে
দরবেশ লালন সাঁই যা বলে।

দুদ্দু শাহ (১৮৪১-১৯১৯) সম্পর্কে যে তথ্যগুলি পাওয়া যায় তা হল এমন—

১. দুদ্দু শাহের জন্ম যশোহর জেলায়।
২. তাঁর জীবৎকাল ১৮৪১-১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ।
৩. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য 'বাংলার বাউল ও বাউল গান' নামাঙ্কিত গ্রন্থে তাঁর ১০০টি গান সংকলন করেছেন। ১৯৫৭ সালে এই কাজটি তিনি সম্পন্ন করেন।
৪. ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার বাংলা একাডেমী প্রকাশ করেন। 'বাউল গান ও দুদ্দু শাহ্' গ্রন্থে ৩১৪টি গান সংকলিত হয়।

এই বইটি সম্পাদনা করেন বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গির। এই গানগুলি তিনি পেয়েছিলেন যশোহরের আবদুল লতিফ আনহু-র কাছ থেকে।[৬]

তাঁর গানে বলেছেন, 'আগে মানুষ পরে ধর্ম'। এর থেকে বড়ো কথা কিছু হয় না। যে কালবেলায় আমরা দুদ্দু শাহের এই গানটি শুনছি আমার ব্যক্তিগত ভাবে মনে হয় প্রতি সকালে একবার করে এই গানের সুর সবার কাছে পৌঁছানো দরকার। আচার-বিচার, হিংসা-ঘৃণা—এগুলি জন্মগত নয়। ছুৎ-অছুৎ, ন্যায়-অন্যায়—এসব সামান্য নীতি-নৈতিকতা দিয়ে বিচার করা যায় না। সুতরাং মানুষকে ত্যাগ করে দরগায় ধর্না দিয়ে বসে থাকলে তাতে কোনো লাভ হবে না। কেননা, আগে মানুষ পরে ধর্ম-জাতির নির্ণয়। তিনি পরিস্কার বলেছেন, দরগায় গিয়ে শিরনি দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তার থেকে অনেক বেশি প্রয়োজন হল, মানুষকে ভালোবেসে কাছে টেনে নেওয়া। মানুষকে দূরে ঠেলে মাটির পুতুল পুজো করেও কোনো লাভ নেই। কেননা, এগুলি সব আসলে মিথ্যা। এই কথাগুলি লিখতে লিখতে কেন জানি না, শ্রীরামকৃষ্ণের কথা মনে পড়ছে। আসলে এসব ভেদ-বৈষম্য মানুষ তৈরি করে, আর উপরে বসে অন্তর্যামী হাসেন। তাই জোর গলায় দুদ্দু শাহ বলেন—

১. কে তাহারে চিনিতে পারে ভাই
মানুষের চরণ না চিনিলে উপায় নাই।
কাশী কিংবা মক্কায় যাও রে মন
দেখতে পাবে মানুষের বদন
ধ্যানধারণা ভজনপূজন মানুষনিধি সর্ব ঠাঁই।

২. মানুষ রতন চিনলে না রে ভাই
গেলে পুতুল পূজে জনম গো ভাই।
যে ভাস্করে গড়ে পুতুল
তার চরণ করিয়া ভুল
পুজে সকলে মাটির পুতুল দেখিরে তাই।

এই মরমিয়া সাধক যখন বলেন, 'জাতি ধর্মের বড়াই কোরো না' তখন কেন জানি না এই গানটিকে আর একটি দেশ-কালের খড়ির গণ্ডির মধ্যে আটকে রাখতে মন চায় না। কবে নজরুল তাঁর একাধিক কাব্য-কবিতা-গান-প্রবন্ধে এই জাতি ও ধর্মের ভেদবুদ্ধি নিয়ে বাঘ-বন্দি খেলতে নিষেধ করেছিলেন। অথচ তাঁর অনেক আগেই বাউল সাধক এই ভেদ-বৈষম্য, আচার-বিচার-সংস্কারের জগদ্দল শিলাকে দুহাতে ছুঁড়ে ফেলেছিলেন। এ কি কম সাহসের কথা! এই সাহস তো **পাঞ্জু শাহ্‌**ও দেখিয়েছেন। 'জাতাজাতির সৃষ্টি করে' গানটিতে দুদ্দু শাহ্ বলেছেন, জাত-পাত-বর্ণবৈষম্য ভারতকে শ্মশানে পরিণত করেছে। তিনি স্পষ্টই জানিয়েছেন উচ্চ বর্ণের মানুষরা এই বর্ণ বৈষম্যের সৃষ্টি করেছেন। অথচ একই মায়ের গর্ভে জন্ম নিয়েছে শূদ্র-বৌদ্ধ-ইতর-মুসলমান। ভারতের মাটিকে সবাই ভালোবাসে। অথচ জাত-পাত মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে। জাতের বেড়া দিয়ে নেহাৎ মানুষ পরস্পরের মধ্যে প্রাচীর তুলে দিয়েছে। দুদ্দু শাহ্ এই গানের শেষে লালন সাঁই-এর কথা উল্লেখ করে বলেছেন, লালনও এই জাত-ধর্ম-বর্ণ বিদ্বেষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। এই বাউল সাধক 'কাজ নেই পিরের দরগায়' গানে অনুরূপে বলেছেন, অন্ধ আচার-বিচার-বিশ্বাস- প্রথা-সংস্কার কখনো জাতিকে মুক্তি দিতে পারে না। আসলে তিনি বেদ-বিরোধী ও শরিয়তপন্থী ইসলামী আচরণেরও বিরোধী ছিলেন। তাঁর মনে হয়েছে মানুষের মধ্যেই মানুষের ঈশ্বরকে অনুসন্ধান করাই জীবনের সবথেকে বড়ো কর্ম। বলাবাহুল্য দুদ্দু শাহ্ লালনের মতো মানুষের মধ্যে আত্মার আত্মীয়কেই অন্বেষণ করেছেন। ফকিরি সাধনায় তাঁর গভীর জ্ঞানের পরিচয় নিহিত রয়েছে বলেই তিনি জানাতে পারেন—

> যে খোঁজে মানুষে খোদা সেই তো বাউল
> বস্তুত ঈশ্বর খুঁজে পায় তার উল॥
> পূর্ব পুনঃজন্ম না মানে
> ধরা দেয় না অনুমানে
> মানুষ ভজে বর্তমানে হয় রে কবুল॥

ড. আনোয়ারুল করীম লিখেছেন—

> লোকধর্মের অনুসারী হয়ে কবীর যেমন তাঁর গানের মাধ্যমে সমাজকে একটি অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও মানবতাবোধের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন লালন ফকির, দুদ্দু ও পাঞ্জু শাহ এমন অনেকের গানে সেই সুরেরই প্রতিধ্বনি আমরা শুনেছি। সুফিবাদে বিভিন্ন ধর্মের সমন্বিত চেতনার প্রকাশ ঘটলেও ইসলামের মানবতাবাদ ও সর্বজনীনতা এখানে মুখ্য হয়ে উঠেছে। দুদ্দু শাহ্ তাঁর গানে ইসলামের মানবতা ও সর্বজনীনতার পাশাপাশি মারফতি চেতনাকেও অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।[৭]

আলোচনা

৬. জেতের বড়াই কী...

জেতের বড়াই কী

ইহকাল পরকালে জেতে করে কী—
আমার মন বলে অগ্নি জ্বেলে দিই জেতের মুখি।
এক জেতের বোঝা লয়ে চিরকাল কাটালাম
মানী মানুষ হয়ে
মানের গৌরব কুলের গৌরব ধন্ধবাজি সব দেখি।
লোকে পেটের জ্বালায় দেশান্তরি হয়
হিন্দু মুসলমানের বোঝা মাথায় করে বয়
কার বা জাতি কেবা দেখে ঘরে এলে চিহ্ন কী?
জেতে অন্ন নাহি দিবে রোগে না ছাড়িবে
পাপ করিলে কোম্পানি সব জাত ধরে লয়ে যাবে
মৃত্যু হলে যাবে চলে জেতের উপায় হবে কী।
মন ডাকো আল্লা বলে কুলের গৌরব ফেলে—
অকূলের কূল মালেক আল্লা তাইরি লেহ চিনে—
পাঞ্জু বলে যত করলাম সবই ফাঁকিজুকি।

পাঞ্জু শাহ্ সম্পর্কে যে তথ্যগুলি পাওয়া যায় তা হল এমন—

১. ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জু শাহ্ জন্মগ্রহণ করেন।
২. তাঁর জন্মস্থান হল বাংলাদেশের যশোহর জেলার ঝিনাইদহ মহকুমার শৈলকূপা গ্রামে।
৩. তিনি অভিজাত খোন্দকার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।
৪. আরবি ফারসি ভাষাতে গভীর ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।
৫. বাংলা বিদ্যাচর্চা সম্পর্কে তাঁর আগ্রহের শেষ ছিল না।
৬. ৪৫ বছর বয়সে ফকিরি পোশাক পরেন।
৭. তিনি নিরামিষ ভোজী ছিলেন।
৮. তাঁর গুরু ছিলেন হিরুচাঁদ।

এই মরমিয়া সাধক প্রথমেই বলে নিয়েছেন জাতির বড়াই করে কোনো লাভ নাই। জাতিভেদ, ধর্মভেদ, বর্ণভেদ শুধু মনের দীনতাকে প্রমাণ করে। সুতরাং তাঁর সিদ্ধান্ত চলমান এই শতাব্দীতে শুধু কেন, হাজার শতাব্দী পরেও অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো আমাদের সত্তা জুড়ে আন্দোলিত করতে থাকবে।

কুবির গোঁসাই

আলোচনা

৭. মানুষ হয়ে মানুষের করণ

মানুষ হয়ে মানুষের করণ কর দেখি রে মন
মানুষে বিশ্বাস কর রে
পাবি মানুষের দরশন।

মানুষ নিত্য মানুষ সত্য
মানুষ ত্রিবেদ গঠন—

যেমন পঞ্চবর্ণ গাভী রে মন
দুগ্ধ হয় তার এক বরণ।

মানুষ হয়ে মানুষ মানো
মানুষ হয়ে মানুষ জানো
মানুষ হয়ে মানুষ চেনো
মানুষ রতনধন।
মানুষ মনছাড়া বেদবিধিছাড়া
বিরজা পার তার আসন—
সেই মানুষ জীবাত্মা জীবের জীবন।

চার যুগেতে মানুষ আছে
সেই মানুষ মানুষের কাছে
বহুরূপ ধারণ করেছে
মানুষ মানুষের কারণ।
আবার তার উপরে মানুষ আছে
মানুষ প্রাপ্তি বস্তুধন—
কর সেই মানুষের অন্বেষণ।
মানুষ এই ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে
বিরাজ করেন ব্রহ্মরূঢ়ে
মানুষ আছে ধড়ে ধড়ে
অসাধ্য হয় তার করণ।
জলে স্থলে হৃদ্ কমলে
মানুষ নয় মানুষের বোলে
কুবির বলে ধরে শ্রীচরণ।

কুবির গোঁসাই সম্পর্কে যে তথ্যগুলি পাওয়া যায় তা হল এমন—

১. কুবির গোঁসাই জন্মগ্রহণ করেন ১৭৮৭ সালে।
২. বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত অখণ্ড নদিয়া জেলার চুয়াডাঙা মহকুমার আলমডাঙার কাছে মধুপুর গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।
৩. তাঁর প্রকৃত নাম কুবের সরকার। তিনি জাতে যোগী তাঁতি।
৪. সাহেবধনী সম্প্রদায়ের গুরু চরণ পালের কাছে দীক্ষা নেন।
৫. ১২০০-র বেশি বাউল ও ফকিরি গান লেখেন।
৬. ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন।

কুবির গোঁসাই তাঁর গানে বলেছেন, এই মানুষের দেহেই সব আছে। মানুষের দেহের মধ্যে রয়েছে স্বর্গ ও নরক। এই দেহের মধ্যেই রয়েছে কারবালা প্রান্তর। রয়েছে বৈকুণ্ঠপুরী। এখানেই রয়েছে বৃন্দাবন-কৃষ্ণ-বলরাম। মানুষের দেহে বিরাজ করেন হাসান-হুসেন। এখানে শেষ বিচারের নদী পার হওয়ার রাস্তা রয়েছে। সুতরাং এই দেহের ভালো-মন্দ বিচার করার

প্রয়োজন নেই। কুবির বলেছেন, ঈশ্বর ও আল্লাতে কোনো ফাঁক নেই। তিনি সমন্বয়বাদী বাউল। তাঁর মনে হয়েছে স্রষ্টা ও ঈশ্বরের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। জাত-ধর্ম-বর্ণের মধ্যে কোনো ভেদ নেই। ভেদ রয়েছে শুধু পুরুষ আর নারীতে। সুতরাং সমাজ আরোপিত ভেদ-বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন কুবির গোঁসাই। "মানুষ হয়ে মানুষের করণ" গানে তিনি মানবপ্রেমের কথা বলেছেন। মানুষের প্রতি বিশ্বাস থেকেই দেবদর্শন হয়। কারণ মানুষই হল সত্য। এই মানুষেই আছেন সেই মানুষ, যাকে আমরা নিরন্তর খুঁজে চলেছি। তাই মানুষকে ভুলে উপরওয়ালাকে পাওয়া যায় না। মানুষই হলেন পরম রতন। এই মানবদেহ ঈশ্বর-আল্লাহের বাসভূমি। প্রকৃত মানুষ হলে সেই পরমেশ্বর দেখা দেন। এজন্যে সমস্ত অন্ধবিশ্বাস, সংস্কার, ভেদাভেদ ত্যাগ করতে হয়। আমরা মনে রাখব যে, রাম ও রহিমকে কুবির গোঁসাই আলাদা করেননি। তিনি সমন্বয়বাদী সাধক। সকলের মধ্যে তিনি এক পরম ঐশ্বর্যবানকে দেখেছেন। সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি—এই চারযুগে মানুষ মানুষের কাছে বহুরূপ ধারণ করেছে। মানুষের উপরে কেউ কখনও হতে পারে না। কেননা, ঈশ্বর মনবদেহ ধারণ করে অবতীর্ণ হন। এই মানুষ হল মূল প্রাপ্তি বস্তুধন। সুতরাং কুবির জানান "কর সেই মানুষের অন্বেষণ।" জলে-স্থলে-হৃদ্‌কমলে মানুষরূপী ঈশ্বরের সন্ধান পাওয়া যায়। সুতরাং কুবির অন্য একটি গানে বলেন—

মানুষে নিষ্ঠারতি কর মন।
তবে রতি ফিরবে জানতে পারবে
মানুষ কেমন বস্তুধন।

এই কথাটুকু বলা জানি না কতটা বাড়াবাড়ি হবে—এই কালান্তিক রাক্ষুসেবেলায় দাঁড়িয়ে ধর্ম-রাজনীতি যখন রাতের অন্ধকারে কোলাকুলি করছে, রং বদলে যাচ্ছে লাল-সবুজ-গেরুয়া—অনেকখানি শৌখিন প্রজাপতির ডানার মতো; ঠিক তখন কোনো রাজনৈতিক ম্যানিফেস্টো আরোপ না করে বাউলরা সাফ জানিয়েছেন তাঁরা বর্ণ-বিত্ত-বর্গ ভেদ মানেন না; মানার প্রশ্ন নেই, তাই মানেনও না।

উৎসের সন্ধানে

১. 'হিতকারী' পত্রিকার সম্পাদকীয়।
২. অক্ষয়কুমার মৈত্র : 'ভারতী' পত্রিকা, ১৩০২ বঙ্গাব্দ।
৩. প্রশান্তকুমার পাল : 'রবিজীবনী', তৃতীয় খণ্ড।
৪. অন্নদাশঙ্কর রায় : 'লালন ও তাঁর গান', কলকাতা, ১৩৮৫, পৃ. ১৯
৫. সুধীর চক্রবর্তী : 'জনপদাবলি', পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০ মে ২০০১, পৃ. ১৯১
৬. তদেব : পৃ. ১৯৫
৭. আনোয়ারুল করীম : 'বাংলাদেশের বাউল সমাজ, সাহিত্য ও সংগীত', কথাপ্রকাশ, বাংলাদেশ, ২০১৬ খ্রি., পৃ. ৫৩৫

‘খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ পাথর’ : প্রসঙ্গ বাউল

মধুসূদন সাহা

অর্ধেক জীবন খুঁজি কোন্‌ক্ষণে চক্ষু বুজি
স্পর্শ লভেছিল যার এক-পল-ভর,
বাকি অর্ধ ভগ্ন প্রাণ আবার করিছে দান
ফিরিয়া খুঁজিতে সেই পরশ পাথর।।[১]

আমাদের সারা জীবনব্যাপীই চলে অন্বেষণ। শুধু খোঁজ। রাতের অন্ধকার থেকে দিনের আলো সবকিছুর মধ্যে মানুষ ভুগছে একটা Identity Crisis-এ। বংশগত, সামাজিক বা প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয় ছাড়াও আমাদের আর একটা পরিচয় নিজের মধ্যে তৈরি হয়। দার্শনিক পরিভাষায় তা ‘self-actualization’ (স্বীয় যথার্থ)। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় দার্শনিক আব্রাহাম মাসলো (Abraham Maslow) এই সম্পর্কে বলেছেন—‘‘Self-actualization is the ultimate goal of all organisms.’’[২] সমস্ত জীবজগতই নির্দিষ্ট লক্ষে পৌঁছাতে চায়। নিজেকে পরিপূর্ণ করে তুলতে চায়। আর তাই-ই তো হন্যে হয়ে আমাদের আমৃত্যু খুঁজে চলা। তবে সবকিছুর মূলে এটাও সত্যি—

যা না চাইবার তা আজি চাই গো।
যা না পাইবার তা কোথা পাই গো!
পাব না, পাব না,
মরি অসম্ভবের পায়ে মাথা কুটে।।[৩]

কিন্তু সেই অসম্ভবকেও আমরা নতমস্তকে মেনে নিই। সমস্ত প্রতিকূলতার ঊর্ধ্বে যে হয়—সেই আশায় বাঁধি খেলাঘর। দার্শনিক মাসলো এই চাওয়া ও পূর্ণতা প্রাপ্তির অভিমুখে অবিরাম অবিরত ছুটে চলাকে বলেছেন—‘‘hierarchy of human needs.’’[৪] কিন্তু বাউলের কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই। সফলতার শৃঙ্গ বলতে সে বোঝে মনের মানুষের দর্শন। দেহ তার সাধনার অঙ্গ। মন তার আরাধনার ঈশ্বর। শুদ্ধ দেহসাধনার মধ্য দিয়ে মনের মানুষের দর্শন লাভই বাউল সাধনার মূলকথা।

শব্দ উৎস : ‘বাউল’ শব্দটির উৎস সন্ধানে গিয়ে দেখা যায়—‘বাতুল’ শব্দটি এসেছে ‘বাতুল’ শব্দের অর্থ বায়ুরোগগ্রস্ত, পাগল, উন্মাদ বা খ্যাপা। ‘বায়ু’ শব্দের সঙ্গে ‘ল’ প্রত্যয় যোগ করে তদ্ধিত প্রত্যয়ের নিয়ম অনুসারে ‘বাউল’ শব্দটি এসেছে। আমাদের সমাজ নামক প্রতিষ্ঠানে যার অর্থ দাঁড়িয়েছে—বিশেষ এক ধর্মসাধক সম্প্রদায়। এখানে শব্দটির অর্থোন্নতি হয়েছে। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর ‘The Origin and Development of the Bengali Language’ গ্রন্থে বাউল শব্দের উৎস সম্পর্কে বলেছেন—

বাউল <<bāiila >> <<bāwula >> (vatula)।[৫]

এখানে ‘t’ লোপ পেয়ে সেই স্থানে ‘w’ শ্রুতিধ্বনি হয়েছে। তারপর ‘w’ ‘উ’

(u) হয়েছে। উক্ত গ্রন্থে সুনীতিবাবু আর একটি বিশ্লেষণও দিয়েছেন—"বাউল [baul] (Vatula, vyakula)''। এখানে বলা হয়েছে 'ব্যাকুল' শব্দ থেকে 'বাউল' শব্দটি এসেছে। অধ্যাপক সুকুমার সেন উভয় মতই স্বীকার করেছেন এবং একে সমমুখ (convergent) ধ্বনি পরিবর্তন বলেছেন—সমমুখ ধ্বনি—পরিবর্তনের (convergent phonemic change) ফলে বিভিন্ন শব্দ একই রূপ নিতে পারে। একরূপ শব্দকে বলা হয় সমরূপ (Homonym)। তেমন ভাবেই সংস্কৃত 'বাতুল' ও 'ব্যাকুল' শব্দ থেকে বাংলায় 'বাউল' এসেছে।[৬] আবার 'ব্যুৎপত্তি সিদ্ধার্থ বাংলা কোষ' গ্রন্থে অধ্যাপক সুকুমার সেন 'উন্মাদ' অর্থে 'পাগল', সংস্কৃত 'বাতুল' এবং বিশেষ্য রূপে 'বাউল' শব্দটির অর্থ করেছেন 'এক শ্রেণির বৈরাগী সাধক।'[৭] রাজশেখর বসু 'চলন্তিকা'য় বলেছেন—

> (বাউল < বাতুল) গায়ক ভিক্ষু-সম্প্রদায় বিঃ। সর্বসংস্কারমুক্ত এক শ্রেণীর ধর্মাচারী। তাহাদের রচিত গীতিগান।[৮]

হিন্দি শব্দ 'বাউলা' বা 'বাউরা' থেকে অপভ্রংশ হয়ে 'বাউল' শব্দটি এসেছে বলেও অনেক দাবি করেন। আবার কারও মতে সুফি সাধকরা এক প্রকার 'উলের কাপড়' পড়তেন। সেই 'উল' শব্দটির সঙ্গে ফরাসি প্রত্যয় 'বার' যুক্ত করে (বার + উল) 'বাউল' শব্দটির উৎপত্তি। সুফিতত্ত্ব মতে বারউল (বাউল) শব্দের অর্থ 'আল্লার সন্ধানী।'[৯] সবদিক থেকে বিচার করে এই সিদ্ধান্তেই আসা যায় যে, 'বাউল' শব্দের অর্থ এক প্রকার ধর্মসাধনকারী সম্প্রদায়। আর সেই সাধনার মূল কথা হল আত্মোপলব্ধি।

শব্দ ব্যবহার : ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' গ্রন্থে 'বাউল' শব্দটির উল্লেখ ছিল—

মুকুল(ত) মাথার চুল নাংটা যেন বাউল
রাক্ষসে রাক্ষসে বুলে রণে।
বিকটান কাড়ি রায় বনে মাংস কাড়ি খায়
রক্ত পড়ে গলিয়া বদনে।।[১০]

মালাধর বসু 'বাউল' বলতে মানুষের উন্মাদ সত্তাকে বুঝিয়েছেন। হয়তো কবির কাব্য রচনার সমসময়ে বা পূর্বে এরূপ উন্মাদ বা হিংস্র মানুষ বর্তমান ছিল। গ্রন্থটির রচনাকাল কবিই স্পষ্ট করেছেন—

তেরশ পঁচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভণ।
চতুর্দশ দুই শকে হৈলা সমাপন।।[১১]

অর্থাৎ ১৩৯৫ থেকে ১৪০২ শতাব্দী, ১৪৭৩-১৪৮০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কাব্যটি রচিত হয়েছিল। এছাড়াও কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত 'চৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থেও 'বাউল' শব্দটির ব্যবহার আছে।

স্থির হঞা ঘরে যাও, না হও বাউল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভব সিন্ধুকূল।।[১২]

কিংবা

আমি ত বাউল আন্ কহিতে আন্ কহি।

কৃষ্ণের মাধুর্যস্রোতে আমি যাই বহি॥[১৩]

এখানে 'বাউল' শব্দের অনেকটাই অর্থোন্নতি ঘটেছে। 'বাউল' বলতে এখানে ভক্তিতে পরিপূর্ণ মানুষ এবং কৃষ্ণের অনুগ্রহ লাভের জন্য ভক্ত হৃদয়ের ব্যাকুলতা প্রকাশ করা হয়েছে। অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তদের সকলকেই 'বাউল' বলা হয়েছে। আবার 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থের অন্ত্যলীলায় অদ্বৈত আচার্য কর্তৃক চৈতন্যদেবকে বলা কয়েকটি নির্দেশেও বাউলের প্রসঙ্গ আছে—

বাউলকে কহিও লোক হইল আউল,
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল
বাউলকে কহিও কাযে নাহিক আউল;
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল।[১৪]

লক্ষণীয় অদ্বৈত আচার্য নিজেকে এবং চৈতন্যদেবকে 'বাউল' হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন। অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদেব ও অদ্বৈত আচার্য দুজনেই কৃষ্ণপ্রেমভক্ত। তাই উভয়েই বাউল। আর আরবি 'আউল' শব্দটির ব্যবহারে ভক্তির গভীরতা বোঝানো হয়েছে। আর শ্লোকটির অর্থ দাঁড়ায় বাউল অর্থাৎ চৈতন্যদেব যেন হাটে চাল না বিক্রি করে অর্থাৎ প্রেমরূপ চাল বিতরণ না করে। বাউল যেন নিজ কার্যে মন দেয়। আর শেষপংক্তির প্রথম বাউল শ্রীচৈতন্যদেব আর দ্বিতীয় বাউল অদ্বৈত আচার্য। অর্থাৎ বাউল হল এক প্রকার সাধনা। নিবিষ্ট ভক্তিতেই তার প্রকাশ।

'সংসার ধর্ম বড়ো ধর্ম' হলেও মানুষ খোঁজে আপনজন। সেই আপনজন নিজের অধীশ্বর। তাঁকে খুঁজতেই আমাদের মানব জনম। পৃথিবীর সমস্ত ধর্মের সারবস্তুই এই অন্বেষণ অর্থাৎ খোঁজা। ভক্ত যখন অধীর হয়ে প্রায় উন্মাদ হয়ে তার অধিদেবতা তথা মনের মানুষকে খুঁজে বেড়ায় তখন হয় বাউল সাধনার শুরু। কারণ—

আমায় ঘরের চাবি পরের হাতে
কেমনে খুলিয়ে সে ধন দেখব চক্ষেতে।...
রাজী হলে দরওয়ানি
দ্বার ছাড়িয়ে দেবেন তিনি...

ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী 'বাংলার বাউল' বক্তৃতামালায় বলেছেন—

> বহু শতাব্দী ধরিয়া জাতি-পংক্তির বহির্ভূত নিরক্ষর একদল সাধক শাস্ত্রভাবমুক্ত মানবধর্মই সাধনা করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা মুক্ত পুরুষ তাই সমাজের কোনো বাঁধন মানেন নাই। তবে সমাজ তাঁহাদের ছাড়িবে কেন? তখন তাঁহারা বলিয়াছেন, 'আমরা পাগল, আমাদের কথা ছাড়িয়া দাও। পাগলের তো কোনো দায়িত্ব নাই।' বাউল অর্থ বায়ুগ্রস্ত, অর্থাৎ পাগল। আর তাঁহারা বলেন, 'মনে করিও যেন সামাজিক হিসাবে আমরা মরিয়াই গেছি।' মৃতের কাছে তো কোনো সামাজিক দাবি চলে না। তাই বাউলদের সাধনার আর এক অর্থ হল 'জগন্তে মরা'।[১৫]

অধ্যাপক দুলাল চৌধুরী বাউল গান ও তাদের ধর্মসাধনার কথা প্রসঙ্গে বলেছেন—

> বাউল সামগ্রিকভাবে তত্ত্বমূলক গান।... বাউল সাধকদের ধর্ম সাধনার রূপটি নানাভাবে বাউলগানের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে।... এঁরা বৌদ্ধ সহজিয়া মুসলিম সুফি ভাবধারা এবং হিন্দু বৈষ্ণবীয়, বেশরা ফকির আদর্শের সমন্বয়ে নিজেদের ধর্মকে উপলব্ধি ও প্রচার করেন। এঁদের আরাধ্য হলেন 'সাঁই', 'দয়ালগুরু' অর্থাৎ স্বামী যিনি বিধাতাও বটেন। 'উল্টা' সাধনা

করেন অর্থাৎ আর পাঁচজনের মতো সাধনা এঁদের নয়, মন্দির-মসজিদ দেউলে এঁদের বিশ্বাস নেই। মুক্ত আকাশের নিচের পথই এঁদের সম্বল।[১৬]

পল্লিপ্রকৃতির মুক্তাঙ্গানে বাউলদের সাধনা। আজও পল্লিগ্রামেই তাদের অবস্থান। শহরের মাল্টিপ্লেক্স, থিয়েটার ও পাঁচ তারা হোটেলের ঠাণ্ডা ঘরে বাজে ক্যানেস্তারা, স্যাক্সোফোন। বিটোফেনের মিউজিকও সেখানে কিছুটা ম্লান। তাই সেখানে বাউলের একতারার কোনো জায়গা হয় না। উঁচু উঁচু মিনার থেকে অনেক দূরে কোনো এক নদীর তীরে শান্ত-সমাহিত একাগ্রতায় আজও বাউল গেয়ে যায়—

আমি কোথায় পাব তারে।
আমার মনের মানুষ যে রে॥

আর আমাদের প্রাণে বাজে—

আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে।
তাই হেরি তায় সকল খানে॥

তবে সবকিছুর ঊর্ধ্বে—

খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশপাথর।
মাথায় বৃহৎ জটা ধূলায় কাদায় কটা
মলিন ছায়ার মতো ক্ষীণ কলেবর।

<u>উৎসের সন্ধানে</u>

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'পরশ পাথর', "সঞ্চয়িতা", রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, অষ্টম মুদ্রণ ১ ফেব্রুয়ারি ২০০৭, পৃ. ১৫৮
২. https://www.britannica.com/science/self-actualization
৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে', "সঞ্চয়িতা", রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, অষ্টম মুদ্রণ ১ ফেব্রুয়ারি, ২০০৭, পৃ. ৩৬৬
৪. https://www.britannica.com/science/self-actualization
৫. Prof. Suniti Kumar Chatterji : 'The Origin and Development of the Bengali Language', Rupa & Co., New Delhi, p. 423
৬. ড. সুকুমার সেন : 'ভাষার ইতিবৃত্ত', আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, সপ্তম মুদ্রণ, পৃ. ৫২-৫৩
৭. ড. সুকুমার সেন : 'ব্যুৎপত্তি সিদ্ধার্থ বাংলা কোষ', পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০ মে ২০০৩, পৃ. ৩০৪
৮. রাজশেখর বসু : 'চলন্তিকা', এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা. লি., কলকাতা, ত্রয়োদশ সংস্করণ, ১৩৮৯, পৃ. ৪৯১
৯. ড. সঞ্জয় প্রামাণিক : 'প্রসঙ্গ মধ্যযুগ : বাউল গানের তত্ত্বকথা এবং ভাষা', অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০১২, পৃ. ১২
১০. খগেন্দ্রনাথ মিত্র : 'মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণ বিজয়', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৪৪, পৃ. ৫২৯

১১. তদেব
১২. কৃষ্ণদাস কবিরাজ : 'চৈতন্যচরিতামৃত' আদিখণ্ডের ১৬ পরিচ্ছেদ
১৩. তদেব : আদি খণ্ডের ২১ পরিচ্ছেদ
১৪. তদেব : অন্ত্যলীলা
১৫. অধ্যাপক শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী : 'বাংলার বাউল', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৩ (১৯৪৯ খ্রি. লীলা বক্তৃতা)
১৬. ড. দুলাল চৌধুরী : 'বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ', আকাদেমি অব্ ফোকলোর, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৪, পৃ. ১৬৬-৬৭

তথ্যের সন্ধানে

১. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : 'বাংলার বাউল ও বাউল গান', ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ নববর্ষ ১৪০৮
২. খগেন্দ্রনাথ মিত্র : 'মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণ বিজয়', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৪৪
৩. মোস্তাক আহ্মদ : 'লালন জীবন ও সংগীতের তত্ত্ব দর্শন', ঢাকা টাউন লাইব্রেরি, ঢাকা, প্রথাম প্রকাশ অমর ২১ বইমেলা, ২০১৪
৪. ড. দুলাল চৌধুরী : 'বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ', আকাদেমি অব্ ফোকলোর, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৪
৫. রাজশেখর বসু : 'চলন্তিকা', এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা.লি., কলকাতা, ত্রয়োদশ সংস্করণ, ১৩৮৯
৬. ড. সঞ্জয় প্রামানিক : 'প্রসঙ্গ মধ্যযুগ : বাউল গানের তত্ত্বকথা এবং ভাষা', অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০১২
৭. ড. সুকুমার সেন : 'ভাষার ইতিবৃত্ত', আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, সপ্তম মুদ্রণ
৮. ড. সুকুমার সেন : 'ব্যুৎপত্তি সিদ্ধার্থ বাংলা কোষ', পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০ মে ২০০৩
৯. সুধীর চক্রবর্তী : 'বাউল ফকির কথা', আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি., কলকাতা, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, আগস্ট ২০০৯

সুধীর চক্রবর্তীর ইন্টারভিউ

দীপঙ্কর মল্লিক

ইচ্ছা ছিল বাউল গান নিয়ে নিজের মতো করে পড়াশোনা করার। ভারত সেবাশ্রম সংঘে প্রণব ছাত্রাবাসে থাকার সময় নিয়মিত বাউলদের সম্পর্কে বইপত্র পড়া শুরু করি। কোনো সেমিনার আয়োজনের খবর পেলে সবার আগে গিয়ে নাম লিখিয়ে নিজের জীবন ধন্য হয়েছে বলে মনে করি। এমনকি সুযোগ পেলে খোলা মাঠের নীচে যেখানে কোনো বারোয়ারি পুজো উপলক্ষ্যে বাউল গান হচ্ছে জানতে পারলে বসে পরতাম। পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরে লোকসংস্কৃতি বিভাগে পড়াতে গিয়ে বাউল গান সম্পর্কে জানার আগ্রহ উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। আমি তখন বিভিন্ন বাউল সাধকের কাছে যাতায়াত শুরু করি। আউল-বাউল-সাঁই ধর্ম-তত্ত্ব সম্পর্কে আমার অনুরাগের কথা কাউকে বলতে পারিনি। কারণ বলার সেই স্পর্ধা বা যোগ্যতা আমি আজও অর্জন করতে পারিনি। কিন্তু এটা বুঝেছি, লোকায়ত বাংলার ধর্মসাধনাকে বুঝতে হলে বাউল ধর্মকে বাদ দিয়ে কিছু বোঝা যাবে না। বাউল গানকে শুধুমাত্র লোকসংগীত বলে বিচার করলে সে বিচার কেমন যেন জোলো বলে মনে হয়। ভাটিয়ালি, সারি, ঝুমুর, ভাদু, টুসু, জারি ইত্যাদি গানের পাশাপাশি বাউল গানকে রাখলে কোথাও যেন এই গানের স্বাতন্ত্র্য অন্যভাবে ধরা দেয়। ছোটোবেলায় অনেক পাঁচালি-কবিগান-তর্জা-ঢপগান-জাগগান-রাখালিয়া গান-ভাওয়াইয়া শুনেছি। গ্রাম বাংলার সঙ্গে শিকড়ের সম্পর্ক ছিল বলে বিভিন্ন পূজা-পার্বণ-উৎসব উপলক্ষ্যে লোকগান, যাত্রা, পাঁচালি, তর্জা, আগমনী-বিজয়া, মনসা ভাসান কত যে শুনেছি তার ঠিক নেই। কিন্তু বাউল গান সব সময় মনকে বিশেষভাবে টেনেছে। কেন টেনেছে আজও বুঝতে পারি না। কিন্তু এটা বুঝতে পারি বাউল গানের মধ্যে এমন কিছু আছে, যা অন্য কোনো সাধন সংগীতে পাওয়া যায় না। তবে একটা কথা না বলে থাকতে পারছি না, রামকৃষ্ণ মিশনে পড়ানোর সুবাদে প্রায় আঠারো বছর ধরে ইউজি ও পিজি স্তরের ছাত্রদের বৈষ্ণব পদাবলী পড়ানোর ফলে বৈষ্ণব গান আমার স্মৃতিসত্তা জুড়ে কেমন যেন আপনার জন হয়ে উঠেছে। সদানন্দদাস বাবাজী, রাধারানি গোস্বামী, সুমন ভট্টাচার্য, রাধাপদ ঘোষ, শ্যামলী দাসী—আরও কতজনের গান যে আমি সারারাত জেগে শুনেছি তার ঠিক নেই। বৈষ্ণব গানের মধ্যে আছে ধ্যানের জগৎ আর বাউল গানের মধ্যে আছে মনের জগৎ। বৈষ্ণব গান ধ্যানস্থ হতে শেখায়, আর বাউল গান মানুষের মধ্যে মানুষের ভগবানকে দেখাতে শেখায়। যতবার এই গান নিয়ে ভেবেছি, ততবার

দুটি শব্দ আমার মনের ইতিহাস-ভূগোল-দর্শন জুড়ে বার বার প্রতিধ্বনিত হয়েছে; আমি ইচ্ছা করলেও সেই শব্দযুগলকে সরিয়ে দিতে পারিনি। সে হল—'মনের মানুষ'। বাউলরাই আমাকে শিখিয়েছে, মনের মানুষকে মনের মাঝে অন্বেষণ করতে হয়। যে মানুষ ভিতরে আছে, যে মানুষ সুগভীর ভালোবাসার মধ্যে আমাকে নিরন্তর জাগিয়ে রেখেছে, সেই মানুষ তো আমার মনের মানুষ। আমাদের কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ইন্দ্রাশিস ব্যানার্জী, যাকে সবাই আই.বি. বলে ডাকে; সেই মানুষটি যখন মনের আনন্দে বাউল গান করে, তখন তাকে দেখে আমার মনে পড়ে নদিয়ার সেই পাগল, যে ঘরে ঘরে সানন্দে নাম বিতরণ করে গিয়েছে—সেই নিত্যানন্দের কথা। আমি ব্যক্তিগত ভাবে জাত-পাত-বর্ণ-বিদ্বেষ-ছুৎমার্গ বুঝি না; বুঝতে চাই না। কারণ, আমি দেখেছি যে মানুষের উপর সবথেকে বেশি বিশ্বাস রেখেছি, সেই মানুষ চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে; অথচ এমন কোনো মানুষ পাশে দাঁড়িয়েছে যাকে দেখে ভাবতেও পারিনি কী অসীম শক্তি তার মধ্যে আছে। বাউল গানে যদি তত্ত্ব বুঝে থাকি তাহলে এটাই হয়তো আমার উপলব্ধ তত্ত্ব—বাউল কোনো ভেদাভেদ মানে না। কেননা, পরমাত্মার সঙ্গে আমাদের কোনো ভেদ নেই। তার অর্থ এই নয়, সব মানুষের মধ্যেই সেই পরমতত্ত্ব বিরাজ করে। পরমতত্ত্ব তার মধ্যেই বিরাজ করে, যে মানুষ নিজেও সোনার মানুষ হয়ে ওঠে। আর সেই সোনার মানুষকে যদি পাওয়া যায়, যদি সাধক তাকে চিনে নেয়, তখন সে তাঁকে হৃদ মাঝারে রেখে দেয়, তাকে কখনো ছেড়ে দেয় না। ছেড়ে দেবেই বা কেন? কেননা, "ছেড়ে দিলে সোনার গৌর, আর তো গৌর পাব না"—একথা সাধকের মতো আর কে ভালো বোঝে?

২.

এবার একটু অন্য প্রসঙ্গে আসি। বাংলার লোকায়ত ধর্ম নিয়ে অনেক না হলেও বেশ কিছু বক্তৃতা আমি শুনেছি। আবার বেশ কিছু বইও পড়েছি। এই একটু করে পথ চলা আবার সেই পথ থেকে বেরিয়ে অন্য আর একটি পথে যাওয়া—এই যাতায়াতের ফাঁকে কখন যে মনের অগোচরে অনেকটা পিছনে পরে গিয়েছে লোকায়ত ধর্ম সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা—তার শেষ নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁরা পড়ান, সেই সব বিদগ্ধ পণ্ডিতরা মূলত তাঁদের ভালোলাগার বিষয়গুলি নিয়ে নিরন্তর গবেষণা করা ও গবেষণা করানোর সুযোগ পান। আমাদের এদিক থেকে "বিধি বাম মম প্রতি" অবস্থা। অর্থাৎ আমরা সমস্ত বিষয়ে পড়াতে ইচ্ছুক না হলেও পড়াতে বাধ্য হই। তার মানে এই নয়, আমরা খুব জোর করে নিমপাতার রস খাওয়ার মতো ছাত্রদের অরুচিকর বিষয় পড়ানোর বিরক্তি উৎপাদন করে থাকি।

ইতিমধ্যে একটা কথা বলে রাখি। ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাননীয় কলাধ্যক্ষ ও বিভাগীয় প্রধানের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হওয়ায় তাঁর বাউল প্রীতি দেখে আমি মুগ্ধ হই। তিনি বাউল বিষয়ক একটি সংখ্যা করার জন্যে আমাকে জানান। তাঁরই কথানুসারে আবার বাউল সম্পর্কে নিয়ম করে না হলেও পড়াশোনা শুরু করি। আর সেই সময় যাঁর বইপত্র আমার হাতের কাছে পৌঁছায়, তিনি হলেন সুধীর চক্রবর্তী। আমি ধীরে ধীরে তাঁর জ্ঞানসমুদ্রের গহন গভীর স্রোতের সামনে দাঁড়ানোর বাসনা প্রকাশ করি। কিন্তু তাঁর সেই গভীর পাণ্ডিত্যের সামনে দাঁড়িয়ে শুধু মুগ্ধ হয়ে সেই সুগভীর জলের সৌন্দর্য দর্শন করা ছাড়া আমার কোনো

প্রাপ্তি যোগ ঘটেনি। আমি মন দিয়ে পড়তে থাকি 'ব্রাত্য লোকায়ত লালন।' এই বইয়ের প্রত্যেকটি শব্দোচ্চারণ আমাকে অভিভূত করে। প্রত্যেকটি অধ্যায় আমি মুগ্ধের মতো পড়তে থাকি। বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁরা দ্রোণাচার্য এবং যাঁরা বিশ্বাস করেন আসমুদ্র হিমাচল তাদের হস্তগত, আমি তাদের কথা মনে রেখেও বলতে পারি এমন বিশ্ববীক্ষার উপলব্ধি সঞ্জাত জ্ঞানের আকরভূমি আমাদের এই বঙ্গদেশে কমই আছেন। 'আপন ঘরে পরে আমি', 'একি আজব কারখানা', 'উৎস থেকে উৎসারিত', 'নিজ ভাষায় পরবাসী', 'যেথায় থাকে সবার অধম' পড়তে পড়তে আমি হারিয়ে যাই, মনে হয় এ কোন ভুবনে নিয়ে চলেছেন এই প্রাজ্ঞ দার্শনিক অধ্যাপক। নিম্নবর্গের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা, লোকায়ত সংস্কৃতির প্রতি সুনিষ্ঠ দায়, সবঅলটার্ন সম্পর্কে তাঁর ভাবনা-চিন্তা আমাকে মুগ্ধ করে। তিনি লালন নিয়ে যখন বলতে থাকেন, তখন আমরা অভিভূত হই। বাউল-ফকিরদের সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি আমাকে অভিভূত করে। একজন কলেজের অধ্যাপক নিঃসন্দেহে ভাবসাধক হবেন না, আমি ধরে নিতে পারি তিনি মধ্যবিত্ত জীবন-যাপন করেন; কিন্তু যা তাঁর সম্পর্কে বলা যায় না, তা হল এই তিনি আর হাজার-লক্ষ মধ্যবিত্তের মতো নিম্নবর্গের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন না। ফলে সুধীর চক্রবর্তীর "ব্রাত্য লোকায়ত লালন" এক বস্তুনিষ্ঠ গবেষকের অসামান্য তথ্যনিষ্ঠ বিদ্যাচর্চার প্রমাণ। লালন নিয়ে তাঁর যে বিস্তারিত লেখা পড়ার জগৎ, সেই জগতের সন্ধান আমরা হয়তো বা এখনও সম্পূর্ণ জানি না। পাশাপাশি তিনি আলোচনা করে চলেন, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, আলাওল, রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র নিয়ে। তিনি একটার পর একটা বিতর্ক তোলেন। পাঠক সেই বিতর্কের পথ ধরে এগিয়ে চলেন। তাঁর বাউল সম্পর্কে গবেষণাধর্মী লেখাপত্র কোনোরকম ভাবালুতায় আচ্ছন্ন নয়। কিন্তু একথা অস্বীকার করি কি করে, তিনি যখন লেখেন মনে হয় তিনি নিজে বাউল হয়ে গিয়েছেন। বাউলরা কোনো ধর্ম-আচার-মন্ত্র-শাস্ত্র মানেন না, মানতে চানও না। সুরদাস, কবির, নানক, দাদু, মীরার মতো লালন মনের মানুষ অন্বেষণ করেছেন। তিনি নিজের মধ্যে নিজেকে খুঁজেছেন। তাঁর গানগুলি এত সুন্দর যে সুধীর চক্রবর্তী লিখেছেন—

> লালন শাহ মরমীয় লোক কবিদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সমতুল্য। এত চমৎকার ভাষা লালন শাহ ব্যবহার করেছেন যে-কোনো মুসলমান কবি রচনা তাঁর গানের সামনে দাঁড়াতে পারে না।[১]

সুধীর চক্রবর্তী লালন সম্পর্কিত আলোচনায় রামপ্রসাদের কথা উচ্চারণ করে বলেন, আধুনিকতায়, মানবিকতা বোধে ও প্রকাশ ভঙ্গির দৃঢ়তায় লালন রামপ্রসাদকে অতিক্রম করে যান। লালনের গানে অভিভূত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। যদিও পরবর্তীকালে বাউলদের সম্পর্কে তাঁর উৎসাহের জোয়ারের স্রোত কোনো পাড় ভাঙা ঢেউ নিয়ে আছড়ে পরেনি। তবু যাদেরকে তিনি অন্ত্যজ, মন্ত্রবর্জিত বলেছেন, তারাই 'একতারা হাতে চলেছে গানের ধারা বেয়ে।' ফলে রবীন্দ্রনাথ বাউলদের অস্বীকার করতে পারেননি। 'গোরা' উপন্যাসেও দেখেছি সেই বাউল গান। বাউলরা কোনো দেবতাকে মন্দিরের গণ্ডিবদ্ধ প্রাঙ্গনে অন্বেষণ করেন না। তারা মূলত মানুষ রতনধন খোঁজেন। কুবির গোঁসাই তাই গেয়েছেন—

মানুষ হয়ে মানুষ মানো
মানুষ হয়ে মানুষ জানো

মানুষ হয়ে মানুষ চেনো
মানুষ রতনধন।
করো সেই মানুষের অন্বেষণ॥

সুধীর চক্রবর্তীর 'বাউল ফকির কথা' বইটি প্রকাশিত হয়েছে আনন্দ পাবলিকেশন থেকে। এই বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি' কেন্দ্র থেকে। এই বইটি ২০০২ সালে আনন্দ পুরস্কার পায়। পরে ২০০৪ সালে সাহিত্য আকাদেমি সম্মান পায়। ২০০৯ সালে বইটি প্রকাশিত হয় আনন্দ পাবলিশার্সের পক্ষ থেকে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, এই বইটি এতগুলি পুরস্কার না পেলেও কোনো যায় আসত না। কেননা, এই বই পাঠকের কাছ থেকে যে পুরস্কার পেয়েছে এবং ভবিষ্যতে ক্রমান্বয়ে পেতে থাকবে, তা নিঃসন্দেহে সবথেকে বড়ো প্রাপ্তির কথা। বীরভূম-বাঁকুড়া-মুর্শিদাবাদ-নদিয়া— পশ্চিমবঙ্গের এই চারটি জেলা মূলত বাউল অধ্যুষিত। বর্ধমান-মেদিনীপুর-পুরুলিয়া জেলাতে বাউলদের দেখা যায়। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরেও বাউলদের বসতি রয়েছে। জেলা ভেদে বাউলদের যে পার্থক্য আছে, বীরভূমের সঙ্গে নদিয়া, উত্তরবঙ্গের সঙ্গে দক্ষিণ বঙ্গের বাউল সাধকদের চিন্তা-চেতনা-জীবনদর্শনগত পার্থক্য রয়েছে।

বাউলরা ভাবসাধক। তাঁরা আত্মতত্ত্ব সম্পর্কে গভীর ধারণা রাখেন। নিজেদের ডেরা, পর্ণকুটির, আখড়া ও আশ্রমের বাইরে তাঁরা মেলা ও মহোৎসবে যোগ দেন। এই বাউলদের নিয়ে নানা ওয়ার্কশপ ও সেমিনার হয়। কত পণ্ডিতরা তাঁদের উপরে গবেষণা করেন। কত সুকণ্ঠের অধিকারী শহুরে শিল্পীরা বাউল গান করেন। বিনিময়ে ভালো অর্থও দাবি করেন। কিন্তু এহোবাহ্য। কেননা, যাঁরা আত্মানুসন্ধান করে না, যাঁরা বাউল তত্ত্ব বোঝে না, যারা যোগসাধনা জানে না; তাঁদের পক্ষে বাউল গান শোনা আর গোটাকয়েক টাকা দিয়ে হাততালি দেওয়া নেহাৎ সৌখিনতার পরিচয় বহন করে। জাতপাতবিরোধী বাউলরা মনে করেন, ধর্ম-কুল-গোত্র-জাতের মধ্যেই যে বিভাজন দেখানো হয় তা আসলে মানুষের তৈরি করা বিভাজন রেখা।

বাউল শুধুমাত্র পোশাকে হয় না। প্রাত্যহিক জীবনাচরণে বোঝা যায়, কে প্রকৃত বাউল। সাজা বাউল ও সাধক বাউল কখনও এক হতে পারেন না। সুধীর চক্রবর্তী সেই প্রসঙ্গে ইঙ্গিত করে বলেছেন—

> একটু ঘনিষ্ঠ বিচারে হয়তো দেখা যাবে কেউ কর্তাভজা, কেউ পাটুলি স্রোতের সহজিয়া, কেউ জাতবৈষ্ণব, কেউ সাহেবধনী, কেউ মাতুয়াপন্থী, কেউ যোগী—কিন্তু সকলেই ঢুকে গেছে বাউলের সর্বজনীন পরিচয়ের গৌরবে—কারণ বাউলদের গ্রহণীয়তা সমাজে আজকাল খুব ব্যাপক। কুষ্টিয়া অঞ্চলের ফকিররা সাদা আলখাল্লা ও তহবন্দ পরে, বাবরি রাখে, কিন্তু নিজেদের বলে বাউল। আবার পশ্চিমবঙ্গের ঝুঁটি বাঁধা গেরুয়াধারীরাও বাউল।[২]

বাউল গান খুব আকর্ষণীয় বলে আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিরাও বাউল সম্প্রদায়ে যোগ দেন। কিন্তু তাদের সেই দৈহিক বেশ বিন্যাসের সঙ্গে মনের কোনো সম্পর্ক বা যোগসাধন হয় না। কেননা, বাউল তত্ত্ব হল সুগভীর দার্শনিক চিন্তা। শুধুমাত্র সুর সাধনায় এই গানকে পাওয়া যায় না। বাউল মত-পথ-সাধনা সম্পূর্ণ আলাদা। সেখানে দেহতত্ত্ব সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়ে থাকে।

বাউলরা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যস্থতায় সাধনার তুরীয় মার্গে অবস্থান করতে পারেন। ফলে দেহ সাধনা বাউল সাধনার মূল অঙ্গ। সুধীর চক্রবর্তী বহু জায়গায় ক্ষেত্র সমীক্ষা করেছেন। তিনি ফকিরদের সম্পর্কে বহু তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তিনি এমনভাবে বাউলদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছন যে, আমরা যেন তাঁরই পথ ধরে পুনরায় বাউলসাধকদের ঠিকানায় পৌঁছে যেতে পারি। তিনি জয়দেবের পৌষ সংক্রান্তির মেলার কথা বলেছেন। সারা ভারতের বহু মানুষ সেখানে উপস্থিত হন। বাংলার বাউলের সমৃদ্ধি ও সারস্বত সাধনার প্রতিষ্ঠা ভূমি হল এই কেঁদুলি। জয়দেব-কেঁদুলির মেলা তাই বর্তমানে তীর্থভূমি দর্শন করার মতো। বীরভূমের বাউলদের প্রসিদ্ধি অর্জনে রবীন্দ্র-পরিকরদের অনেকেই অত্যন্ত আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। নন্দলাল বসু, রামকিঙ্কর বেইজ, সোমনাথ হোর প্রমুখ বিশ্ববিশ্রুত শিল্পীরা বাউলের স্কেচ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ নিজে পৌষমেলাকে ঘিরে গ্রামীণ সংস্কৃতির উজ্জীবন করতে চেয়েছিলেন। সেখানে বাউলরা আসতেন। আজও পৌষ মেলায় বাউলরা আসেন। কিন্তু সেই পরিবেশ বদলে গিয়েছে। বাউলদের তত্ত্ব নির্ভর গানের থেকেও অনেক সময় বড়ো হয়ে ওঠে আধুনিক জীবনকেন্দ্রিক গানের সুর ও স্বর। অথচ ভাবের গভীরে আত্মগোপন না করলে বাউল কখনও পরম রতনকে উপলব্ধি করতে পরেন না। ফকিরি গানের আসরে কত মানুষ এক জায়গায় বসে জাত-ধর্ম ভুলে বাউল গান করে থাকেন। সুধীর চক্রবর্তী কত অসংখ্য বাউলের সঙ্গে তাঁর পাঠককে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। প্রত্যেক বাউলের নাম-ধাম-ক্রিয়া-কর্ম সব যেন তাঁর ছোটোবেলায় নামতা পরার মতোই মুখস্থ। ভাবের বাউল, সাজা বাউল, দরবেশি পোষাকে বাউল, একতারা ও ডুবকি হাতে বাউল—এঁদের তো তিনি কাছের থেকে দেখেছেন, এদের সঙ্গে গভীর সখ্য স্থাপন করেছেন। তিনি জানেন ফকিরের গেরস্থালি কেমন হয়। তিনি জানেন কারা সাজা ফকির আর কারা সাধক ফকির। ফলে তাঁর বাউল নিয়ে আলোচনা-গবেষণা এমনভাবে চলতে থাকে মনে হয় তিনি আমাদের সঙ্গে খোলামেলা গল্প করে চলেছেন। তাঁর লেখার ভাষাও এতটাই দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে আমরা যেন তাঁর পাশে বসে সেইসব মানুষের সঙ্গে পরিচিত হই—

> ষাটের শেষে বা সত্তর দশকের গোড়ায় যখন আমি গানের সন্ধানে গ্রামে ঘুরতাম তখন নদিয়ার বৃত্তিহুদায় পেলাম কুবির গোঁসাইয়ের ঢাউস এক গানের খাতা। হাজারের ওপরে গান। গানের যিনি ভাণ্ডারী সেই রামপ্রসাদ ঘোষ সম্পন্ন চাষি গৃহস্থ। খুব আপ্যায়ন করলেন, খাওয়ালেন। এক পুরনো কাঠের সিন্দুক খুলে লাল সালুতে মোড়া গোঁসাইয়ের গানের খাতা বার করে মাথায় ঠেকিয়ে তারপরে আমাকে দিয়ে বললেন, 'এই খাতায় কুবির গোঁসাইয়ের গান সবই আছে। আমার পিতা দাসানুদাস ঘোষ, তাঁর পিতা রামলাল ঘোষের হাতের লেখায় এটা মূল খাতার নকল। দেড়শো বছর আগেকার পুঁথি।[৩]

বাউলদের সেমিনারে গেলে দেখা যায় দলে দলে ভিড় জমেছে। একজন বাউলের সঙ্গে আরও অনেকের আগমন ঘটে। ফলে যারা উদ্যোক্তা তাদের বাজেট বেড়ে যায়। যিনি গান করেন, তিনি ভালো তত্ত্ব জানেন না; যিনি তত্ত্ব জানেন, তিনি ব্যাখ্যা জানেন না; আবার যিনি ব্যাখ্যা জানেন তিনি সুরের সাধক নন। ফলে দেখা যায় অধিকাংশ সেমিনারে যা আসার কথা তার থেকে অনেক মানুষ উপস্থিত হয়। ফলে শুরু হয় চাপা অসন্তোষ। এই ঘটনাগুলি যখন

সুধীর চক্রবর্তী শোনেন, তখন তিনি ঔপন্যাসিকের সফল শব্দোচ্চারণের অপূর্ব ভঙ্গিতে বলেন এমন রসালো কথা—

> —এত বাউল আছে এ অঞ্চলে?
>
> —না না, সবাই বাউল নাকি? এসে পড়েছে। একসেট গেরুয়া পোশাক আছে, গোটা দশেক গান জানে। ব্যস, তবে আর কী। এখন থাকতে দিতে হবে, গাণ্ডেপিণ্ডে গিলবে পাঁচ-ছ' বেলা, গাঁজা টানবে। যত্ত সব। মশাই, এর নাম লোকসংস্কৃতি? বাউলগানের উন্নয়ন? ধুস। ঘেন্না ধরে গেল। মানবসম্পদের টাকাই তো এখনও আসেনি। বুঝুন ঠেলা।[৪]

সত্যি কথা বলতে কী, সব বাউলের আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। ফলে তাঁরা সুযোগ পেলে অনাহূত অতিথির মতো এসে পড়ে। তবে আগের তুলনায় বাউলদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। তাঁরা দিব্যি গান গেয়ে জীবন অতিবাহিত করতে পারে। তবে সমস্যা হল এই, তাদের সেই গানের উপরে শহরের সংগীত বিশ্বায়নের যাবতীয় শক্তি নিয়ে উপস্থিত হওয়ায় বাউলগান বিকৃত হয়েছে। পাশাপাশি এটাও দেখা যায়, অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে যে বাউলরা কথা বলছেন, গাইছেন তাঁদের অনেকেই অপসংস্কৃতিকেই প্রশ্রয় দিয়ে চলেছেন। সেই সব সাজা বাউলরা চটজলদি গান বাঁধতে পারেন। কিন্তু যাঁরা প্রকৃত লোকায়ত ধর্ম-দর্শন বোঝেন, যাঁরা প্রকৃত ফকির, যাঁরা ফিকির জানেন না সেই সব বাউল এখনও আর্থিকভাবে সম্পন্ন নন। অর্থাৎ দেখা যায়, বাউলদের মধ্যে ভেদ রয়েছে। ইদানীং দেখা যায়, বীরভূমের নানা জায়গায় বাউলরা বাদ্যযন্ত্র সহকারে গান শোনাতে ব্যস্ত। বাউল বলতে যে উদাসী মানুষরা থাকেন, তাঁরা কখনও নিজেদের আচার-আচরণ, বেশ-ভূষণ ত্যাগ করেন না। তাঁরা সৎ। তাঁরা আত্মসুখী। তাঁরা তাত্ত্বিক। কোনো সার্টিফিকেট তাঁরা চান না। পছন্দও করেন না। তাঁরা ক্যাসেটশিল্পী হতে চান না। মাদকতার মধ্যে জীবনে সোনার ফসল ছুঁড়ে ফেলে দেন না। পরীক্ষিতবালা, সনজিৎ মণ্ডলকে সুধীর চক্রবর্তী বলেছেন, "সফল ক্যাসেটশিল্পী"। তাঁদের মডেল হলেন পুর্ণদাস বা গোষ্ঠগোপাল। এঁরা নানা রকম আধুনিক বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করেন। দেশ-বিদেশে গান গেয়ে বেড়ান। এরা ধরাছোঁয়ার বাইরে। অথচ যাঁরা প্রকৃত বাউল তাঁরা নিম্নবর্গ থেকে উঠে আসা মানুষ। তাঁরা তত্ত্বজ্ঞানী ও রসিক। তাঁরা গুরুকেন্দ্রিক আচার-আচরণ মানেন। তাঁদের চাওয়া-পাওয়া কম। তাঁরা মনে করেন জীবনের পরম পাওয়া হল মনের মানুষের অনুসন্ধান। তাঁরা পরমতত্ত্ব অন্বেষণ করেন। এই বাউলরা 'মর্কট বৈরাগী' নন। এঁরা প্রকৃত পক্ষেই ব্রাত্য। এঁরা গোঁড়ামিতে বিশ্বাস করেন না। মন্ত্রশিক্ষা অপেক্ষা মন শিক্ষায় অধিক গুরুত্ব দেন। এঁরা কায়াবাদী। এঁরা গুপ্ত সাধনা করেন। দীক্ষা দেন ও প্রকৃত পথের সন্ধান দেন। সুধীর চক্রবর্তী দেশ-বিদেশের বাউল অনুরাগীদের কথাও বলেছেন। তিনি বাউলদের মনের কথা শুনিয়েছেন। তিনি স্পষ্টই জানিয়েছেন এই বাউলরা যৌন সর্বস্ব জীবন-যাপন করেন না। মানব দেহ-ই তাঁদের আরাধ্য। মানুষ থেকে মানুষের সৃষ্টির মধ্যে রয়েছে ঈশ্বরের খেলা। সুতরাং মানুষের মধ্যেই সেই পরম তত্ত্বের অবস্থান। বাউলরা ভাব সাধক। তাঁরা জানেন গুরু ছাড়া কেউ সঠিক পথ দেখাতে পারেন না। তাই তাঁরা গুরুকেই জীবনের একমাত্র অঙ্গীকার বলে মনে করেন। সুধীর চক্রবর্তী বাউলদের জীবনের যে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন তার মধ্যে শুধু আর্থ-সমাজ-সংস্কৃতির পরিবেশ ফুটে ওঠে না; বরং তার মধ্যে দীনহীন বাউলদের প্রকৃত

জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। আর সেই জীবনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন সুধীর চক্রবর্তী।

৩.

এবার আসি, শেষ কথায়। যে সুধীর চক্রবর্তীর বইয়ের মধ্যে মুখ রেখে সমস্ত কাজ ভুলে যেতে হয়, সেই সুধীর চক্রবর্তীর বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম বাউল জীবন-দর্শন-গান সম্পর্কে তাঁর কথা শুনতে। যাঁর 'জনপদাবলি' গ্রন্থের বিন্যাস কৌশল যে-কোনো পাঠককে মন্ত্রমুগ্ধের মতো আকর্ষণ করে, যাঁর বাউল-ফকির নিয়ে গবেষণার শেষ নেই, সেই শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মননজীবী মানুষ সুধীর চক্রবর্তীর একটি ইন্টারভিউ আমি নিয়েছিলাম। কিন্তু সমস্যা হল এই তাঁর পাশে বসে যখন বাউল ফকিরদের কথা শুনছিলাম, তখন আমি এতটাই অভিভূত-আপ্লুত-আবেশের মধ্যে ছিলাম যে, প্রত্যেকটি শব্দ ধরে নোট নেওয়ার মতো মেধা-মনন-বুদ্ধির প্রখর দীপ্ত তেজ তখন আমার ছিল না। বলতে দ্বিধা নেই, আমি তখন এক অধ্যাপক-বাউল-গবেষকের সামনে নতজানু শিক্ষানবীশ। ফলে ভাবের ঘোরে থাকারই কথা। তিনি আমায় বলেছিলেন, বাউল নিয়ে তাঁর প্রথম আগ্রহ থেকে তিনি ইউ.জি.সি-র স্কলারশিপ নিয়ে 'Folk Songs of Nadia'-এর কাজ করেন। ইউ.জি.সি-র অর্থানুকূল্যে তিনি দিনের পর দিন ক্ষেত্রসমীক্ষায় নিমগ্ন থাকেন। গ্রামের মধ্যে তিনি ঢুকে যেতেন। বাউল ফকিরদের সঙ্গে কথা বলতেন। গ্রামেই থেকে যেতেন। তাঁদের সঙ্গেই মিশে যেতেন। নিজের বনেদিয়ানা বাদ দিয়ে লোকায়ত জীবনকেই গ্রহণ করতেন।

বছর পাঁচেক সময় লেগেছিল বাউলদের অন্তর্নিহিত তাত্ত্বিক ভাষা আয়ত্ত করতে। তিনি অনুভব করেন বৈষ্ণব পদাবলি ও শাক্ত পদাবলির পাশাপাশি জনপদাবলি 'Paralal text'। সেখানে ধর্ম নিরপেক্ষতা আছে। ধর্ম নির্লিপ্ত চেতনা আছে। ধর্মের আচরণগত দিক নিয়ে তখন থেকেই ভেবেছেন সুধীর চক্রবর্তী। তিনি উপলব্ধি করেছেন, বাউলদের প্রধান আকর্ষণ হল মনের মানুষ। মানুষের মধ্যেই রয়েছে পরমেশ্বর। ফলে প্রেম হল শেষ কথা। জীবের নিজস্ব প্রেম আছে, পশুদের নিজস্ব কোনো প্রেম নেই। পশুরা instinct-নির্ভর। আমাদের প্রেমে উত্তরণ আছে, পশুদের প্রেমে কোনোরকম উত্তরণ নেই। ঈশ্বর মানুষকে সব থেকে বেশি শক্তি দিয়েছেন। দেবতারাও মানুষ হয়েছেন। তাই রাম, কৃষ্ণ, চৈতন্য—এঁরা সবাই মানুষ রূপেই অবতীর্ণ হয়েছেন।

সুধীর চক্রবর্তী অনুভব করতে চেয়েছেন লোকায়ত শক্তির মূল আধার কী? তিনি বলেছেন, আমাদের ধারণ, করণ, কর্তৃ হলেন মা। তাই "মায়ের এক ফোঁটা দুধের ঋণ, শোধ হবে না কোনোদিন।" আমি তাকে প্রশ্ন করেছিলাম, বাউলদের আর্থিকসংগতি সেই অর্থে নেই—একথা যেমন ঠিক; তেমন অনেক বাউল আছেন, যাঁরা এ.সি. বাড়ি, এ.সি. গাড়ি ছাড়া ভাবতেই পারেন না। তাঁরা আগে থেকে বলে নেন, থাকার জায়গায় এ.সি. আছে কিনা। তাহলে এঁরা কীসের বাউল। আমার এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, আর্থিক দিক থেকে সংগতি সম্পন্ন হলে তিনি লোকায়ত হবেন না। লোকায়তরা কখনও বিপুল ঐশ্বর্যের সম্ভারে থাকতে পারেন না। এই প্রসঙ্গে তিনি আমাকে সাধক বাউল আর গায়ক বাউলের কথা বলেন। তিনি জানান সাধক বাউলের কাছে আমাদের যেতে হয়, আর গায়ক বাউলরা আমাদের কাছে আসেন। সেই গায়ক

বাউলরাই স্টেজ করেন, তাঁরা টিভির পর্দায় ভেসে ওঠেন, সেমিনারে বক্তৃতা করেন। তাঁরা সাজুগুজু করেন, তাঁদের কোরিওগ্রাফির প্রয়োজন হয়। কিন্তু প্রকৃত বাউল Communicate করতে চান না। তাঁরা সবার সামনে আসতে চান না। এই বাউলদের Dress coat সম্পূর্ণ আলাদা। আমেরিকায় প্রথম বাউলদের নিয়ে যান হিতব্রত রায় (বাচ্চু রায়)। এই বাউলদের পোশাকের ভিন্নতা রয়েছে। উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গে বাউলরা সাদা পোশাক পড়েন। তাঁরা তামার বালা পড়েন। পায়ে ঘুঙুর বাঁধেন। যাঁদেরকে Genuine Indian Baul বলা হয় তাঁরা আসলে 'Genuine' নন।

কথা প্রসঙ্গে সুধীর চক্রবর্তী আমায় বলেন, ক্ষিতিমোহন বসু বাউলদের কাছে যেতেন। বাউলরা যেতেন না। বাউলরা এখন চাকরি করেন, এজেন্টের মাধ্যমে গান করেন। তাঁরা ভিজেটিং কার্ডে লিখে রাখেন—"আমেরিকা ফেরৎ।" এদের সঙ্গে মূল ফকির ও বাউলদের পার্থক্য রয়েছে। বাউলরা দেহকে বাদ দিতে চাননি। তাঁরা জন্মান্তরবাদ, পরলোকবাদ, ঈশ্বরবাদ, সমাজবাদ, বিবাহ বন্ধন, নারী-পুরুষের ভেদ বৈষম্য, পুনরুজ্জীবনে বিশ্বাস, ভবিষ্যৎবাণীতে আস্থা—এ সব কিছু মানেন না। আমরা দেয়ালে টাঙাই ছবি; বাউলরা দেওয়ালে রাখেন বাদ্য যন্ত্র। এঁরা যৌনব্যাভিচারে যুক্ত নন। এঁরা মনোশিক্ষা লাভ করেন। তবে একটা কথা বলে রাখি সুধীর চক্রবর্তী বেশ আক্ষেপের সুরে আমায় বলেছেন—বাউল নষ্ট হয়ে গেছে টাকার কাছে। সাজা বাউল আজ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। প্রকৃত বাউল সমাজে প্রতিষ্ঠা পাননি। অবশ্য প্রকৃত বাউল প্রতিষ্ঠা চান না। বরং তিনি এটা চান তাঁর প্রকৃত নিষ্ঠা থাকুক পরম রতন সম্পর্কে। আজ যুগের পরিবর্তনের রথের চাকা যত এগিয়ে চলেছে, ততই বাউল গান ধর্ম-দর্শনে রূপান্তরিত হচ্ছে। ফলে লোকায়ত দর্শন ভাঙছে। অবশ্য সুধীর চক্রবর্তী মনে করেন, যা ভাঙে, তা-ই তো বেঁচে থাকে। জীবনকে দেখার এক সুদুর প্রসারী দৃষ্টিকোণ বাউলদের মধ্যে ছিল বলে, বাউলরা জীবনকে দেখতে পেয়েছেন তাঁদের নিজস্ব জীবন দর্শনের আলোয়। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, সুধীর চক্রবর্তী বাউলদের নিয়ে যেভাবে গোড়ার কথা রেখে শেষের কথা পর্যন্ত সুগভীর দার্শনিক প্রত্যয় থেকে গবেষণা ধর্মী একের পর এক প্রবন্ধ ও গ্রন্থ লিখেছেন তা থেকে প্রমাণিত হয়, বাউল দর্শন সম্পর্কে কী গভীর ধারণা তাঁর রয়েছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি, বাউল সাধনাকে জানতে ও বুঝতে হলে যাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে, নিঃসন্দেহে তাঁদের অন্যতম হলেন সুধীর চক্রবর্তী। আপনি যদি আমার সঙ্গে সহমত পোষণ করেন তাহলে অবশ্য জানাবেন।

বাউলের টানে রবীন্দ্রনাথ

সঞ্চিতা সাহা

বাংলা সাহিত্যের সকল শাখাতেই বিচরণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি একক প্রচেষ্টাতেই বাংলা সাহিত্যকে বিশ্ব সাহিত্যের প্রাঙ্গণে দাঁড় করিয়েছেন। লোকায়ত জীবন-সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল। সেই আগ্রহের টানে তিনি বাউল সংগীত নিয়ে তাঁর মতো করে ভেবেছেন। বাংলাদেশের কুষ্টিয়া, পাবনা থেকে পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম-বোলপুর-মুর্শিদাবাদ-জয়দেবের কেন্দুলি পর্যন্ত বাউলগানের বিস্তৃতি রয়েছে। তবে সময়ের আবর্তে লোকসংগীতের যে ঐতিহ্য, তা অনেকটা হারিয়ে যাচ্ছে। একমাত্র বাউলগানের মধ্যে রয়েছে লোকায়ত সংগীতের প্রাণের কথা। এই কারণেই বাউলগান গ্রাম থেকে শহর হয়ে বিশ্ববাসীর মনে পৌঁছেছে।

বাউলগান মূলত অধ্যাত্মগান। এই গানের বাইরে যে অর্থ, তার ভিতরেও একটি সাধারণ অর্থ থাকে। রবীন্দ্রনাথ বাউলগানের সেই সাধনার কথা পরবর্তীকালে বিভিন্ন বক্তব্যেও প্রকাশ করেছেন। শিলাইদহে অবস্থানকালে তিনি বাউলদের সংস্পর্শে আসেন। তিনি জানিয়েছেন— "শিলাইদহে যখন ছিলাম, বাউলদের সঙ্গে আমার সর্বদাই দেখা-সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা হতো।"[১] রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, লোকসংগীতের চেয়ে বাউলগান অনেক ছন্দবহুল। ১২৯০ বঙ্গাব্দে 'ভারতী' পত্রিকায় বাউলগান সম্পর্কে তাঁর প্রথম আগ্রহের প্রকাশ আমরা দেখি। এই পত্রিকায় কিছু বাউলগানও তাঁরই আগ্রহে ছাপা হয়। সাতাশ বছর বয়সে তিনি প্রায় লিখেছিলেন ৪০০টি গান। তাঁর গানে বাউল আঙ্গিকের সুর স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গান "খেপা তুই আছিস আপন খেয়াল ধরে" একটি অসামান্য বাউলগান।

'বিসর্জন' নাটকে আমরা যে সংগীতগুলি পাই, তার মধ্যে বাউল আঙ্গিকে "আমাকে কে নিবি ভাই" গানটি মুগ্ধ করার মতো। রবীন্দ্রনাথের বেশ কয়েকটি কালজয়ী গান যা প্রত্যেকের মুখে মুখে ঘোরে, তা বাউল আঙ্গিকেই রচিত হয়েছে। এমন কয়েকটি গান হলো—

১. নিত্য তোমার যে ফুল ফোটে ফুলবনে
২. রাঙিয়ে দিয়ে যাওগো এবার যাবার আগে
৩. ওরে বকুল পারুল

শেষের গানটির মধ্যে রয়েছে ঝুমুরের প্রভাব। রবীন্দ্রনাথের বাউল আঙ্গিকে রচিত গানগুলিতে লালন ফকির ও গগন হরকরার প্রভাব রয়েছে। ১৩১৪ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যাতে

'প্রবাসী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লালনের গান প্রকাশ করেন। এই বছরেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত 'ছন্দের প্রকৃতি' শিরোনামাঙ্কিত প্রবন্ধেও তিনি লালনের গানের প্রসঙ্গ তোলেন। এই প্রবন্ধটি পরে তাঁর 'ছন্দ' নামাঙ্কিত গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লালনপ্রীতির প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় ১৩১৪ বঙ্গাব্দের ভাদ্রমাসে 'প্রবাসী' পত্রিকায়। 'গোরা' উপন্যাসে প্রথম প্রকাশিত বাউল গানের দুটি পঙ্ক্তির উদ্ধৃতিতে তিনি লালনকে স্মরণ করেছেন। নায়ক বিনয়ের অভিব্যক্তি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> আলখাল্লা-পরা একটি বাউল নিকটে দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া গান গাহিতে লাগিল: খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়/ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতাম পাখির পায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন—

> বিনয়ের ইচ্ছা করিতে লাগিল বাউলকে ডাকিয়া এই অচিনপাখির গানটা লিখিয়া লয়, ভোর রাত্রে যখন শীত শীত করে অথচ গায়ে কাপড়টা টানিয়া লইতে উদ্যম থাকে না, তেমনি একটা আলস্যের ভাবে বাউলকে ডাকা হইল না, গান লেখাও হইল না, কেবল এ অচেনা পাখির সুরটা মনের মধ্যে গুন গুন করিতে লাগিল।

১৩১৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'জীবনস্মৃতি'র "গান সম্বন্ধে প্রবন্ধে" তিনি বলেছেন—"সেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিশ্বমোহিনীর দ্বারে আমার গানের সুর আমাকে আনিয়া উপস্থিত করিল এবং আমি কহিলাম—'ভুবন ভ্রমিয়া শেষে/এসেছি তোমারি দেশে/আমি অতিথি তোমারি দ্বারে, ওগো বিদেশিনী।' দেখিলাম বাউলের গানও ঠিক ওই একই কথা বলিতেছে। মাঝে বন্ধ খাঁচার মধ্যে আসিয়া অচিন পাখি বন্ধনহীন অচেনার কথা বলিয়া যায়; মন তাহাকে চিরন্তন করিয়া ধরিয়া রাখিতে চায়, কিন্তু পারে না। এই অচিন পাখির নিশব্দ যাওয়া-আসার খবর গানের সুর ছাড়া আর কে দিতে পারে।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনদেবতার যে তত্ত্ব বলেছেন, সেই তত্ত্বের মধ্যে রয়েছে বাউলদের মনের মানুষের সাদৃশ্য। তিনি লিখেছেন, বিশ্বদেবতা আছেন লোকে-লোকে, গ্রহ-চন্দ্র-তারায়। জীবনদেবতা বিশেষভাবে জীবনের আসনে অধিষ্ঠান করেন। হৃদয়ে হৃদয়ে তাঁর পীঠস্থান, সকল অনুভূতি, সকল অভিজ্ঞতার কেন্দ্রে তিনি রয়েছেন। বাউল তাকেই বলেছেন 'মনের মানুষ'। এই মনের মানুষের কথা তিনি পুনরায় উল্লেখ করেছেন 'Religion of man' বক্তৃতায়। অর্থাৎ বাউলদের সাধনা রবীন্দ্রজীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। রবীন্দ্রনাথের লেখার মধ্যে বাউল গানের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ নানা প্রসঙ্গে ব্যক্ত হয়েছে। তিনি যখন শিলাইদহে ছিলেন, তখন বাউলদের সঙ্গে নিত্য সাক্ষাৎ হয়েছে। তাঁর অনেক গানে বাউল জীবনদর্শন মিশে গিয়েছে। "আমি কোথায় পাবো তারে/আমার মনের মানুষ যে রে"—এই গানটির মধ্যে যে অসামান্য হৃদয়বাণী প্রকাশিত হয়েছে, তাতে দার্শনিক-কবি অভিভূত হয়েছিলেন। "মনের মানুষ" কথাটি তার হৃদয় ছুঁয়ে গিয়েছিল। তিনি বলেছেন "এমন বাউলের গান শুনেছি, ভাষার সরলতায়, ভাবের গভীরতায়, সুরের দরদে যার তুলনা মেলে না, তাতে যেমন গানের তত্ত্ব, তেমনি কাব্য রচনা, তেমনি ভক্তিরস মিশেছে। লোকসাহিত্যে এমন অপূর্বতা আর কোথাও যায় বলে বিশ্বাস করিনে।"[২] রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবনে বাউলের জীবন ও সাধনা অত্যন্ত

গুরুত্ব পেয়েছে। আমাদের দেশের ইতিহাস আজ পর্যন্ত প্রয়োজনের ইতিহাস। অথচ এর বাইরের যে বৃহত্তর মানুষের জীবন ইতিহাস, জীবন দর্শন রয়েছে, সেদিকে আমাদের গবেষকরা দৃষ্টি দেওয়ার সময় পাননি। যে সম্প্রীতির বন্ধনের কথা আমরা সবসময় বলি, সেই বন্ধনের বাণী বাউলরাই প্রথম শুনিয়েছেন। তাদের গানেই রয়েছে মিলনের বার্তা। তাঁরা বিরোধের বর্বরতাকে সরিয়ে দিয়ে কোরান ও পুরাণকে এক জায়গায় রেখেছেন। অর্থাৎ, হিন্দু-মুসলমানকে একাসনে বসিয়েছেন বাউলরা। বাউলগানে সেই সম্মিলনের তত্ত্ব পাই।[৩]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বাউলের অন্তরঙ্গ সম্পর্কের কতো গভীরতা ছিলো, সে তো তাঁর একাধিক গানে খুঁজে পাই। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি গানের কথা বলতে ইচ্ছে করছে। যেমন—

১. আমি তাঁরেই খুঁজে বেড়াই
২. আমি কান পেতে রই
৩. সে যে মনের মানুষ, কেন তারে বসিয়ে রাখিস
৪. আমার হিয়ার লুকিয়ে মাঝে লুকিয়ে ছিলে

এই গানগুলিতে রবীন্দ্রজীবন দর্শনের যে গভীরতা পাওয়া যায় তা অন্যত্রও দেখি, যেখানে আমরা প্রায়শ্চিত্ত, ফাল্গুনী, ডাকঘর নাটকের প্রধান চরিত্রের সংলাপে গভীর জীবনদর্শনের প্রসঙ্গ উঠে আসে। ধনঞ্জয় বৈরাগী, অন্ধবাউল ও ফকিরের মতো মানুষদের বক্তব্যের মধ্যে বাউল ধর্ম-তত্ত্ব-দর্শনের পরিচয় পাই।

উৎসের সন্ধানে

১. বাংলার সুফি সাধনা ও সংগীত, রবীন্দ্রমানসে বাউল সাধনার প্রভাব, পৃ. ১৫৮
২. শান্তিদেব ঘোষ : রবীন্দ্র সংগীত বিচিত্রা, পৃ. ৯৭
৩. তদেব : পৃ. ৯৮